ভারতবর্ষের ...

তত্ত্বকথা শুনিয়া ... ঋষিকুমার জিজ্ঞাসা করিতেন,—

"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ?" *

অতি প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সেই এক কথা পৃথিবীর সকল সকল যুগেই উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসিত হইয়া আসিতেছে! এই রহস্য করিতে গিয়া কত দেশে কত যুগে কত বিজ্ঞান, কত দর্শন ও কত ধর্ম্মের উ পতন হইতেছে, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা সহজ নহে। এই অসীম রহস্য এ অসীম যে, এক যুগে লোকে যাহাকে সত্য-সিদ্ধান্ত বলিয়া অবনত মস্তকে স্বীকা করিয়া আসিতেছিল, উন্নততর যুগে তাহাকেই লোকে 'অজ্ঞান' বলিয়া পরিত করতঃ নিত্য নূতন সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করিবার জন্য অনবরত মস্তি আলোড়িত করিতেছে! এই জগৎ-রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা যেমন স্বাভা সেইরূপ সার্ব্বভৌমিক—সকল দেশে সকল যুগে সমানরূপে বর্ত্তমা প্রভেদ কেবল উপায় নির্ব্বাচনে। এই জগৎ-রহস্য বুঝিতে গিয়া যুগের লোকে ব্যক্তিবিশেষের কথা অভ্রান্ত, সত্য বলিয়া বিশ্বাস ক লইয়াছে, কোন যুগে বা পুস্তক বিশেষের লিখিত তত্ত্বকে আপ্তবাক্য ব গ্রহণ করিয়াছে, আবার আজ কাল সেই সকল উপায় অগ্রাহ্য ক বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত লাভ করিবার জন্য অনুসন্ধিৎসা আরম্ভ হই এইরূপ জিজ্ঞাসা ও তত্ত্বনির্ণয়ের প্রণালীগত পার্থক্য থাকিলেও মানু যে এই অসীম রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে তাহা অকা

* সামবেদীয় তলবকার শ্রুতি।

ছে। ... দিকে বিস্তীর্ণ

বিজ্ঞান যতই নিত্যনূতন ... রহস্য প্র... করিয়া দিতেছে, সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়া মানুষ ততই নূতন সিদ্ধান্তের জন্য ব্যাকুল ছে! এই চেষ্টার ফলস্বরূপ সভ্যজগতে দুই শ্রেণীর সিদ্ধান্ত প্রচলিত —একটি আস্তিক অপরটি নাস্তিক!

হাত্মা হার্বার্ট স্পেনসার অন্ধ নাস্তিকতার ভ্রম অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন াছেন, সুতরাং তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। হার্বার্ট ার বর্ত্তমান জ্ঞান-গর্ব্বিত উন্নত যুগের একজন আরাধ্য শিক্ষাগুরু—তাঁহার ল বসিয়া দর্শন, বিজ্ঞান ও শিক্ষাতত্ত্বের অনেক কথা ঊনবিংশ শতাব্দী করিয়াছে ও করিতেছে। তাঁহার গভীর তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা বিমল জ্যোৎস্না-কের ন্যায় হৃদয়মুগ্ধকর বলিয়া বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত সম্প্রদায় মেই তাঁহার প্রচারিত 'অর্দ্ধ অচেতন অর্দ্ধ সচেতন' মত গুলি একে একে গ্রহণ িতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ভাব এতই গূঢ়-নিহিত যে, অনেক য়ে তাহার প্রকৃত তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন; সেই জন্য অনেকে াহার গভীর তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া, কেবল বাহ্য আবরণ দেখিয়াই 'জড়বাদ' প্রচার করিতেছেন, কেহ কেহ বা তাঁহার প্রচারিত অর্দ্ধপথ স্ত গিয়াই অনুসন্ধিৎসা অতলজলে ডুবাইয়া দিতেছেন। সেই জন্য সারের প্রচারিত অজ্ঞেয়বাদের' সমুচিত আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

য অসীম জগৎ-রহস্য আমাদের অন্তর বাহিরে চারি দিকে বর্ত্তমান, যে ভেদ করিতে গিয়া জগতের নরনারী অযুত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের অবতারণা ছে, তাহার বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া হার্বার্ট স্পেনসার যে কয়েকটি ান্ত বাহির করিয়াছেন আমরা সেই কয়েকটি অবলম্বন করিয়া াদের' সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

সিদ্ধান্ত।—যদিও ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে চিরদিনই বিবাদ বিসংবাদ হয়েছে এবং তাহা ক্রমেই কুটিলতর আকার ধারণ করিতেছে, তথাপি

ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান যত বলিতেছে তত সত্য নহে এবং ধর্ম্ম যত বলিতে চাহিতেছে তত প্রকৃত কথা নহে। সমুদায় কিছু না কিছু সত্য আছে, সমুদায় বৈজ্ঞানিক গর্ব্বের ... অপ্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ত আছে। ধর্ম্ম আপন আলোচ্য বিষয় ছাড়ি অনধিকার চর্চ্চা করিতে গিয়াছে, সেই পরিমাণে তাহার মধ্যে ভ্রম স্থান পাইয়াছে এবং বিজ্ঞান যে পরিমাণে আপন অধিকার ভুলিয়া ধ... লোচনা করিতে গিয়াছে, সেই পরিমাণে, তাহার মধ্যে 'বিজ্ঞান ... প্রবেশলাভ করিয়াছে! ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান আপনাপন অধিকার মধ্যে থা... তত্ত্বনির্ণয় করিবার চেষ্টা করিলে প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহাদের মধ্যে কোন বিরো... থাকিতে পারে না।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত।—সমুদায় ধর্ম্মমত সমালোচনা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, জগৎ-রহস্যকে ধর্ম্ম মতাবলম্বিগণ যত রহস্যময় জ্ঞান করিয়া থাকেন ইহা তাহা হইতে অধিকতর অগম্য অপার রহস্যে পরিপূর্ণ! এই রহস্য চিরদিনই 'অজ্ঞাত' রহিয়াছে, এবং চিরদিনই অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে, শুধুই তাহা নহে, জগৎ ব্রহ্মাণ্ড যে মহাশক্তির আভাসমাত্র প্রকাশ করিতেছে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সম্পূর্ণরূপে 'অজ্ঞেয়'।

তৃতীয় সিদ্ধান্ত।—বিজ্ঞান যতই নিত্য নূতন সত্যতত্ত্ব আবিষ্কার করুক না কেন, মূলসত্য সে কখনও বাহির করিতে পারিবে না, তাহা চিরদিনই মানব-জ্ঞানের সীমার বাহিরে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে!

চতুর্থ সিদ্ধান্ত।—আমাদের সকল জ্ঞানই আপেক্ষিক জ্ঞান। আপেক্ষিকত্ব না থাকিলে কোন জ্ঞানই সম্ভব হইত না। রাত্রি আছে বলিয়া দিনের জ্ঞান, স্থূল আছে বলিয়া সূক্ষ্মের জ্ঞান, হইয়া থাকে। নিত্য বস্তুর যখন কাহারও সহিত তুলনা হইতে পারে না, তখন তাহা আমাদিগের পক্ষে 'অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়।'

পঞ্চম সিদ্ধান্ত।—ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান উভয়েই এক বাক্যে বলিতেছে যে 'তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়'—সুতরাং ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানে মধ্যে প্রকৃত পক্ষে কোন বিরোধ নাই।

এই পাঁচটী পৃথক্ পৃথক্ সিদ্ধান্ত একত্র করিয়া বিচার করিলে ইহাই

.সার কয়েকটী কথা স্বীকার ও কয়েকটী কথা অস্বীকার
.ব করেন তাহা 'জ্ঞাত ও জ্ঞেয়'—হয় মানুষ তাহা
. .ন্নত হইলে জানিতে পারিবে। যাহা অস্বীকার করেন,
ও অজ্ঞেয়—মানুষ তাহা জানে বলিয়া বৃথা আস্ফালন করিলেও
.ব কিছু জানে নাই এবং কি বর্ত্তমান কি উন্নততর অবস্থায় কখনও
.াবিবে না। এই স্বীকৃত ও অস্বীকৃত সিদ্ধান্ত লইয়া 'অজ্ঞেয়বাদের'
.. করিতে হইলে এই সকল সিদ্ধান্তগুলি এক একটী করিয়া বাছিয়া
। করা আবশ্যক। স্বীকৃত সিদ্ধান্তগুলি যথাক্রমে এইরূপে শ্রেণীবদ্ধ করা
.তে পারে, যথা ;—

(১) ধর্ম্মের ভিত্তি মানব প্রকৃতিতে অতিগূঢ়রূপে নিহিত। কোন দেশে বিকাশভাবে তাহা বীজরূপে বর্ত্তমান, কোথায়ও বা প্রকৃত বিকাশ পাইয়া ফুলফলে সুশোভিত বৃক্ষাকার ধারণ করিয়াছে।

(২) জগতের এক অদ্বিতীয় 'আদি-কারণ' আছে—তাহা সর্ব্বশক্তিময়, সর্ব্বব্যাপী ও অনন্ত। এই শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করা মূর্খতা মাত্র। সকল স্থানে সকল কালে ইহা অনন্তরূপে বিরাজিত রহিয়াছে।

(৩) মানবজ্ঞান অনন্ত উন্নতিশীল। 'এই পর্য্যন্ত জানিতে পারিবে, তাহার পর আর কিছুই জানিতে পারিবে না'—এমন কথা মানব জ্ঞানের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। কিন্তু মানব কেবল সাপেক্ষিক জ্ঞানের অধিকারী, নিরপেক্ষ বস্তু তাহার জ্ঞানগম্য নহে।

(৪) নিরপেক্ষ নিত্যবস্তু আছে। মানবজ্ঞান সাপেক্ষিক বলিয়া প্রকারান্তরে সীমাবদ্ধ, সেই জন্য আমরা নিরপেক্ষ নিত্যবস্তুকে জ্ঞানদ্বারা ধরিতে .ারি না। কিন্তু সাপেক্ষিক জ্ঞানের মূলে নিরপেক্ষ বস্তুর কিছু না কিছু জ্ঞান .া থাকিলে মানুষের কোন জ্ঞানই হইতে পারে না! আমাদের জ্ঞান যে .পেক্ষিক কিনা তাহা জানিতেও নিরপেক্ষ জ্ঞান মানিয়া লইতে হয়, সুতরাং .ই নিরপেক্ষ জ্ঞান অস্বীকার করিলে আমাদের জ্ঞান যে সাপেক্ষিক কিনা .াহাও জানা যাইতে পারে না। চিরপরিবর্ত্তনশীল দৃশ্যবস্তুর অন্তরালে .নত্যবস্তু আছে। সেই নিত্যবস্তুর অস্তিত্বে আমাদের যে বিশ্বাস আছে তাহা .নষ্ট হইতে পারে না।

(৫) যদিও নিরপেক্ষ মূলবস্তু সম্বন্ধে আমাদের তথাপি তাহার নিশ্চয়াত্মক অস্তিত্বে বিশ্বাস করা আমাদে আবশ্যকীয় অঙ্গ। মানব প্রাণে যত দিন 'অনুভূতি' বলিয়া এক আছে, ততদিন সেই আবশ্যকীয় অঙ্গও বর্ত্তমান থাকিবে।

অস্বীকৃত সিদ্ধান্তগুলি যথাক্রমে এইরূপে শ্রেণীবদ্ধ করা যাই যথা,—

(১) যদিও ধর্ম্মের ভিত্তি মানবহৃদয়ে গূঢ়-নিহিত তথাপি তাহা বিশেষ কোন সাহায্য হয় না, 'অজ্ঞেয়' চিদ্‌বস্তু চিরদিনই 'অজ্ঞেয়' থাকিয়া যা

(২) যদিও 'আদি-কারণের' অস্তিত্ব অপ্রমাণ করা যায় না, তথাপি তাহা যে কিংস্বরূপ তাহা চিরদিনই 'অজ্ঞেয়'।

(৩) আমরা এই পর্য্যন্ত জানিতে পারি যে 'অজ্ঞেয় আদি-কারণ' আছে, ইহার বেশী যখন আর কিছুই জানিতে পারি না তখন তাহার সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে পারি না। ইহার অবশ্যম্ভাবি ফল এই যে ধর্ম্মচর্চ্চা অনাবশ্যক।

(৪) মানবজ্ঞান কখনও সেই 'অজ্ঞেয়' পরমবস্তু জানিতে পারিবে না।

এই সকল স্বীকৃত ও অস্বীকৃত তত্ত্ব তুলনায় সমালোচনা করিতে হইলে নিম্ন-লিখিত কয়েকটী তর্কের মীমাংসা করা আবশ্যক হইয়া উঠে। আমরা যথাক্রমে সেই সকল তর্কের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব, কেন না তাহার মীমাংসার উপরেই প্রকারান্তরে 'অজ্ঞেয়বাদের' সমগ্র সমালোচনা নির্ভর করে। যে সকল বিষয় মীমাংসা করা আবশ্যক তাহা কিয়ৎপরিমাণে নিম্নলিখিতরূপে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে। যথা,—

(১) মানবজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ কি?

(২) অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলিতে কি পরিমাণ জ্ঞান বুঝায়?

(৩) আদি-কারণ কিংস্বরূপ?

(৪) ধর্ম্ম কি?

(৫) ধর্ম্মের ভিত্তি কোথায়?

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

---

# বাঙ্গলা কবিতা।

সাহিত্য জগতে সুপরিচিত আমার জনৈক বন্ধু একদিন আমাকে বলিতে লাগিলেন, বাঙ্গলা ভাষায় লেখার প্রয়াস এক্ষণে বিড়ম্বনা মাত্র, কারণ কবিতার উপযোগী সমুদয় ভাব নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। আমার বন্ধুর এই উক্তিই যদি সর্ব্বসাধারণের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া অনুমিত হয়, তাহা হইলে আমি বলিব যে, বাঙ্গলা কবিতার এই তিরোধান যথা কালে বা স্বাভাবিক নিয়মে হয় নাই। অকালে এবং অস্বাভাবিক উপায়ে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। সাহিত্য রাজ্যে যদি সর্ব্বশক্তিমান্ কোন রাজা থাকেন, তবে তাঁহার নিকটে আমরা দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত।

মানুষের অনুকরণ প্রবৃত্তি এতই প্রবল যে যাহাদিগকে তাহারা শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান করে তাহাদিগের অনুকরণ করিতে গিয়া স্ব স্ব জাতির অনুরাগ পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিতে প্রলুব্ধ হয়, অধুনা বঙ্গদেশের সেই ঈপ্সা চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। কার্য্যক্ষেত্রে ইংরাজ জাতির অদম্য উৎসাহ এবং সুনিশ্চিত সাফল্য দেখিয়া সর্ব্বাংশে ইংরাজকে আমরা আদর্শস্থানীয় করিয়াছি। ইংরাজের সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি সমুদয়ই আমাদের নিকট উপাদেয় বলিয়া বোধ হইতেছে। যাহা ইংরাজের পক্ষে অসম্ভব, তাহা আমাদের পক্ষেও অসম্ভব, এই আমাদের ধারণা।

আমি আমার কোন কোন বিজ্ঞ স্বদেশ বাসীর ন্যায়, জন সমাজে ইংরাজকে নগণ্য এবং অজ্ঞ প্রমাণ করিবার জন্য এসকল কথার অবতারণা করি নাই। ইংরাজের অনুকরণ করিয়া আমাদের যে অনেক স্থলে সুফল ফলে নাই, সেই কথা বলিবারও আমার অভিপ্রায় নাই। বাঙ্গলা সাহিত্যের অঙ্কে যদি দুই একটী দুগ্ধপোষ্য বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক শিশু প্রতিভা প্রদীপ্ত বদনে হাস্য করিতে দেখা যায়, তবে তাহা ব্রিটেন ভগিনীর অনুগ্রহ-প্রদত্ত বঙ্গভাষার পালিত-পুত্র মাত্র। ইংরাজের নিকট আমরা আর সকলই শিখিয়াছি, কেবল

# বাঙ্গলা কবিতা।

দর্শন ( Philosophy ) এবং কবিতা শিখি নাই। * কবিতা বর্ত্তমান আলোচ্য।

তুষারসমাচ্ছন্ন গ্রেট ব্রিটেন "সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা" কবিতা শিখাইতে পারে না। বাহ্যজগৎ মানবের অন্তর্জগতের উপর কার্য্য করিয়া থাকে। প্রাকৃতিক কঠোরতা ইংরাজকে সাংসারিক করিয়াছে। সংসারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির চেষ্টাই ইংরাজের আদিম কাল হইতে মূলমন্ত্র, সংসারের সী বেষ্টন পরিত্যাগ করিয়া সীমা-বিহীন সুবিশাল চিন্তা-গগনে উড্ডীয়মান হ গেলে অনন্ত তুহিন-রাশির নির্দ্দয় শীতলতা ইংরাজকে আবার ভূমণ্ডলে নিপা করিয়া ফেলে। তাই ইংরাজের প্রথম সপ্তদশ শতাব্দীর প্রধান চিন্তার গা ধর্ম্ম-পদ্ধতির সমন্বয় ও স্বাধীনতা, তৎপর শতাব্দীর আবেগ রাজনৈতিক আন্দোলন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর সফলতা প্রকৃতি-বিজ্ঞান ( Physical Science. ) সাংসারিক বিজয় এবং সাংসারিক নিপুণতা ইংরাজের মুখ্য উদ্দেশ্য। বাণিজ্য ও বিজ্ঞান তাহার ফল।

ঋগ্বেদের প্রথম শ্লোক হইতে বঙ্কিমবাবুর শেষ উপন্যাস পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের চিন্তাতন্ত্রীর তার কবিতা-গ্রামে বাঁধা। ভারতের কূলপরিপ্লাবিনী ভাগীরথীর স্বচ্ছসলিলে কবিতাশ্রেষ্ঠ ভারতের এক মাত্র ইতিহাসস্থানীয় রামায়ণ ও মহাভারতে কবিতার পূর্ণ মূর্ত্তি। ভারতের প্রতি নগর, প্রতি গ্রাম, প্রত্যেক পরিবারের ইতিহাস এক একটী সমুজ্জ্বল কল্পনার আভায় বিভাসিত। এই দুর্ব্বল বাঙ্গালীর ক্ষীণ দেহে, কুঞ্চিত ললাটে, কবিতার ছায়া। বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে সেই সুকেশা, সুমধ্যমা, ললনাবৃন্দ মূর্ত্তিমতী কবিতা। দারুণ দুর্ভিক্ষে অনাহারে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়া মর্য্যাদা রক্ষা—এ কবিতা কোন্ দেশের মহিলাকুলে পাওয়া যায়?

আমরা ইতিহাস লিখি নাই, সভ্য সমাজের চক্ষে আমরা তাই হীন। আমরা বিজ্ঞান শিখি নাই, শিখিতে পারি না, সুতরাং আমরা অকর্ম্মণ্য। কিন্তু আমরা চিন্তা করিতে শিখি নাই এ কথা কোন জাতিই সাহস করিয়া বলিতে পারেন না।

---

* কেবল দর্শন ও কবিতা কেন, জ্যোতিষ, চিকিৎসা প্রভৃতি অনেকানেক শাস্ত্র ইউরোপ ভারতবর্ষ হইতে শিক্ষা করিয়াছেন। ইহা বহু ইংরাজ লেখক মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। উ, স।

# উৎসাহ।

enzy fire" স্বর্গ হইতে মর্ত্তে এবং মর্ত্ত হইতে স্বর্গে নাচিয়া ন্তা করিতে গিয়া নৈসর্গিক বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলি। সংসারের দের নিকট সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। তাই যে দেশে াংখ্য, পাতঞ্জল, ভগবদ্গীতার জন্ম হইয়াছে সে দেশে বাষ্পীয়পোত বা বৈদ্যুতিক বাদের কৌশল আবিষ্কৃত হয় নাই, যে দেশে "শকুন্তলা" "উত্তর চরিত" হ সে দেশে রাজ্যবিপ্লবের রক্তস্রোতের চিত্র সংরক্ষিত হয় নাই, । ভারত চন্দ্র, মধুসূদন পবিত্র করিয়াছেন সে দেশ ওয়েলিংটন দর্শন য়াছেন এবং যে দেশে "প্রফুল্লমুখী" ও "শান্তি" আছে সে দেশে litical Economy" নাই।

আমার বিশ্বাস আমার পাঠকবৃন্দের মধ্যে কেহ এ কথা মনে করিবেন না য আমি ইংরাজিতে কবিতা গ্রন্থ নাই এই কথা বলিতেছি। যদি আমার পাঠক-গণের মধ্যে এরূপ কেহ থাকেন তবে বঙ্কিম বাবুর ন্যায় যশস্বী লেখক হইলে আমি বলিতাম এ প্রবন্ধ এই স্থানেই তাঁহার পাঠ সমাপন করা উচিত। ইংরাজীতে কবিতা গ্রন্থ না থাকিলে ক্ষুদ্রাক্ষরে মুদ্রিত ১৬৫৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ "Chamber's Cyclopædia" আমরা দেখিতে পাইতাম না। ইংরাজের কবিতার গতি মুক্ত এবং স্বাধীন নয়। সাংসারিক বিপ্লব ও পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সমবেগ রক্ষা করিয়া ইহার গতি পরিচালিত হইয়াছে এই আমার বক্তব্য। দুই একটী প্রধান কবির উদাহরণ সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া আমাদের বক্তব্য বিষয় একটু বিশদ করিলে বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ইংরাজী ভাষার কবিবৃন্দের কথা উত্থাপিত হইলেই চসার (Chaucer) স্পেনসার, (Spencer), সেক্সপিয়ার (Shakespeare) এবং মিল্টনের কথা আসিয়া পড়ে। চসারের প্রধান কাব্য ক্যান্টারবারির গল্প (Canterbury Tales.) কবিতাভাবগ্রাহিতার অল্পতা নিবন্ধনই হউক, অথবা কবির কৃতিত্বের ন্যূনতা হেতুই হউক, ক্যান্টারবারির গল্পে এমন কোন বিশেষ কবিত্ব আমি দেখিতে পাই নাই। বাঙ্গালীর ঠাকুরমার মুখে ইহাপেক্ষা অধিকতর আমোদপ্রদ ও কবিত্বপূর্ণ গল্প অনেক শুনিতে পাওয়া যায়। চসার ইংরাজী ভাষার গঠন ও পরিমার্জ্জন করিয়াছেন কিন্তু বিশেষ কোন কবিত্ব সংযোগ করিয়া যাইতে পারেন নাই তিনি ইংরাজ কবিকুলের পিতা কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

ম্মাদের ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতার তামসী নিশা আলোকিত করে। আমি বিস্ময়-বেদন-চিত্তে তোমাকে আবার নমস্কার করি। কিন্তু কবিতাহিমানন্দশী [illegible]! কেন তুমি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রবেষ্টিত কঠোর [illegible] জন্মিয়াছিলে? তুমি ভারতবর্ষে জন্মিলে তোমাকে "সেকৃসিন জোহানাম ক্যাকৃটোটাম" এসকল দুর্ব্বাক্য সহ্য করিতে হইত না। তুমি [illegible]ক্রেতার পুত্র বা বস্ত্রব্যবসায়ীর পুত্র, পাঠশালার গুরু মহাশয় বা [illegible]লের মোহুরের এ সকল তত্ত্ব আমরা করিতে যাইতাম না। আমরা তোমার বতকালে সচন্দন পুষ্পদলে পূজা করিতাম আর "to the last syllable of the recorded time" তোমার কবিতার বিমল সুধাপান করিয়া শোক তাপ ভুলিয়া যাইতাম। নারীর নৈতিক পতন দেখিয়া বলিতাম "Frailty thy name is woman"; জীবনের অনিশ্চিত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দেখিয়া বলিতাম

"We are such stuff,
As dreams are made of",

সন্তানের অকৃতজ্ঞতা দেখিয়া বলিতাম

"Filial ingratitude!
Is it not as this mouth should tear this hand
For lifting food to it?"

অহঙ্কারীর অহঙ্কার দমন করিতে গিয়া বলিতাম

"Pride hath no other glass
To show itself, but pride."

সুনাম নষ্ট হইলে আমরা ক্যাসিওর মত কাঁদিয়া বলিতাম

I have lost my reputation! I have lost the immortal part of myself, and what remains is bestial."

বাস্তবিক হে কবিগুরু! তুমি প্রাচ্য উপাদানে গঠিত পাশ্চাত্য কবি। তোমার প্রতিভার প্রত্যেক চরিত্রের অঙ্কন আমাদের প্রাণে প্রাণে মিলিয়া যায়। প্রকৃতির অত্যাশ্চর্য্য ভ্রান্তিতে তুমি ইংলণ্ডে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে। এখানে জন্মিলে তোমার প্রেতাত্মা অনন্ত শান্তির মধ্য হইতে মিসেস্ আনের নিকট আসিয়া

কবিতারসবর্জ্জিত বণিক্ সমালোচকদের হস্তে নিজের দুর্গতির ক
বলিত না। * আমরা আমাদের গৌরবের ধন কালিদাসের সঙ্গে একাসনে বসাইয়া তোমার অমিয় কবিতার রস উপভোগ করিতাম। † নিজেদে মতানুযায়ী করিবার জন্য নেহাম টেট্ (Nahum Tate) প্রভৃতির ন্যায় তোমা অনন্ত কল্পনার পক্ষচ্ছেদ করিতে যাইতাম না। আমরা তোমার স্বজাতির ন্যায় কার্য্যকুশল ঘোর সাংসারিক বণিকের জাতি নহি। আমাদের জীবনে প্রতিদিবস তোমার মহানাটকের এক এক গর্ভাঙ্ক। আমরা প্রতি নিঃশ্বাসে তোমার সঙ্গে "Life is but a walking shadow" বলিতেছি

ইংরাজের যাহা রোমান্স (romance) আমাদিগের তাহা দৈনন্দিন চিত্র ইংরাজের কল্পিত উপন্যাসে, চিত্রিত কাব্যে দম্পতীর হৃদয়ের যে মিলনে উপাখ্যান, আমরা পার্থিব বিবাহে সেই উপন্যাসের সেই উপাখ্যানের যাথার্থ্য দেখাইয়া বলি—

"যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব,
যদিদং হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।"

বাঙ্গালীর কবিতানদী ভারতের রত্নস্বরূপা ললনা থাকিতে শুকাইবে, এ অতি অশ্রদ্ধেয় কথা।

মহামতি মেকলে বলিয়া গিয়াছেন সভ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিত্ব-শক্তি বিলোপ প্রাপ্ত হয়, কারণ কবিতা কল্পনাময়ী, সভ্যতা সত্য প্রিয়া। এ উভয়ের সামঞ্জস্য বড় কঠিন। জাতীয় জীবনের বাল্যকালে কবিতার মোহিনী শক্তি অসম্ভবকে সম্ভব করে; কিন্তু বার্দ্ধক্যে সে শক্তি যুক্তির প্রস্ফুট আলোকে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। কঠোর যুক্তির ভ্রান্ত পরিচয় ইংরাজের পক্ষে এই

* "Much I have borne from cankered critic's spite,
From fumbling baronets, and poets small,
Pert barristers, and parsons nothing bright
But what awaits me now is worst of all."
Verses from William Shakespear by Gray )

† কিন্তু এদেশে জন্ম গ্রহণ করিলে মধুসূদনের ন্যায় দাতব্যচিকিৎসালয়ে দেহ বিসর্জ্জন করিতে হইত কিনা, তাহা কে বলিতে পারে? উ, স।

...কার প্রতিবর্ণ সত্য কিন্তু কল্পনাকৌতুকী বাঙ্গালীর জাতীয়জীবন, এক শব্দের সরলতা ব্যতীত আর কিছুই জানে না। বাঙ্গালীর স্থির বিশ্বাস "There are more things in Heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy," অহর্নিশি পরিবর্ত্তমান ইংরাজের প্রকৃতি-বৈরাগ্যে বৃত্তিতে বাঙ্গালীর প্রাণের কবিতা কিছুকাল লুক্কায়িত থাকিতে পারে বটে, কিন্তু বিনাশ প্রাপ্ত হইতে পারে না। যদি বিনাশ প্রাপ্ত হয় তবে বাঙ্গালীর অবহেলায়।

ইংরাজ চিরকালই কর্ম্মিষ্ঠ পুরুষ। কার্য্যক্ষেত্রে সফলতাই ইংরাজের মূল...। সভ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই পিপাসা ইংরাজের আরও প্রবলতর হইতেছে। গদ্য সাহিত্য, সমালোচনা, বিজ্ঞান, ইতিহাস এই সকল ইংরাজ জাতির জাতীয় অনুরাগের অনুকূল। জাতীয় জীবনের বাল্যাবস্থার বিশ্বস্ততা ইংরাজের কবিতা শক্তির একমাত্র উপাদান ছিল। বিজ্ঞানের সূক্ষ্মালোচনায় সে বিশ্বস্ততা হারাইয়া ইংরাজ যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কবিত্ব হারাইবে এটা অসম্ভব নয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ইংরাজের অনুকরণ করিয়া আমাদের জাতির বিধিদত্ত সম্পত্তি কবিত্ব শক্তির আলোচনা ত্যাগ কি সামান্য পরিতাপের বিষয়? আমার সাহিত্য-সেবী বন্ধুর বাঙ্গলা কবিতা সম্বন্ধে পূর্ব্ব কথিত নিরাশ মন্তব্যের যে একেবারে হেতু নাই তাহা নহে। অধুনা "বাঙ্গলা কবিতা" সাহিত্যাসন হইতে অধঃপতিত হইয়াছে। কি মানসিক সাহিত্যে, কি বিজ্ঞ লোকের চিন্তায় কাহারও নিকট "বাঙ্গলা কবিতার" আদর নাই। ইংরাজের অন্ধ অনুকরণ করিতে গিয়া এই মহামূল্য জাতীয় ধন আমরা হারাই, এই আমার আশঙ্কা। সেই আশঙ্কায় প্রণোদিত হইয়াই আমরা ক্ষুদ্র কণ্ঠে এই ভীতিধ্বনি করিতেছি। ইহাতে যদি কোন ভাবুকের বিজ্ঞান চিন্তার ব্যাঘাত হয় তবে আমাকে ক্ষমা করিবেন। কোন সুপ্রখ্যাত ইংরাজ অধ্যাপকের মুখে শুনিয়াছিলাম "Babu, you are poets, we are poor shopkeepers" "বাবু, তোমরা কবি, আর আমরা দোকানদার।" আমরা এ গৌরব পাছে হারাই সেই আমার ভয়।

আমি বিজ্ঞান, ইতিহাস, গদ্য সাহিত্য ও সমালোচনা প্রভৃতি সম্বন্ধে ইংরাজের অনুকরণ করিয়া ভাণ্ডার পুষ্টিসাধন করিতে বারণ করি না। অথবা এই

সকল বিষয়ে পাণ্ডিত্য লাভের ক্ষমতা যে
কথা বলাও আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু
বাঙ্গালীর কবিতা-স্রোত চিরকাল অপ্রতিহত যে
আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা। আমরা অবহেলা করিয়া
ধ্বংস করিলে জাতীয়ত্ব ধ্বংস করা হইবে। বাঙ্গা
আসন সর্ব্বশীর্ষে না থাকিলে অর্দ্ধ শতাব্দী পর আর কোন
জের মুখে আমরা শুনিব না "you are poets, we are poor th
আমার এই আশঙ্কা যদি যুক্তির চক্ষে ভিত্তিহীন বলিয়া বোধ হয় ত
কোন প্রত্যবায় নাই, কারণ এ সকল বিষয়ে নিশ্চিন্ততা অপেক্ষা অতি
ব্যস্ততাও ভাল।—"Better to be despised for too anxious apprehensions, than ruined by too confident a security."

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

---

# জাহানারা ও রোশেনারা।

—00—

সৌন্দর্য্যপ্রিয় সাজাহান বাদসাহ প্রিয়তমা প্রণয়িনীর প্রতি অগাধ প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ তাজমহল নামক বিচিত্র মমতমহল রচনা করিয়াছিলেন। তাজমহল সমাধি-মন্দির হইয়াও দাম্পত্য প্রেমের পবিত্র স্তম্ভ রূপে বিরাজ করিতেছে। ভুবন-সুন্দরী নুরজাহানের ভ্রাতা আসফজার কন্যা আরজমন্দ বানুর উন্মাদয়িত্রী রূপ-সুধা পান করিয়া সাজাহান অধীর হইয়া পড়েন। যে নৌরোজা বাজারে 'রমনীরূপের হাট" বসিয়া যাইত, সেই নৌরোজা বাজারেই সাজাহান অনিন্দ্য সুন্দরী আরজমন্দ বানুর সাক্ষাৎ লাভ করেন। নৌরোজা বাজারের "রূপের হাট" ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছে, এমন সময়ে যুবরাজ সাজাহান আরজমন্দ বানুর নিকট কোন দ্রব্য ক্রয় করিবার ছলে উপস্থিত হন।

.ত সমস্তই বিক্রীত হইয়া গিয়াছিল।
ক্রয় করেন। এই ক্রয় বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে
.ম্পন্ন হইয়া যায়। আরজমন্দ বানু বিবাহিতা।
নষ্ঠতা বৃদ্ধি প্রাইতেছে দেখিয়া বানুর স্বামী তাঁহাকে
চ্ছা করিলেন না, এইরূপে বানু সাজাহানের অঙ্কলক্ষ্মী
.ন সাজাহান সিংহাসনারোহণ করিয়া হৃদয়ের ভালবাসা
তাঁহাকে মমতাজ জেমানী বা তৎকালগৌরব 'উপাধিতে ভূষিত
মমতাজের গর্ভে সাজাহানের চারি পুত্র ও চারি কন্যা জন্মে। পুত্র
.ের নাম, দারা, সুজা, আরঙ্গজেব ও মোরাদ। কন্যা চারিটির মধ্যে
জাহানারা, রোশেনারা ও সুরিয়া বানু এই তিন জনের নাম অবগত হওয়া যায়। চতুর্থ কন্যার প্রসবের পরই মমতাজ জেমানী ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। সাজাহান তাঁহার গৌরব বৃদ্ধির জন্য শ্বেত মর্ম্মরের স্বপ্নতরঙ্গময় অলোকসামান্য তাজমহলের প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বীয় ভালবাসার পরিচয় দিয়াছিলেন। সেই মমতাজ জেমানীর জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা কন্যা জাহানারা ও রোশেনারার কাহিনী অদ্য আমাদের আলোচ্য বিষয়।

মোগল সম্রাট্‌দিগের কন্যাগণ অনেক সময়ে রাজনৈতিক বিষয়ে সংলিপ্ত থাকিতেন। তাঁহাদের মধ্যে জাহানারা ও রোশেনারা এই দুই জনেরই কথা কিছু অধিক পরিমাণে শ্রুত হওয়া যায়। এই দুই ভগিনী যেমন বুদ্ধিমতী ও রাজনীতিতে ব্যুৎপন্না সেইরূপ বিলাসপরায়ণা ও ইন্দ্রিয়বশবর্ত্তিনী ছিলেন। সাজাহানের প্রথম কন্যাত্রয়ের মধ্যে সুরিয়া বানু কোন রাজনৈতিক বিষয়ে লিপ্ত থাকিতেন না, এবং তাঁহার বিলাসিতার কথাও সেরূপ শুনা যায় না। উক্ত তিন ভগিনীর সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা এইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন। জাহানারা বুদ্ধিমতী, এবং উদার ও ঔদার্য্য-পরিপূর্ণা ছিলেন, তিনি দেখিতে যেরূপ সুন্দরী অন্তরেও সেইরূপ সদ্‌গুণশালিনী বলিয়া কথিত হন। পিতার উপর তাঁহার যথেষ্ট প্রভুত্ব ছিল। দারার ন্যায় জাহানারার স্বভাব অকপট হওয়ায়, তিনি দারারই মঙ্গলচেষ্টা করিতেন। এবং জাহানারার প্রভুত্বের জন্যই দারা বাদশাহ সাজাহানের অনুগ্রহলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। রোশেনারা তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অভ্রান্ত বিচারশক্তিশালিনী ছিলেন। শারীরিক সৌন্দর্য্যে

ও ব্যবহারে তিনি লোকের হৃদ
অত্যন্ত সুচতুরা ছিলেন বলিয়া না,
আরঙ্গজেবের ন্যায় তাঁহারও প্রতিভা দূরত
অবলম্বন করেন। সুরিয়াবানুর স্বভাব অত্যন্ত
ধীর ও মনোজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ; কারুণ্য, পরহিতৈষ
স্বরূপ ছিল; কপটতা ও কৌশলপ্রযোগে তিনি বিরত
গৌরবে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল। সুরিয়াবানু রাজ্যসং
দানে করেন নাই, তিনি স্ত্রীজাতিসুলভ শোভনকার্য্যে ও বিশুদ্ধ
সময় অতিবাহিত করিতেন। বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণ জাহানারা
সমস্ত গুণেরই উল্লেখ করেন, কিন্তু তাঁহারা রোশেনারাকে জাহানারা অ
নূতন সৌন্দর্য্যশালিনী ও বুদ্ধিমতী বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন, কিন্তু বিলা
তায় উভয় ভগিনীকে সমতুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

জাহানারাকে কোন কোন ঐতিহাসিক "পাদশা বেগম" নামে অভি
করেন, এবং বৈদেশিক পর্য্যটকগণের গ্রন্থে তিনি বেগম সাহেব বলিয়া উ
খিত হন। জাহানারা সাজাহানের অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী ছিলেন, এইজন্য ই
রোপীয় পর্য্যটকগণ তাঁহাদের সম্বন্ধে এমন এক কুৎসা রটনা করিয়া গিয়াছে
যে তাহার উল্লেখ করিতেও ঘৃণা বোধ হয়। সাজাহান জাহানারার প্র
প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, জাহানারাও পিতার মঙ্গল কামনায় আ
নার জীবনকে উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন। সাজাহানের রাজত্বকালে সম
সাংসারিক কর্ত্তৃত্বই জাহানারার উপর নির্ভর করিত। রাজনীতির পরা
হইতে গৃহস্থলীর তত্ত্বাবধান পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়েই জাহানারা লিপ্ত থাকিতেন
সম্রাট্ তাঁহার সহিত সকল পরামর্শ করিতেন, এবং গৃহকার্য্যে তাঁহার এরূ
প্রভুত্ব ছিল যে, তাঁহার তত্ত্বাবধান ব্যতীত যে সমস্ত খাদ্য-দ্রব্যাদি প্রস্তুত হই
তাহা কদাচ বাদসাহ-সকাশে নীত হইতে পারিত না। বাদসাহের এই
অপরিমিত স্নেহলাভ করায় মোগলসাম্রাজ্যে জাহানারার ক্ষমতা অত্যন্ত বলব
হইয়া উঠে। এই অসীম প্রভুত্বের জন্য নানাদিক্ হইতে তিনি বহুমূল্য উপ
প্রাপ্ত হইতেন, এবং নিজেরও বৃত্তিবাহুল্যের জন্য জাহানারা অনেক ধন
সঞ্চয় করিয়া যান। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জাহানারা দারার প্র

এই পক্ষপাত বৃদ্ধির এক কারণ
.।টদিগেব কন্যাগণ বিবাহ করিতে
.য. প্রথমতঃ তাঁহাদের উপযুক্ত পাত্র মিলিত
.মাতৃগণ পাছে ক্ষমতাশালী হইয়া সিংহাসন
উরোপীয় ভ্রমণকারিগণ বলিয়া থাকেন যে, জাহা-
.নী ছিলেন বলিয়া দারা সাম্রাজ্য লাভ করিলে তাঁহাকে
.তি প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন।

.।গল অন্তঃপুর বা রঙ্গমহলে যত পাপকাণ্ডের অভিনয় হইত, অন্য কোথাও সেরূপ হইত কিনা সন্দেহ! যদিও সেই অন্তঃপুরে কা প্রবেশের উপায় ছিল না, তথাপি বিলাসিগণের লালসা-পরিতৃপ্তির জন্য ।ম্নিবর্গের পক্ষে তাহার পথ অবাধ ছিল। যমদূতের ন্যায় খোজা ও ভীষণা-ত তাতাররমণীগণের প্রহরিত্ব সত্ত্বেও প্রণয়িগণ নিঃশঙ্ক চিত্তে প্রবেশ লাভ রিতে পারিতেন। বিশেষতঃ যিনি সমস্ত রঙ্গমহলের কর্ত্রী ছিলেন, তাঁহার য়পাত্রকে কেহ বাধা প্রদান করিতে পারিত না। কিন্তু বাদসাহবংশীয়েরা সংবাদ জানিতে পারিলে সেই সকল প্রণয়িদিগকে চিরদিনের জন্য বিদায় ত্তে বাধ্য করিতেন। উচ্চপদস্থ বা উচ্চবংশীয় ব্যক্তিরাই যে বাদসাহ-নীদিগের প্রণয়পাত্র হইতেন এমন নহে, তাঁহাদের চক্ষে যাহারা মনোজ্ঞ লয়া প্রতীত হইত, তাহারাই তাঁহাদের প্রণয়ভাজন হইতে পারিত। কিন্তু য়ে সময়ে এই সকল প্রণয়পাত্রদিগকে অবিচারে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে ইত। একদা, সম্রাট্ সাজাহান সহসা জাহানারার প্রকোষ্ঠমধ্যে উপস্থিত ।। জাহানারা পূর্ব্ব হইতে ইহার কিছুমাত্র সংবাদ পান নাই। তিনি নন্যোপায় হইয়া প্রণয়পাত্রকে স্নানার্থে ব্যবহৃত এক বৃহৎ জলপাত্র মধ্যে শ্রয় প্রদান করেন। বাদসাহ তাহা বুঝিতে পারিয়া কোনরূপ ভাববিকৃতি দেখাইয়া কন্যার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে বলিলেন তোমার শরীর দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমি স্নানের প্রতি তাদৃক্ মনো-'গ প্রদান কর না; অতএব তোমার শরীর স্নানস্নিগ্ধ করা কর্ত্তব্য। এই ।য়া তিনি খোজাদিগকে সেই স্নানপাত্রের নিম্নে অগ্নি-সংযোগ করিবার দেশ প্রদান করিয়া, তাহাদিগকে এইরূপ ইঙ্গিত করিলেন যে, যতক্ষণ

পর্য্যন্ত সেই হতভাগা ইহজীবনে
যেন নিবৃত্ত না হয়। আর এক সময়ে
পারসীককে নিজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত ক
সায়েস্তা খাঁ নাজিরের সহিত জাহানারার
ছিলেন। বাদসাহ কন্যাদিগের বিবাহের পক্ষপাতী
মনে মনে বিরক্ত হন। নাজিরকে জাহানারার প্রণয়
দিন দরবার সময়ে বাদসাহ নাজিরকে একটী তাম্বুল
বিনা বাক্যব্যয়ে বাদসাহদত্ত তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে আরম্ভ
তাহাকে বাদসাহের ভবিষ্যৎ অনুগ্রহ ও সম্মান প্রদর্শনের নিদর্শন
মনে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইল। কিন্তু প্রাসাদ হইতে শিবিকা
গৃহে প্রত্যাগত হইতে না হইতে পথিমধ্যেই তাহার প্রাণ বায়ুর অবসান হই
গেল!

জাহানারার ন্যায় রোশেনারাও গুপ্তভাবে প্রণয়পাত্রদিগকে অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া যাইতেন। জাহানারার প্রভুত্বকালে তাঁহার তেমন সুবিধা ঘটিয়া উঠিত না। কিন্তু আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে রোশেনারা মোগল অন্তঃপুরের কর্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত হন,—সেই সময়ে তাঁহার বিলাসলালসা পূর্ণমাত্রায় পরিতৃপ্ত হইত। আরঙ্গজেব এই সমস্ত ঘটনা জানিতেন, কিন্তু ভগিনীর প্রণয়পাত্র দিগের প্রতি তিনি সাজাহানের ন্যায় কঠোর দণ্ডবিধান করিতেন না। তিনি প্রহরীদিগকে যৎপরোনাস্তি শাসন করিয়া দিতেন, কারণ, তাহাদের অবহেলার জন্য কেবল যে অন্তঃপুরের সম্মান নষ্ট হইত এমন নহে, ইহাতে তাঁহার নিজের জীবনও বিপদসঙ্কুল হইতে পারিত। * মহারাষ্ট্রপতি শিবাজীর প্রতিও রোশেনারা অনুরক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিয়া থাকেন, †

* জাহানারা ও রোশেনারার এই সকল প্রণয়কাহিনী ফরাসী ভ্রমণকারী Bernier উল্লেখ করিয়াছেন। একটী বৃদ্ধা পর্টুগীজ রমণীর নিকট হইতে তিনি রোশেনারার প্রণয়কাহিনী শ্রুত হন।

† শিবাজীও রোশেনারার প্রণয় সম্বন্ধে স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় অঙ্গুরীয় বিনিময় নামে স্বীয় ঐতিহাসিক উপাখ্যানে উল্লেখ করিয়াছেন। বাবু রমেশ চন্দ্র দত্ত তাঁহার মাধবী কঙ্কণ নামক পুস্তকের টীপ্পনীতে উক্ত প্রবাদের কতকটা সমর্থন করিয়াছেন।

না।

.ঝবাদে অবশেষে তাঁহাকেই কারারুদ্ধ

. ঝবাদে জাহানারা ও রোশেনারা উভয়েই

.াহানের রাজত্বকালে দারা কাবুল ও মুল্‌তানের,

দাক্ষিণাত্যের ও মোরাদ গুজরাটের শাসনকর্তৃপদে

.াতা পরস্পর পরস্পরের হিংসা করিতেন, এবং সকলেই

প্র.তি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন। দারা

.ানের শাসন কর্তৃপদে নিযুক্ত থাকিলেও, সাজাহান বৃদ্ধ বয়সে

.নকটে রাখিতেন, ও তাঁহার প্রতি রাজ্যশাসনের কতক কতক ভার

.ও করেন। পুত্রদিগের মধ্যে পরস্পর হিংসা ও বিবাদে সাজাহান বড়ই

.থিত হইয়াছিলেন। ১৬৫৭ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ হিজরী ১০৬৭ অব্দে সাজাহান সাংঘাতিক পীড়াক্রান্ত হইলে তাঁহার পুত্রগণ সিংহাসনপ্রাপ্তির জন্য সৈন্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। দারা দিল্লী ও আগরায়, সুজা বাঙ্গলায়, আরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে এবং মোরাদ গুজরাটে মহাসমরসজ্জার উদ্যোগ আরম্ভ করেন। জাহানারা ও রোশেনারাও এ বিষয়ে নিতান্ত নীরব ছিলেন না। যাহাতে দারা সিংহাসন লাভ করেন, জাহানারা তদ্বিষয়ে বিশেষরূপে চেষ্টা করিতে থাকেন। ওদিকে রোশেনারা আরঙ্গজেবের নিকট সমস্ত সংবাদ পাঠাইয়া দারার যুদ্ধসজ্জার কথা তাঁহাকে অবগত করান। চারি ভ্রাতার মধ্যে আরঙ্গজেব অত্যন্ত চতুর ছিলেন, তিনি মোরাদকে কৌশলে হস্তগত করিয়া দারার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হন। প্রথমতঃ সুজা সসৈন্যে বাঙ্গলা হইতে আগরার অভিমুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে সাজাহান সুস্থ হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হন, ও পুত্রদিগকে শান্তভাব অবলম্বন করিতে আদেশ পাঠান। কিন্তু তাঁহারা তাহাতে নিরস্ত হন নাই। সুজা অগ্রসর হইয়া কাশীর নিকট যুদ্ধে দারার পুত্র সলিমান কর্তৃক পরাজিত হইয়া পুনর্ব্বার বাঙ্গলায় প্রস্থান করেন। ওদিকে যশোবন্ত সিংহের অধীনস্থ সম্রাট্‌সৈন্য উজ্জয়িনীর নিকট আরঙ্গজেব ও মোরাদ কর্তৃক পরাজিত হয়। দারা পুনরায় আরঙ্গজেব ও মোরাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জার আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। সাজাহান তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করেন, কিন্তু দারা বাদসাহের নিষেধ শুনিয়া ও ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলেন

অবশেষে আগরার নিকট তাঁহাদের
য়ন করেন। যখন আরঙ্গজেব ও মোরা
স্থিত হন, সেই সময়ে সাজাহান জাহানারাকে
ইয়াছিলেন। জাহানারা প্রথমতঃ মোরাদের শিবি
তাঁহাকে দারার হিতৈষিণী জানিয়া জাহানারার প্রতি অ
করেন। ইহাতে জাহানারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রাসাদাভি
প্রবৃত্ত হন। আরঙ্গজেব এই সংবাদ পাইয়া জাহানারাকে নিজ শি
যান, ও তাঁহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া নিজের বিদ্রোহাচরণে
দুঃখ প্রকাশ করেন, এবং কতকগুলি লোকের কুপরামর্শে তিনি পিতার বি
দ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া ব্যক্ত করেন। এক্ষণে পিতাকে তাঁহার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য আরঙ্গজেব জাহানারাকে অনুরোধ করিতে বলেন। * জাহানারা ও সাজাহান আরঙ্গজেবের ধূর্ত্ততা বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহারা অনেক পরিমাণে আরঙ্গজেবের কথায় বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। আরঙ্গজেব সেই সুযোগে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ছলে দুর্গ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সাজাহান ও জাহানারা উভয়কেই বন্দী করিয়া ফেলেন, এবং মোরাদকে বন্দী করিয়া আপনাকে ভারতের সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন, দিল্লী নগরী তাঁহার রাজধানী হয়। তাহার পর দারা নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে ধৃত হইয়া দিল্লীতে আনীত হইলে আরঙ্গজেবের আদেশে প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হন। মোরাদও সেইরূপে প্রাণত্যাগ করেন। সুজাও নানস্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে আরাকাণে উপস্থিত হইলে, তদ্দেশের রাজার আদেশে সপরিবারে প্রাণবিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হন, জাহানারার আধিপত্য হ্রাস হওয়ায় রোশেনারা মোগল অন্তঃপুরের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। সাজাহান ৭ বৎসর বন্দী-অবস্থায় থাকিয়া আগরাদুর্গে জাহানারার ক্রোড়ে জীবন বিসর্জ্জন দেন, তাঁহাকে তাজমহলে মমতাজ বেগমের পার্শ্বে সমাহিত করা হয়।

সাজাহানের মৃত্যু ও জাহানারার আধিপত্য হ্রাস হইলেও আরঙ্গজেবরাজত্বের সহিত জাহানারার সম্পর্ক একেবারে রহিত হয় নাই। রাজ্যের প্রধান

* Dow's History of Hindustan Vol III P. 274.

ফলেই জাহানারাকে সম্মান প্রদর্শন
.াতিপালনে তৎপর ছিলেন। এক সময়ে
.ঙ্গজেবের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ভাবত আক্রমণের
। জাফর নামে এক সম্ভ্রান্ত পারসীক দিল্লীর বাদসা-
তষ্ঠিত ছিলেন, এবং দিল্লীতে অনেক পারসীক সম্ভ্রান্ত
অভিষিক্ত হন। তাঁহারা সকলে সা আব্বাসের পক্ষাবলম্বী
.হের সন্দেহ হয়, এবং সেই সময়ে আব্বাস ও জাফরকে একখানি
.লখেন, সেই পত্র বাদসাহের হস্তগত হওয়ায় বাদসাহ বিশেষরূপ চিন্তিত
.য়া পড়েন। তিনি জানিতেন, পারসীকগণ জাহানারাকে অত্যন্ত ভক্তি করিয়া থাকেন। বাদসাহ তৎক্ষণাৎ জাহানারাকে আগরা হইতে দিল্লীতে আসিতে সংবাদ পাঠাইলেন। জাহানারা দিল্লীতে উপস্থিত হইলে, আরঙ্গজেব তাঁহাকে সমস্ত বিষয় ব্যক্ত করিয়া বলেন। জাহানারা সেই সমস্ত শুনিয়া একেবারে উজীরের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। উজীর এই সংবাদ পাইবামাত্র জাহানারাকে বহুসম্মানের সহিত স্বীয় অন্তঃপুর-মধ্যে লইয়া যান। জাহানারা অন্তঃপুরবাসিনীগণের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলে, উহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে বাদসাহের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সিংহাসনের পার্শ্বে লুটাইয়া পড়েন। অতঃপর অন্যান্য পারসীকগণও শান্তভাব অবলম্বন করেন। এই সময়ে সা আব্বাসের ও সহসা মৃত্যু হওয়ায়, আরঙ্গজেবের সমস্ত চিন্তা ও আশঙ্কা দূরীভূত হয়। জাহানারার সহিত মোগল সাম্রাজ্যের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, এই সকল ঘটনা হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

জাহানারার শেষ জীবন সম্ভবতঃ দিল্লীতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। কারণ তাঁহার সমাধিস্তম্ভ দিল্লীতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। হিজরী ১০৯২ অর্থাৎ ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে জাহানারা ইহলোক পরিত্যাগ করেন। পুরাতন দিল্লী ও নূতন দিল্লীর মধ্যে জাহানারার ক্ষুদ্র সমাধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই ক্ষুদ্র মর্ম্মর কবর মধ্যস্থলে শ্যামদূর্ব্বাদলে পরিশোভিত হইয়া পথিকনয়নের তৃপ্তি সম্পাদন করিতেছে। সমাধি গাত্রে খোদিত একটী পারসী কবিতা জাহানারার পিতৃভক্তির পরিচয় দিতেছে। কবিতায় তিনি তৃণাবরণ ব্যতীত অন্য আবরণে কবর সুসজ্জিত করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এবং তাহাতে নিজের খৃষ্টভক্তিরও পরিচয়

দিয়াছেন। জাহানারা মোগলরমণী হইয়াও খৃষ্টকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন, সেইজন্য স্বীয় কবিতায় তাঁহাকে নিজের পীর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইউরোপীয়দিগের সহিত সংস্রব ঘটায় তৎকালে খৃষ্টের মাহাত্ম্য কিছু কিছু এতদ্দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। সাজাহানের ও আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে অনেক ইউরোপীয় ব্যক্তির নামোল্লেখ দেখা যায়, সুতরাং তাহাদিগের দ্বারাই খৃষ্টের মাহাত্ম্য এতদ্দেশে প্রচারিত হওয়াই সম্ভব। কবিতার শেষে জাহানারা স্বর্গীয় পিতৃদেবের কন্যাদের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। কবিতাটী অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহিণী। * আমাদের বঙ্গকবি নবীনচন্দ্র তাঁহার প্রবাসের পত্রে সেই কবিতাটীর কয়েক চরণের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন :—

"বহুমূল্য আবরণে কবিওনা সুসজ্জিত
কবর আমার।
তৃণ শ্রেষ্ঠ আবরণ দীন-আত্মা জাহানারা
সম্রাট-কন্যার।"

জাহানারা সম্বন্ধে যে কোন প্রবাদ প্রচলিত থাকুক না, সাধারণে তাঁহার প্রগাঢ় পিতৃভক্তির কথাই অবগত আছে। বিশেষতঃ তাঁহার সমাধিস্থ কবিতাপাঠ করিয়া আজিও দিল্লীবাসিগণ তাঁহাকে দেবতাবোধে পূজা করিয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জাহানারার প্রভুত্বহ্রাসের পর রোশেনারা মোগল অন্তঃপুরের সর্ব্বেসর্ব্বা হন। সেই সময় হইতে তাঁহার প্রণয়পরিতৃপ্তির যথেষ্ট সুবিধা ঘটে। আরঙ্গজেব রোশেনারার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন, তিনি রোশেনারার অযথা প্রণয়ের কথা শুনিয়াও শুনিতেন না। আরঙ্গজেব যেখানে যুদ্ধোপলক্ষে অথবা অন্য কোন কার্য্যব্যপদেশে গমন করিতেন, রোশেনারা অন্তঃপুরের কর্ত্রীস্বরূপে তাঁহার সঙ্গ লইতেন। বার্ণিয়ার

* উক্ত পারসী কবিতার ইংরেজীতে এইরূপ অনুবাদ করা হইয়াছে—
"Save the green herb, place naught above my head,
Such pall alone befits the lowly dead;
The fleeting poor Jahanara lies here,
Her sire was Shah Jahon and Christ her Pir,
May God the Ghazi monarch's proof make clear."

সাহেব আরঙ্গজেবের কাশ্মীরযাত্রাকালে রোশেনারার গমনের কথাও লিখিয়াছেন। রোশেনারা ক্রমে তাঁহার বিপুল আধিপত্য হইতে বঞ্চিত হন। আরঙ্গজেবের কন্যাগণের ক্ষমতা বৃদ্ধি হওয়ায় রোশেনারার প্রভুত্ব মন্দীভূত হয়। আরঙ্গজেবের কন্যাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠা অবিবাহিতা ছিলেন, তিনি পিতৃস্বসাদিগের ন্যায় ভ্রমরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বেড়াইতেন। রোশেনারার সহিত ও অনেক স্থলে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হয়। ভ্রাতুষ্পুত্রী পিতৃস্বসার অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে নানা কথা পিতার কর্ণগোচর করান। ক্রমে আরঙ্গজেব রোশেনারার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠেন, অবশেষে এ জগৎ হইতে তাঁহার অন্তর্দ্ধান ঘটে। তাহার পর আরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা মোগল অন্তঃপুরের অধীশ্বরী হইয়া নিজের বিলাসলালসা পূর্ণমাত্রায় পরিতৃপ্ত করিতে থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র আরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠকন্যাকে জেবউন্নিসা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কোন কোন ইতিহাসে মোরাদের কন্যার নামই জেব উন্নিসা দৃষ্ট হয়। *

জাহানারা ও রোশেনারার বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, মোগল সাম্রাজ্যে রমণীগণ রাজনৈতিক ব্যাপারে কিরূপ লিপ্ত থাকিতেন। এরূপ কঠোরতার ও কোমলতার সমাবেশ পৃথিবীর অনেক স্থলে দুর্লভ।

শ্রীনিখিল নাথ রায়।

---

# জ্যোতির্ময়ী।

———00———

১

শুক্রবার, রাত্রি ৭টা—আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে সমস্ত জগৎ জ্যোৎস্নামগ্ন। জ্যোতির্ময়ী জ্যোৎস্নাভাসিত মুক্তাকাশ তলে গৃহ প্রাঙ্গনে বসিয়া আপনার ছোট ভাইটিকে খেলা দিতেছে। বিজয়ার প্রনাম করিতে নীরদ জ্যোতির্ম্ময়ীদের বাটী মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু জানি না নীরদকুমার কি জন্য ক্ষণকাল চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়াছিল।

---

* Dow's History of Hindustan Vol III P. 161.

২

জ্যোতির্ম্ময়ীর মাকে নীরদ পিসীমা বলিয়া ডাকিত, অন্যান্য বৎসর পূজা এবং গ্রীষ্মাবকাশে নীরদ কদাচিৎ পিসীমার বাড়ীতে পদার্পণ করিত; কিন্তু জানি না এইবার নীরদকুমার কেন প্রত্যহ বৈকালে জ্যোতির্ম্ময়ীর ভাইয়ের পড়া বলিয়া দিবার জন্য তাহাদিগের বাটী আসিত।

৩

কলেজ সোমবারে খুলিয়াছে। অন্যান্যবারে নীরদ ২।৪ দিন অগ্রেই কলিকাতা যাত্রা করে, কিন্তু সোমবারের পর আর এক সোমবার চলিয়া গেল তবুও নীরদের যাওয়া হইল না। কেন? বোধ হয় নীরদের বৈকালে পুরান জ্বর হয়।

৪

বিজয়ার পর পঞ্চম সপ্তাহ—আজ শুক্রবার, নীরদকুমার রাত্রিতে কলিকাতা রওয়ানা হইবে। দুপুর বেলা, নীরদ পিসীমা কলিকাতা হইতে কি আনিতে দিবেন তাহা জানিবার জন্য পিসীমার বাড়ীতে আসিয়াছে। দুপুর বেলা গ্রাম নিস্তব্ধ, লতাপাতা ঘেরা নীল গ্রামখানি যেন শরতের তীব্র রৌদ্রে মূর্চ্ছিত। বাঁশ ঝাড়ের ছায়ায় বসিয়া ঘুঘু একতানে উদাস গীতি গাহিতেছে। জ্যোতির্ম্ময়ী বসিয়া বসিয়া সেই উদাস গীতি শুনিতেছিল, এমন সময়ে নীরদ আসিল। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর নীরদ বলিল—"কই তুমি আমায় কি দিতে চেয়েছিলে।"

জ্যো—"আমি তা তোমায় দেব না।"

নী—"কেন দেবে না?"

জ্যো—"তুমি যদি তা বিশ্রী বলে ছিঁড়ে ফেল।"

নী—"বা বিশ্রী হলে ছিড়ব না?" তখন জ্যোতির্ম্ময়ী আপনার ছোট হাত-বাক্স হইতে একখানি ছোট ফটো বাহির করিয়া নীরদের হাতে দিল। নীরদ কিছুক্ষণ আনন্দ-বিস্ফারিত-লোচনে সেই ছবির দিকে চাহিয়া রহিল, পরে, "তাইতো বড় বিশ্রী—ছিঁড়ে ফেলে দিব"—বলিয়া আপনার পকেটে রাখিয়া দিল।

৫

পিসীমার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইল। নীরদ বাড়ী ফিরিল। দরজার কাছে জ্যোতির্ম্ময়ী দাঁড়াইয়া। অতিধীরে 'তবে আইস' এই ছোট কথা টুক বলিয়া নীরদ জ্যোতির্ম্ময়ীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। দুই জনেরই চক্ষু ছল ছল--নীরদের সহসা Byron এর সেই কথাটি মনে পড়িল,——

" If I meet thee,
After long years
How should I greet thee,
With silence and tears. "

তার পর নীরদ দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল ; কিন্তু তাহার মন কি তাহার অনুগমন করিতেছিল ?

৬

কালের কি পরিবর্ত্তন। মহেশপুরের ছোট তরফের কিছুই নাই। অমিতব্যয়ী, বিলাসী কালীচরণ মুখোপাধ্যায়ের বিধবা পত্নী আজ পথের ভিখারিণী। এরূপ অবস্থায় বড় তরফ বিধবা এবং তাহার অনাশ্রয় তিনটি পুত্রের সাহায্য করা দূরে থাকুক বরং কিরূপে তাহাদিগকে গৃহবহিস্কৃত করিবে তাহার উপায় করিতেছে। বিধবা তিনটী পুত্র কি প্রকারে পালন করিবে তাহা ভাবিয়া চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতেছে। পিত্রালয়ের কথা মনে হইল, কিন্তু পিতামাতা অনেক দিন মৃত। পিতামাতার এক কন্যা বিবাহ করিয়া কালীচরণ শ্বশুরের সমস্ত বিষয়টি প্রাপ্ত হইয়াছিল—সুতরাং তাহাও বিক্রীত। বিধবা সাশ্রুনয়নে ভগ্নহৃদয়ে আকাশের দিকে চাহিয়া করুণ কণ্ঠে কহিল "হা! ভগবন্—জ্যোতির্ম্ময়ীকে কি কেবল জ্বালা সহিবার জন্য ভবে পাঠিয়েছিলে ?"

৭

এন, ব্যানার্জ্জি খুব বড় দরের ব্যারিষ্টার। বয়স প্রায় ৪০ বৎসর। ব্যানার্জ্জি সাহেবের প্রচুর অর্থ,— কিন্তু দুরারোগ্য ক্ষয় কাশের হস্ত হইতে অর্থ কি রক্ষা করিতে পারে ? দিন দিন ব্যারিষ্টারের অবস্থা শোচনীয় হইতে অধিকতর শোচনীয় হইতে লাগিল। ব্যারিষ্টার উইল রেজিষ্টরি করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশের জল বায়ুতে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনায় দারজিলিং গমন করিলেন।

৮

জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুমে জ্যোতির্ম্ময়ীকে তিনটী সন্তান লইয়া সহরে যাইতে হইল। পথে দুঃখিনী বিধবার কত চিন্তা। মধ্যে মধ্যে তাহাঁর মনে হইতে লাগিল নিশ্চয়ই স্বামীর ঋণের জন্য তাহাদিগকে জেলে দিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট লইয়া যাইতেছেন।

৯

সুন্দর একটী দ্বিতল গৃহে তিনটী সন্তান লইয়া জ্যোতির্ম্ময়ী অবগুণ্ঠন টানিয়া বসিয়া রহিয়াছে। ঘরে ৮।৯ জন বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভদ্র লোক। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট একখানি কাগজ ইংরাজিতে পড়িয়া বাঙ্গলায়ই অবগুণ্ঠনবতী বিধবাকে বুঝাইয়া দিলেন।

"আমার নাম নীরদকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি কলিকাতার একজন ব্যারিষ্টার। আমি সজ্ঞানে উইল করিতেছি যে আমার স্বোপার্জ্জিত দুই লক্ষ পোনের হাজার টাকার যে কোম্পানির কাগজ আছে আমি মহেশপুরের জমিদার ৺ কালীচরণ মুখোপাধ্যায়ের বিধবাপত্নী শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে সেই কাগজের স্বত্বাধিকার প্রদান করিলাম।"

ম্যাজিষ্ট্রেট আর একটি ছোট হস্তিদন্তখচিত বাক্স জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর সন্তানের হাতে দিলেন। তাহার উপরে লেখা আছে "শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী।"

১০

ধীরে ধীরে জ্যোতির্ম্ময়ী বাক্স খুলিল, দেখিল দুইখানি ফটো ও একখানি চিঠি, একখানা বাঁধান খাতা। একখানি বার তের বৎসরের মেয়ের ফটো। তাহার পৃষ্ঠে লেখা রহিয়াছে——

নীর,

আমাকে তুমি ভালবাস। তুমি বলেছিলে আমার চেহারা তোমার কাছে বেশ লাগে, তাই এইখানা দিলাম।

তোমার—

জ্যোতি।

আর একখানি ফটোর নীচে লেখা রহিয়াছে——

এন্, ব্যানার্জ্জি, ব্যারিষ্টার য়্যাট্ ল, মিড্‌ল টেম্পল।

চিঠিখানি এই——

জ্যোতির্ম্ময়ি——

শুক্রবার জ্যোৎস্নালোকে তোমায় দেখিয়াছিলাম, সে দেখা আর ভুলিতে পারিলাম না, ভুলিতে ইচ্ছাও করি না। তোমাকে ভাল বাসিতাম, ভালবাসি, ভালবাসিব। আমি জানি তুমি আমায় কখনও ভুলিতে পারিবে না। তোমার কথা ভাবিয়া তোমার দুঃখের কথা শুনিয়া কতদিন অশ্রুজল ফেলিয়াছি। ডাক্তার বলিয়াছে আর তিন দিন, তার পর ক্ষয়কাশে আমাকে এক আঁধার দেশে লইয়া যাইবে। তোমার ছেলেরা যাহাতে সুশিক্ষা পায় তাহার যত্ন করিও। ভালবাসার ঋণ শোধ হয় না। আর পারি না—বড় শরীর অবশ হইয়া আসিতেছে, হায় জীবনে কিছুই হইল না। এই অসার জীবন, উল্কা সম জীবন, যদি সংসার হইতে ছুটিয়া যায় তবে কেহ তাহার জন্য কি এক বিন্দু অশ্রু ফেলিবে? আমার জীবনের অনেক কথা ওই বইখানিতে লেখা আছে; বাঙ্গলায় লিখিয়াছি। গায়ে মোটেই রক্ত নাই অথচ গলা দিয়ে রক্ত উঠিতেছে, বোধ হয় রাত্রেই—উঃ মরার কথা ভাবিতে ভয় হচ্ছে। তবে আসি——

হতভাগা——

নীরদ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়

# ধূমকেতু।

নানাবিধ শিখা-সংযুক্ত ধূমকেতু সময়ে সময়ে আকাশক্ষেত্রে লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহারা নিজ সুদীর্ঘ কক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইলে দৃষ্টি পথে পতিত হয়। গ্রহ, উপগ্রহগণ যেমন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে, ইহারাও তদ্রূপ করে। কিন্তু ইহাদিগের সকলের

ভ্রমণপথ ডিম্বাকৃতি নহে। কোন কোন ধূমকেতুর ভ্রমণপথ এত দূর দীর্ঘ ডিম্বাকৃতি যে তাহার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী রেখাদ্বয় প্রায় সমান্তরাল রেখার ন্যায় অনুভূত হয়। কোন কোন ধূমকেতু গ্রহগণের ন্যায় পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ও কোন কোন ধূমকেতু বা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম মুখে পরিভ্রমণ করে। যাহাদিগের ভ্রমণপথ ডিম্বাকৃতি, তাহাদিগের গতি ও প্রত্যাবর্ত্তনকাল গণনাসিদ্ধ; কিন্তু যাহাদিগের তদ্রূপ নহে, তাহারা কোথা হইতে আসিল, কবে প্রত্যাগমন করিবে, কোথায় যাইতেছে কিছুই বলা যায় না। কোন কোন ধূমকেতু ৩।৪ বৎসরে, কেহ বা ৭০।৭৫ বৎসরে; কেহ বা ২।৩ সহস্র, কেহ লক্ষ বর্ষে সূর্য্যমণ্ডল পরিবেষ্টন করে। ইহারা সূর্য্য ও পৃথিবী হইতে বহুদূরবর্ত্তী।



সকলেই অবগত আছেন যে ধূমকেতু পুচ্ছাকার। অর্থাৎ একটি অথবা ততোধিক বিন্দুকে আশ্রয় করতঃ শিখা অথবা পুচ্ছ বিস্তার পূর্ব্বক ধূমকেতু গগনমণ্ডলে আবির্ভূত হয়। ঐ বিন্দুকে মণ্ডল এবং অপর অংশকে পুচ্ছ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে।

মণ্ডল অধিকতর জ্যোতির্ম্ময়, এবং পুচ্ছ অথবা শিখা অপেক্ষাকৃত হীনপ্রভ। এই মণ্ডল এবং পুচ্ছ অতি স্বচ্ছ, ইহার মধ্য দিয়া অপর পার্শ্বস্থ তারাদল দেখা যাইতে পারে। কোন ধূমকেতুর এক, কাহারও দুই, কাহারও ছয়টি পর্য্যন্ত শিখা দেখা গিয়াছে। শিখা সূর্য্যমণ্ডলের বিপরীত দিকে থাকে। ধূমকেতু যতই সূর্য্যমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী হয় ততই মণ্ডলাংশে জলন্ত শিলাখণ্ড সকল পরস্পরের আঘাতে ও সংঘর্ষণে আরও উজ্জ্বল প্রতীয়মান হয়। এবং ঐরূপ ঘাত প্রতিঘাতে শিলাখণ্ড সকল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ক্ষুদ্রাকারে, অথবা বাষ্পাকারে মণ্ডল হইতে সূর্য্যাভিমুখে নিঃসৃত হইতে থাকে। কিন্তু সূর্য্যমণ্ডলস্থ তড়িৎ-শক্তির ক্রিয়াবশতঃ সমধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া সূর্য্য হইতে বিপরীত দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। কারণ সম তড়িৎধর্ম্মাক্রান্ত বস্তুদ্বয় পরস্পরকে বিক্ষেপণ

করে। এইরূপ ঘাত প্রতিঘাত ও বিক্ষেপণ ক্রিয়া অবিচ্ছেদে হইতে থাকাতেই ঐ বিক্ষিপ্ত অংশ পুচ্ছবৎ প্রতীয়মান হয়, এবং ধূমকেতু যতই সূর্য্যমণ্ডলের নিকটস্থ হয়, ততই পুচ্ছভাগ দীর্ঘায়তন হয়। সুতরাং ইহা সহজেই অনুমিত হইবে যে দীর্ঘকাল এই ক্রিয়া স্থায়ী হইলে ক্রমে শিলাভাগ অর্থাৎ মণ্ডলস্থ ক্ষিতি অংশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে ধূমকেতুও লয় পাইতে পারে। অথবা উল্লিখিত ঘাত-প্রতিঘাত-সম্ভূত খণ্ড খণ্ড শিলাভাগ প্রত্যেকে এক একটি ধূমকেতু রূপে পরিণত হইয়া সূর্য্য মণ্ডলের চতুর্দ্দিক্ ভ্রমণ করিতে পারে। জ্যোতির্ব্বিদ্গণ ধূমকেতুগণের এই উভয়বিধ অবস্থাই উপলব্ধি করিয়াছেন।

পুচ্ছভাগ মণ্ডলাংশের ক্ষয় হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং ক্রমে ধূমকেতু যতবার সূর্য্যমণ্ডলের সমীপবর্ত্তী হইবে, ততই তাহার মণ্ডলাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত ও গুরুত্বের হ্রাস হইবে। অবশেষে উহার গুরুত্বের এতদূর হ্রাস হইতে পারে, যে ধূমকেতুর ক্ষিপ্রগতি ক্রমে মন্দীভূত হইয়া গ্রহগণের ন্যায় গতিবিশিষ্ট হইয়া যায়। আকাশস্থ সূক্ষ্মবায়ুভাগের সংঘর্ষনই গতিহীনতার প্রধান কারণ। তখন ইহার কক্ষ প্রায় মণ্ডলাকার হইতে থাকে। এবং ক্রমে ইহার জ্বলন্ত অবস্থা নির্ব্বাপিত হইয়া গ্রহগণের ন্যায় কেবল সূর্য্য কিরণে প্রভাযুক্ত হয়। নচেৎ স্বভাবতঃ ধূমকেতুগণের নিজের ও সূর্য্য কিরণ প্রতিফলিত, এই দুই প্রকার জ্যোতিঃ আছে। ইহাদিগের পুচ্ছ ৫ কোটি ক্রোশ দীর্ঘ ও মণ্ডলাংশের ব্যাস ৫০ লক্ষ ক্রোশ হইতে দেখা গিয়াছে। এত বৃহদায়তন হইলেও ইহারা গুরুত্বে অতি যৎসামান্য, ও ঘনত্বে অতি হীন।

অতি প্রাচীন কাল হইতে এ পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক ৯০০ শত ধূমকেতু গণনা করা হইয়াছে।

সাধারণ বিশ্বাস এই যে ইহাদিগের উদয়ে পৃথিবীস্থ জীবগণের অনিষ্ট হইয়া থাকে। এই বিশ্বাস একবারে ভিত্তিহীন নহে।

শ্রীশশধর রায়।

---

## পরিচয়।
### ( সূত্র )

ভগ্ন কুটীরের মাঝে কত দিন এসেছে সে।
ভগ্ন হৃদয়েতে কতদিন দে'ছে দরশন,
কিন্তু কভু ভাবি নাই, স্বপনে বা ধ্যানে,
সখা মোর সুন্দর এমন !!!

করুণায় নিমজ্জিত শৈশব হৃদয়,
বুঝে নাই সে কারুণ্য লাবণ্যেতে ভরা।
বুঝে নাই প্রস্ফুটিত কুসুমের স্তরে,
মদিরা মিশায়ে দিয়ে রূপরাশি গড়া।

শিশুর কল্পনা যাহে ছিল পরাঙ্মুখ,
যৌবনের মৃদুজ্যোতিঃ করিছে প্রকাশ,
সৌন্দর্য্য, অমিয়, দুইয়ে পূর্ণ করি বুক,
ঢালিয়া দিতেছে প্রাণে কাতর নিশ্বাস !

যে রূপের কথা আগে জাগেনি মানসে,
সে তরঙ্গে আজি মোর হৃদয় বিকল,
মধুরতা,—মাদকতা, অমৃতও ছাড়া
এক বিন্দু বুঝি তাহে আছে হলাহল !

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

## সৃষ্টি—স্থিতি—লয়।

উত্তুঙ্গ শিখর শ্রেণী প্রসারি গগনে,
সুবিশাল গিরি ওই অটল গম্ভীর,
ফল পুষ্প তরু লতা তুষার কাননে,
প্রকৃতির চিরশান্ত—পবিত্র মন্দির।

লীলাময়ী নির্ঝরিণী ঝর ঝর ঝরে,
বিহগের কলকণ্ঠে মিলায়ে সঙ্গীত,
গৈরিকের রক্ত রাগ মুকুতা অধরে,
নেমে আসে মাতৃরূপে জগতের হিত।

সমতলে দয়াময়ী রাখি শ্রীচরণ
কল্যাণ-তরঙ্গ তুলি আনন্দে নাচিয়া,

ছুই করে ফুটাইয়া মন্দার কানন,
চলে যায় স্নেহ-নীর-ক্ষীর পিয়াইয়া।

অকূল-অর্ণব কোলে, কালের বিধানে,
মিশাইয়া প্রাণময়ী সুধানীর-ধারা,
আবার বাষ্পীয় রথে আরোহি বিমানে
পিতৃ-কোলে কন্যারূপে হয় আত্মহারা

চিন্তাশীল নর! ইথে নাহি মনে হয়
ব্রহ্মাণ্ডের চিরন্তন সৃষ্টি, স্থিতি, লয়?

শ্রীরজনীকান্ত সেন।

শুষ্কপত্র।

( একটী ইংরেজী কবিতা অবলম্বনে.)

তুমি যবে হেরেছিলে প্রথম প্রভাত,
কচি কিশলয় মাঝে কচি মুখ মেলে
হেসেছিলে নব হাসি, শিশির-সম্পাত
চুমেছিল ধীরে ধীরে কোমল কপোলে!
বসন্তের কুসুমিত সুগন্ধি মলয
তোমার অধরে এসে হ'ত পথহারা।
ফুলদল র'চে দিত নন্দন-নিলয;
কোথা হ'তে ভেসে এসে, অমিযার ধারা—
ঢেলে যেত পাখিগুলি, মধুমাখা স্বরে,
জাগাইয়া প্রকৃতির নীরব প্রাণ,
মৃদু মন্দ সান্ধ্য বায়ু হাত খানি ধ'রে
নিরখিত প্রেমভরে শ্যামল বযান।
হায়, সেই জীবনের চিরহাসি হ'তে
আজ তোরে কে আনিল অশ্রুর আগারে?
--শীতল নিঠুর ওই হেমন্তের বাতে
তোরে ফেলে গেছে আহা ধূলির উপরে!
অনন্ত আকাশ আর সান্ত ধরা মাঝে
তুই এসেছিলি শুধু খেলিতে দুদিন
প্রকৃতির কোলে,--আজ খেলা ভেঙ্গে গেছে
--কোমল অধর দুটী বিশুষ্ক মলিন!

# অজ্ঞেয়-বাদ।

( সমালোচনা )

## দ্বিতীয় অধ্যায়—মানবজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ কি ?

'অজ্ঞেয়বাদের' সঙ্গে নাস্তিকতা অপেক্ষা আস্তিকতারই সাদৃশ্য অধিক; কেবল বিভিন্নতা এই যে আস্তিকগণ জগতের 'আদিকারণকে' যেরূপভাবে 'জ্ঞাত ও জ্ঞেয়' বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন, অজ্ঞেয়বাদিগণ সেরূপ ভাবে অথবা ততদূর পর্য্যন্ত মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। ইহার জন্য অজ্ঞেয়বাদিগণকে দোষ দিবার পূর্ব্বে অধিকাংশ আস্তিকগণকে অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহারাই প্রকারান্তরে দোষী। কোন কোন আস্তিক-সম্প্রদায় জগতের 'আদিকারণকে' এমনি সম্পূর্ণভাবে মানবোচিত হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি গুণসম্পন্ন দেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়া তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য জগৎবাসীকে আহ্বান করিতেছেন যে, তাহাই যদি মানবজ্ঞানের স্বরূপ-জ্ঞাপক হয়, তাহা হইলে মানুষ যে পরমেশ্বর-তত্ত্ব কিছুই জানে না এবং কখনও জানিতে পারিবে না এ কথা প্রাণের আবেগে স্বতঃই বলিতে ইচ্ছা হয়! যিনি অনন্ত চরাচরে শক্তিরূপে সর্ব্বব্যাপী হইয়া বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে যদি তুমি কোন বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ করিয়া সাকার বস্তু বিশেষ বলিয়া বুঝাইতে চাও এবং তদুত্তরে অজ্ঞেয়বাদিগণ যদি তোমাকে বলেন "নেদং যদিদমুপাসতে"—তোমরা যাহাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিতেছ তাহা ঈশ্বর নহে, তবে কি অজ্ঞেয়বাদীদিগেরই সকল দোষ ? কোন কোন আস্তিকসম্প্রদায় মানবজ্ঞানে আদৌ যাহা নাই তাহা অপেক্ষাও অলৌকিক শক্তি আরোপ করিয়া কখন তাহার দ্বারা স্বর্গের সংবাদ আনাইতেছেন, কখন যমপুরীর ভ্রমণবৃত্তান্ত শুনাইতেছেন, কখন বা স্বর্গের সুশীতল ছায়াতলে ভগবানের সহিত একান্তে বসাইয়া সদালাপ করাইতেছেন! যাহার যাহা নাই তাহাকে তাহা থাকার

স্তায় ভাগ করিতে দিলে যাহা হয়, ইহার ফলও ক্রমশঃ সেইরূপ হইতেছে, অথবা দশদিন পরে তাহা আপনিই হইবে। মানবজ্ঞানের স্বাভাবিক শক্তিকে আনুষঙ্গিক শক্তি দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া "ইহাই ধর্ম্ম, উহা ধর্ম্ম নয়" এরূপ ভাবে ধর্ম্ম কথা প্রচার করিলে কিছুদিন তাহা মানুষ বিশ্বাস করিয়া লইতে পারে, কিন্তু চিরদিন সেরূপ করিবে না। আস্তিকতা যেমন মানবজ্ঞানকে যাহা তাহার স্বরূপ তাহা অপেক্ষাও অধিক শক্তি প্রদান করিতে চায়, অজ্ঞেয়বাদ সেইরূপ মানবজ্ঞানের যাহা স্বরূপ তাহাকে সংখ্যায় ও কার্য্যকারিতায় সঙ্কুচিত করিয়া আনিতে চায়। এই জন্য একদল বলেন পরমেশ্বর সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার তাহা জানা হইয়া গিয়াছে আর জানিতে কিছুই অবশিষ্ট নাই, এমন কি তিনি স্বয়ং স্বহস্তলিখিত পুস্তক পাঠাইয়া অথবা নিজ প্রতিনিধি দ্বারা তাহা মানুষকে জানাইয়া দিয়াছেন। আর একদল বলেন যে পরমেশ্বর সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি নাই, এমন কি জানিবার উপায় পর্য্যন্তও নাই! হার্বার্ট স্পেনসার তত্ত্ব-নির্ণয়ার্থ যেরূপ বৈজ্ঞানিক বিচার প্রণালীর অবতারণা করিয়াছেন, তাহার আশ্রয় লইয়া আমরাও তাঁহার ন্যায় বলিতে পারি যে, আস্তিকগণ যত পূর্ণ জ্ঞানের অভিমান করিতেছেন ততটা সত্য নহে, তাহার মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে অজ্ঞান জ্ঞানের নামে চালিত হইতেছে; এবং অজ্ঞেয়বাদিগণ যতটা 'অজ্ঞানতার' অতিবিনয় দেখাইতেছেন ততটাও সত্য নহে; তাঁহাদের অজ্ঞানতার ভাণের মধ্যেই অন্ততঃ এতটুকুও জ্ঞান আছে যাহাতে অজ্ঞেয়বাদের সমুদায় অন্ধকার দূর হইতে পারে।

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে মানবজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহার আলোচনা করা আবশ্যক। অজ্ঞেয়বাদিগণ যাহা কিছু বলিতেছেন তাহার মধ্যে একটি স্বীকৃত বাক্য এই যে, "বাস্তবিক নিত্য সত্য বস্তু যে নাই তাহা নয় বরং তাহা যে সত্যই আছে তাহাই স্থির কথা। কিন্তু আমাদের জ্ঞান তাহার বিষয় জানিতে পারে না!" অজ্ঞেয়বাদিগণের ধারণা এই যে, বাহ্যজগতের পরপারে মানবাত্মার আবাসযোগ্য পরম সুন্দর স্থায়ী রাজ্য আছে, কিন্তু সে রাজ্যের কোন বিষয়ই আমাদের জ্ঞানগম্য নহে! মানবজ্ঞানের অজ্ঞতা যে জ্ঞান অজ্ঞেয়বাদিগণ নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা নহে। বহুদিন হইতেই দার্শনিকগণ ক্রমে ক্রমে মানবজ্ঞানকে সঙ্কুচিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, অজ্ঞেয়

বাদিগণ তাহাই অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে মানবজ্ঞানে সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা আরোপ করিতে চাহিতেছেন মাত্র। অধ্যাপক লক বলিতেন "মানবজ্ঞান কোন বস্তুরই প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারে না, কেবল বাহিরে বাহিরে যতটুকু দেখে ততটুকুই জানিতে পাবে।" কিন্তু কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বস্তুর প্রকৃত তথ্য যে মানবজ্ঞানে একেবারেই জানা যায় না এরূপ কথা লক নিঃসন্দেহে বলিতে পারিতেন না। তাঁহাব পরবর্ত্তী দার্শনিক হিউম একেবারে নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছিলেন যে, "সকল বস্তু সম্বন্ধেই মানবজ্ঞান অসম্পূর্ণ; সুতরাং সৃষ্টির মূলে কোন ব্যক্তিগত 'কারণ' নাই; সৃষ্টি কেবল বিবিধ কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার সমষ্টি মাত্র।" হিউমের পরবর্ত্তী দার্শনিক পণ্ডিতবর বারক্লে একেবারে বাহ্যজগতের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকাব করিয়া সকলই 'ভাবময়' বলিয়া ব্যাখ্যা কবিয়া গিয়াছেন। ইঁহার মতে আমাদেব দর্শন শ্রবণাদির বিষয়ীভূত বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান নাই; বুঝি বলিয়া মনে করি বটে, কিন্তু তাহা ভ্রম। বাহ্যজগৎ নাই, আছে কেবল 'ভাব' এবং আমবা তাহাই উপলব্ধি করিয়া থাকি। ক্যাণ্ট আবাব শুধু বাহ্যজগৎ নয়, স্থান কাল, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ, মানবাত্মা ও পবমেশ্বর পর্য্যন্ত ভাবমাত্রে পবিণত করিয়া বলিয়াছেন যে, এই সকল বিষয়ের নিশ্চযাত্মক জ্ঞান আমাদের হইতেই পারে না। এই সকল মত যে কেবল ইউরোপ খণ্ডেই প্রচলিত ও প্রচাবিত হইয়াছে তাহা নহে, আর্য্য-সভ্যতার লীলাভূমি ভারতবর্ষেও অতি প্রাচীন কাল হইতে এইরূপ মতবিবর্ত্তন চলিয়া আসিয়াছে। এই জন্যই যে বেদকে অবলম্বন করিয়া মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" তাহাকেই ধরিয়া মহামুনি পতঞ্জলী যোগশাস্ত্র লিখিয়াছেন, যে বেদকে শিবোধার্য্য করিয়া সায়নাচার্য্য দ্বৈতবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহারই শ্রুতি অবলম্বন করিয়া শ্রীমদাচার্য্য শঙ্করস্বামী অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন! এই সকল দার্শনিক মতের চরম ফল কি? ধর্ম্মের জন্য যেরূপ জ্ঞানের আবশ্যক তাহা যখন মানবজ্ঞানাতীত, তখন ধর্ম্ম কি বৃথা কুসংস্কার নহে? দর্শনশাস্ত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ও অধ্যাপকগণ ইচ্ছা করুন আর না করুন, তাঁহাদের শিষ্যগণ প্রকারান্তরে ধর্ম্মবিরোধী না হইলেও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া পড়িতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই জন্য, ইউরোপ খণ্ডে খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রবল প্রতাপ থাকিতেও লোকের মন ধর্ম্মবিচ্ছিন্ন

হইতেছে, ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে ধর্ম্মের উজ্জ্বলালোক থাকিতেও লোকের মন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটু বিশেষ ধরাবাঁধা আলোচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত সম্প্রদায় হয়ত কোন ধর্ম্মই মানেন না, নচেৎ একেবারেই উদাসীন। এজন্য বিদ্বান-দিগের পক্ষে ধর্ম্মালোচনা করা আজ কাল সকল দেশেই বৃথা সময় নাশ অথবা ঘোরতর ব্যলীকতা বলিয়া লোকের ধারণা জন্মিযাছে।

অজ্ঞেয়বাদীরা বলেন যে ভগবৎতত্ত্ব মানবজ্ঞানের সীমার বাহিরে, সুতরা তাহা মানবজ্ঞানের নিকট চিরদিনই অজ্ঞাত! বাস্তবিক পক্ষে ঈশ্বরতত্ত্ব মানব জ্ঞানের সীমার বাহিরে কি ভিতরে, তাহা জানিতে হইলে মানবজ্ঞানের সীম কোথায়, আগে তাহার মীমাংসা করিতে হয়; এবং নিরপেক্ষভাবে সেই কথা মীমাংসা করিতে হইলেই জিজ্ঞাসা করিতে হয়, মানবজ্ঞানের সীমা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে কিনা? যদি বল মানবজ্ঞানের সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারি না, তাহা হইলে প্রকারান্তরে মানিয়া লইতে হয় যে, ঈশ্বরতত্ত্ব মানবজ্ঞানের সীমার বাহিরে কি ভিতরে তাহাও নির্ণয় করিতে পার না। যদি বল মানব জ্ঞানের সীমা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব, তাহা হইলে প্রকারান্তরে মানবজ্ঞানকে 'অনন্ত' বলিয়া মানিয়া লইতে হয়; সুতরাং— অনন্ত মানবজ্ঞানে অনন্ত পরমেশ্বরতত্ত্ব জানিতে পারিব না কেন? আর যদি বল মানবজ্ঞানের সীম নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিব, কোথায় সেই সীমা? এই সীমা নির্দ্দেশ করিতে হইলেই 'অজ্ঞেয়-বাদ' কিয়ৎপরিমাণে খণ্ডিত হইয়া যাইবে। মানবজ্ঞান কি কি জানিতে পারে আর কি কি জানিতে পারে না অথবা কি জ্ঞেয় আর কি অজ্ঞেয়, আগে তাহার নির্ব্বাচন না করিয়া তুমি কি বলিতে পার মানবজ্ঞানে 'ইহা' জানিতে পারিবে, 'উহা' জানিতে পারিবে না? সুতরাং আগে 'জ্ঞেয়' ও 'অজ্ঞেয়' বস্তু নির্ণয় করা আবশ্যক। এখন বিচার করিয়া দেখ 'জ্ঞেয় আর 'অজ্ঞেয়ের' মধ্যে সীমা নির্দ্দেশ করা সম্ভব কিনা? এই দুইটী ভাব পরস্পর সংলগ্ন, একটিকে ছাড়িয়া অপরটির জ্ঞান হইতে পারে না। কি 'অজ্ঞেয়' তাহা না জানিলে 'জ্ঞেয়' রাজ্যের সীমা নির্ণীত হয় না, এবং কি 'জ্ঞেয়' তাহা না বুঝিতে পারিলেও, কোথা হইতে 'অজ্ঞেয়' রাজ্যের সীমা আরম্ভ হইবে তাহা বলিতে পার না। সুতরাং মানবজ্ঞানের সীমা নির্দ্দেশ

করিতে হইলেই 'অজ্ঞেয়' রাজ্যের সীমা নির্ণয় করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা যদি সত্য সত্যই 'অজ্ঞেয়' তাহার সীমাও 'অজ্ঞেয়'; সুতরাং 'অজ্ঞেয়ের' সীমা তুমি নির্দ্দেশ করিতে অক্ষম বলিয়া মানবজ্ঞানেরও সীমা নির্দ্দেশ করিতে পার না। যদি বল মানবজ্ঞানের সীমা নির্দ্দেশ করা যায়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই সীমা নির্দ্দেশ করিতে হইলে 'অজ্ঞেয়' রাজ্যের যতটুকু 'জ্ঞান' থাকা আবশ্যক তাহা তোমার আছে। তবে আর ঘোর 'অজ্ঞেয়বাদ' কোথায় থাকিল? তুমি যাহার সম্বন্ধে কিছুই জান না বলিয়া মানবজ্ঞানকে গণ্ডীর মধ্যে আনিতে চাও, সেই গণ্ডীর মধ্যে আনিতে হইলেই 'অজ্ঞেয়' তত্ত্ব কিছু কিছু জানা আবশ্যক হয়। বাস্তবিক স্থূল সূক্ষ্ম, উচ্চ নীচ, সুন্দর কুৎসিৎ, সত্য মিথ্যা, আলোক আঁধার, নূতন পুরাতন, সসীম অসীম, জ্ঞেয় অজ্ঞেয় এমনি পরস্পর সংযুক্ত যে, একটিকে ছাড়িয়া দিয়া অপরটির জ্ঞান হইতে পারে না। একটিকে জানিতে হইলেই অপরটির স্বরূপ কতক কতক জানা আবশ্যক হইয়া পড়ে। সুতরাং জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয় উভয়ই এক অর্থে 'জ্ঞেয়' এক অর্থে 'অজ্ঞেয়' হইয়া পড়ে। যাহাকে তুমি 'অজ্ঞেয়' বলিতে চাও তাহার সম্বন্ধে কিছু না জানিলে তাহা যে 'অজ্ঞেয়' কি 'জ্ঞেয়' তাহা কখনও পৃথক করিয়া বুঝিতে পারিতে কি?

আমি যদি তোমাকে কোন পথের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করি, আর তাহার উত্তরে তুমি যদি বল যে এক ক্রোশ পরেই সেই পথের সীমা—তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে, সেই এক ক্রোশের পর কি আছে তাহার বিষয় তুমি একবারে কিছুই জান না? যদি কিছুই না জানিতে তবে এক ক্রোশের পর যে সীমা আছে কি নাই তাহা বলিতে পারিতে কি? যেখানে গিয়া পথের শেষ হইয়াছে সেখানে অবশ্যই এমন কিছু আছে যাহার অবরোধ-বশতঃ পথের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই পথরোধকারী বস্তুর সাকল্যতত্ত্ব তুমি না জানিতে পার, কিন্তু তাহার তত্ত্ব কিছু না কিছু জানিতেই হইবে। যদি তুমি বল যে সেই এক ক্রোশের পর আর পথ নাই, আমি জিজ্ঞাসা করিব, কেন নাই? তুমি তাহার উত্তরে বলিতে পার যে সেইস্থান হইতে মহাসমুদ্রের আরম্ভ হইয়াছে, যে দিকে চাও কেবল জলে জলময়, তাহার অন্ত পাওয়া যায় না। আমি ইহাতে কি এই বুঝিব যে সেই মহাসমুদ্রের বিষয় তুমি কিছুই জান না? যেখানে গিয়া পথের শেষ ও পথহীনতার আরম্ভ হয়, যেখানে গিয়া জ্ঞানের শেষ হইয়া 'অজ্ঞেয়তার'

আরম্ভ হয়, সেই সংযোগ-স্থলে পথ ও পথহীনতা, 'জ্ঞেয ও অজ্ঞেয়তা' সম্মিলিত থাকে,—সুতরাং যে বলিতে পারে যে সেই পর্য্যন্ত পথ, তাহার পর আর পথ নাই, সেই পর্য্যন্ত 'জ্ঞেয়' তাহার পর 'অজ্ঞেয়' রাজ্য, সে সীমান্তস্থিত পথহীনতা ও অজ্ঞেয়তার তত্ত্ব কিছু না কিছু অবশ্যই জানে। ( ক্রমশঃ )

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

---

# গাছের বুদ্ধি।

——00——

শাস্ত্রে বলে উদ্ভিজ্জের জ্ঞান আছে, কিন্তু ঐ জ্ঞান মোহান্ধকারে আবৃত। উদ্ভিজ্জ জীবশ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদিগের কার্য্যকলাপ মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিলে জ্ঞান অথবা বিচার-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যে কার্য্য তুমি আমি করিলে বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, তদ্রূপ কার্য্য উদ্ভিজ্জে করিলে তাহাতে বুদ্ধি আরোপ করিব না কেন? কতিপয় দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথা পরিষ্কাররূপে বুঝান যাইতে পারে।

(১) লাউগাছ কিরূপে নিম্ন হইতে উচ্চে উঠে ও কিরূপে ক্রমে বর্দ্ধিত হয় তাহা অনেকেই দেখিযাছেন। লাউযের লতা হইতে স্থানে স্থানে আঁকুড়া বাহির হয় ও তদ্দ্বারা আশ্রয় পদার্থকে জড়াইয়া ধরিয়া লাউগাছ ক্রমশঃ অগ্রসর হয়। লাউয়ের জাঙ্গলা, বাঁশ এবং কঞ্চিকা দ্বারা প্রস্তুত করিয়া নীচে একটি লাউয়ের চারা বুনিয়া দিলে দেখা যাইবে যে উহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া আঁকুড়া দ্বারা অতি সাবধানে ঐ বাঁশ ও কঞ্চিকা জড়াইয়া ধরিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। ঐ বাঁশ অথবা কঞ্চিকা গায়ে তৈল, ঘৃত অথবা অন্য কোন পিচ্ছিল পদার্থ মাখাইয়া দিলে, লাউগাছ অনেকবার আঁকুড়া দিয়া তাহাকে জড়াইয়া অবশেষে উপরে উঠে। ঐরূপ পিচ্ছিল না করিলে আশ্রয় বাঁশ অথবা কঞ্চিকাতে যতবার আঁকুড়া দ্বারা জড়াইত, পিচ্ছিল করাতে তদপেক্ষা অনেক বেশীবার জড়ায়। কোন কোন

লতা গাছের আঁকুড়া আশ্রয়কে জোড়া সংখ্যক বার জড়াইয়া ধরে, অর্থাৎ ২, ৪, ৬, ৮ ইত্যাদি জোড়া সংখ্যক পেঁচ দেয়। এবং কোন কোন লতা বিজোড়া সংখ্যকবার আঁকুড়া দ্বারা আশ্রয়কে জড়াইয়া ধরে। অর্থাৎ ৩, ৫, ৭, ৯ বার ইত্যাদি। কোন লতার আঁকুড়া দক্ষিণ হইতে বামে ও কোন লতার বাম হইতে দক্ষিণে জড়াইয়া ধরে। আশ্রয় পিচ্ছিল হইলে অধিকবার জড়াইয়া ধরা অবশ্যই বুদ্ধির কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

(২) লাউয়ের লতা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে আশ্রয়ের বাঁশ অথবা কঞ্চিকাকে সরাইয়া রাখিলে ঐ লতা অন্যদিকে অগ্রসর না হইয়া ঐ আশ্রয়ের দিকেই যাইবে। সেই সময় তুমি উহাকে অপর দিকে সরাইয়া দিলেও কিয়ৎকাল পরে দেখিবে যে পুনরায় আশ্রয়ের দিকেই যাইতেছে। ইহাও বুদ্ধির পরিচয়।

(৩) কোন কোন লতাগাছের গন্তব্য পথে কাষ্ঠ, প্রস্তর অথবা ইষ্টক আদি বাধা রাখিয়া দিলে, কখন বা তাহার উপর দিয়া, কখন বা তাহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইবে। কিন্তু উপর দিয়া গেলে যদি অল্প পথ যাইতে হয়, তবে প্রায়শঃ পার্শ্ব দিয়া যাইবে না। এবং পার্শ্ব দিয়া গেলে যদি অল্প পথ অতিক্রম করিতে হয়, তবে উপর দিয়া যাইবে না। যেমন আমরা সহজ পথ পাইলে অন্য পথে যাই না, তদ্রূপ আচরণ কি বুদ্ধির কার্য্য নহে?

(৪) মহাত্মা ডারউইন দেখিয়াছেন যে একটি গাছের ফল পক্ষীতে নষ্ট করিত। কিন্তু তাহার নিকটবর্ত্তী ভিন্ন বর্ণের আর একটি গাছের ফল ঐ সকল পক্ষী স্পর্শও করিত না। কিছু দিন পরে ঐ প্রথমোক্ত গাছ, শেষোক্ত গাছের ন্যায় বর্ণ ধারণ করিল, এবং এই উপায়ে পক্ষীদিগের দৌরাত্ম্য হইতে আত্ম-রক্ষা করিল। কারণ বর্ণ-পরিবর্ত্তন করা অবধি পক্ষিগণ আর তাহার ফল নষ্ট করিত না।

(৫) কোন কোন গাছের ফুল এবং শাখাগ্রভাগ সূর্য্যের অভিমুখে সতত থাকিতে ভাল বাসে। তাহারা প্রাতঃকালে পূর্ব্ব মুখে, অপরাহ্ণে পশ্চিম মুখে থাকে। ইহার মধ্যে কি সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা নাই?

(৬) মাংসাহারী গাছ সকল অন্য কোন দ্রব্য দিলে গ্রহণ করে না। কিন্তু মাংস খণ্ড পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে আবদ্ধ করে, এবং পরিশেষে

অস্থি ভিন্ন আর সকলই খাইয়া ফেলে। এইরূপ আহার্য্য বস্তু নির্দ্ধারণ ও অনেকাংশে জ্ঞানের কার্য্য বলিতে হইবে।

এই সকল বিষয় অনেকেই অতি সহজে পরীক্ষা করিতে পারেন। আর নিজ নিজ পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহাতে সাধারণের উপকার ও আছে।

শ্রীশশধর রায়।

---

# নেপোলিয়নের উপাখ্যান।

জগতের ইতিহাসে নেপোলিয়নের ইতিহাস একটি অতুল্য সামগ্রী। ইউ-রোপ ও ইংলণ্ডের অর্দ্ধ শতাব্দীর ইতিহাস নেপোলিয়নের ইতিহাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নেপোলিয়ন কেবল যে বিখ্যাত রাজনীতিবিৎ ও অদ্বিতীয় রণপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার ইতিহাস পাঠ করা উচিত তাহা নহে। ইঁহার আশৈশব জীবনবৃত্ত সর্ব্বশ্রেণীর মানবগণের পক্ষেই শিক্ষাপ্রদ। নেপোলিয়ন এক দিনে হঠাৎ ফ্রান্সের সম্রাট হন নাই। কোন উচ্চপদ লাভ করিতে হইলে মানসিক শক্তি-সমূহের কিরূপ অনুশীলন আবশ্যক নেপোলিয়-নের ইতিহাস পাঠে তাহা বিশদরূপে শিক্ষা করা যাইতে পারে। নেপোলিয়নের উন্নতি বাল্যকাল হইতে তাঁহার মানসিক ও শারীরিক অনুশীলনের ফল।

নেপোলিয়ন নিজে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে তাঁহার সর্ব্বপ্রকারের উন্নতি তদীয় মাতৃদত্ত নৈতিক ও মানসিক শিক্ষার ফল মাত্র। তাঁহার জননীর শাসনে ও উপদেশে কোন প্রকারের নীচভাব তাঁহার অন্তঃকরণে স্থান পায় নাই। জননীর সৎসাহসে ও সৎদৃষ্টান্তে তাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা উচ্চ ভাবে পরিপূর্ণ থাকিত। একদা ফ্রান্সের নৈতিক ও মানসিক হীনতা দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, দেশে সর্ব্বপ্রকারের অভাব অপেক্ষা সুশিক্ষিতা জননীর

স্বভাবই গুরুতর বলিয়া অনুভূত হয়।

নেপোলিয়নের জননীর মানসিক দৃঢ়তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। সিংহাসন অধিরোহন করার পর নেপোলিয়ন একদা সভাসদগণে পরিবৃত সেণ্ট ক্লাউড নামক রাজভবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার জননীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় নেপোলিয়ন অর্দ্ধপরিহাসচ্ছলে তাঁহার জননীর চুম্বন জন্য রাজন্যগণের রীত্যনুযায়ী আপন হস্ত প্রসারণ করিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার জননী গম্ভীরভাবে নিজ হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিলেন, "বৎস, তাহা হইবে না, যিনি তোমার জন্মদাত্রী তাহারই হস্ত চুম্বন করা তোমার কর্ত্তব্য।" নেপোলিয়ন বলিয়াছেন তাঁহার জননী রমণীকুলের শিরোমণি ছিলেন, তাঁহার তুল্য রমণী সহসা দৃষ্ট হইত না। উপযুক্ত জননীর উপযুক্ত পুত্র বটে।

নেপোলিয়নের চরিত্র অতি পবিত্র ছিল। অসচ্চরিত্র ব্যক্তি বহুগুণসম্পন্ন হইলেও তাঁহার নিকট আদর পাইত না। দাম্পত্য প্রণয়ের দৃষ্টান্ত পাইলে পত্নী বা স্বামীকে তিনি বিশেষ অনুগ্রহ ও সম্মান করিতেন।

নেপোলিয়ন সম্রাট হইবার পরে এক দিন দুই জন কর্ম্মচারী মাত্র সঙ্গে লইয়া সেনানিবাস মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন; এমন সময় দেখিতে পাইলেন একটি যুবতী রমণী একটি বালকের হস্ত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছে। রমণী সম্রাটকে চিনিত না। নেপোলিয়ন তাহাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রমণী কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইল। বালকটি বলিল "মহাশয়, আমার পিতা প্রহার করিয়াছেন বলিয়া আমার মাতা কাঁদিতেছেন।"

সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার পিতা কোথায়?"

বালক বলিল,—"তিনি নিকটেই প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।" নেপোলিয়ন রমণীকে তাহার স্বামীর নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে সে তাহার স্বামী ক্যাপ্টেন কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইবে ভাবিয়া নাম বলিতে অস্বীকৃত হইল। সম্রাটকে সে জনৈক ক্যাপ্টেন বলিয়া অনুমান করিয়াছিল। সম্রাট রমণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—তোমার স্বভাব অতি আশ্চর্য্য, তোমার স্বামী তোমাকে প্রহার করিয়াছে তথাপি তুমি তাহার নাম বলিতেছ না। বোধ হয় তোমার নিজেরও কিছু দোষ আছে।

রমণী বলিল "আমার স্বামীর অনেক গুণ আছে, দোষের মধ্যে তিনি বড় সন্দিগ্ধমনা। আমার প্রতি সন্দেহ করিয়া তিনি অনেক সময় ক্রোধ দমন করিতে পারেন না। তাহা হইলেও তিনি আমার স্বামী ও এই বালকের পিতা। আমি তাঁহাকে বড় ভালবাসি।"

সম্রাট পুনরায় বলিলেন, "তথাপি তোমার স্বামীর এই ব্যবহার বড় নিন্দনীয়। তোমার স্বামীর নাম বল, আমি সম্রাটের নিকট এই কথা উত্থাপন করিয়া ইহার প্রতিবিধান করিব।"

রমণী উত্তর করিল "আপনি স্বয়ং সম্রাট হইলেও আপনাকে আমার স্বামীর নাম বলিব না। কারণ তাহা হইলে আমার স্বামীর বিশেষ শাস্তি হইবার সম্ভাবনা।"

সম্রাট তাঁহার সঙ্গীদিগকে বলিলেন, "দেখ, এই রমণী কেমন স্নেহশালিনী। রাজভবনেও ইহার তুল্য রমণী অধিক নাই। এই রমণীর ন্যায় পত্নী তাহার স্বামীর অমূল্য সম্পত্তি বটে।" সম্রাট তৎক্ষণাৎ সেনাপতিকে ডাকাইয়া ঐ সৈনিকের বিষয় অবগত হইলেন ও তাহাকে তাঁহার সন্মুখে ডাকাইলেন। সৈনিক সম্রাটকে চিনিত না, সে অল্প দিন মাত্র সৈনিক শ্রেণীতে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।

সৈনিক আসিলে সম্রাট তাহাকে বলিলেন—"তোমার স্ত্রী তোমা অপেক্ষা সৎস্বভাব-সম্পন্না; তাহাকে তোমার মারিবার কারণ কি? ফরাসী সৈন্যের ইহা অতি নিন্দার কথা।"

সৈ। স্ত্রীলোকদিগের কথা বিশ্বাস করিলে তাহারা নির্দ্দোষী বলিয়া বোধ হয়। তাহাকে আমি অধিক গল্প করিতে নিষেধ করি, তথাপি সে আমার কথা না মানিয়া সকলের সহিত গল্প ও আলাপ করিয়া বেড়ায়।

সম্রা। বা, এ ত তোমার অতি বিষম ভ্রম দেখিতেছি। স্ত্রীলোকের জিহ্বাকে নীরব থাকিতে বলা ও প্রবল নদীর স্রোতকে ক্ষান্ত থাকিতে বলা তুল্য কথা। যদি সে প্রকৃত দোষী হইবে, তবে কখনই প্রফুল্লভাবে গল্প করিয়া বেড়াইত না। আমার উপদেশ গ্রহণ কর,—তাহাকে সন্দেহ করিও না ও কদাপি তাহাকে মারিও না। আমার আজ্ঞা অবহেলা করিলে সম্রাটকে জানাইব। বল দেখি সম্রাট যদি তোমাকে এজন্য ভর্ৎসনা করেন তবে তাঁহাকে তুমি কি জবাব দিবে?

সৈনিক তাহাতে কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, "সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলি,—'মহাশয়, আমার স্ত্রী আমার। আমার ইচ্ছা আমি তাহাকে প্রহার করিব। তুমি তোমার রাজ্য শাসন কর, আমি আমার স্ত্রীকে উপযুক্তরূপে শাসন করিব।' নেপোলিয়ন হাসিয়া বলিলেন—"বৎস, আমিই সম্রাট।" সহসা 'সম্রাট' শব্দ সৈনিকের হৃদয়ে মন্ত্রতুল্য ক্রিয়া সম্পাদন করিল। লজ্জিত হইয়া সৈনিক তখন বিনম্র বদনে উত্তর করিল, পিতঃ, তাহা হইলে পৃথক কথা। মহারাজের যে আজ্ঞা তাহাই শিরোধার্য্য। সম্রাট বলিলেন "বেশ কথা। আমি তোমার পত্নীর প্রশংসা সর্ব্বত্র শুনিতে পাইতেছি, তাহার চরিত্র অতি নির্ম্মল। আমাকে অসন্তুষ্ট করিয়াও সে তোমার নাম বলে নাই। তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া তাহাকে পুরস্কৃত করা কর্ত্তব্য। আমি তোমার পদোন্নতি করিয়াদিলাম এবং এই ৫০০ শত স্বর্ণমুদ্রা, তোমার পত্নীকে কোন স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করাইবার জন্য প্রদান করিলাম। তোমার বালকের জন্য ভবিষ্যতে বন্দোবস্ত করা যাইবে। কিন্তু কদাপি তোমার স্ত্রীকে প্রহার করিও না; তাহা হইলে আমিও তদ্রূপ শাস্তি দিতে বাধ্য হইব।"

এই ঘটনার বহু দিবস পরে সহসা একদিন নেপোলিয়ন সেই সৈনিক-পত্নীর সাক্ষাৎ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে, এখন কেমন আছ? তোমার স্বামী তাহার অঙ্গীকার পালন করিয়াছে ত?" সেই রমণী এই কথা শ্রবণ মাত্র বাষ্পপূরিতলোচনে সম্রাটের পদতলে লুঠাইয়া বলিল, "পিতঃ, সেই সৌভাগ্যের দিন হইতে আমি রমণীমণ্ডলমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখী হইয়াছি।"—"তাহা হইলে নারী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সচ্চরিত্রা হইও। ইহাই আমার এক মাত্র পুরস্কার।" (Then reward me by being the most virtuous of wives) এই বলিয়া তাহাকে কয়েক খণ্ড স্বর্ণমুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক নেপোলিয়ন অন্তর্হিত হইলেন।

নেপোলিয়ন সর্ব্বদা সর্ব্বস্থলে গুণের আদর ও সম্মান করিতেন। চিত্র কার্য্যের উৎসাহ প্রদান জন্য নেপোলিয়ন একদিন সপত্নীক বিখ্যাত চিত্রকর ডেবিডের বাসস্থলীতে গিয়াছিলেন। তৎকালে ডেবিড, সম্রাট ও মহারাজ্ঞীর একটী চিত্র কেবল মাত্র সম্পূর্ণ করিয়াছেন। নেপোলিয়ন চিত্র

দর্শনে অতীব হৃষ্ট হইলেন ও শিল্পবিদ্যার সম্মানার্থে আপন শিরোভূষণ উন্মোচন করিয়া "চিত্রবিদ্যা-বিশারদ ডেবিড, আমি আপনাকে অভিবাদন করিতেছি,"—বলিয়া প্রগাঢ় অভিবাদন করিলেন।

বাক্‌পটু ডেবিড তাহার উত্তরে বলিলেন "আমি সম্রাটদত্ত এই সম্মান দেশের সমস্ত শিল্পীর পক্ষে গ্রহণ করিতেছি।"

স্ত্রীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধে নেপোলিয়নের নিরতিশয় যত্ন ও চেষ্টা ছিল। নিজ প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলি তাঁহার বড়ই যত্নের সামগ্রী ছিল। বালিকারাও নেপোলিয়নকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ভালবাসিত। নেপোলিয়ন একদা কোন বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে একটি বালিকার বুদ্ধি-কৌশলে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে একটি স্বুবর্ণহার উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ন সিংহাসনচ্যুত হইবার পর পরবর্ত্তী রাজগণ নেপোলিয়নের সর্ব্বপ্রকার স্মৃতিচিহ্ন বিলোপ করার জন্য হুকুম প্রদান করিলেন। ঘটনাক্রমে এই বালিকার নিকট স্মৃতিচিহ্ন থাকা প্রকাশ পায়। বালিকার নিকট শিক্ষকগণ উহা চাহিলে বালিকা বলিল,—"ইহা সম্রাট আমাকে দিয়াছেন, আমি জীবন থাকিতে ইহা ছাড়িব না।" উপরিস্থ কর্ত্তাদের হুকুম ক্রমে বালিকাকে সংশোধনাগারে ( House of correction ) কয়েদ রাখিয়া অনেক কষ্ট দেওয়া হইয়াছিল, তথাপি বালিকা ঐ স্বর্ণহার ছাড়ে নাই।

---

## বাঙ্গলা উপন্যাস।

বঙ্গভাষার ইতিহাস লিখিবার সময় এখনও হয় নাই। যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি প্রথমে ইহার ইতিহাস লিখিতে বসিবেন, তাঁহার চক্ষে ইহার জীবনের একটি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা নিশ্চয়ই প্রতিভাত হইবে। কোন ভাষার ভাগ্যে যাহা হয় নাই, এই পরমুখাপেক্ষিণী বঙ্গভাষার ভাগ্যে তাহা ঘটিয়াছে। সম্পূর্ণ তরুণ

বয়সে একই লোকের হস্তে ইহার উপন্যাসের উৎপত্তি ও পূর্ণতা প্রাপ্তি হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন আর বাঙ্গলা উপন্যাসের জন্ম ও পরিণতি অচ্ছেদ্যভাবে সম্বদ্ধ। বাঙ্গলা উপন্যাসে, ডি ফো ( De Foe ), রিচার্ডসন ( Richardson ), ফিল্ডিং ( Fielding ), স্মোলেট ( Smollett ) না জন্মিয়াই সার ওয়ালটার স্কটের জন্ম হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে ডিকেন্স ( Dickens ), থ্যাকারে ( Thackeray ) অপেক্ষা করিতেছে কিনা এ ভবিষ্যদ্বাণীর আলোচনা বর্ত্তমান লেখকের সীমার বহির্ভূত।

বঙ্কিম বাবুর মৃত্যুর পর কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, তিনি যদি উপন্যাস না লিখিয়া "কৃষ্ণচরিত্রের" ন্যায় আর কয়েকটি রত্ন বাঙ্গলা সাহিত্য ভাণ্ডারে রাখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আমরা বঙ্কিম বাবুর নিকট অধিকতর ঋণী থাকিতাম। এ বাক্যের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে ঘোরতর মতভেদ হইতে পারে। কৃষ্ণচরিত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য রহিয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু এই উন্নতির দিনে দাঁড়াইয়াও আমাদের বোধ হয় কৃষ্ণচরিত্র অসময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। যে গান্ধার-গ্রামে কৃষ্ণচরিত্রের রাগিণী বাঁধা রহিয়াছে, অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত না হইলে বলা যায় না বাঙ্গালী এই রাগিণীতে কখনও গলা মিশাইতে পারিবে কিনা। বঙ্কিমের অলোকসামান্য প্রতিভা উপন্যাসে নিযোজিত না হইয়া প্রকারান্তরে ব্যয়িত হইলে বঙ্গভাষা আজ সভ্যসাহিত্যে স্থান পাইত কিনা এ প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের প্রাণে উদিত হয়। বঙ্কিমের অভ্যুদয়-সময়ে "দুর্গেশনন্দিনী," "বিষবৃক্ষের" জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল, কিন্তু কৃষ্ণচরিত্রের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল না।

ইংলণ্ডের অমর কবি সেক্সপিয়রের মহানাটকে কবিত্ব যথেষ্ট আছে, কিন্তু কোন বুদ্ধিমান্ পাঠকই বোধ হয় একথা অস্বীকার করিবেন না যে এই জীবন্ত শক্তি নাটকাকারে স্ফূরিত না হইলে সেক্সপিয়র বিশ্বজনীন কবি ( "The universal poet" ) এই নৃপতি-অভিলষিত আখ্যা কখনই প্রাপ্ত হইতেন না। সাহিত্য-বিমানে হয়ত তিনি একটি সমুজ্জ্বল তারকা স্বরূপ কিরণচ্ছটা বিকীর্ণ করিতেন, কিন্তু মহামহিমান্বিত মধ্যাহ্ন তপন স্বরূপ গগনবিহারী চন্দ্র তারকা ও সুদূর সূর্য্যমুখীর আদরের সামগ্রী হইতে পারিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের সূক্ষ্ম তর্কজালে জীবনের যাবতীয় কাল আচ্ছন্ন করিয়া রাখিলে তিনি

একজন সূক্ষ্মদর্শী তার্কিক বলিয়া এককালে সম্মান পাইতে পারিতেন, কিন্তু বঙ্গসাহিত্যাসনের সুবিমল পারিজাত হইতে পারিতেন না, ইহাই আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস।

সাহিত্য-রাজ্যে বঙ্কিমের স্থান নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। তাহার পুনর্বিচার এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্র যে কেবল বঙ্গ-কবিকুল-শিরোমণি তাহা নহে নব্যশিক্ষিতসমাজের চক্ষে বঙ্গভাষা যে ঘৃণার সামগ্রী নয় ইহার একমাত্র মূলীভূত কারণ সেই অমিততেজা বঙ্কিম। আজ কাল মাসিকপত্রে, উপন্যাসে, দর্শন-বিজ্ঞানে বঙ্গদেশ ছাপাইয়া গিয়াছে,—ইহারও মূলীভূত কারণ সেই কার্য্যবীর বঙ্কিম। বাঙ্গলা উপন্যাসের প্রস্তাবে বঙ্কিমের নাম সংযোজিত না থাকিলে অকৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইবে, তাই ভক্তি গদ্গদচিত্তে সেই পূতনামের উল্লেখ করিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা এ প্রবন্ধ লেখকের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার উপন্যাস সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিবার জন্যই এ প্রস্তাবের অবতারণা।

বাঙ্গলা উপন্যাসে বাঙ্গলা সাহিত্যের জীবন। মুসলমান রাজত্বের অত্যাচার, ইংরাজ রাজ্য-স্থাপনের প্রারম্ভে উচ্ছৃঙ্খলতা, বর্গীর হাঙ্গামা এই সকল ঘোরতর দুর্ঘটনা বাঙ্গালীর হৃদয়ে যে এক একটি বিষশল্য বিদ্ধ করিয়াছিল সেই মর্ম্মভেদী কাতরোচ্ছ্বাসের কোন জাতীয় সাহিত্য বঙ্গদেশে ছিল না, উপর্য্যুপরি বিপ্লবে বঙ্গের ধন ধান্য, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিলয় প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গাকাশ যে নিবিড় ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল, বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে তাহার এক বিন্দু আবেগ-বারিও বর্ষণ হয় নাই। বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রারম্ভে, ভগ্নতার বীণার ন্যায়, যে তাল-লয়-বিরহিত ক্ষীণ ঝঙ্কার করিতেছিল সে যন্ত্র এ জাতীয় উচ্ছ্বাস-গীতির সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিল। সেই সময়ে বাঙ্গলার গৌরবরবি ঈশ্বরচন্দ্র এ বীণার তার উচ্চগ্রামে বাঁধিয়া দিলেন। বঙ্গভাষার সেই জন্ম। শুক্ল পক্ষের শশিকলার ন্যায় সেই হইতে বঙ্গভাষা পুষ্টিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। কিন্তু প্রাবৃষিজ মেঘমণ্ডলের গুম্ফীভূত গাম্ভীর্য্যের ন্যায় জাতীয় জীবনে যে এক সুগম্ভীর নিস্তব্ধতা পরিবেষ্টন করিয়াছিল, বাঙ্গলা উপন্যাস সেই আবেগ-বারি স্বরূপ বর্ষিত হইয়া বহু দিনের সঞ্চিত নীরদমালা ক্রমে অপসারিত করিয়াছিল। তাই পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাঙ্গলা উপন্যাসের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল।

যে সময়ে বাঙ্গলা উপন্যাসের জন্ম হয় তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে পাশ্চাত্য

শিক্ষার একটি প্রবল স্রোত বঙ্গদেশে প্রবাহিত হইতেছিল। মুসলমান রাজত্বের অজ্ঞানান্ধকারে বাঙ্গালীর জ্ঞানেপ্সু আত্মা বহু দিন পর্য্যন্ত যে অজ্ঞাত জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছিল, জাতীয় সাহিত্যে সে আকাঙ্ক্ষা পূরণের উপযোগী সামগ্রী কিছুই ছিল না। তাই রত্ন-প্রসবিনী বাঙ্গলার সুসন্তানগণ বিদেশীয় সাহিত্য ভাণ্ডারে রত্ন কুড়াইতে গিয়াছিল, সেই সঙ্গে মাতৃভাষার প্রতি যে বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল, বাঙ্গলা উপন্যাস-বারি যথাসময়ে সিঞ্চিত না হইলে, বলা যায় না সে বহ্নি কখনও নির্ব্বাপিত হইত কিনা। বাঙ্গলা উপন্যাস, বিপুলজ্যোতিঃ-প্রদীপ্ত-বদনে এই সময়ে বঙ্গদেশে অবতীর্ণ না হইলে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আজ বঙ্গদেশ জাতীয় সাহিত্য-বিহীন একটি অসভ্য দেশ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইত।

উচ্চতর আদর্শের অনুগমন করা মানবের স্বাভাবিকী বৃত্তি। ইংরাজী কাব্যে, ইংরাজী উপন্যাসে যে আদর্শ ও সৌন্দর্য্য নিহিত আছে তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করার উপযোগী আমাদের দেশীয় ভাষায় কিছুই ছিল না। সুতরাং এই উচ্চতর চিত্রে বিমোহিত হইয়া বাঙ্গালী জাতীয়ত্ব হারাইতে বসিয়াছিল, তাই বাঙ্গলার মধুসূদন বিদেশী মধুতে "মধুচক্র" রচনা করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। আজ যে "গৌড়জন" আনন্দে জাতীয় অবিকৃত মধুর আস্বাদ লইতেছে তাহারও কারণ "বাঙ্গলা উপন্যাস।" যদি "রেবেকার" প্রতিযোগিতায় "আয়েসা" না দাঁড়াইত, তাহা হইলে বোধ হয়,—"হেম", "নবীন," "রামেন্দ্র," "রবীন্দ্র" আমরা দেখিতে পাইতাম না। যখন সমগ্র পাশ্চাত্য সাহিত্যভাণ্ডার খুঁজিয়া "কুন্দনন্দিনী," "মৃণালিনী," "চন্দ্রশেখর," "ব্রজেশ্বর" মিলিল না, তখনই পাশ্চাত্য স্রোত শারদীয় মেঘমালার ন্যায় মিশিয়া গেল। বাঙ্গলার প্রকৃত সুসন্তানগণ তাই বাঙ্গলা উপন্যাসের নিকট অপরিশোধনীয়ভাবে ঋণী।

কোন কোন কঠোর সমালোচক বাঙ্গলা উপন্যাসের মৌলিকতা নাই বলিয়া কৃতিত্বের অপলাপ করিতে চেষ্টা করেন। এই সম্প্রদায়ের মতে বাঙ্গলার উপন্যাস গুলি স্বদেশী বর্ণে চিত্রিত বিদেশী ছবি। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বাদানুবাদ না করিয়া আমি কেবল মাত্র এই কথা বলিতে চাই যে মিল্টন ইংরাজ কবিকুলের মধ্যে অদ্বিতীয় "Second to none." তাঁহার প্রধান প্রধান

কাব্য গুলির প্রতি ছত্রের অনুরূপ ভাব কি ল্যাটিন ও গ্রীককাব্য হইতে বাহির করা যায় না? যে কথা কেহ কথনও ভাবে নাই, মানবমনে যে চিত্র কথনও প্রতিফলিত হয় নাই, সেই কথার উল্লেখ কি সেই চিত্রঅঙ্কন কবির কার্য্য নহে। যিনি আমাদের প্রাণের কথায়, হৃদয়ের আবেগে, চিত্তের উচ্ছ্বাসে, ভাষা সংযোগ করিতে পারেন, যিনি এই মৌনীবৃত্তিকে মুখরা করিতে পারেন, তিনিই কবি। কোন্ ব্যক্তি এমন হৃদয়বিহীন আছেন, যিনি কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে একবিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করেন নাই; সোপানোপরি উপবিষ্টা আলুলায়িত-কুন্তলা মনোরমার দেবীমূর্ত্তি ক্ষণেকের জন্য যাঁহার সাংসারিক সঙ্কীর্ণতা দূর করে নাই? সর্ব্বজন পূজনীয়া বাঙ্গলা উপন্যাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণের পবিত্রতা উপলব্ধি না করিয়া যিনি কর্কশভাবে মৌলিকতার অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান, সৌন্দর্য্যময় কাব্যজগতে তাঁহার স্থান নাই।

সুমন্দ হিল্লোল সঞ্চালিত, পরিপূর্ণ জাহ্নবী-বারির ন্যায় বঙ্গভাষার এই ঈষৎ বিকম্পিত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সুললিত প্রবাহ, ইহারও জন্ম বাঙ্গলা উপন্যাসে। সংস্কৃতের মধুরতা ও ইংরাজীর স্বাধীনতা এই দুইয়ের সামঞ্জস্যে যে নূতন বেশে বাঙ্গলাভাষা বাঙ্গলা উপন্যাসে দেখা দিয়াছিল, তাহারই মধুরালোকে সভ্যজগতে বাঙ্গলা সাহিত্যের পরিচয় হইয়াছে। ভাষা জাতীয় উন্নতির বিজয় পতাকা। ভাষা-সৌন্দর্য্য-বিহীন ভাব, ছিন্নবস্ত্রপরিধানা সুন্দরী ললনার ন্যায় দয়ার পাত্রী। সুকেশা সালঙ্কৃতা সুন্দরী ললনার ন্যায় বাঙ্গলা উপন্যাস, বাঙ্গলা সাহিত্যে দাঁড়াইয়া, "সুজলাং সুফলাং, মলয়জ শীতলাং, শস্য শ্যামলাং" কোকিল স্বরে গাহিতে আরম্ভ করিলে সমগ্র বাঙ্গালী সেই সৌন্দর্য্যপানে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। সাহেব মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাঙ্গলা কাব্যের কীর্ত্তি-স্তম্ভ "মেঘনাদ বধ" লিখিলেন। সমগ্র বঙ্গসাহিত্য তাই বাঙ্গলা উপন্যাসের নিকট ঋণী। এই সৌন্দর্য্যময়ী ভাষা, সৃষ্টির আধারভূতা বলিয়া সমগ্র বাঙ্গালী বাঙ্গলা উপন্যাসের নিকট ঋণী। যদি কখনও আমাদের মানসিক বৃত্তির সম্পূর্ণ পরিস্ফুরণযোগ্যা কোন ভাষা বাঙ্গলায় পাওয়া যায়, তবে তাহারও জন্ম এই উপন্যাসের ভাষার বিকীর্ণ শক্তিতে। যদি কখনও বাঙ্গালী সে সকল মানসিক বৃত্তি পরিস্ফুরণের উপযুক্ত হয়, তবে তাহাও এই উপন্যাসের ভাষার প্রসাদাৎ। "A *language* is what man has made it, so truly man

is what language has made him." মনুষ্য-কর্তৃক যেমন ভাষার সৃষ্টি, ভাষা কর্তৃকও সেইরূপ মনুষ্যের সৃষ্টি।

বঙ্কিমের অত্যাশ্চর্য্য প্রতিভাবলে একই যুগে বাঙ্গলা উপন্যাস উন্নতির উচ্চতম শীর্ষে নীত হইয়াছিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ার ফল-স্বরূপ কিয়ৎকাল বাঙ্গলা উপন্যাস সাহিত্যজগতে আর জন্মিবে না। বঙ্কিমের অসামান্য তেজঃপ্রভাব নিকট অন্যান্য প্রতিভা খদ্যোতেরন্যায় বোধ হয়। আবার উপন্যাসের নাম ধরিয়া অনেক অপাঠ্য ও অশ্রদ্ধেয় গ্রন্থ প্রতিনিয়ত মুদ্রাযন্ত্র হইতে উদ্গীরিত হইতেছে। এই সকল বাঙ্গলা উপন্যাসগ্রন্থের দোষ গুণ সমালোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বঙ্গসাহিত্য বঙ্কিমের বাঙ্গলা উপন্যাসের নিকট অশেষ প্রকারে ঋণী, এইটী প্রকটনই প্রবন্ধলেখকের অভিপ্রায়।*
বঙ্গভাষা যদি বিদ্যাসাগরের দুহিতা, তবে বঙ্কিম বাবুর বনিতা।

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

---

## ভারতে দারিদ্র্য।

ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান রাজাদিগের রাজত্বকালে লোকের সামাজিক ও বৈষয়িক অবস্থা কিরূপ ছিল এবং ইংরেজদিগের আগমনের পর তাহাদিগের সংসর্গে ও শাসনে ঐ ঐ অবস্থার কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এই বিষয় লইয়া সম্প্রতি কিছু বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছে। ইংরেজ জাতি ভারত-রাজত্ব হস্তগত করাতে দেশের যে বিশেষ মঙ্গল হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। মোগল সাম্রাজ্যের পতন সময়ে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগের উৎপীড়নে ও বর্গী, পিণ্ডারী প্রভৃতির উপদ্রবে দেশ এতই উদ্বেজিত হইয়াছিল যে তৎকালে প্রবল পরাক্রান্ত ইংরেজের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত না হইলে হয়ত ভারতে সভ্যতার চিহ্নও বিলুপ্ত হইত। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান রাজাদিগের সুশাসনকালে প্রজাবর্গের যেরূপ সুখ সমৃদ্ধি ছিল, ইংরেজ শাসনে যে তদপেক্ষা অধিক হইয়াছে ইহা স্বীকার করা কঠিন। বাষ্পীয়পোত ও বাষ্পীয়-শকট দুর্গম পথ সুগম করিয়া লোকের হিত-সাধন করিয়াছে সত্য। তড়িদ্বার্ত্তা লোকের বহু-

---

* বাঙ্গলা উপন্যাস বঙ্কিমের নিজের সম্পত্তি, ইহাতে অন্য কাহারও দাওয়া করিবার ক্ষমতা এখনও জন্মে নাই। বাঙ্গলা উপন্যাস বলিতে আমি বঙ্কিমের উপন্যাসই ধরিয়াছি। সেইটাই আদিম এবং অকৃত্রিম।

বিধ মঙ্গলের কারণ হইযাছে সত্য ; কিন্তু তাহাতে দেশের সুখ সমৃদ্ধি কতদূর বৰ্দ্ধিত হইযাছে তাহা তর্কের বিষয়। দুই প্রকারে লোকের পার্থিব হিত-সাধন করা যাইতে পারে,—অপরিহার্য্য নিত্য কার্য্যের সৌকর্য্য-সাধন ও নূতন উপভোগের পথ-প্রদর্শন ও উপায়-উদ্ভাবন—বাষ্পীয়পোত বাষ্পীয়-শকট ইত্যাদি প্রথমোক্ত রূপ হিত-সাধন কিয়ৎপরিমাণে না করিয়াছে বলা যায় না, কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত রূপেই অধিক পরিমাণে করিয়াছে। উপভোগের ইচ্ছার চরিতার্থতা সর্ব্বদাই সুখোৎপাদিকা। কিন্তু উপভোগের ইচ্ছা একটি বিশেষ ক্রম অনুসরণ করিয়া উৎপন্ন হয। যে ব্যক্তি উদর-চিন্তায় সর্ব্বদা চিন্তিত, সুরম্য হর্ম্মে সুবিস্তৃত খট্টোপরি দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যায় শয়ন করার ইচ্ছা তাহার মনে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব,—হইলেও ইচ্ছারূপে নহে, স্বপ্নরূপে মাত্র। কিন্তু উদরান্নের চিন্তা শান্ত হইতে দাও, কিছু অর্থ সংগৃহীত হইতে দাও, ঐরূপ চিন্তা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইবে। তুরস্ক অথবা রুস রাজ্য লাভ করার ইচ্ছা ব্রিটীস ভারতের ক্ষুদ্র করদ রাজার মনে উপস্থিত হয় কিনা তিনি জানেন। হইলেও যেরূপ ভাবে হয় তাহাকে আমরা স্বপ্ন নির্ব্বিশেষ চিন্তা বলি,—ইচ্ছা বলি না। কিপ্রকারে উদরান্ন সংগৃহীত হইবে, ইহাই সম্প্রতি ভারতবর্ষে একটি কঠিন সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। যত দিন এই সমস্যার সুমীমাংসা না হইবে, ততদিন বাষ্পীয় পোত বল, বাষ্পীয় শকট বল, তড়িদ্‌বার্ত্তা বল, কিছুতেই ভারতের কোনও প্রকৃত অভাব দূর করিবে না; সুতরাং কোনও প্রকৃত সুখ উৎপাদন করিবে না। অতএব যদি দেখিতে পাই যে হিন্দু ও মুসলমান রাজাদিগের রাজত্ব কালে জীবিকা নির্ব্বাহ বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা সুকর ছিল, যদি দেখিতে পাই যে ঐ সময়ে দেশে বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা ধন অধিক ছিল, এবং অধিক পরিমাণে উত্তরোত্তর বৰ্দ্ধিত হইতেছিল, তবে কি প্রকারে স্বীকার করিব যে ইংরাজ-শাসনে ও ইংরাজ-সংসর্গে ভারতের সুখ সমৃদ্ধি বৰ্দ্ধিত হইযাছে ? কৃষি ও বাণিজ্য দ্বারা ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধি হয়,—কৃষি দ্বারা উৎপন্ন ও বাণিজ্য দ্বারা দেশান্তর হইতে আনীত হয়। বাণিজ্য দ্বারা ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধি করা ভারতের অদৃষ্ট-লিপিতে লিখিত নাই। সুতরাং কৃষিই অর্থাগমের একমাত্র উপায়।

চিরকালই কৃষি দ্বারা ভারতের ঐশ্বর্য্য, চিরকালই ভারত কৃষির উপর নির্ভর করিয়া আসিয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে ভারত এখন নিঃস্ব হইল

কি প্রকারে?—ভারতে কৃষির কি পূর্ব্বাপেক্ষা অবনতি ঘটিয়াছে? কর্ষিত জমির পরিমাণের সহিত লোকসংখ্যার অনুপাত বাড়িয়াছে কি কমিয়াছে তাহা পরে দেখিব। কৃষি বিদ্যার পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি হইয়াছে কি অবনতি হইয়াছে তাহাও পরে বিবেচনা করিব। সম্প্রতি দেখিতেছি দেশ যেরূপে শাসিত হইতেছে তাহাতে দারিদ্র্য অবশ্যম্ভাবী। প্রথমতঃ, হিন্দু ও মুসলমান রাজাদিগের রাজত্ব-কালে কৃষকেরা নিজ-পরিশ্রমের ফলভোগ করিতে পারিত। ভূমিকর্ষণদ্বারা যে শস্য উৎপাদিত হইত তদ্দ্বারা রাজস্ব পরিশোধিত হইয়া স্বচ্ছন্দে কৃষকের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। এখন কৃষক রাজস্বের জন্যই ভূমি কর্ষণ করে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভারতের যে অল্পাংশে রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা ছাড়িয়া দিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কৃষকের করভার এতই বৃদ্ধি পাইতেছে যে, কোনও কোনও স্থানে রাজস্ব পরিশোধ ও কৃষিকার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া কৃষির উপস্বত্বের যাহা অবশিষ্ট থাকে তদ্দ্বারা কৃষকের উদরান্নও চলে না। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দু ও মুসলমান রাজাদিগের রাজত্বকালে দেশে যে অর্থ উৎপন্ন হইত, দেশেই তাহা ব্যয়িত হইত। দুরন্ত হোম চার্জ্জ কৃষকের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া সুদূর ইংলণ্ডে নিক্ষেপ করিত না। সুদানের যুদ্ধ-সজ্জার ব্যয় নির্ব্বাহ-জন্য ভারতের ধন-ভাণ্ডার লুণ্ঠিত হইত না। রাজার রাজত্ব-নির্ব্বিশেষে উচ্চবেতনভোগী বিদেশবাসী রাজকর্ম্মচারিগণ, ভারতের ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যান্বিত হইয়া তাহা স্বদেশে ভোগ করিবার জন্য ভারত হইতে বিদায় লইত না। হিন্দু ও মুসলমান রাজারা দেশীয় কর্ম্মচারিদ্বারাই রাজকর্ম্ম চালাইতেন, দেশীয় শিল্পোৎপাদিত বস্তু দ্বারাই রাজ্য-শাসন ও জীবিকা-নির্ব্বাহ সম্পর্কীয় অধিকাংশ ব্যাপার সম্পন্ন করিতেন। ফলতঃ, ভূমি-কর্ষণ দ্বারা উপার্জ্জিত প্রজার ধনের যে অংশ রাজস্বস্বরূপ রাজকোশে গমন করিত। তাঁহাও প্রকারান্তরে প্রজার মধ্যেই বিতরিত হইত। হয়ত কেহ বলিবেন যে কেবল ধন থাকিলে কি হইবে? তাহা দস্যু প্রভৃতির হস্ত হইতে সুরক্ষিত হওয়া চাই,—তাহা উপভোগ করিবার সুবিধা চাই। যদি দেশ সুশাসিত না হয়, যদি সর্ব্বপ্রকার আততায়ীর ভয়ে প্রজাবর্গকে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতে হয়, যদি শরীর ও সম্পত্তি নিরাপদ না হয়, তবে অর্থ কেবল অনর্থ মাত্র। কথাটি সত্য। কিন্তু হিন্দু ও

মুসলমান রাজাদিগের রাজত্ব কালে কি প্রজাবর্গের শরীর ও সম্পত্তি নিরাপদ ছিল না? পিণ্ডারী ও বর্গীর উৎপাত চিরকাল ছিল না। (ম্যাগাস্থিনিসের সময় হইতে ভারতবাসীর যত বৈদেশিক ইতিবৃত্ত পাওয়া গিযাছে তাহাতে জানা যায় যে ভারতবাসীরা স্বদেশীয রাজাদিগের শাসনে সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে ছিল। ম্যাগাস্থিনিস বলেন তৎকালে হিন্দুদিগের মধ্যে চৌর্য্য ছিল না. মিথ্যা প্রবঞ্চনা ছিল না। তবে দেখা যাইতেছে ইংরেজ শাসনে ভারতের ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধি হয় নাই, জীবিকা নির্ব্বাহ সৌকর্য্য-জনিত সুখ ও বৃদ্ধি হয় নাই, পরন্তু উভয়তঃই অবনতি ঘটিয়াছে।)

তবে ইংরেজের সংসর্গ ও শাসন হইতে আমরা কিরূপ ফল পাইয়াছি ও পাইতেছি? পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ইংরেজ শাসন-ভার গ্রহণ করাতে দেশ ধ্রুব অধঃপাত হইতে অব্যাহতি পাইযাছে। ভারতবাসিগণ "সুজল সুফল শস্যশ্যামল" বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রে সুখে কাল যাপন করিতেছিল, হঠাৎ চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হওয়ায তাঁহারা ভয়ে বিহ্বল হইযা পড়িল। সেই সময়ে নিরাশ্রয়-ভাবে পড়িয়া থাকিলে হয়ত প্রবল প্রলয-বারিতে তাহারা ভাসিয়া যাইত, কিন্তু ইংরেজ জাতি আসিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিল। রক্ষা করিল বটে, কিন্তু রক্ষা করিযা কি করিল? সেই শ্যামল সমতল ক্ষেত্র হইতে একটী মনোজ্ঞ পথে তাহাদিগকে একটী পর্ব্বতের উপর লইয়া চলিল। পথের দুইদিকে মনোহর আপণ-শ্রেণী। ইংরেজ জাতি তাহাতে ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যস্ত। ভারতবাসী প্রলয-বারি হইতে অব্যাহতি পাইয়া মনের সুখে চলিতেছে আর দুই পার্শ্বস্থ মনোহারী আপণ-শ্রেণীর শোভা সন্দর্শন করিতেছে। উপরের দিকে যতই যাইতেছে ততই বলক্ষয় হইতেছে,—আর চলিতে পারে না। রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফে দেশের সুখ স্বচ্ছন্দ বাড়িয়াছে, দেশ অধিকতর সভ্য হইয়াছে; কিন্তু এইরূপে দেশ যতই সভ্যতার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতেছে, ততই দেশের বলক্ষয হইতেছে, দেশ দরিদ্র হইতেছে, দুর্ব্বল হইতেছে। সভ্যতার ও সুখ স্বচ্ছন্দের উপাদানের জন্য ভারত ইংলণ্ডের নিকট যে টাকা ঋণ করিযাছে তাহার সুদ চালাইতেই ভারত ক্রমশঃ হীনবল

হইতেছে। কেহ বলিতে পারেন যে রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ না থাকিলে এই বৃহদ্ রাজ্যের শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া সুকঠিন হইত এবং লোকের যাতায়াত অত্যন্ত কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য হইত। এই কথা সম্পূর্ণ সত্য। ভারত-গবর্ণমেণ্ট যেরূপ প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে, এদেশের লোকের রুচি ও অভ্যাস যে ভাবে গঠিত হইয়াছে, আধুনিক সামাজিক জীবন যেরূপ জটিলতা-পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এদেশে রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ আর বিলাসের সামগ্রী বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

সভ্যতার সমস্ত আয়োজনই আজ ভারতে অত্যাবশ্যক, কারণ ভারত আধুনিক সভ্যতার সোপানে উপস্থিত হইয়াছে। এই সোপানে ভারত স্বয়ং আরোহণ করিতেছে না; আরোহণ করিতে তাহার ক্ষমতা নাই। ভারত শক্তিহীন, উপায়হীন, উদ্যমহীন। ইংরেজ ভারতকে এই সোপানে টানিয়া তুলিতেছেন, এবং এইরূপ উদ্গমনে ভারতের যে ক্লান্তি জন্মিতেছে, তাহাতেই ভারত ক্রমশঃ শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। ফলতঃ যাহাকে আধুনিক সভ্যতা বলে তাহা ভারতবর্ষীয়ের ন্যায় নিঃস্ব ও দুর্ব্বল জাতির সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয়ের ন্যায় জাতি এই সভ্যতার সোপানে স্বয়ং আরোহণ করিতে পারে না, কেহ আরোপণ করিয়া দিলেও নিরাশ্রয়ে স্থির থাকিতে পারে না। (অদম্য অধ্যবসায়, সাহস ও সংকল্প এই সভ্যতার ভিত্তি, অজস্র অর্থ ও অর্থাগমের উপায় এই সভ্যতার আশ্রয়স্তম্ভ। ভারত তাস লইয়া সভ্য ইংরেজের সহিত ডাক খেলিতে বসিয়াছিল। ইংরেজ ডাকিতে ডাকিতে ভারতকে 'ফুরুশ' করিয়াছে এখন ভারত বিভাগে যাহা পাই-তেছে ইংরেজ তাহা হস্তগত করিয়া ভারতকে ইচ্ছামত যে কয়েকখানা তাস বাছিয়া দিতেছেন তাহা লইয়াই ভারত খেলিতেছে। এ খেলাতে ভারতের স্বার্থ নাই, স্বার্থ কেবল ইংরাজের —তিনি অন্য খেলুকেও 'ফুরুশ' করিবেন।)

( ক্রমশঃ )

শ্রীসুদর্শন চক্রবর্ত্তী।

---

# কলিকাতা।

——oo——

কবিবর নবীনচন্দ্রের অপূর্ব্বসৃষ্টি ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী পলাশী-বিজেতা ক্লাইবকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়াছিলেন ঃ—

"ওই শোভে শতমুখী ভাগীরথী তীরে
কলিকাতা, ভারতের ভাবী রাজধানী,
আবৃত এখন যাহা দরিদ্র কুটীরে,
শোভিবে, অমরাবতীরূপে করি গ্লানি।"

সেই দরিদ্রের পর্ণকুটীর-সমাচ্ছন্ন কলিকাতা তাহার আরও পূর্ব্বে একটী সামান্য পল্লীরূপে বিরাজ করিতেছিল। এক্ষণে যাহা সমগ্র ভারত-সাম্রাজ্যের রাজমুকুট মাথায় দিয়া ভাগীরথীবক্ষে আপনার দিব্য কান্তি প্রতিফলিত করিতেছে, দুই শত বৎসর পূর্ব্বে কেহ তাহাকে সামান্য পল্লী ব্যতীত আর কিছু বলিয়াই মনে করিতে পারিত না। সামান্য পল্লী হইলেও অনেক দিন হইতে ইহা ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ আইন আকবরীতে প্রথমে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সরকার সাতগাঁয়ের মধ্যে কলিকাতা, বার্ব্বাকপুর ও বাকুয়া নামক তিন স্থান হইতে ২৩৪০৫।৶ রাজস্ব সংগ্রহের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ইহার প্রকৃত ঐতিহাসিক ভিত্তি স্থাপিত হয়।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরাজেরা বাঙ্গলার নানা স্থানে বাণিজ্য ব্যবসায় করিয়া আপনাদিগের ক্ষমতা বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে বিহার প্রদেশে গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায়, ইংরাজেরা তাহাতে যোগদান করিয়াছেন সন্দেহ করিয়া নবাব সায়েস্তা খাঁ ইংরাজদিগকে নির্য্যাতন করিতে প্রয়াসী হন। তিনি ইংরাজদিগের বার্ষিক ৩ সহস্র টাকা করের পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে বাণিজ্যদ্রব্যের মূল্যের শত করা ৩।০ টাকা প্রদানের আদেশ দেন। ইহাতে ইংরাজদিগের বাণিজ্যের অত্যন্ত ক্ষতি হইতে আরম্ভ হয়। আপনাদিগের বাণিজ্যের ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া ইংরাজেরা অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন। অবশেষে তাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বল-প্রয়োগের

দ্বারা বাঙ্গলায় আপনাদিগের ক্ষমতা বদ্ধমূল করাই যুক্তিসঙ্গত। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাঁহারা ইংলণ্ডাধিপ দ্বিতীয় জেমসের নিকট আবেদন করিলে তিনি বাঙ্গলার নবাব ও দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার জন্য ও বাঙ্গলায় ইংরেজ-রাজ্য স্থাপন করিতে আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, বাঙ্গলার মসনদে তৎকালে কার্য্যদক্ষ নবাবাগ্রণী সায়েস্তা খাঁ ও দিল্লীর সিংহাসনে আসমুদ্র-হিমালয়-বিজয়ী সাহানসাহ আরঙ্গজেব বাদসাহ উপবিষ্ট ছিলেন।

ইংলণ্ডাধিপের আদেশানুসারে আডমিরাল নিকলসনের অধীন ছয় শত সৈন্য সমেত দশখানি যুদ্ধজাহাজ বঙ্গদেশে প্রেরিত হইল। নিকলসনের প্রতি এইরূপ আদেশ ছিল যে, তিনি কোম্পানির সমস্ত সম্পত্তি ও কর্ম্মচারী-দিগকে লইয়া চট্টগ্রামে উপস্থিত হইবেন, এবং উক্ত স্থান অধিকার পূর্ব্বক সুদৃঢ় করিয়া তথায় অবস্থিতি করিবেন। সেই জন্য তাহার সহিত দুই শত কামানও প্রেরিত হয়। নিকলসনের প্রতি আরও আদেশ ছিল যে, মোগলদিগের চিরশত্রু আরাকান-রাজের সহিত মিত্রতা করিয়া ও হিন্দু জমিদারদিগকে বশীভূত করতঃ রাজস্ব আদায় ও টাঁকশাল স্থাপন করিতে হইবে। এককথায়, তিনি বঙ্গদেশে একটী নূতন রাজ্য-স্থাপনের প্রয়াস পাইবেন। কিন্তু সে সময় ইংরাজদিগের সে আশা দুরাশা মাত্র ছিল। তৎকালে ইংরাজ-দিগের ক্ষমতা এতদূর প্রবল হয় নাই যে, তাঁহারা দিল্লীশ্বর আরঙ্গজেবের রাজ্য অধিকার করিয়া ভারতে ব্রিটিশ-রাজ্য-স্থাপনের প্রয়াস পান। অন্ততঃ তখন ভারতে ব্রিটিশরাজ্য স্থাপনের সময় হয় নাই। কিন্তু সময় না হইলে কি হয়? তাঁহাদের রাজ্যপিপাসা মিটাইতে তাঁহারা ত্রুটি করিবেন কেন? কাজেই এই সমস্ত আয়োজন হইতে লাগিল। নবীনচন্দ্রের ক্লাইব পলাসী যুদ্ধের পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন :—

"কিন্তু যদি আমাদের হয় পরাজয়,
বাঙ্গলার স্বর্ণপ্রসূ বাণিজ্যের আশা
ডুবিয়ে অতল জলে, ঘুচিবে নিশ্চয়
ইংলণ্ডের আন্তরিক রাজ্যের পিপাসা।"

বাস্তবিক ক্লাইব সাহেবের আগমনের বহুপূর্ব্ব হইতেই ইংরাজদিগের

রাজ্যপিপাসা বলবতী হইয়া উঠে। উপরিউক্ত ঘটনা হইতে সাধারণে বুঝিতে পারিবেন যে, ইংরাজেরা কেবল এতদ্দেশে যে বাণিজ্যের জন্যই অবস্থিতি করিতেছিলেন এমন নহে, তাঁহাদের হৃদয়ে রাজ্য-গ্রাসের ইচ্ছাটাও সম্পূর্ণ ছিল। পলাশী-যুদ্ধের পর হইতে সেই ইচ্ছা ক্রমেই অধিকতর পরিস্ফুট হইতে থাকে।

যাহাহউক, নিকলসন ঐ সমস্ত আদেশ লইয়া বাঙ্গলাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাঁহার কতকগুলি জাহাজ সমুদ্রে ঝটিকায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, আরও কতকগুলি প্রতিকূল বায়ুর জন্য যথাসময়ে উপস্থিত হইতে পারে নাই। নিকলসন অবশিষ্ট জাহাজের সহিত ভাগীরথী পথে হুগলী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার কিছু পূর্ব্বে মান্দ্রাজের ইংরাজ অধ্যক্ষ ৪০০ শত সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। জলে ও স্থলে ইংরাজদিগকে সহসা এরূপ যুদ্ধ করিতে উদ্যত দেখিয়া নবাব একটু বিচলিত হইলেন। তিনি রাজ্যমধ্যে রক্ত-স্রোত প্রবাহিত করিতে ইচ্ছা না করিয়া ইংরাজদিগকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইংরাজেরা অমনি ৬০ লক্ষ টাকা হাঁকিয়া বসিলেন। ইতিমধ্যে একঘটনা উপস্থিত হওয়ায় পুনঃ ইংরাজদিগকে কিছু দিনের জন্য বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইতে হয়। ১৬৮৬ খৃঃ অব্দে ২৮ এ অক্টোবর ইংরাজদিগের ৩ জন সৈন্য হুগলীর বাজারে নবাবের সৈন্যদিগের সহিত বিবাদ করিয়া প্রহৃত হইলে, তাহাদের সাহায্যের জন্য প্রথমে একদল, পরে আর একদল, অবশেষে যাবতীয় সৈন্য প্রেরিত হইল। ক্রমে নবাব-সৈন্যদিগের সহিত তাহাদের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই সময় নিকলসনও জাহাজ হইতে হুগলী-বন্দরের উপর গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করেন। নবাবপক্ষের ৬০ জন লোক হত ও অনেক আহত হয়; এবং প্রায় ৫০০ শত গৃহ নষ্ট হইয়া যায়। তাহার মধ্যে কোম্পানীর ৩০ লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্য সঞ্চিত একটি গুদামও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই সমস্ত ঘটনায় হুগলীর ফৌজদার ভীত হইয়া ইংরাজদিগের সহিত আপাততঃ সন্ধি করিতে স্বীকৃত হন, এবং বাদসাহের পুনরাদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত ইংরাজদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় বাণিজ্য করিবারও ক্ষমতা প্রদান করেন। কিন্তু নবাব সায়েস্তা খাঁ এই সংবাদ অবগত হইবামাত্র ইংরাজদিগের প্রতি যৎপরো-নাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া পাটনা, মালদহ, ঢাকা, কাসিমবাজার প্রভৃতি স্থানের সমস্ত

ইংরাজ-কুঠী অবরোধ করিতে আদেশ দিলেন, ও ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অনেক পদাতি ও অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন।

সেই সময়ে জব চার্ণক হুগলীর ইংরাজ-কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি হুগলীতে থাকা নিরাপদ নহে মনে করিয়া কোম্পানীর সমস্ত সম্পত্তিসহ ভাগী-রথীর পূর্ব্বতীরে সুতানটি নামক গ্রামে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। সেই সুতা-নটি ক্রমে কলিকাতা মহানগরীতে পরিণত হয়। তাহার পর নবাবের লোক-দিগের সহিত একটি সন্ধি স্থাপিত হয়। ইহাতে ইংরাজেরা পূর্ব্বের ন্যায় বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা লাভ করেন। কিন্তু নবাবের অন্য একটি গুপ্ত উদ্দেশ্য ছিল। তিনি ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিয়া সময়ের অপেক্ষা করিতেছিলেন, এবং উপযুক্ত অবসর পাইলে একেবারে তাহাদিগকে বাঙ্গলা দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে ইচ্ছুক হন। চার্ণক সুতানটিতে থাকা সঙ্গত মনে না করিয়া, ইঞ্জিলী নামক স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিবার ইচ্ছা করেন। তিনি ইঞ্জিলী গমনকালে টানার দুর্গ ভঙ্গ করিয়া মোগলদিগের কতকগুলি জাহাজ অধিকার করিয়া বসেন। মোগলেরা অনেকবার ইঞ্জিলী আক্রমণ করে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ইঞ্জিলীর জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় ইংরাজদিগের লোক দিনদিন পঞ্চত্ব পাইতে লাগিল। এইসময়ে মোগলেরা ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। কারণ সুরাট অঞ্চলে মোগলদিগের অনেকগুলি জাহাজ ধৃত করিয়া মক্কা গমনের গোলযোগ উপস্থিত হয়। সেই জন্য বাদসাহ তাহাদিগের সহিত সন্ধি করিতে স্বীকৃত হন। তদনুযায়ী বাঙ্গলার ইংরাজদিগের নানা স্থানে কুঠীনির্ম্মাণের আদেশ দেওয়া হয়, ও জাহাজাদি নির্ম্মাণের জন্য উলুবেড়িয়া নামক গ্রাম তাঁহাদিগকে প্রদান করা হইয়াছিল। চার্ণককেও ধৃত মোগল জাহাজগুলিও ফিরাইয়া দিতে হয়। চার্ণক ইঞ্জিলী হইতে উলুবেড়িয়া, পরে তথা হইতে পুনর্ব্বার সুতানটীতে আগমন করেন। নবাব সায়েস্তা খাঁ কিন্তু বরাবরই ইংরাজদিগকে নির্যাতন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি ইংরাজ-দিগকে পুনর্ব্বার হুগলীতে আসিবার জন্য আহ্বান করিলেন, ও সুতানটীতে প্রস্তর অথবা ইষ্টকময় গৃহাদি নির্ম্মাণে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। ইংরাজ-দিগের দ্রব্যাদি লুণ্ঠনের জন্য একদল সৈন্য ও প্রেরিত হইল। নবাব,

চার্ণকের নিকট অনেক টাকাও চাহিয়া পাঠান, কিন্তু অর্থাভাবপ্রযুক্ত চার্ণক তাহা দিতে সক্ষম হইলেন না। কিন্তু তিনি নবাবকে শান্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে ঢাকায় নবাবের নিকট দূত স্বরূপ দুইজন লোক প্রেরিত হইল।

হুগলীর যুদ্ধের কথা শ্রবণ করিয়া ডিরেক্টারগণ কাপ্তেন হীথ নামক এক ব্যক্তিকে যুদ্ধজাহাজ সহিত এই সময়ে বাঙ্গলায় প্রেরণ করেন। হীথ কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগকেও সমস্ত সম্পত্তি লইয়া প্রথমতঃ বালেশ্বরে গমনপূর্ব্বক তথায় লুঠপাট করিয়া চট্টগ্রামে উপস্থিত হন। কিন্তু উক্তস্থান আক্রমণের সুবিধা না হওয়ায় তিনি আরাকানে উপস্থিত হইয়া তথাকার রাজার সহিত মোগলদিগের বিরুদ্ধে যোগদান করিতে ইচ্ছুক হইলেন। আরাকানরাজ তাহাদের প্রস্তাবের কোন উত্তর প্রদান না করায়, হীথ বিরক্ত হইয়া বঙ্গদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মান্দ্রাজে গমন করিলেন। এইসময়ে ইংরাজদিগকে নির্যাতন করিবার জন্য বাদশাহের আদেশ প্রকাশিত হইলে সায়েস্তা খাঁ ইংরাজদিগের সমস্ত দ্রব্যাদি আটক করিলেন, ও চার্ণকের প্রেরিত দূতদ্বয়কে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। ইহার পর সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গলা পরিত্যাগ করায় ইব্রাহিম খাঁ নিযুক্ত হইয়া আসিলেন।

ইব্রাহিম খাঁ নবাব হইয়া আসার পর ইংরাজদিগকে আহ্বান করিবার জন্য পুনর্ব্বার বাদশাহের আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। তদনুযায়ী তিনি ইংরেজদিগকে বাঙ্গলায় আসিতে আদেশ দিলে চার্ণক সমস্ত লোকজন লইয়া ১৬৯০খৃঃঅব্দের ২৪শে আগষ্ট সুতানটীতে পুনর্ব্বার উপস্থিত হন। উক্ত দিনই কলিকাতা মহানগরীর উৎপত্তির দিন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ইংরাজেরা শান্তভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করায় বাদসাহ তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন। এইরূপে কলিকাতা নগরের স্থাপন করিয়া চার্ণক বারাকপুরেরও স্থাপনা করেন। অদ্যাপি তাহা তাঁহার নামানুসারে 'চানক' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। * কলিকাতা স্থাপনের দুই বৎসর পরে চার্ণকের মৃত্যু

* Charnock কাহারও কাহারও কর্ত্তৃক Chaunock নামে অভিহিত হইতেন, এই জন্য বারাকপুরের নাম চানক হইয়াছে। একটী হিন্দু রমণীকে সহমরণে যাইতে দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া চার্ণক তাহাকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করেন। ইহার গর্ভে চার্ণকের অনেকগুলি সন্তান সন্ততি হইয়াছিল। সহমরণ যাইতে দেখিয়া করুণার্দ্র হৃদয়ে তিনি যে উক্ত রমণীকে রক্ষা করিতে চেষ্টা পান, কেবল তাহাই নহে। তাহার অপরূপ রূপ লাবণ্য তাহাকে হস্তগত করিবার জন্য চার্ণককে উত্তেজিত করে। সে কালের ইংরাজ চরিত্র আলোচনা করিলে অনেক স্থলে ঐরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

হয়। অদ্যাপি কলিকাতাতে তাঁহাব সমাধি বিদ্যমান আছে।

কলিকাতার স্থাপনা হইলে দিন দিন তাহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। শোভা-সিংহের বিদ্রোহের সময় ১৬৯৬ খৃঃ অব্দে সুতানটির ইংরাজেরা আপনাদিগের কুঠী সুরক্ষিত করিবার জন্য আদেশ প্রাপ্ত হন। ইহাই ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের সূচনা। ১৭০০ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা আজিম ওসানের নিকট হইতে সুতানটি ও তাহার নিকটস্থ কলিকাতা ও গোবিন্দপুর নামক গ্রামদ্বয়ের ক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ষ্টানলী নামক এক জন ইংরেজ এইজন্য অনেক টাকা নজর লইয়া বর্দ্ধমানে আজিম ওসানেব নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুতানটি কলিকাতা ও গোবিন্দপুব, আমিরাবাদ প্রভৃতি পরগণার অন্তর্ভূর্ত ছিল। তৎকালে কলিকাতা নামে একটি পরগণারও নামোল্লেখ দেখা যায়। * এই সুতানটী কলিকাতা ও গোবিন্দপুব গ্রামত্রয় শেষে কেবলই কলিকাতা মহানগরী আখ্যা প্রাপ্ত হয়। উক্ত গ্রামত্রয় চিতপুব হইতে কুলীবাজাব পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহার মধ্যে চিতপুর হাটখোলা প্রভৃতি উত্তর দিকেব স্থানগুলি সুতানটীর অন্তর্ভূর্ত। ক্লাইব ষ্ট্রীটের প্রায় ২০০ হস্ত উত্তব হইতে বাবুরঘাট পর্য্যন্ত স্থানকে কলিকাতা বলিত। এবং দক্ষিণদিকে কুলীবাজাব পর্য্যন্ত স্থান গোবিন্দপুব নামে অভিহিত হইত। ১৭১৭ খৃঃঅব্দে ইংরেজ ডাক্তার হামিল্টন সম্রাট ফেবক সায়েবের পীড়াশান্তি করিয়া কোম্পানীর জন্য সুতানটী প্রভৃতি গ্রামত্রয়েব নিকটস্থ আরও ৩৮ খানি গ্রামক্রয় করিবার আদেশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সুচতুর নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর গুপ্ত আদেশে কোন জমিদারই একখানি গ্রামও বিক্রয় করিতে সাহসী হন নাই। যাহাহউক, ইংরেজেরা উক্ত গ্রামত্রয় লইয়াই বঙ্গদেশে আপনাদিগের ক্ষমতা বদ্ধমূল করিতে আরম্ভ করেন। ১৭৪২ খৃঃ অব্দে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর রাজত্ব সময়ে বঙ্গদেশে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অত্যন্ত উপদ্রব উপস্থিত হইলে, ইংরেজেরা সুতানটীব উত্তব হইতে গোবিন্দপুরের দক্ষিণ পর্য্যন্ত স্থানে নবাবের আদেশে এক পরিখা খনন করেন।

* আমীরাবাদ ও কলিকাতা পরগণার কিয়দংশ (কিসমৎ) কৃষ্ণনগরের রাজবংশের অধীন ছিল। ইংরেজেরা সম্ভবতঃ তাঁহাদের নিকট হইতে উক্ত গ্রামত্রয় ক্রয় করিয়া থাকিবেন। আমীরাবাদ পরগণার কিয়দংশ বসিরহাট উপবিভাগের অন্তর্গত পূঁড়াগ্রামবাসী রায় জমিদারদিগের জমিদারী ছিল। অদ্যাপি তদ্বংশীয়েরা তাহা উপভোগ করিয়া থাকেন।

তাহাই মহারাষ্ট্রীয় খাত বলিয়া কথিত হয়। অদ্যাপি স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে নবাব সিরাজদ্দৌলা কলিকাতা অধিকার করিয়া ইহার অনেক গৃহাদি নষ্ট করেন। মীরজাফরের রাজত্ব কালে আবার সে সমস্তের সংস্কার হইয়া কলিকাতা ইংরেজ-ক্ষমতা-বিস্তারের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠে। যে কলিকাতা পূর্ব্বে একটী সামান্য পল্লীমাত্র ছিল, এক্ষণে তাহা গগনস্পর্শিনী সৌধমালায় বিভূষিত হইয়া সমস্ত আসিয়া-খণ্ডের গৌরব-পতাকা মাথায় লইয়া দিন দিন উন্নতি শিখরে আরোহণ করিতেছে।

---

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

# ছোট কথা।

(১)

বিশ্বে বহু কথা আছে, — আমি শুধু ছোট কথা লিখি কেন? যাহা ছোট, তাহা কি তুচ্ছ নহে? যাহা ছোট, লোকে কি তাহা বড় মনে করে? ছোট লোক কত কষ্ট পায়! ক্ষুধা আছে, অন্ন নাই, তৃষ্ণা আছে, জল নাই, পীড়া আছে, পথ্য নাই, বড় লোকে পীড়া দেয়, কেহ আহা উহু করেনা! এই ভাবে কত ছোট লোক বাঁচে, কত ছোট লোক কাঁদে, কত ছোট লোক মরে,— সে কথা কয় জনে ভাবে? বরং দেখা যায়, ছোট লোক যত হায়, হায় করে, বড় লোকে তত দূর, দূর করে! তবে ছোট কথা লিখি কেন?

সব ছোট কথা কি তুচ্ছ? সদা সত্য কথা কহ,—সত্যে বুদ্ধি, সত্যে শক্তি, সত্যে মুক্তি, সত্যে জয় — এই ছোট কথা, কত দেশে কত লোকে কত ভাবে শিক্ষা দেয়। কিন্তু কেহ কি এই শিক্ষা মানে? সত্যে লাভ নাই, তাই সত্যে লোভ হয়না। সত্য সেই জন্য খুব ছোট কথা। ছোট—কিন্তু তুচ্ছ কি?

লোকে লাভ চাহে, কিন্তু আশু-লাভ ভিন্ন গৌণ-লাভ চাহেনা! শিশু আশু-লাভে তুষ্ট; যুবা আশু-লাভে মুগ্ধ, বৃদ্ধ আশু লাভে অন্ধ;— সেই জন্য শিশু, যুবা, বৃদ্ধ লাভ চাহে। আশু-লাভে লোভ আছে, তাই কেহ গৌণ-লাভ—লাভ মধ্যে গণ্য করেনা। যদি বাঁচি তবে,না হয় দীর্ঘকালে কিছু গৌণ লাভ,—তবে আশু-লাভ ত্যাগ করি কেন? এই জন্য লোকে আশু-লাভে মত্ত। সেই শিক্ষা পায়, সেই শিক্ষা শুনে, সেই কথা বড় কথা— আর সব ছোট, এই শিক্ষা রাম শ্যাম তুমি আমি কে না বুঝি?

(২)

উপদেশ পালন করে, এমন লোক বড়ই বিরল, কিন্তু উপদেশ বিতরণ করে, এমন লোকের কত ছড়াছড়ি! ইহাতে আর কিছু না হউক, একটা কুশিক্ষা বৃদ্ধি পাইতেছে,—নিরন্তর উপদেশ শুনিতে শুনিতে তাহার গাম্ভীর্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন আর কোন কথাই বড় বলিয়া মনে হয় না।

সে কালের তাঁহারা দুই চারিটী ভাল কথা শুনিবার আশায় কত গিরি নদী অতিক্রম করিয়া সাধুসঙ্গের অনুসন্ধান করিতেন। বহু ক্লেশে যাহা সংগ্রহ করিতেন তাহা বহুযত্নে জীবনে পালন করিতে চেষ্টা করিতেন। এখন সেই সকল কথা বড়ই সুলভ হইয়াছে!

যে কথা শুনিয়া একদিন মরা মানুষ উঠিয়া বসিয়াছে, শুষ্ক কাষ্ঠ মঞ্জরিত হইয়াছে মরুভূমে প্রেমের প্রস্রবণ ছুটিয়াছে,—সে সব এখন নিতান্ত মর্য্যাদাহীন ছোট কথা, তাহাতে আর কেহ কাণ দিতে চায়না। শিশুরাও তাহা লইয়া আমোদ করিয়া বেড়ায়।

সেকালে ভাল কথার বক্তা শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ ছিল, এখন বক্তা খুব সুলভ হইয়াছে, কিন্তু শ্রোতা নাই। সেকালের বক্তার যোগ্যতা থাকা আবশ্যক হইত, এখন আর যোগ্যতা আবশ্যক নাই বলিলেই হইল। তাই ভাল কথা খুব সুলভ হইয়াছে, তাই ভাল কথার শ্রোতা এত দুর্লভ!

(৩)

যে যাহা নয়, সে তাহা সাজিলেই সং সাজা হয়। যাত্রার আসরে, অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চে, চড়ক পূজার সাজ সজ্জায়, এমন কত সং বাহির হইয়া থাকে। কিন্তু যথার্থ সংয়ের আড্ডা এই সংসার; বোধ হয় সেই জন্যই ইহার নাম, সং—সার!

এ সংসারে যাহার যাহা নাই, সে তাহা দেখাইবার জন্য যত ব্যস্ত, নিজের যত টুকু আছে, তাহার ব্যবহার করিতে তত ব্যস্ত হয় না। যে হয়ত খুব ভাল চিত্রকর হইতে পারিত, সে কবিতা লিখিয়া কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিতে চাহিতেছে। যে হয়ত খুব ভাল মোসাহেব হইতে পারিত, সে সংবাদপত্র বাহির করিয়া সর্ব্বস্ব বেচিতেছে! যে গরীব, সে চাল চলনে সর্ব্বদাই বড় মানুষীর ভান করিতে ব্যস্ত;—যে যত শূন্যভাণ্ড সে তত কলকলায়মান!

আসল অপেক্ষা নকলের আমদানী বড়ই বেশী হইয়া পড়িয়াছে! বাজারে সোণা রূপার পরিবর্ত্তে গিল্টী গহনার পসার বাড়িয়া উঠিয়াছে; পুস্তকালয়ে সুপাঠ্য সদ্গ্রন্থের পরিবর্ত্তে অপাঠ্য আবর্জ্জনার প্রাবল্য হইয়াছে;—পথে ঘাটে সর্ব্বত্র প্রকৃত আত্মীয়তার পরিবর্ত্তে একটা মৌখিক শিষ্টাচার-ব্যঞ্জক মুখোমুখী হাতাহাতি ধরণের করমর্দ্দনের ব্যবস্থা হইয়াছে!

তুমি হয়ত আমাকে মোটেই দেখিতে পার না, কি উপায়ে আমাকে লোকসমাজে অপদস্ত করিবে সেই চিন্তায় ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিতেছ না; তবু পথে ঘাটে সভামণ্ডপে আমাকে দেখিবামাত্র হস্তমর্দ্দন করিয়া আত্মীয়তা জানাইবার জন্য কত আগ্রহ! সং আর কাহাকে বলে?

যে যাহা নয় তাহার মত ভান করিলে দেখিতে নিতান্ত মন্দ হয় না;—বেশ একটু সং দেখিবার মত সাময়িক আনন্দ লাভ করা যায়। কিন্তু তাহাতে মানব হৃদয় তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। বোধ হয় সেই জন্য লোকের সংসারে এত অতৃপ্তি!

সুখের দিনে, সম্পদের দিনে, উন্নতির দিনে তোমার সঙ্গে গায়ে পড়িয়া আত্মীয়তা পাতাইবার জন্য লোকের কত ভিড়? তাহারা হয়ত তোমাকে নির্ব্বিঘ্নে খাইতে শুইতেও দেয় না,—লোকের উপর লোক। কাহারও কন্যাদায়, কাহারও নৌকাডুবি, কাহারও বা ভবিষ্যতে কিছু অভিসন্ধি পূরণ করিবার প্রত্যাশায় অগ্রিম তোষামোদ!

একবার দুঃখের দিন আসুক, একবার অবনতির দিন পড়ুক,—দেখিবে তোমার বাড়ীতে কাক উড়িবে না, চিল পড়িবে না। যাহারা কত আত্মীয়তার ভান করিয়াছিল, পথে ঘাটে মাথায় মাথায় ঠেকাঠেকি হইলেও তাহারা আর তোমাকে চিনিতে পারিবে না। সং আর কাহাকে বলে?

সংসারের মানুষের মত সং আর কোথাও নাই। ইহাদের মুখের নিন্দা প্রশংসার দিকে চাহিয়া চাহিয়া পরকাল মাটি করিতেছ কেন?

---

# কবিতাকুঞ্জ।

## শেষ সাধ।

১।

অন্তরে একটি বৃত্তি— আঁধার নিরাশা
রয়েছে এখন,
হৃদি-মাঝে এক সাধ রয়েছে জাগিয়া—
সে শুধু মরণ।

২।

উন্মত্ত আমোদ স্রোতে যেতেছি ভাসিয়া—
কর্ণহীন তরী,
প্রভঞ্জন সনে মেঘ আকাশে হুঙ্কারে
ডুবে বুঝি মরি!

৩।
শালীবন শ্যামতট গিয়াছে মিশিয়া
আঁধার সলিলে,
অকূল সিন্ধুর মাঝে ভগ্ন তরী মম
ভাঙ্গে তিলে তিলে।

৪।
কি করি কোথায় যাই উন্মত্ত জলধি—
কোথা হায় তট,
এইবার—এইবার, ছিঁড়ে বুঝি যায়
অদৃষ্টের পট।

৫।
ডুবে গেল—ডুবে গেল, ভাঙ্গা তরী খানি
সিন্ধু-গর্ভ মাঝে,
তরঙ্গ ধ্বনির তালে, শ্রবণে আমার
মৃত্যু-গীতি বাজে।

৫।
একা এসেছিনু আমি চলিনু "একেলা"
বহুদোর দেশে,
কেহ কি ফেলিবে অশ্রু আমার লাগিয়া
শ্যাম তটে বসে'?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।

---

## মিনতি।

আর নাহি কোন অভিলাষ
এই মাত্র সুধু চাই——
সারাদিন হা হুতাশে
কাটাইয়া অবশেষে
এলে যেন সাড়া পাই।

নিরাশায় ভরিলে অন্তর,
আঁখি জলে ভরিলে নয়ন,
মহাশূন্যে না মিশাতে সখে।
মানবের অমূল্য জীবন,

অমানিশা অন্ধকার ভেদি,
উঠে যথা তরুণ তপন
তেমতি মিনতি এই আছে——
ফুটে যেন ও নব কিরণ

ক্ষুদ্র এক রশ্মি তার
চুমিয়া চুমিয়া,
বড় আশা থামিবে এ
বিরহ-বিধুর হিয়া।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

# তিনটী কথা।

(১)

পবিত্রতা যদি সার, ভগবান, নাহি কর তুমি,
দুঃখ নাই, গরলে কি ভীত হয় গরলের কৃমি?
দীনবন্ধু, দুঃখ এই — পবিত্রাত্মা বলে তোমা সবে
এই চির-নিষ্কলঙ্ক যশোরাশি মলিন যে হবে।

(২)

তোমার পৃথিবী, নাথ, করিয়াছ সুখ রঙ্গালয়,
দেখেছি দাঁড়ায়ে দূরে, করি নাই—কভু অভিনয়।
পলে পলে পটক্ষেপ—আশঙ্কায় আকাঙ্ক্ষার দুখ।
পদে পদে পদচ্যুতি তবু প্রেম দাও এই সুখ।

(৩)

আজীবন সুখ দুঃখ,—এ ভীষণ তরঙ্গ মাঝারে,
এ দীনের ক্ষীণ প্রাণ আকুলিত অকূল পাথারে,
এ ক্ষণিক সুখ দুঃখ লহ প্রভু চাহি না যে আর,
চিদানন্দ, করে দাও এ হৃদয় তন্ময় আমার।

শ্রীরজনীকান্ত সেন।

---

# কৌতুকাবহ আশীঃ কবিতা।

[হীরক জুবিলী উপলক্ষে আমরা ভারতেশ্বরীর দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ-কবিতাটি প্রকাশিত করিলাম। তিনি আয়ুষ্মতী হউন, তাঁহার শত্রু তদ্বিপরীত আয়ু প্রাপ্ত হউক। উঃ সং।]

ইষ্টাঙ্কে দশপূরিতে ভবতি যৎ কুত্ত্বৈকহীনঞ্চ তৎ
হত্বা শূন্য ভুবাহভ্রবাণহরণাৎ যচ্ছিষ্টমঙ্কং ভবেৎ।
বাণৈঃ পূর্ণ তদঙ্কসঙ্খ্যকসমা ত্বং জীব পৃথ্বীপতে,
ভূয়াৎত্বদ্দ্বিষদায়ুষে দ্বিপহৃতং ক্ষিপ্রং তদঙ্কং নৃপ॥ *

---

* হে পৃথ্বীপতে, যে কোন অঙ্ক ইচ্ছা হয় তাহাই ধরিয়া লও, সেই অঙ্ককে দশ দ্বারা পূরণ করিয়া যে ফল হইবে তাহার মধ্যে ১ বিয়োগ কর অবশিষ্টকে শূন্য ০ ও ভূ ১ (অর্থাৎ "অঙ্কস্য বামাগতি" এই শাস্ত্র অনুসারে) ১০ দিয়া পূরণ কর এবং পুনরায় তাহা হইতেই অভ্র ০ ও বাণ ৫ (পূর্ব্ববৎ) ৫০ বাদ দাও, যাহা অবশিষ্ট থাকিল তাহাকে আবার ৩ দ্বারা পূরণ করিয়া যে অঙ্ক হইবে, সেই অঙ্কের সমসঙ্খ্যক বৎসর তুমি বাঁচিয়া থাক। আর সেই অঙ্ক হইতে ৮ হরণ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তত বৎসর তোমার শত্রুর আয়ুঃ হউক।

ইচ্ছানুসারে ১ এই অঙ্কটী ধর, তাহাকে ১০ দিয়া পূরণ করিলে ১০ হইল। ইহা হইতে ১ বাদ দিলে ৯ হইল, তাহাকে ১০ দিয়া পূরণ করিলে ৯০ হইল, তাহাকে ৫০ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট অঙ্ক ৪০ থাকিল তাহাকে ৩ দ্বারা পূরণ করিলে ১২০ হইল। অতএব ১২০ বৎসর তুমি জীবিত থাক। আর উক্ত ৪০ অঙ্ককে ৮ দিয়া ভাগ করিলে ০ শূন্য অবশিষ্ট থাকিল, তাহাই তোমার শত্রুর পরমায়ু হউক।

উক্ত রূপে যে কোন অঙ্ক ধরিয়া দেখ ঠিক ১২০ ও অন্য পক্ষে ০ হইবে।

শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মা।

# অজ্ঞেয়-বাদ

( সমালোচনা )

## দ্বিতীয় অধ্যায়—মানবজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ কি ?

মানবজ্ঞানের স্বরূপ-নির্ণয় বা সীমানির্দেশ করিতে হইলে 'জ্ঞান' শব্দে আমরা কি বুঝিব, আগে তাহার মীমাংসা হওয়া উচিত। চিন্তাহীন, ভাবহীন, বিচারহীন, অকর্ম্মক মানসিক সুষুপ্তিবৎ জড়াবস্থার নামই কি জ্ঞান ? দার্শনিকগণ অনেক তত্ত্বালোচনার পর স্থির করিয়াছেন যে 'জ্ঞান' মানবমনের সকর্ম্মক অবস্থাবিশেষ। কিন্তু এই লক্ষণাও নিঃশেষ লক্ষণা নহে। 'জ্ঞান' যেমন মানবমনের সকর্ম্মক অবস্থা, সেইরূপ শ্রেণীর অনুভূতি ইচ্ছা প্রভৃতি মানবমনের আরও অনেক সকর্ম্মক অবস্থা আছে। সুতরাং অন্যান্য মানসিক সকর্ম্মক অবস্থা পরিবর্জ্জন করিয়া যে বিশেষ অবস্থার নাম 'জ্ঞান' তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু তাহা কি চিন্তা ও বিচারণা-সাপেক্ষ নহে ? এই জন্য চিন্তাপ্রসূত বিচারণাজাত মানবমনের সকর্ম্মক অবস্থা বিশেষকে 'জ্ঞান' বলাই বরং সঙ্গত। ভারতবর্ষের পূজ্যপাদ ঋষিগণ এই সকল আপত্তি নিরসন করার জন্য বলিতেন "অববোধং বিদুর্জ্ঞানম্"—অববোধকে পণ্ডিতগণ 'জ্ঞান' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, অর্থাৎ বিচারণা দ্বারা দশটির মধ্যে একটি নির্দ্দেশ করিয়া জানার নামই 'জ্ঞান'।

চিন্তা বলিলেই চিন্তিতব্য বিষয়ের বর্ত্তমানতা আসিয়া পড়ে। চিন্তার কোন লক্ষ্য নাই, অথবা এমন কোন বস্তু নাই যাহার বিষয় চিন্তা করিব অথচ চিন্তাকার্য্য চলিতে থাকিবে—এমন কথা হইতে পারে না। চিন্তা একটীমাত্র কার্য্য বটে, কিন্তু সেই একটী কার্য্য দুইটী বিষয়ের উপর নির্ভর করিতেছে—চিন্তাকারী ও চিন্তিতব্য বিষয়। সুতরাং চিন্তাকার্য্য চলিয়া 'জ্ঞান' লাভ করিতে হইলে যাহা যাহা প্রয়োজন সেই সেই আবশ্যকীয় শক্তি চিন্তাকারী ও

চিন্তিতব্য বস্তুর মধ্যে থাকা আবশ্যক। যদি চিন্তিতব্য বস্তু না থাকে অথবা মানুষের চিন্তাশক্তির দোষ থাকে তাহা হইলে জ্ঞানের অভাব বা ক্ষীণতা হয়। এই চিন্তাশক্তি পরিচালিত করিবার ক্ষেত্র স্থান ও কাল। স্থান ও কালের সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখিয়া চিন্তা চলিতে পারে না। তুমি যাহার বিষয় ভাবিতে চাও তাহা হয় স্থানে নয় কালে তোমা হইতে পৃথক বলিয়া ভাবিতে হইবে। এখন বিচার করিয়া দেখ 'অজ্ঞেয়' বলিতে ইহার কোন্‌টীর ক্ষীণতা বুঝাইতেছে? মানুষের চিন্তাশক্তিরই দোষ না আদিকারণেই জ্ঞানাভাব? শেষ সিদ্ধান্তটী অজ্ঞেয়বাদিগণ স্বীকার করিতে পারেন না, কেন না তাহা মানিতে গেলে আদিকারণের 'অনন্তত্ব' থাকে না; সুতরাং অগত্যা তাঁহাদিগকে মানিয়া লইতে হয় যে অপূর্ণতা, ক্ষীণতা বা দৃষ্টিহীনতা মানব চিন্তাতেই আছে, সেই জন্য আদিকারণ মানবজ্ঞানের নিকট অজ্ঞেয়। অন্ধের দৃষ্টিশক্তির দোষে সূর্য্য তাহার নিকট যেমন অজ্ঞেয়, ইহাও কতকটা যে সেইরূপ ইহাই তাঁহাদের ধারণা। এখন ভাবিয়া দেখ মানবজ্ঞানের অপূর্ণতা কোথায়?

বাহ্যজগৎ যে আমাদের জ্ঞানগম্য তাহা অজ্ঞেয়বাদিগণ অস্বীকার করেন না। এই বাহ্যজগতের জ্ঞান কি ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হয় নাই? কাল যাহাকে 'অজ্ঞেয়' মনে করিয়াছিলাম আজ তাহাকে 'জ্ঞেয়' বলিয়া বুঝিতেছি, আবার আগামী কল্য তাহা 'জ্ঞাত' হইবে। সুতরাং বাহ্যজগতের কোন তত্ত্বকেই 'অজ্ঞেয়' বলিতে পারি না এবং তাহার সম্বন্ধে মানবজ্ঞানের সীমানির্দ্দেশও করিতে সক্ষম নহি! কেবল ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধেই 'অজ্ঞেয়বাদ' বিশ্বাস করিতেছি কেন? তাহা কি বাহ্যজগতের জ্ঞানের ন্যায় ক্রমোন্নতিশীল জ্ঞানগম্য নহে? ইহার উত্তরে অজ্ঞেয়বাদিগণ বলেন যে আদিকারণ সম্বন্ধে আমাদের 'নিরপেক্ষ জ্ঞান' হইতে পারে না বলিয়া তাহা 'অজ্ঞেয়'।

জ্ঞাতা ও জ্ঞাতব্য—এই দুইটী জ্ঞানের আবশ্যকীয় অঙ্গ। জ্ঞান হইতে হইলে জ্ঞাতব্যের স্বরূপ জ্ঞাতার জ্ঞানশক্তির অনুভূতির বিষয় হওয়া আবশ্যক। নচেৎ জ্ঞাতা ও জ্ঞাতব্য থাকিলেও কোন 'জ্ঞান' হইতে পারে না। জ্ঞাতা ও জ্ঞাতব্যের পরস্পর সংস্রবের উপর 'জ্ঞান' এতদূর নির্ভর করে যে সেই স্বরূপের যে পরিমাণে পরিবর্ত্তন বা অভাব হয়, সেই পরিমাণে জ্ঞানের তারতম্য বা অভাব হইয়া থাকে। একটি সুন্দর কুসুমকে একজন অন্ধ ও একজন চক্ষুষ্মান্

ব্যক্তি পরীক্ষা করিয়া যাহার যেরূপ জ্ঞানশক্তি সে সেইরূপ তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞাতার জ্ঞানশক্তির তারতম্য অনুসারেই যে 'জ্ঞেয়' ও 'অজ্ঞেয়' বলা হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা অল্প হউক অধিক হউক 'অজ্ঞেয়তত্ত্ব' যখন কিছু না কিছু জানিতে পারি তখন যে পরিমাণে জানিতে পারি সেই পরিমাণে কি 'অজ্ঞেয়' আদিকারণ আমাদিগের 'জ্ঞেয়' নহে? প্রকৃত কথা এই যে 'জ্ঞেয়' ও 'অজ্ঞেয়' দুইটি কথা মাত্র—যে পরিমাণে জানিতে পারি সেই পরিমাণে জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয় উভয় তত্ত্বই 'জ্ঞেয়', এবং যে পরিমাণে জানিতে না পারি সেই পরিমাণে যাহাকে মূর্খতাবশতঃ 'জ্ঞেয়' মনে করি তাহাও প্রকৃত প্রস্তাবে 'অজ্ঞেয়'।

আমাদের মধ্যে সাপেক্ষিক নিরপেক্ষিক দুই শ্রেণীর জ্ঞানই যে বর্ত্তমান আছে তাহা একটু আলোচনা করিলেই বুঝা যায়। একটি বস্তু দেখিবামাত্র তাহা 'ইহা নয়, উহা নয়' এইরূপ করিয়া পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তু হইতে ভিন্ন করিয়া লওয়া নিরপেক্ষ জ্ঞান এবং তাহা 'এইরূপ কিম্বা ঐরূপ' এবম্প্রকার বিচারণা করা সাপেক্ষিক জ্ঞানের কার্য্য। এই সাপেক্ষিক জ্ঞানের কার্য্য পরিচালিত হওনার পূর্ব্বে যে নিরপেক্ষ জ্ঞান কিয়ৎ পরিমাণে থাকা আবশ্যক তাহা স্পেন্সার মানিয়া লইয়াছেন, সুতরাং যাহা তাঁহার মতে 'অজ্ঞেয়' আমরা যে তাহার নিরপেক্ষ জ্ঞান কিছু কিছু পাইতে পারি তাহা তিনিই দেখাইয়া দিয়াছেন। সেই আদিকারণকে কোন বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া তিনি 'এইরূপ কিম্বা ঐরূপ' একথা বলা যায় না বলিয়াই স্পেনসার বলেন যে সাপেক্ষিক মানবজ্ঞানের নিকট নিত্যবস্তু 'অজ্ঞেয়'। কিন্তু এই অজ্ঞেয়বাদ মানিতে হইলে বাহ্যজগৎও অজ্ঞেয়ের সমষ্টি হইয়া পড়ে—আমরা তাহারও নিরপেক্ষতত্ত্ব জানিতে পারি না।

যদি সম্পূর্ণরূপে বুঝিনা বলিয়া 'অজ্ঞেয়' বলিতে চাও, তাহা হইলে 'আদিকারণ' কেন, কোন্ বিষয়ে সম্পূর্ণ বুঝিয়া থাক? শিশু পিতা মাতাকে কি সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে—শিশুর সম্বন্ধে পিতা মাতা কি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলিবে? মানবজ্ঞানও সেইরূপ জগতের পিতামাতাকে সম্পূর্ণ বুঝে না, বুঝিতেও পারে না, কিন্তু এই অজ্ঞানের মধ্যে কি কোনই 'জ্ঞান' নাই? নাস্তিকদর্শন প্রবর্ত্তকগণও মানিয়া থাকেন যে স্থূল সূক্ষ্ম, সসীম অসীম প্রভৃতি বিরুদ্ধ জ্ঞান না

থাকিলে জ্ঞানকার্য্য একেবারেই অচল হইয়া পড়ে। সুতরাং অনন্তবস্তুর কোন জ্ঞান না থাকিলে সান্ত বস্তুর জ্ঞান কেমন করিয়া হইতে পারে? যে বাহ্যজগৎকে তোমরা 'জ্ঞাত ও জ্ঞেয়' বলিয়া আস্ফালন করিতেছ এবং যে আদি-কারণকে তোমরা 'অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়' বলিয়া বিষণ্ণ হইতেছে, কিয়ৎ পরিমাণে সেই অজ্ঞেয়ের জ্ঞান নাথাকিলে জ্ঞেয় বস্তুর কোন জ্ঞান হইতে পারিত কি? নদী-তীরস্থ স্থির বৃক্ষগুল্ম লতার দিকে না চাহিয়া আরোহী যেমন অনুভব করিতে পারে না যে তাহার নৌকা চলিতেছে কি না, সেইরূপ নিরপেক্ষ নিত্যবস্তুর দিকে না চাহিলে পরিবর্ত্তনময় জগতের প্রকৃতজ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং জগৎকে জ্ঞেয় বলিলে সেই সঙ্গে সেই পরিমাণে অজ্ঞেয়কেও জ্ঞেয় বলিতে হয়।

বাহ্যজগতের যে কোন একটি পদার্থ লইয়া আলোচনা করিয়া দেখ তাহার সম্বন্ধে কোন্ শ্রেণীর জ্ঞান কি পর্য্যন্ত হওয়া সম্ভব? চন্দ্র কি, সূর্য্য কি, মাধ্যাকর্ষণ কি?—ইহাদিগকে কাহার সহিত তুলনা করিতে পার? তথাপি যতদূর মানবজ্ঞান জানিতে পারে ততদূর পর্য্যন্ত জানিয়া সেই 'জ্ঞেয়-অজ্ঞেয়, তত্ত্ব লইয়া কি সমুদায় কার্য্য নিয়মিত করিতেছে না? সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ জ্ঞান নাই বলিয়াই এই সকল বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে যে শ্রেণীর যতটুকু জ্ঞান আছে তাহা কি পরিত্যাগ করিতেছ? ইহাদের স্বরূপ যে পরিমাণে আমাদের সাপেক্ষিক জ্ঞানের সীমার মধ্যে আসিতেছে, সেই পরিমাণে জানিতেছি, যে পরিমাণে বাহিরে থাকিতেছে সেই পরিমাণে ইহাদের স্বরূপ 'অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়' থাকিয়া যাইতেছে না কি? যেমন মাধ্যাকর্ষণাদির বিষয়ে সাপেক্ষিক জ্ঞানে কতক কতক তত্ত্ব জানিতেছি, সেইরূপ সাপেক্ষিক জ্ঞানে আদি-কারণ সম্বন্ধে কোন তত্ত্ব জানা যাইতে পারে কি না তাহাই বিচার করিবার জন্য 'অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়' বলিতে কি পরিমাণ জ্ঞান বুঝায় তাহারই আলোচনা করিয়া দেখ।

আদি-কারণ যখন নিরপেক্ষ অনন্ত সত্তা তখন যে তাঁহার তত্ত্ব আমাদের নিকট 'অজ্ঞেয়' থাকিবে তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু এই অজ্ঞেয়ের অর্থ ইহা নয় যে আমরা কিছুই জানিতে পারিব না। 'জ্ঞাত' আর 'অজ্ঞাত' ব্যবধান চিরদিনই থাকিবে। মানুষের জ্ঞানশক্তির দিক দিয়া দেখিলাম পরমেশ্বর আমাদের জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয়, তাঁহার সম্বন্ধে আমরা জানিও জানিও না। একবার পরমেশ্বরের দিক দিয়া দেখ তিনি যখন অনন্তশক্তিশালী দেবতা, তিনি কি

তাঁহার স্বরূপ মানবজ্ঞানের নিকট প্রকাশ করিতে পারেন না? শিশু সন্তান দৌড়িয়া পিতামাতার কোলে যাইতে পারে না বলিয়া পিতামাতা কি তাহাকে কোলে তুলিয়া লইতে অক্ষম? (ক্রমশঃ)

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

---

# কবিতার যুগ।

আজকাল মধ্যে মধ্যে একটা কথা শুনিতে পাওয়া যায়—কবিতার যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে, এখন দর্শন, বিজ্ঞানের যুগ। ইহার অর্থ কি? মানবের জ্ঞান-বিস্তারের ইতিহাসে কবিতার কি কোন স্বতন্ত্র যুগ আছে? যদি তাহাই থাকে তবে কবিতার সহিত দর্শন ও বিজ্ঞানের এমনই কি বিরোধ যে, একই যুগে দর্শন, বিজ্ঞান ও কবিতার তিন স্রোত মানবের উন্নতির কোন পুণ্য প্রয়াগ-ক্ষেত্রে সন্মিলিত হইতে পারেনা?

কবিতার যুগ গিয়াছে শুনিলে মনে হয়, যেন আর কুসুম বিকশিত হইবেনা, আর মেঘাভাবে পূর্ণিমা রজনীতে চন্দ্রের অমল ধবল কিরণে প্রকৃতি হাসিবেনা, আর পবনস্পর্শে পাদপলতায় মৃদু মর্ম্মর উঠিবে না, মানব হৃদয়েও আর স্নেহ প্রেমাদি দেখা যাইবে না। মেকলে বলিয়াছেন মধ্যাহ্নে সঙ্গীত হয় না, অথচ দেখিতে পাই তাঁহারই তুষারসমাচ্ছন্ন নীলাম্বুবেষ্টিত জন্মভূমিতে মধ্যাহ্নেই ওয়ার্ডসওয়ার্থ, টেনিসন, ব্রাউনিং, সুইনবার্ণ প্রভৃতির উদয়। টেনিসন এক-স্থানে যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্মার্থ এই যে যতই সময় গত হয়, মানবের চিন্তার পরিসর ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বাস্তবিকও আমরা দেখিতে পাই মানব ক্রমেই নানা বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতেছে। কল কবজা হইতে বৈজ্ঞা-নিক আবিষ্কার পর্য্যন্ত মানবের কৃত কর্ম্ম সমূহ ক্রমেই উন্নতিপ্রাপ্ত হইতেছে। মানবের কৃতকর্ম্মের উন্নতি দেখিয়াই প্রকৃতপক্ষে মানবের উন্নতি বিচার করিতে

হয়। এ উন্নতির মূলে দেখা যায় মানবের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান বিস্তার। এই অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান বিস্তারবশতঃ মানবের কৃত সকল কার্য্যই—কল কবজা হইতে মানবের রচিত উপন্যাস পর্য্যন্ত সবই যখন উন্নতিপ্রাপ্ত হইতেছে, তখন কেন যে কেবল কবিতারই উন্নতি না হইয়া অবনতি হইবে এ কথার সদুত্তর দিতে আমরা অসমর্থ। মানবের প্রতিভা জগতের নানাপথে আপনার কিরণ ছড়াইয়া, কেন যে কেবল একপথে সে আলোকদান করিতে কুণ্ঠিত হইবে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। বিজ্ঞানের তাড়নায় বা দর্শনের যাতনায় কেন যে কবির মানসকন্যা মানসেই বিলীন হইবেন আমরা তাহা বুঝিতে পারি না।

কবি স্বভাবতঃই কবি—কথাটা সত্য। কিন্তু কবিতা রচনা করিবার বা কবিতা অনুভব করিবার ক্ষমতাটা কি নিতান্তই খাম খেয়ালী ভাবে এক এক জনের উপর বর্ষিত হইয়া থাকে! সে ক্ষমতা প্রথমতঃ সকলেরই অল্প বিস্তর থাকে—তাহার পর ঘটনাচক্রে কাহারও বা অনুশীলনবশতঃ তাহা সম্যক্ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, কাহারও বা অনুশীলনাভাবে তাহা নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া যায়। দর্শন, ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় হইতে বর্ণনা প্রধান কবিতার উৎপত্তি; প্রেমাদি বৃত্তির প্রাবল্য হইতে নাটকোপযোগী কবিতার উৎপত্তি, আবেগাতিশয্য হইতে গীতি কবিতার উৎপত্তি; চিন্তা হইতে দার্শনিক কবিতার উৎপত্তি। ভাবাবেশে অতি মূর্খও যে কথা বলে, তাহা কবিত্বপূর্ণ; আকুলতার সময় অতি গদ্যপ্রবণ লোক ও কবিতার মত 'কি যেন কি' অনুভব করে।

প্রতিভার কথায় এইটুকুমাত্র বক্তব্য আছে, যে অনুশীলন ব্যতীত প্রতিভার উন্নতি নাই।

যাঁহারা বলেন,—কবিতার যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা আপনাদিগের কথা সমর্থনার্থ বলিয়া থাকেন যে এখন আর মহাকাব্য রচিত হইতেছে না। কথাটা আংশিকরূপে সত্য। কিন্তু ইহার কারণ কি? এখন আমরা বুঝিয়াছি যে বিচিত্র ঘটনাময় নানা চরিত্র-সঙ্কুল গল্প পদ্য অপেক্ষা গদ্যে রচিত হওয়াই উচিত এবং তাহাই স্বাভাবিক। আমরা এখন গদ্যের ভাগ গদ্যকে দিয়া পদ্যের জন্য কেবল, পদ্যেরই প্রাপ্য অংশ রাখিয়া থাকি। সেই জন্য এখন আর মহাকাব্যের উপর লোকের বিশেষ আকর্ষণ নাই। নহিলে সিভিলওয়ারের সময় যদি মিল্টন মহাকাব্য রচনা করিতে পারিয়া থাকেন তবে এখনই যে

কবিগণ মহাকাব্য রচনা করিতে একেবারেই অশক্ত ইহার কোনই কারণ নাই।

কবিতা সময়ের সহিত পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের কবিতা প্রথমে একরূপ ছিল, মধ্যে আর একরূপ দাঁড়াইয়াছিল, এখন আবার আর একরূপ দাঁড়াইয়াছে। ড্রাইডেন ও পোপের হস্তে কবিতা বন্দীকৃতা পরীবাণীর অবস্থা পাইয়াছিল। আদবকায়দার উৎপাতে, মার্জ্জিত ভাষার পদতলে প্রকৃত কবিত্ব-পূর্ণভাব বিসর্জ্জনের বিষম অত্যাচারে কবিতা স্বাভাবিকতা হারাইয়া কৃত্রিমতার শত বন্ধনে বদ্ধ হইয়া পড়িতেছিল। কবিতা শ্যামশোভাময় পল্লিগ্রাম ছাড়িয়া যেন ধূলি ধূম সমাকীর্ণ সোলাবণ্য লণ্ডন সহরের সঙ্কট সঙ্কীর্ণ পথপার্শ্বে একটা আলোক ও পবনহীন গহে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কল-নাদিনী নিম্নগা সঙ্কীর্ণ খালে পরিণত হইতেছিল। পোপের পর কলিন্স, গ্রে, গোল্ডস্মিথ এবং টম্‌সন কবিতার স্বাভাবিকতা সঞ্জীবিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা পূর্ব্ব প্রভাব একেবারে দূর করিতে পারেন নাই। বার্ণসের কথা স্বতন্ত্র-তাঁহার কবিতা যেন সাধারণ কবিতার বাহিরে—সে স্রোত স্বতন্ত্র ভাবে বহিয়া যাইত, তাহা সাধারণ স্রোতের সহিত মিশ্রিত হয় নাই। তবে তাঁহার পরবর্ত্তী কবিদিগের উপর তাঁহার প্রভাব অল্প ছিল না। ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ স্বীকার করিয়াছেন যে সামান্য সামান্য সত্যের উপর সংস্থাপিত সঙ্গীত কিরূপ প্রভাবময় হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত তিনি কৃষককবি বার্ণসের নিকটই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই পথ হইতে অন্য পথে গিয়াছিলেন—কবি কাউপার।

তবে কাউপারের কবিতা গৃহস্থালীর বর্ণনায় ছোট খাট বর্ণনায় বড় মধুর,—উত্তালতরঙ্গকুলসঙ্কুল সাগর বা তুষারমুকুটমণ্ডিত অম্বরচুম্বিত গিরি—এ সকলের মুক্ত সৌন্দর্য্যের বর্ণনা দেখিতে হইলে পাঠককে কাউপার ছাড়িয়া ওয়ার্ডসওয়ার্থের আশ্রয় লইতে হইবে। কাউপারে যাহার অঙ্কুর ওয়ার্ডসওয়ার্থে তাহা মুকুলিত। কবিতা পল্লিগ্রাম পরিহার করিয়া, সহরে আসিয়াছে বলিয়া কবি কাউপার তাঁহার টাস্কে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। সমাজের পরিবর্ত্তনের উপর তিনি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়াছেন।

ইহার পর কথা কবিতার বিষয়ের অভাব হইবে। যেন কুসুমে, স্রোতস্বতীতে, চন্দ্রে যেটুকু কবিতারস ছিল, পূর্ব্ব কবিগণ নিষ্পেষণযন্ত্র সাহায্যে সে টুকু সবই বাহির করিয়া লইয়াছেন—এখন কবিদিগের আর রস প্রত্যাশা করা

বৃথা—সে যেন শরতের বিগলিতাম্বু জলধরের নিকট পিপাসার্ত্ত চাতকের জলবিন্দু লাভ প্রত্যাশা। বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন যে, জগতের সকল পদার্থেই বিদ্যুৎ ব্যাপ্ত আছে,—কোন কারণ না পাইলে তাহা প্রকাশিত হয় না এই পর্য্যন্ত; তবে ঐ সকল পদার্থে বিদ্যুতের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সহজ, এমন কি যন্ত্র বিশেষের সাহায্যে ঐ বিদ্যুৎ বাহির করা ও যাইতে পারে। আমাদিগের মনে হয়, কবিতা সম্বন্ধেই এই কথাই প্রযুজ্য, জগতের সকল পদার্থেই কবিতা ব্যাপ্ত আছে; কবির অনুকূল দৃষ্টি না পাইলে তাহা প্রকাশিত হয় না। প্রকৃত কবিগণ বিষয়ের অভাব অনুভব করেন না। কবিগণ বর্ণনাপ্রধান কবিতা অনেক লিখিয়াছেন, কিন্তু আর কি বর্ণনা করিবার বিষয় নাই? বাল্মীকি, হোমর হইতে কবিগণ স্বভাব বর্ণনা করিয়া আসিতেছেন; তাই বলিয়া কি এখনকার কবিগণের স্বভাব-বর্ণনা মধুর হয় না? প্রকৃত কবিতার আদরের অভাব হয় না—বর্ণনাবহুল কবিতায় প্লাবিত ইংরাজী সাহিত্যে কি কাউপারের যশোলাভ হয় নাই? হোমার হইতে আরম্ভ করিয়া বহু কবি যুদ্ধ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তবু স্কট "ফাইট অফ ফ্লডেন ফিল্ড" (The Fight of Flodden field) লিখিবার অবসর পাইয়াছিলেন; ক্যাম্বেলের পৃষ্ঠে কেহ 'হোহেনলিন্‌ডেন' (The ballad of the battle of Hohenlinden) লিখিয়া যান নাই। বঙ্গভাষায় বিদ্যাপতি. চণ্ডীদাস হইতে মধুসূদন পর্য্যন্ত বহু কবি বিরহবেদনাব্যঞ্জক কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তবুও "ব্যর্থ-যৌবনে" রবীন্দ্র বাবুর

"আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায়
কেমনে?"

বলিয়া বিরহ ব্যথা প্রকাশের অবসর ছিল।

অতি সাধারণ, অতি সামান্য দ্রব্যেও কবিতা আছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলিয়াছেন, যে তিনি

"Even from the meanest flower that blows
Thoughts that do often lie too deep for tears"

পাইতেন। প্রকৃতির অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, সামান্য সামান্য অংশেও স্বভাবকবি বার্ণস একভাবে এবং স্বভাবের কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ আর একভাবে কবিতার উপাদান পাইয়াছিলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ আপনি একটি স্বতন্ত্র "স্কুল"—তাঁহার

ভাষা, তাঁহার ভাব তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি। প্রকৃতির শোভা, স্নেহ ভালবাসাদি বৃত্তির মোহকর প্রভাব, নীতির নিয়ম, তিনি যেমন করিয়া দেখিয়াছেন, তেমন করিয়া আর কোন কবি দেখেন নাই। তদ্ভিন্ন সভ্যতার শৈশবাবস্থায়, শিক্ষার প্রথম বিস্তারকালে মানব প্রকৃতিতে যেরূপে ধর্ম্ম মিশাইয়া ফেলিয়াছিল, তখন মানব প্রকৃতিকে যে ভাবে দেখিয়াছিল সরল হৃদয় ওয়ার্ডসওয়ার্থও তেমনই করিয়াছিলেন। তাঁহার সকল কবিতাতে তাঁহার একটা দার্শনিক মত ব্যাপ্ত; কিন্তু তাহাতে তাঁহার গৌরব নহে; তাঁহার গৌরব কবিতায়। ম্যাথিউ আর্ণল্ডের মত ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভক্তও তাঁহার দার্শনিক মতকে "illusiae" বলিয়াছেন।

আমরা আলোচনা দ্বারা দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি যে কবিতার কোন বিশেষ যুগ ছিল না ও থাকিতে পারে না, কবির প্রতিভা বিকশিত হইবার পক্ষে কোনই প্রতিবন্ধক নাই, কবিতা রচনার উপাদানের অভাব নাই। তবে কে বলিবে মধ্যাহ্নে সঙ্গীত হয় না, কে বলিবে কিছু দিন পরে পূর্ব্বকালে রচিত কাব্য সমূহ মিশরের দূরব্যাপ্ত মরুমধ্যস্থ নিঃসঙ্গ পিরামিডের মত বিস্ময়ের বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে, কে বলিবে দর্শন বিজ্ঞানের অত্যাচারে কবিতার উৎস শুষ্ক হইয়া যাইবে?

যাঁহারা বলেন বিজ্ঞানে কবিতা নাই বা কবিতায় বিজ্ঞান নাই তাঁহাদিগকে টেনিসন পাঠ করিতে অনুরোধ করি, যাঁহারা বলেন দর্শনে কবিতা নাই বা কবিতায় দর্শন নাই তাঁহাদিগকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

বর্ত্তমান শতাব্দীতে দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে, অথচ ইহারই প্রথম ত্রিংশৎ বৎসরে ইংলণ্ডে বহু কবির প্রধান প্রধান রচনা সকল রচিত—ওয়ার্ডসওয়ার্থ, স্কট, বায়রণ, সাদে, কোলরিজ, সেলী, কিট্স ইহাদিগের সকলেরই প্রধান রচনা সকল ঐ সময় মধ্যে রচিত। ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে এক এক সময় এক এক জন মনীষি কবির কথা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এক সময় এতগুলি সুকবির গর্ব্ব এই মধ্যাহ্ন ভিন্ন আর কোন সময়ই করিতে পারে না। তবে কেমন করিয়া বলিব, মধ্যাহ্নে সঙ্গীত হয় না?

জগৎ উন্নতির পথে প্রধাবিত হইতেছে সন্দেহ নাই। উন্নতিই সভ্যতার আরাধ্য দেবতা।

কিন্তু এই সর্ব্বব্যাপী উন্নতিব পথে কি আমবা মানবের সাধনার ধন কবিতাকেই পরিত্যাগ করিয়া যাইব!!

সৃষ্টির প্রথমে যখন মানব নগ্নসরলতায বিস্ময় বিস্ফারিত নযনে আপনার চারিদিকে চাহিয়াছিল, তখন যেমন ফলফুলপত্রে শোভিত পাদপোপরি বিহগগণ তাহার কর্ণে অমৃতময় সঙ্গীত ঢালিয়াছিল, আজিও তাহারা তেমনই অমৃতময় সঙ্গীত ঢালিতেছে; আজিও পবনতাড়িত তবঙ্গিণী সলিলে রবিকর তেমনই জ্বলিতেছে, আজিও অনন্ত যৌবন সম্পদশালিনী ধরণীর ভূষণ কুসুমকুল তেমনই বিকশিত হইতেছে, আজিও সন্ধ্যাব অন্ধকারকুন্তলে তেমনই তাবকারাজি জ্বলিতেছে, আজিও আকাশে মেঘেবৰিকবে তেমনই খেলা হইতেছে। আজি ও মানব হৃদযে অমৃতময় স্নেহ, সকল মাধুরীব সাব প্রেম বিকশিত হইতেছে। আজি ও জগৎ শোভাময়—আজি ও জগৎ কবিতাময়।

তবে কবিতাব কোন স্বতন্ত্র যুগ নাই; কবিতার যুগ অনন্তকালব্যাপী। অনন্তকাল কবিতা মানবহৃদয়ে আনন্দালোক বিকীর্ণ করিয়া অন্ধকার দুব করিবে। কবিতার কোন বিশেষ যুগ নাই; কবিতার যুগ অনন্তকালব্যাপী।

শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ।

---

# বেদানা।

(ছোট গল্প)

(১)

শীতকাল। পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। আগ্রীব লেপ দ্বারা আবৃত করিয়া বঙ্কিম বাবুর দেবী চৌধুরাণী পড়িতেছি। নভেল পড়িয়া যে কাল্পনিক সুখ পাওয়া যায়, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিতেছি। ঝিকে ডাকিয়া মা'র কাছ হইতে মুড়ি লইয়া আসিতে বলিলাম। মুড়ি চিবাচ্ছি আর দেবী

চৌধুরাণীর অসম্ভব রস হৃদয়-চৌবাচ্চাতে নিংড়াইয়া ফেলিতেছি। একটু পরেই পাশের ঘরেতে "একজামিণীর" ঘড়িতে ঠুং করিয়া শব্দ হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম '——' বাবু কয়টা বাজিল?— উত্তর পাইলাম চারিটা। লেপ ফেলিয়া ধড় ফড় করিয়া উঠিলাম হাফ-গ্যারান্সিটা আঁটিয়া হাত মুখ ধুইতেছি, এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া একখানি পুরু কাগজেব টুকরা হাতে দিল,— দেখিলাম কাগজে লিখা রহিয়াছে "Your Rajani Babu at the door." ভৃত্যকে বলিলাম, বল্‌গে যাচ্ছি। বৈকালিক ভ্রমণের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ঝির নিকট হইতে দুটী পান লইলাম। রজনী বাবুকে একটী পান দিলাম।

আমাদের বাটীর পাশ দিয়া একটা বাঁধ সোজাসুজি অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। বাঁধের উপব দিয়া আমবা দু'জনে ভ্রমণোচিত পাদবিক্ষেপে ও স্ফূর্ত্তি সহকারে চলিলাম। রজনী আমার সমপাঠী,— অনেক দিন হইতে একসাথে পড়িয়া আসিতেছি। এ, ও, তা, সাত পাঁচ গল্পের পব রজনী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "ক্ষিতীশ, গোকুলকে যে বড় একটা দেখা যায় না, তাহার কি হযেছে বলিতে পাব?" আমি বলিলাম "বোধ হয অসুখ হয়ে থাকবে।" রজনী বলিল "চল না একবার তাহাকে দেখে আসি, তাদের বাড়ী ত নিকটেই।"

আর বেড়ান হইল না। আমরা গোকুলের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলাম। অদূবে একটা গলি। গলির মোড়েতে একটা লাইটপোষ্ট। লাইটপোষ্টের নিকট দাঁড়াইযা সরলভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে গোকুলের বাড়ী দেখা যায়। আমবা বহির্দ্বাবের নিকট দাঁড়াইযা ডাকিলাম "গোকুল বাবু বাড়ীতে আছেন?" দু'তিন ডাকেব পর উত্তব পাইলাম— "অনেকক্ষণ বেড়াতে বাহির হইয়া গিয়াছেন"। গোকুলের তবে অসুখ হয় নাই—ইহা অনুমানে বুঝিলাম। রজনী বলিল "দাঁড়ালে হয় না?'— আমি বলিলাম "সন্ধ্যা হইয়া আসিল যে।" "তা একটু দেরী হইলই বা।" 'আচ্ছা"।

আমরা দাঁড়াইয়া গোকুলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

কুয়াসার ঘন আবরণে চারিদিক ছাইয়া ফেলিল। গোধুলির আধ আলো আধ ছায়া,— অস্ত রবির শেষ কনক রশ্মিরেখা,— আব বনের শ্যামল শোভার সুমিলন, শান্ত সন্ধ্যাকে মূর্ত্তিমতী করিয়া তুলিল। আমার কাব্যামোদী সঙ্গী

অবসর পাইয়া সময়োপোযোগী দু'চারিটী কবিতা আওড়াইতে লাগিলেন।

এখনও গোকুল ফিরিল না দেখিয়া আমরা আর অপেক্ষা করিলাম না। অধিক দূর যাইতে না যাইতে গোকুলের সহিত গলির মোড়ে লাইটপোষ্টের ধারে দেখা হইল।

রজনী বলিল 'কি হে তোমার যে দর্শন পাওয়া ভার। আমরা ভেবেছিলেম যে তোমার অসুখ হয়েছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে এইমাত্র ফিরছি"।

গোকুল বলিল—"আমার বড়ই সৌভাগ্য যে তোমরা আমার সাথে দেখা করিতে আসিয়াছিলে। আমি সময় মত বাড়ীতে না থাকিতে পারাতে বড়ই লজ্জিত ও দুঃখিত হইলাম। ভাই তোমাদের সঙ্গে বোধ হয় এই শেষ দেখা। বাবা কাল্লই আমাকে মুঙ্গের রওয়ানা হইতে লিখিয়াছেন। আপাততঃ যে কোথায় পড়িব তাহার কিছুই লেখেন নাই। কবে যে আর তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে বলিতে পারি না"।

আমি বলিলাম "ভাই তোমার কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। যাঁদের সহিত অনেক দিন হইতে আলাপ,—পরিচয়—যাঁদের সহিত অনেক দিন হইতে অধ্যয়ন করিয়া আসিতেছি—যাঁদের সহিত আমোদ আহ্লাদে দুদণ্ড বেশ আরামে কাটিয়া যায় তাঁরা যদি হঠাৎ আমাদের মধ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করে, তাঁহলে আমাদের আর দুঃখের পরিসীমা থাকে না।"

গোকুল বলিল "ভাই আমার কি অসাধ—তোমাদেরকে ছেড়ে যেতে আমার আদরেই ইচ্ছা নাই—কি করি বাবার আজ্ঞা উপেক্ষা করিতে পারিনা।"

এ দিকে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। শীতকালের রাত্রি—নিশাচরের প্রাদুর্ভাব অতি কম। জন মানবের সাড়া শব্দ নাই। লাইটপোষ্টের ধারে—আমরা শুধু তিনজন। গোকুলের সহিত আমাদিগের অনেক দিন হইতে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। অশ্রুভার উপহার দিয়া, মনে রেখ, চিঠি পত্র লিখ বলিয়া, গোকুলের নিকট হইতে আমরা বিদায় লইলাম। প্রবাসে, জীবন কৈশোরে, অপরিচিতের মধ্যে দু একটী হৃদয়ের সহিত আমাদিগের এমনি পরিচয় হইয়া যায়, দু একটী হৃদয় এমনি আপনার হইয়া যায়, যে তাহাদিগকে নয়নের অন্তরাল হইতে দেখিলে আমরা যথেষ্ট কষ্ট অনুভব করিয়া থাকি। এমন

অনেক স্নেহ প্রবণ অন্তঃকরণের মধ্যে আমরা আসিয়া পড়ি, যাহাদিগের স্নেহ-আবরণে আবৃত থাকিয়া আমরা সাচ্ছন্দ্য সুখ অনুভব করিয়া থাকি--- কিন্তু দৈবাৎ সে স্নেহ আবরণ আমাদিগের সম্মুখ হইতে অপসারিত হইলে ক্ষোভের পরিসীমা থাকে না।

( ২ )

দু'বৎসর অতীত। পিতৃদেব আমাদের মায়া কাটাইয়া উর্দ্ধলোকে চলিয়া গিয়াছেন। সংসারে মা ও আমি একাকী। আমাদের সংসার যাত্রা এক প্রকার অচল হইয়া পড়িয়াছে। নানাবিধ সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে এ বৎসর বি, এ, ফেল হইয়াছি। কলেজে পুনরায় অধ্যয়ন করিয়া পাশ করি এমন সংস্থান নাই সুতরাং শিক্ষকতা করিয়া প্রাইভেটে পড়িব মনস্থ করিলাম।

শিক্ষকতা কোথায় পাইব। আজ কাল চাকুরী সুলভ নহে। পুরাতন বন্ধুদিগের কথা মনে পড়িল। রজনী কলিকাতায় এম, এ পড়িতেছে। গোকুল বি, এ, পাশ করিয়া মুঙ্গেরে তাহার পিতার নিকট থাকে। কলিকাতায় চাকরীর অন্বেষণ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে জানিয়া রজনীকে চিঠি লিখিলাম না। মুঙ্গেরে কোন শিক্ষকের পদ শূন্য আছে কিনা, থাকিলে সে পদ যাহাতে আমার হয় এই মর্ম্মে গোকুলকে একখানি পত্র লিখিলাম। দু দিন পরে পত্রের উত্তর পাইলাম। ভাগ্য আমার প্রতি সুপ্রসন্ন। গোকুল লিখিয়াছে মুঙ্গের এনট্রান্স স্কুলের অষ্টম শিক্ষকের পদ খালি আছে। বেতন বিশ টাকা।

তৎক্ষণাৎ উদ্যোগ করিয়া মাকে বাটী পাঠাইয়া দিলাম। ক্যাম্বিসের ব্যাগে দু চার খানা কাপড় পুরিয়া— ক'এক খানা আবশ্যকীয় পুস্তকের একটা পুঁটুলি করিয়া মুঙ্গের যাত্রা করিলাম।

( ৩ )

থাকি গোকুলদের বাড়ীতে। গোকুলের পিতা মুঙ্গেরে একজন স্বনামখ্যাত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট। তিনি অতি সৎ ও অমায়িক প্রকৃতির লোক। পূর্ব্বকার সহধ্যায়ী বলিয়া ও গোকুলের অযাচিত সুপারিশে গোকুলের পিতা আমাকে একটী ছোট কুঠরি দিয়াছেন।

দু তিন মাস বেশ কাটিয়া গেল। স্কুলে রীতিমত শিক্ষকতা করিয়া থাকি।

মাসে মাসে দশ টাকা মাকে পাঠাইয়া থাকি। অবসর মত বি, এ, ষ্টান্ডার্ড গুলি একবার চোখ বুলাইয়া থাকি।

লম্বা লম্বা চুল রাখিয়াছি;— আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা এখনও বাবরিতে পরিণত হয় নাই। সর্ব্বদা ব্যবহারের নিমিত্ত দুখানি লংক্লথের মোটা চাদর সেলাই করিয়া লইয়াছি। একজোড়া ঠনঠনিয়ার চটী আমার পাদুকার উদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকে।

আমি যখন রাস্তা দিয়া হাঁটি, অনেকে আমার দিকে বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া থাকে। বিস্ময়ের কারণ উপলব্ধি করিতে গিয়া আমি আপনার নিকট আপনি অধিকতর বিস্মিত হইয়া পড়ি।

( ৪ )

প্রকৃতি ভাসান বরষা তাহার সন্ধিস্থলে পা দিয়াছে। শ্রাবণের দিকবধূ তপনহীনা। ধরণী অসামান্য সহিষ্ণুতার আশ্রয়ে অবিরল অবিশ্রান্ত বারিধারা তাহার বৃহৎ উদার বক্ষাভ্যন্তরে সঞ্চয় করিতেছে। বৃষ্টি স্নাত তরুলতা, রঞ্জিত চিত্রপটের মত দেখাইতেছে। থাকিয়া থাকিয়া--বাদ্‌লা হাওয়া বহিতেছে। চারিদিকে যেন কর্ম্মহীন জীবনের একটা মলিন অলস ছবি প্রতিভাত।

প্রাতঃকাল। নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। গোকুলের চারিদিন হইল জ্বর হইয়াছে। আকাশ একটু ফরসা হইলে গোকুলের জন্য বেদানা কিনিতে বাহির হইলাম। এক রসি রাস্তা আসিয়াছি আবার টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। ছাতাটা এত জীর্ণ হইয়াছিল যে বৃষ্টিকণা অবাধে আমার মাথার উপরে সিঞ্চিত হইতে লাগিল। কাকস্নান করিতে করিতে বেদানার দোকানে গিয়া উঠিলাম।

একটী হিন্দুস্থানী প্রৌঢ়া দোকানের অধিকারিনী। দোকানের ঘর খানি খোলার। দেওয়াল গুলি ইঁট দিয়ে গাঁথা খুব উঁচুতে তিন দিকে তিনটা জানালা কাটা। ঘরের মেঝেতে ক্রেতাদের জন্য দু তিন খানি মসিমলিন টুল পড়িয়া আছে। প্রৌঢ়াটী একটী মাচার উপরে অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় রহিয়াছে। সম্মুখে নানাবিধ ফলের ঝুড়ি। আমাকে দোকানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া উঠিয়া বসিল। হিন্দুস্থানী ভাষায় আমাকে বলিল "বাবু— বাদ্‌লি মে আপ খুব ভিজা— কা আপশোষ। ছোট্টা চৌকি পেকে এধার বৈঠিয়ে।"

আমি গায়ের মোটা চাদর দিয়া মাথা মুড়িয়া ফেলিলাম। টুল টানিয়া লইয়া হরেক রকম ফলের ঝুড়ির সম্মুখে যাইয়া বসিলাম। এক একটা বেদানা লইয়া নাড়া চাড়া করিতেছি আর তাহার মূল্য জিজ্ঞাসা করিতেছি। কোথা হইতে বালিকাস্বভাবসুলভ দু চারিটে কথা শুনিতে পাইলাম। "রঙ্গিয়া, দুটো বেদানা দাও— ভাল দেখে বাছিয়া দাও।" চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে একদিকের একটা দেওয়াল সংলগ্ন জানালাতে দুটী রূপার চুড়ি পরা গোল গাল হাত,— আর ভ্রমরকৃষ্ণ ভ্রূযুগের ছায়াতে দুটী ভাসা ভাসা চোখ দেখিতে পাইলাম। যেই দেখিলাম— সেই মনোরাজ্যে একটা বিপ্লবের সূচনা হইয়া দরবার বসিল— প্রেম বল, প্রণয় বল, ভালবাসা বল,— কি তিনের সংমিশ্রণ বল দরবারের সিংহাসন অধিকার করিল।

রঙ্গিয়া ঐ হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকটীর নাম অনুমানে বুঝিলাম। অধরের কোণে অভ্যস্ত দোকানদারী হাসি আনিয়া রঙ্গিয়া বলিল "আরে কেঁউ নিম্‌লি হ্যায়— তুঁহি বেদানা লিবে"। ঝুড়ির মধ্যে আর ভাল বেদানা ছিল না। আমিই চারিটা ভাল বেদানা বাছিয়া লইয়াছিলাম। রঙ্গিয়া নিজ লাভের প্রতি মনোযোগী হইয়া দুটা আধ পচা বেদানা দিতে যাইতেছিল। কি জানি কেন অজ্ঞাতসারে আমি সে পচা বেদানা দুটো বদলাইয়া আমার হাতে চারিটা বেদানার দুটা লইয়া রঙ্গিযার হাতে দিলাম। রঙ্গিয়া কোন্ কথা না কহিয়া, বেদানা দুটা বালিকার হাতে দিল। বালিকা আমার ব্যবহার দেখিয়া বেদানা লইতে ইতস্ততঃ করিতেছিল; এমন সময়ে পাশের বাটী হইতে কে ডাকিল "নিম্‌লি ও নিম্‌লি তোর এখন ও বেদানা কেনা হইল না· দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জলের মধ্যে ভিজছিস্ বুঝি"। বালিকা ডাকে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বেদানা লইল। একটা আধুলি ফেলিয়া দিয়া বলিল— "বাঁকি পয়সা একটু পরে এসে নিয়ে যাব"। বালিকা চলিয়া গেল।

রঙ্গিয়ার কথার আভাসে জানিলাম, বালিকা হরিশ বাবু এ্যাসিস্‌টাণ্ট সার্জ্জনের কন্যা। রঙ্গিয়ার দোকানের পাশেই হরিশ বাবুর বাটী। বালিকার নাম নির্ম্মলা— স্নেহ ও আদরের ডাক নিম্‌লি।

হৃদয়ে গুরুভার চাপিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

( ৫ )

আমি জীবনের একটা অভিনব সিঁড়িতে ধাপ ফেলিলাম; একটা নূতন নাট্যজগতের অভিনেতা হইতে চলিলাম। এখন আব কিছুই ভাল লাগে না। নূতন রসের প্রথম আস্বাদেই বিভোব হইযা পড়িয়াছি। প্রায় একজন উদ্ভ্রান্ত প্রেমিক হইযা পড়িলাম। ভুক্তভোগী পাঠকেরা আমার বর্ত্তমান অবস্থা সম্যক-রূপে বুঝিতে পাবিবেন।

স্কুলের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে চালাইতে পারি না। ফিলজ-ফিব বহির পাতা খুলিয়া সেক্ষপীবের মিরান্দার তত্ত্বাবধান করি। চারি পাঁচ ডাকেও উত্তর দিই না। গোকুল বড় চতুর। আত্মবিস্মৃতির মূল কারণ জানিতে আব উহার বাঁকি রহিল না। সে আমাকে ফৌজদাবীব মোকদ্দমার সাক্ষীর মত সর্ব্বদা জেরা কবিযা থাকে! যথাসাধ্য উত্তর দিয়া আমি সারাংশটুকু গোপন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকি।

আজ শনিবার সকাল সকাল স্কুল হইতে আসিযাছি। ঝি নানাবিধ সন্দেশ সজ্জিত একখানা রেকাব আমার সম্মুখে রাখিয়া গেল। সম্পূর্ণরূপে রসনা তৃপ্তির এমন সুন্দব উপকরণ কোন দিন পাই নাই। মনে একটা খট্‌কা বাধিল; ঝিকে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "আজ কি যে এত সন্দেশেব ঘটা"?

ঝি হাসিয়া উত্তর করিল "তা'কি আপনি জানেন না যে, ও পাড়ার ডাক্তার বাবুব মেয়ে নির্ম্মলাব বিয়ের সন্দেশ"। আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে একটা মর্ম্মস্পৃক যন্ত্র ধ্বনিত হইতে লাগিল। হাসিরেখা শূন্যে উচ্চারিত শব্দের ন্যায় আমাব অধবের কোণে মিলাইয়া গেল। হায়!— আমার মানসী প্রতিমা নির্ম্মলা আজ কাহার হৃদয়ের অন্তঃপুব আলোকিত করিতে চলিল।

ঝি চলিয়া গেল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নির্ব্বাক হইয়া থাকিলাম। জল খাবার যেমন ছিল তেমনি পড়িয়া রহিল। পরদিন শুনিলাম নির্ম্মলারা হুগ্‌লি চলিয়া গিয়াছে। সেইখানে তাহার বিবাহ হইবে।

( ৬ )

সূত্র ছিঁড়িয়া গিয়াছে— গ্রন্থি দিলে আর মানে না। ১৫ দিনের ক্যাজু-য়াল লিভ লইয়া রজনীর উদ্দেশে কলিকাতা যাত্রা করিলাম। রজনী আমাকে দেখিয়া বলিল "কি ভায়া কি মনে করে"? প্রকাশ্যে বলিলাম "আব হাওয়া

বদলাইতে"। মনে মনে বলিলাম "ভগবান্ জানেন কি মনে করে"।

কলিকাতাবাসীরা কঠোর জীবন-সংগ্রামে উন্মত্ত। তাহাদিগের গতি বিধির চাঞ্চল্য দেখিয়া আমার মনও অস্থির হইয়া উঠিল। মনে করিলাম এখনি এ স্থান পরিত্যাগ করি। রজনীর অনুরোধে আরও পাঁচ দিন কলিকাতায় রহিলাম।

* * * * *

আজ বৈকালের ট্রেনে রাজমহল আসিয়াছি। হোটেলে চারিটি ভাত নাকে মুখে গুঁজিয়া প্রাচীন রাজধানীর অতীত গৌরবের শেষ স্মরণচিহ্ন সমূহ দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। গগনস্পর্শী উচ্চ সৌধাবলী বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আপিস গৃহে পরিণত হইয়াছে। বঙ্গীয় ধনকুবের জগৎ শেঠের প্রবাল-প্রস্তরাদিখচিত প্রাসাদ ভগ্নাবশেষে পর্য্যবসিত হইয়াছে। মনে হইল যেন কোন শাসন-শকুনি তাহার করাল পাখা আবহমান কাল এই প্রাচীন রাজধানীর উপর বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে,— আর পবিত্র সলিলা জাহ্নবী লুপ্তকীর্ত্তির কঙ্কাল তাহার তুষার-শীতল বক্ষে ধারণ করিয়া দিগন্তে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে।

বেড়াইতে বেড়াইতে পা ধরিয়া গেল। গঙ্গার ধারে কতকগুলি বড় বড় মোটা শালকাঠ পড়িয়াছিল। শ্রান্ত ও অবসন্ন হৃদয়ে একখানি কাঠের উপর বসিয়া পড়িলাম।

সূর্য্য ডুবিয়া গেল। সুদূরে শৈলমালা কনকের টিপ কাটিয়া সলজ্জভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে দ্বিতীয়ার চাঁদ মলিনোজ্জ্বল জ্যোছনা ছড়াইতেছে। আমার মাথার উপরে তারকাখচিত উদার অনন্ত নির্ম্মলাকাশ,— নীচে ক্ষুরধারা খর-পরশা জাহ্নবী। আমি ভাবিতেছিলাম সৈকত-সংলগ্ন ভাসমান ফুল-ফল-তৃণ-দলের মত আমাকেও এক দিন অনন্তের প্রবাহে ভাসিয়া যাইতে হইবে; ভাবিতেছিলাম সেই সিন্ধুগভীর, নীলাভ চক্ষুর্দ্বয়— আর সুন্দর গোলগাল চুড়ি-পরা দুটী হাত; ভাবিতেছিলাম সেই অগাধ অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি যাহা এক দিন এক চুমুকে পান করিয়াছিলাম,— আর ভাবিতেছিলাম সেই বেদানা যাহা কিনিতে যাইয়া যে হৃদয় বেদনা বহিয়া লইয়া আসিয়াছিলাম, সে বেদনা আর কোন দিন ঘুচিবার নহে।

শ্রীরমেশ চন্দ্র রায়।

# জগৎ শেঠ।

## উপক্রমনিকা।

"শেঠের বংশের হায়। ঐশ্বর্য্যের কথা
সমস্ত ভারতে রাষ্ট্র প্রবাদের মত।
জগৎ শেঠের নাম বঙ্গে যথা তথা
লক্ষ-মুদ্রা-সমকক্ষ। জাহ্নবীর মত
শতমুখে বাণিজ্যের স্রোতে অনিবার
ঢালিছে সম্পদরাশি সমুদ্র ভাণ্ডারে।
আপনি নবাব যিনি, (অন্য কোন ছার।)
ঋণপাশে বাঁধা সদা যাহার দুয়ারে।"

কবিবর নবীনচন্দ্রের অতুল কল্পনা শেঠ-গৌরবের যে অমরগীতি ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রত্যেক বঙ্গবাসীর কথোপকথন-প্রসঙ্গে সেই গৌরব-গাথা সত্য সত্যই ধ্বনিত হইয়া উঠিত। কেবল বঙ্গবাসী কেন,— সমগ্র ভারতবাসীর নিকটেও শেঠ-বংশের ঐশ্বর্য্যকাহিনী প্রবাদকাহিনীর মত প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। রূপৈশ্বর্য্যের অপূর্ব্ব সমাবেশে ভারতবর্ষের ময়ুর-সিংহাসন ইতিহাসবিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে;— সেই গৌরবোদ্দীপ্ত মোগল রাজসিংহাসনাধিপতি "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" হইতে পর্ণকুটীরবাসী শাকান্নভোজী দরিদ্র গৃহস্থ পর্য্যন্ত, সকলেই শেঠ-বংশের ঐশ্বর্য্যকাহিনী আলোচনা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিত। যাঁহারা সৌভাগ্যলক্ষ্মীর করুণাকিরীট-বিভূষিত হইয়া অদ্বিতীয় ধনকুবেররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যাঁহাদের ঐশ্বর্য্যপ্রবাহ দ্বিতীয় জাহ্নবীধারার ন্যায় আসমুদ্র হিমাচলতল পরিপ্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল, তাঁহাদের কথা যে লোকমুখে প্রবাদকাহিনীর ন্যায় সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি?

এই গৌরবগীতি ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশ দেশান্তরেও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সুদূর ইউরোপ খণ্ডেও জগৎ শেঠের ঐশ্বর্য্যকাহিনী শনৈঃ শনৈঃ প্রবেশলাভ করিয়াছিল। এখন আর সে দিন নাই। এখন

রথচাইল্ডের কল্যাণে আধুনিক ইংরাজ স্ফীতবক্ষে অযুত-লৌহ-বর্ম্মে ভারত-ভূমিকে শৃঙ্খলিত করিয়া ফেলিযাছেন; জাহ্নবী, যমুনা, নর্ম্মদা, কাবেরী, ব্রহ্মপুত্র। বন্যাতাড়িত জলপ্রবাহের ন্যায় খরবেগে ইংরাজ বণিকের ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার সুদূরে—শ্বেতদ্বীপে বহন করিবার জন্যই প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু ইংরাজ বণিকের মস্তকে সৌভাগ্যলক্ষ্মীর শুভাশীর্ব্বাদ্ নিপতিত হইবার পূর্ব্বে শেঠ-বংশের ঐশ্বর্য্য-কাহিনী সমস্ত ইউরোপ খণ্ডকে চমকিত করিয়া তুলিয়াছিল। এত ঐশ্বর্য্যের কথা অনেকে কল্পনায় ধারণা করিতে না পারিয়া, অনেক সময়ে রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমির সকল কাহিনীই আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক বলিয়া অনুমান করিতে বাধ্য হইতেন!

সেকালের সমগ্র পরিজ্ঞাত প্রদেশের মধ্যে জগৎ শেঠের ন্যায় আর কেহ ধনশালী ছিলেন কিনা সন্দেহ। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ভারতবর্ষের মোগল বাদশাহগণ মুরশিদাবাদের শেঠদিগকে 'জগৎ শেঠ' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। যাঁহাদিগের ধনভাণ্ডারের সহিত বিপুল ভারতসাম্রাজ্যের প্রায় সমস্ত কার্য্যেরই কিছু না কিছু সংশ্রব থাকার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, 'জগৎ শেঠ' উপাধি তাঁহাদের পক্ষে অধিকতর গৌরবের বিষয় নহে। উহা তাঁহাদের পক্ষে একরূপ "ভূতার্থ ব্যাহৃতি" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ধনসম্পত্তিতে তাঁহারা যেরূপ শ্রেষ্ঠ ছিলেন, সেইরূপ ভারতসাম্রাজ্যে তাঁহাদের ক্ষমতাও অপরিসীম হইয়া উঠিয়াছিল। অর্থ ও ক্ষমতাবলে জগৎশেঠগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে এক অভাবনীয় কাণ্ডের অবতারণা করিয়া তুলেন। বাদশাহ নবাব হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা জমিদার পর্য্যন্ত তাঁহাদের অজস্র অর্থ বৃষ্টিতে অভিষিক্ত হইয়া উঠিতেন! বৈদেশিক ইংরাজ ফরাসীগণ তাঁহাদের বিনা অনুগ্রহে বাণিজ্য কার্য্য পরিচালনে সক্ষম হইতেন না। মুরশিদাবাদের নবাবগণ সর্ব্বদাই তাঁহাদের মুখাপেক্ষা করিতেন। কি বাণিজ্য, কি রাজস্ব সমস্ত বিষয়েই সেই ধনকুবেরগণের সাহায্য ব্যতীত কদাচ সম্পন্ন হইত না। অষ্টাদশ শতাব্দীর যাবতীয় রাজনৈতিক কার্য্য তাঁহাদের পরামর্শের উপর নির্ভর করিত। তাঁহাদের কথায় নবাবের নবাবী প্রত্যর্পিত হইয়াছে, এবং তাঁহাদের ইঙ্গিত মাত্রেই নবাবের নবাবী গিয়াছে। তাঁহাদের কটাক্ষে তৎ-কালীন রাষ্ট্রবিপ্লব সমূহ সংঘটিত হইয়াছে। মুরশিদাবাদের দুইটী বিশাল

সমরক্ষেত্র গিরিয়ায় ও পলাশীতে যে রণক্রীড়ার অভিনয় হইয়াছিল, জগৎশেঠগণ তাহার মূলে না থাকিলে তাহা কদাচ সম্পন্ন হইতে পারিত না। জগৎ শেঠের ক্রোধাগ্নিতেই মুর্শিদ কুলী খাঁর দৌহিত্র ও মুরশিদাবাদের তৃতীয় নবাব সরফরাজ খাঁ পতঙ্গবৎ ভস্মীভূত হইয়া যান, এবং তাঁহাদের সাহায্যেই গিরিয়ার সমরক্ষেত্রে বিজয়নিশান উড্ডীন করিয়া আলিবর্দ্দি খাঁ মুরশিদাবাদের সিংহাসন লাভ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর যে ভয়াবহ বিপ্লবে প্লাবিত হইয়া হতভাগা সিরাজ সামান্য তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল, এবং মীরজাফর ও মীরকাসীম ঊর্দ্ধক্ষিপ্ত ও অধঃক্ষিপ্ত হইয়া কেহ বা অনন্ত নিদ্রায় কেহ বা ফকিরী অবলম্বনে নিষ্কৃতি লাভ করেন, জগৎশেঠগণের ক্রোধঝটিকা সেই তুফান সৃজনের মূল। দুঃখের বিষয়, সেই ভীষণ তুফানে অবশেষে তাঁহাদিগকেও অনন্তগর্ভে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। যে ব্রিটিশ রাজরাজেশ্বরীর শান্তিধারায় আসমুদ্র হিমালয় স্নিগ্ধ হইতেছে, জগৎশেঠগণের সাহায্যেই তাহার প্রতিষ্ঠা। একজন ইংরাজ বলিয়াছেন যে 'হিন্দু মহাজনের অর্থ ও ইংরাজ সেনাপতির তরবারি, বাঙ্গলায় মুসলমান রাজত্বের বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে।' * কেবল অর্থ বলিয়া নহে, এজন্য তাঁহাদিগকে আত্মবিসর্জ্জনও দিতে হইয়াছে। যে ব্রিটিশ রাজলক্ষ্মীর কিরীটপ্রভায় সমস্ত ভারতবর্ষ আলোকিত হইতেছে, মহাপ্রাণ জগৎশেঠগণের অর্থ বৃষ্টিতে ও প্রাণ পাতে তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। আমরা ইংলণ্ডবাসীদিগকে একবার সেই পুরাণ কথাটা স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

বাস্তবিক জগৎশেঠগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার যাবতীয় রাজনৈতিক ব্যাপারের মূল ছিলেন। রাজস্ব বিষয়ে জমিদারদিগের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ ছিল, বাণিজ্য বিষয়ে তাঁহারাই তত্ত্বাবধান করিতেন, এতদ্ভিন্ন শাসনকার্য্য তাঁহাদের পরামর্শ ব্যতীত কদাচ সম্পন্ন হইত না। রাজ্যের মুদ্রা তাঁহাদের মতানুসারেই মুদ্রিত হইত। শেঠদিগের ক্ষমতা ও অর্থের তুলনা ছিল না। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁহাদের গদি সংস্থাপিত থাকায় বাদশাহ নবাব হইতে রাজা মহারাজা ও বণিক মহাজনগণ সেই সমস্ত গদি হইতে প্রয়োজনানুসারে অর্থ

* "The rupees of the Hindu Banker, equally with the sword of the English colonel contributed to the overthrow of the Mahomadan power in Bengal." (Quoted by Hunter.)

গ্রহণ করিতেন। প্রতিনিয়ত কোটি কোটি অর্থে তাঁহাদের কোষাগার পরিপূর্ণ হইত। তৎকালে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, শেঠেরা ইচ্ছা করিলে সুতীর নিকট ভাগীরথীর মোহানা অনায়াসে অর্থ দিয়া বাঁধাইয়া দিতে পারিতেন। হিন্দুস্থান অথবা দাক্ষিণাত্যে তাঁহাদের সমান অর্থশালী মহাজন তৎকালে দৃষ্ট হইত না। ভারতবর্ষে এমন কোন মহাজন বা বণিক ছিল না, শেঠদিগের সহিত যাহাদের তুলনা হইতে পারে। বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত গদিয়ানই তাঁহাদের প্রতিনিধি অথবা স্ববংশীয় ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁহাদের গদি লুণ্ঠন করিয়া কিছুই করিতে পারে নাই। মুতাক্ষরীণকার বলেন যে, সেই লুণ্ঠিত অর্থ তাঁহাদের নিকট দুই গুচ্ছ তৃণের সমান ছিল। সেই লুণ্ঠ-নের পরও তাঁহারা প্রতিবারে দরবারে কোটি টাকার দর্শনী প্রদান করিতেন। এক কথায়, তাঁহাদের এরূপ অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল যে, তাহার বিবরণ প্রদান করিতে হইলে, অতিরঞ্জনের আভাস প্রদান অথবা কাহিনীর ন্যায় বর্ণনা না করিয়া থাকা যায় না। তাঁহাদের অধীনস্থ সহস্র সহস্র লোক অর্থোপার্জ্জন করিয়া অগাধ ভূসম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া গিয়াছে।* দুঃখের বিষয় সেই জগৎশেঠদিগের আর সে গৌরব নাই। তাঁহাদিগের বিশাল ভবন এক্ষণে ভগ্নস্তূপে পরিণত। জগৎশেঠদিগের বংশধর জীবিকানির্ব্বাহের জন্য বৃত্তির আশায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দ্বারস্থ হইয়া প্রত্যাখ্যাত, যাহাদিগের অর্থোপহারে ও আত্মবলিতে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, ভিক্ষা ভাণ্ড হস্তে উপস্থিত তাঁহাদের বংশধরকে একমুষ্টি ভিক্ষা না দেওয়া ন্যায়পর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কদাচ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। এবিষয়ে তাঁহাদিগের কি একবার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত নহে?

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

---

* "Their riches were so great, that no such bankers were ever seen in Hindustan or Deccan; nor was there any banker or merchant, that could stand a comparison with them, all over India. It is even certain, that all the bankers of their time in Bengal, were either their factors, or some of their family. Their wealth may be quessed by this only fact. In the first invasion of the Marhattas, and when Moorshoodabad was not yet surrounded by walls, Mir Habib, with a party of their best horses, having

# ভাষা
# ও
# আদিরস।

ভাষা দুই প্রকার, ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক। মনুষ্যের ভাষা বর্ণাত্মক ও অপর জীবগণের ভাষা ধ্বন্যাত্মক। ধ্বন্যাত্মক ভাষাই বর্ণাত্মকের পূর্ব্বপুরুষ; এবং ধ্বন্যাত্মক ভাষা প্রথমে আদিরস হইতে উৎপন্ন। সুতরাং আদিরসই সর্ব্ব-প্রকার ভাষা-উৎপত্তির মূল কারণ।

প্রাণীগণকে ক্রমে এই কয়েক শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়:—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১। কীট | | ৪। সরিস্পৃপ | | |
| ২। পতঙ্গ | } | ৫। জন্তু | } | বিশেষ অর্থে এই শব্দ |
| পক্ষী | | পশু | | ব্যবহৃত হইল। |
| ৩। পক্ষী | | ৬। বানর | } | সাধারণ শ্রেণী বাচক অর্থে |
| | | নর | | এই শব্দ ব্যবহৃত হইল। |

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে কীট ও পতঙ্গ শ্রেণী ভাষাহীন, অর্থাৎ কথন কোন প্রকার ধ্বনি উচ্চারণ করে না। মশকাদির রব পক্ষ সঞ্চালনজনিত, উহা মুখনিঃসৃত ধ্বনি নহে। জীবরাজ্যমধ্যে পক্ষী শ্রেণীতেই সর্ব্ব প্রথমে ভাষার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ক্রমে সরিস্পৃপ ও পশু শ্রেণীতে এবং সর্ব্বশেষে

---

found means, to fall upon that city, before Aly-werdy qhan could come up, carried from Jagad-Seat's house two crores of rupees, in Arcot coin only; and this prodigious sum did not affect the two brothers, more than if it had been two trusses of strow. They continued to give afterwards to government, as they had done before, bill of exchange, called dursunnies, of one crore at a time by which words is meant, a draft, which the acceptor is to pay at sight, without any sort of excuse In short their wealth was such that there is no mentioning it, without seeming to exaggerate, and to deal in extravagant fables Thousands of their agents and factors, have acquired such fortunes in their service, as have enabled them to purchase large tracts of land, and other astonishing possession.' (Seir Mutuqherin Trans. Vol II pp 226-227.)

নরগণ মধ্যে ভাষার সম্পূর্ণ বিকাশ। উল্লিখিত তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণী মধ্যে স্বাভাবিক ভাষা ধ্বন্যাত্মক; কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীস্থ জীবগণকে অর্থাৎ পক্ষী-দিগকে বর্ণাত্মক ভাষাও শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

ভাষার মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে প্রথমতঃ উহা কোন্ সময়ে উচ্চারিত হয়, তাহা দেখা আবশ্যক; এবং কি কারণেই বা উহা প্রথমতঃ নিঃসৃত হয়, তাহাও পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। মনুষ্যেতর প্রাণিগণ মধ্যে অনেকেরই নির্দ্দিষ্ট রমণ কাল আছে। ঐ কালকে আমরা এই প্রবন্ধে ঋতুকাল বলিব। পক্ষী, সরিসৃপ ও পশুগণের মধ্যে ঋতুকালেই প্রধানতঃ ভাষার স্ফূর্ত্তি হয়। ঐ কাল সমাগত হইলে ঐ ঐ শ্রেণীস্থ পুংজাতীয় প্রাণীগণ সহসা মুখর হইয়া উঠে। যে সমস্ত পক্ষী অন্য সময়ে নীরব, তাহারাও ঋতুকালে বিবিধ অঙ্গভঙ্গিযুক্ত মধুর নিনাদে বনরাজি প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলে। পক্ষিণীর সমক্ষে নিজ নিজ সঙ্গীত বিষয়ক পারদর্শীতা দেখাইবার জন্যই যেন ঋতুকাল উপস্থিত হইলে প্রত্যেক পক্ষী সচেষ্ট হইয়া থাকে। *

সরিসৃপগণও ঋতুকালেই মুখর। কূর্ম্ম জাতীয় জীব প্রায়শঃ নীরব, কিন্তু কোন কোন কূর্ম্ম ঋতুকালে পরস্পর পৃষ্ঠসংঘর্ষ সময়ে এরূপ বিকট নাদ উত্থিত করে, যে তাহা বহুদূর হইতে শুনা যায়। কোন কোন সচরাচর নীরব পক্ষী ঋতুকালে বন্দুকের গুলির ন্যায় ধ্বনি করিয়া থাকে। গবাদি পঞ্চম শ্রেণীস্থ জীবগণ-মধ্যে অনেকে ঋতুকালে অত্যন্ত মুখর হয়, ও উচ্চ ধ্বনি করে। সেই ধ্বনি শ্রবণ মাত্রেই ঐ সকল পশুর রক্ষকগণ সাধারণ ভাষায় "ডাক আসিয়াছে" বলে। পরিশেষে, নরগণের মধ্যেও যৌবন-প্রারম্ভের বিকৃত স্বর অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। বালকগণ যৌবনে পদার্পণ করিবা মাত্রই বাল্যস্বর আর থাকে না। তখন অন্যরূপ বিকৃত স্বর হয়, তাহাকে অনেকে "বয়সধরাস্বর"

---

* বোধ হয় এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কবিতায় পরিস্ফুট করিবার জন্য প্রবন্ধলেখক স্বরচিত "ত্রিদিব বিজয়" কাব্যে লিখিয়াছেন—

"ঘোরনাদে চক্রাকারে প্রেমের নর্ত্তনে
নাচিছে প্রণয়ী-পক্ষী পক্ষ বিস্তারিয়া,
মাতাইয়া পক্ষিণীরে অক্ষিমদোন্মাদে।"

উ, স।

বলে। সময়বিশেষে নরনারীগণের কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়। ভারতচন্দ্র ঐ স্বরকে "কোকিল কুজনের" সহিত তুলনা দিয়াছেন। এই সকল বিবেচনা করিলেই নীরব কণ্ঠ হইতে ধ্বনি নিস্মৃত হইবার মূল কারণ যে প্রবল কাম-বৃত্তি তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে। নিম্ন শ্রেণীস্থ জীবগণের অন্যবিধ মনোবৃত্তি থাকুক আর নাই থাকুক উৎকট কামবৃত্তি অবশ্যই আছে। সেই বৃত্তিই আদি বৃত্তি। সেইভাবে তাহাদিগের মন আন্দোলিত হইলেই আর তাহারা নীরব থাকিতে পারে না, তখনই ধ্বন্যাত্মক ভাষার সৃষ্টি। ভাষা, চিত্তের ভাব হইতে সঞ্জাত। এবং নিম্ন জীবগণের চিত্তে কেবল কাম ভাবই প্রবল; সুতরাং ঐ আদিভাবই যে ভাষার প্রবর্ত্তক, ইহা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই প্রতিপন্ন হয়। নরগণ বর্ণাত্মক ভাষার এতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদিগের ভাষাতেও ধ্বন্যাত্মক অব্যক্ত শব্দ এখনও প্রচুর পরিমানে আছে।

ভাষা লইয়াই যদি মনুষ্যের মনুষ্যত্ব ও প্রধান গৌরবের স্থল হয়, তবে মনুষ্য ঐ ভাষার মূল প্রবর্ত্তক আদিরসের নিকট তজ্জন্য বিশেষ প্রকারে ঋণী। এবং বোধ হয় এই জন্যই ইহার নাম আদিরস হইয়াছে।

শ্রীশশধর রায়।

# রাজা ও প্রজা।

বাগানের শাক, কলা মূলো আক, বেচে আসি গিয়ে হাটে;
জমি করি আধি, ঠিকে ঘর বাঁধি; এইরূপে দিন কাটে।
খণ্ডকাঠ নাই, পেটে ছুটো খাই, ধারিনে ক আধ লাটী;
সবে মনে করে, সুখে আছে হ'রে, ধরিয়া বাপের মাটী।
আমি ভাবি হায়, বৃথা দিন যায়, কি হবে বাঁধিয়ে টাকা;
না করিলে বিয়া, না পূরিবে হিয়া, সংসারে সবি ফাঁকা।
দেখে শুনে বুঝে, গাঁয়ে গাঁয়ে খুঁজে, করিলাম এক বিয়ে;
নথ, বাজু, বালা, গোট, হেলে মালা, তিরিশ নগদ দিয়ে।
প্রাণপণে খাটি, হয়ে গেনু কাঠি, বুদ্ধির ঝকমারি;
বউ ঘরে আনি, সবি টানাটানি, কুলাইতে নাহি পারি।

ভার হলো চলা, যেবার অফলা হইল সকল জমি,
রাজা ন্যায়পর, বাড়াইল কর, সেবার নাদিযে কমি।
দিবস খাটিলে, মুজুরি না-মিলে, দুজনার উপযুক্ত,
পেট নাহি ভরে, এক বেলা ক'রে, খাই দোঁহে শাক শুক্‌তো।
আমি বলি "ওগো, পাপ ভোগ ভোগো, ধান হ'ল না যে ক্ষেতে,
হায় রে কপাল, সকাল বিকাল, না পাও দুমুঠি খেতে।"
সজল নয়নে, চাহি মোরপানে, যাতনা হৃদয়ে বাঁধি;
কহিল নীরবে, "সবি মোর স'বে, তোমারি লাগিয়া কাঁদি।
প্রেমেতে মিষ্ট, ক্ষুধায় ক্লিষ্ট, পূর্ণ-যুবতী নারী,
আহা হা সে মুখ — ফেটে যায় বুক,— স্মরিতে যে নাহি পারি।

---

রাজা বলে "হ'রে, ভাত বিনে মরে, বউটা কি করে ব'সে?
মোরে না সুধায়, মিছে দুখ পায, শুধু বুঝিবার দোষে।
বল বউটাকে, ব'সে কেন থাকে আমার এখানে থাক্,
কাজ কাম ক'রে, থালা ভ'রে ভ'রে, ভাত নিয়ে বাড়ী যাক্।"
আমি বলি ভাই, কাজে কাজ নাই, থাক্ বউ ঘরে ব'সে,
রয়েছি যে হালে, ধনীর কপালে কি হবে কপাল ঘ'সে।
সে তো বোঝে নাকো, বলে "তুমি থাকো, আমিও দুদিন দেখি,
তোমারে খাটাব, আমি ব'সে খাব, লোকে শুনে বলিবে কি?"
আমি বলি "না, না, আছে মোর মানা, খাটা কি তোমারে সাজে?"
না শুনি নিষেধ, করি মহা জেদ, লাগিল সে গিয়া কাজে।

---

যাবে রাজবাড়ী, লাল ডুরে সাড়ী,— পা'ড তার কাল ফিতে—
দেরি নাহি সহে, পরে আগ্রহে, সিন্দূর পরে সীঁথে।
আমি বলি "তবে, সাবধানে রবে, চাহিও না কারো দিকে,
রাজা মহাশয়, অতি নীচাশয়, টানে যত বৌ ঝি কে।"
হেসে বলিল সে, "থাক তুমি ব'সে, আমারে ছুঁইবে কেটা,
মোরে কিছু বলে, নাহি ধরাতলে, এমন বাপের বেটা।"
দুই ধারে আম, তাল, কুল, জাম, মাঝ দিয়ে ছোট পথ,
বন দেবী হেন, চলে গেল যেন, কাঙ্গালের মনোরথ।
বিধি তুমি আছ? স্বর্গে বিরাজ? দুঃখীর কেহ নও?
বিচার করিয়া, ধুইয়া মুছিয়া, নিলে?— স্মৃতি টুকু লও।

---

হয়ে এল রাতি, দিয়ে সাঁজ বাতি, ব'সে রহিলাম পথে;
যে গেল সে গেল, ফিরে নাহি এল, রাজদরবার হ'তে।
পাখী পাখা নাড়ে, বুঝি এই বারে— মনে হয়— আসিতেছে;
"সেকি মোর কেনা? আর আসিবেনা,"— শেষে ভাবি, "চলি গেছে।"
তবু এ পরাণে, প্রবোধ না মানে, রহিলাম রাত জাগি:

শঙ্কিত হৃদে, যন্ত্রণা বিঁধে, অধীর তাহারি লাগি।
প্রত্যুষে উঠি, তাড়াতাড়ি ছুটি, চলিলাম রাজবাড়ী,
দেখিনু ফটকে, ফিরিছে চটকে, গাল পাটা চাপ দাড়ী।
কেঁদে বলি তায়, "পাঁড়েজি মশায়, কেন মোরে দাও দাগা ?"
বলে দ্বারবান্, "আরে বাপ জান্, জল্দ তেরা নাহি যা গা।"

শিরে কর হানি, চুল ছিঁড়ি টানি, লুঠে পড়ি তার পায়।
"দোহাই ধর্ম্ম, এমন কর্ম্ম, বাজারে না শোভা পায়।"
রাজা বলে "কেঁও, অভি হাঁকা দেও," দ্বারবান ধরে চুলে
ফেলিয়া দুয়ারে, দুই হাতে মারে, পায়ের নাগরা খু'লে।
হাত পায়ে গিঁঠে, পেটে বুকে পিঠে, কোথা মারে দিশা নাই,
শোণিত ছুটিল, গেষান টুটিল, ভূঁমে গড়াগড়ি যাই।
হায়রে জগতে, ধনী ধন-মদে, কাঙ্গালের বধে প্রাণ,
দুষ্ট রাজার, কে করে বিচার, বিনা সেই ভগবান্।
সাত দিন জ্বরে, প'ড়ে ছিনু ঘরে, প্রলাপ বকেছি কত!
প্রতিবেশি দলে, দেখে যায় চ'লে, সবাই মর্ম্মাহত।

পুণ্য কচির, শূন্য কুটীর, নির্ব্বাসিতের বাটী;
শৈশব স্মৃতি,— যৌবন-গীতি,— মিশ্রিত যার মাটী।
ছবি টুকু তার, মুছিয়াছি, আর কিছু আছে অবশেষ:
কত কাল পরে, মনে নাহি পড়ে, ফিরিয়াছিলাম দেশ।
বাস্তু বাগান, সকলি শ্মশান, কত তার গাছ পালা,
সুধু এক ধারে, জঙ্গল পারে, ছোট এক খানি চালা।
কাননচারিণী, এক পাগলিনী, দুই মাস হ'তে আছে,
আমি চিনিলাম, হায় ভগবান্, দাঁড়ালাম গিয়ে কাছে।
আমারে দেখিয়া, উঠিল হাসিয়া, বলিল "ও তুমি কে গো ?
তোমার জ্বালায় ঝি বউ পলায়, কুলনাশা রাজা এ' গো।"

বেগে বারিধার, বহিল আমার, নয়নে না কিছু দেখি,
প্রভু, ভগবান্, কেন আসিলাম, এসে দেখিলাম, একি।
পাগলিনী হেসে, হাতে ধরে এসে, বলে, "কোথা দেখিয়াছি;
একজন মোরে, ভাল বাসিতরে, তারে ভাল বাসিয়াছি।
কে তুমি পথিক্, বল দেখি ঠিক, তাহারে কি তুমি জান ?
সে যে মোর স্বামী, তারি তরে আমি, বসে আছি,— ডেকে আন।"
ছুটে যায় আসে, কাঁদে আর হাসে, বলে "কি! আবার চুরী ?
যাও সরে যাও,— তফাৎ দাঁড়াও, এই দেখ সেই ছুরী।"
নিমেষে ছুটিয়া, গেল পলাইয়া, আর ত দেখিনি তারে;
এ পারে ইহার, হ'লনা বিচার, হয় যদি পরপারে।

---

শ্রীরজনীকান্ত সেন।

# ছোট কথা।

সঙ্গ-দোষ প্রবল দোষ। সঙ্গ দোষে কত ভাল মানুষ মাটি হইয়া যাইতেছে॥ সঙ্গগুণে যাহারা মানুষ হইতে পারিত,— নিজে উন্নত হইয়া দশজনকে উন্নত করিতে পারিত,— তাহারা যখন সঙ্গদোষে বিপথগামী হয়, তখন হৃদয়ের মধ্যে স্বভাবতঃই কেমন একটা পরিম্লান সকাতর পরিতাপের বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। স্বতঃই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, হায়! তুমি— তুমি— তুমি এমন হইলে কেন? তোমার সম্বন্ধে, আমার সম্বন্ধে, তোমার আমার বন্ধুবান্ধবের সম্বন্ধে, কত শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুজনে কতবার না এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন? কিন্তু আমরা কি একবারও আত্মসংশোধনে যত্নশীল হই?

আত্মসংশোধনের সময় অসময় নাই;— মানুষ ইচ্ছা করিলেই একদিনে বহুদিনের পুঞ্জীকৃত পাপ তাপ পরিহার করিতে পারে। জগতে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অভাব কেবল সাধু দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবার প্রবৃত্তি।

প্রবৃত্তি থাকিলেও বুঝি সকল সময় সুযোগ ঘটিয়া উঠে না! দশজনে ধরিয়া বাঁধিয়া পাপপঙ্কে ডুবাইয়া রাখিতে চায়। সঙ্গ-দোষে এমন দৃঢ়বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে যে সঙ্গীদিগের খাতিরে কত অকথ্য কহিতে হয়, কত অকার্য্য করিতে হয়, তথাপি আত্মসংশোধন করিবার অবসর হয় না।

মনে হয় যাহা বলিয়াছি তাহা আর কোন্ মুখে প্রত্যাখ্যান করিব, যাহা করিয়াছি তাহা আর কোন্ মুখে প্রত্যাহার করিব? এই সংকোচ, এই লজ্জা, এই ইতস্ততঃ— এই কাপুরুষত্বই আত্মসংশোধনের প্রধান অন্তরায়। যিনি পুরুষকারপ্রভাবে একবার এই "হত ইতিগজের" হাত এড়াইতে পারেন, তাঁহার পক্ষে কুসঙ্গ পরিবর্জ্জন করিয়া আত্মসংশোধন করা কিছুমাত্র কঠিন হয় না।

কি করিতে আসিয়াছিলাম, কি করিয়া দিন কাটাইতেছি,—এই কথা দিনান্তে একবারও মনে পড়ে ত বহুভাগ্য। কারণ ইহাই আত্মানুসন্ধানের মূল; আত্মানুসন্ধানই আত্মদোষাবলোকনের অদ্বিতীয় উপায়, এবং আত্মদোষাবলোকন আত্মসংশোধনের সর্ব্ব প্রধান সোপান।

আপন দোষ আপনি দেখিয়া আত্মবলে তাহা পরিহার করিবার সংকল্প না করিলে কেহ ধরিয়া বাঁধিয়া কাহারও হরিভক্তি জন্মাইয়া দিতে পারে না। যাহাদের লালন পালনের দিন চলিয়া গিয়াছে, তাড়নার দিনও যায় যায় হইয়াছে, যাহারা কৈশোর ছাড়াইয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়া ধরাকে সরা দেখিতেছে, তাহাদিগকে মিত্রবৎ মিষ্টবাক্যে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া দেখ। মস্তিষ্ক শীতল হয় ত কালে তাহাতেই শুভফল সমুৎপন্ন হইবে। নচেৎ আজিও যাহা, কালিও তাহা,— যতই দুঃখ কর, যে কুসঙ্গে পড়িয়াছে সে কুরঙ্গে মাতিয়া কুকীর্ত্তিতেই ডুবিয়া রহিবে'

বিষণ্ণ হইও না। অসহিষ্ণু হইও না। পরাপবাদে শতকণ্ঠ না হইয়া আত্মোন্নতির জন্য একাগ্রচিত্তে ভগবানের প্রসাদ ভিক্ষা কর। যাহা লাভ করিয়াছ তাহার সদ্ব্যবহার কর, যাহা লাভ কর নাই তাহার জন্য সাধনা অবলম্বন কর, যাহা এখন বুঝিতেছ না, তাহা অবশ্যই যথাকালে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

---

# বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি।

( রাজসাহী )

---

জাতীয় ইতিহাস যেরূপ জাতীয় উন্নতির প্রধান সোপান, জাতীয় অভাব ও দুঃখের অভিব্যক্তির জন্য এবং জাতীয় আশা ও আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্য যে যে উপায় অবলম্বিত হয় তাহার পূর্ণ বিবরণও সেইরূপ জাতীয় ইতিহাসের প্রধান উপাদান। এই জন্যই বাঙ্গালী জাতির উন্নতিকল্পে বাঙ্গালীর সমবেত চেষ্টায় বঙ্গের স্থানে স্থানে বৎসরে বৎসরে যে সকল প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হইয়া থাকে তাহার পূর্ণ বিবরণ রক্ষিত হওয়া আবশ্যক। বঙ্গের রাজনীতি ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাদেশিক সমিতিরূপ যে বীজ নিক্ষিপ্ত হইতেছে, কে

বলিতে পারে কাল্লে ইহার শক্তি ও প্রভাব জগতের শিক্ষা ও আলোচনার বিষয় না হইবে? অবনত জাতির উত্থান-চেষ্টার প্রত্যেক সোপান, প্রত্যেক স্তর, প্রত্যেক ক্রম, সফল হউক বা নিষ্ফল হউক মানুষের শিক্ষা ও আলোচনার উপযুক্ত বিষয় এবং ইতিহাসে স্থান পাইবার অধিকারী"। ভবিষ্যতে কোন সুদক্ষ হস্ত এ কার্য্যভার গ্রহণ করিলে আমাদের প্রবন্ধ হইতে অতি সামান্য মাত্রও সাহায্য পাইতে পারিবেন আশায় আমরা রাজসাহী কনফারেন্সের উদ্দেশ্য ও বিবরণ যথা সাধ্য বিবৃত করিলাম।

আমাদের দেশের অবস্থা কি ছিল আর কি হইয়াছে, সোণার ভারত এখন পথের ভিখারী সাজিয়াছে। ভারতের সর্ব্বত্র কি ভীষণ দারিদ্র্য ও কি ভয়ানক অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। ভারতের কৃষক ও শ্রমজীবিগণ সমস্ত দিন প্রাণ-পণে খাটিয়াও নিজ নিজ উদরান্ন সংস্থান করিতে পারিতেছে না। একে দেশের এই শোচনীয় অবস্থা, তাহার উপর আবার ভারতবাসীকে নানাপ্রকারের কর-ভার বহন করিতে হইতেছে। কিন্তু ঐ কর আমাদের উপকারের জন্য ব্যয়িত হইতেছে কিনা তাহাও আলোচনা করিবার রীতিমত অধিকার আমাদের নাই। শুধু কি ইহাই, আমরা আরও কত প্রকারের অত্যাচার ও অবিচার সহ্য করিতেছি— আমরা মোকর্দ্দমার ব্যয় চালাইতে একরূপ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া তবে বিচারালয়ে বিচার পাইতেছি, নানাপ্রকার অপমান ও অসুবিধা ভোগ করিয়া তবে রেল ও ষ্টীমারে যাতায়াত করিতেছি, পুলিশের অত্যাচারে নানা-রূপে উৎপীড়িত হইতেছি এবং আশানুরূপ উচ্চ রাজপদ হইতে বঞ্চিত রহি-যাছি। আমরা ভারতবাসী উদরান্নের জন্য হাহাকার করিতেছি, আর আমা-দের দেশের বহুল অর্থ বিলাতে চলিয়া যাইতেছে— নিজের দেশেও আমাদের কোন বিষয়েই হাত নাই, কোন বিষয়েই অধিকার নাই। আমরা চিরকালই কি এই দুঃখ কষ্ট ভোগ করিব, না ইহা হইতে মুক্ত হইবার কোন উপায় আছে? অলস ও নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে কি আমাদের এ দুঃখ কষ্ট ঘুঁচিবে? কোন দেশে কোন কালে চেষ্টাভিন্ন উন্নতি হয় নাই, সাধনাভিন্ন সিদ্ধি হয় নাই; অতএব দুর্গতি দূর করিতে হইলে বিশেষ চেষ্টার আবশ্যক।

ইংরাজ এখন আমাদের রাজা, ইংরাজেরা বিদেশীয়, তাঁহারা আমাদের সমস্ত দুঃখের কথা জানিতে পান না, সকল অভাবের বিষয় বুঝিতে পারেন না

আবার অনেক সময় আমাদের দুঃখের ও অভাবের কথা জানিতে ও বুঝিতে পারিয়াও আমাদিগকে চেষ্টাশূন্য ও নীরব দেখিয়া তাঁহারা আমাদের অভাব মোচনের জন্য যত্নশীল হন না। এ দেশে ও বিলাতে এমন অনেক সদাশয় ইংরাজ আছেন যাঁহারা আমাদের দেশের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিলে আমাদের উন্নতির জন্য প্রাণপণে খাটিতে পারেন, এই জন্যই সকলে একত্র হইয়া দেশে দুঃখ ও দারিদ্রের কথা, দেশের অভাব ও আকাঙ্ক্ষার কথা আমাদের রাজাকে জানান আবশ্যক। আমরা ত্রিশ কোটী ভারতবাসী সমবেত হইয়া যদি রাজার নিকট আমাদের দুঃখকাহিনী জানাই তাহা হইলে রাজা কখনই এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত, নীরব ও উদাসীন থাকিতে পারিবেন না—আজ হউক, কালি হউক, বা দুই দিন পরে হউক আমাদের দুঃখ দূর করিবার বিধান হইবেই হইবে। এই জন্যই সকলে মিলিয়া ক্রমাগত অক্লান্তভাবে আমাদের দুঃখ ও অভাবের আলোচনা করা আবশ্যক— এবং এই জনাই জাতীয় মহাসভার সৃষ্টি।

কিন্তু জাতীয় মহাসভায় সকল বিষয়ের আলোচনা সম্ভবে না। যে সমস্ত দুঃখ ও অভাব ভারতের সর্ব্বত্রই সমানভাবে রহিয়াছে, জাতীয় মহাসভায় কেবল সেই সমস্ত বিষয়েরই আলোচনা ও আন্দোলন হয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন দুঃখ ও ভিন্ন ভিন্ন অভাব আছে এবং তাহা দূর করিবার উপায়ও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অবস্থানুসারে বিভিন্ন রকমের রহিয়াছে, এই জন্যই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যে যে স্বতন্ত্র দুঃখ ও অভাব আছে তাহার যথাযোগ্য আলোচনা করিবার সময় বা সুবিধা জাতীয় মহাসভায় হয় না এবং হইতে পারেও না। এই জন্যই প্রাদেশিক সমিতির আবশ্যক। প্রত্যেক প্রদেশে যে যে স্বতন্ত্র দুঃখ ও কষ্ট আছে প্রাদেশিক সমিতিতে কেবল মাত্র তাহারই আলোচনা হয়। মূল নদী যেরূপ তাহার ছোট ছোট শাখা প্রশাখার সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জল বিতরণ করিয়া দেশকে উর্ব্বর করিয়া তুলে, জাতীয় মহাসভাও সেইরূপ এই সকল প্রাদেশিক সমিতির সাহায্যে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন জাগাইয়া রাখে। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত শাখা সমিতি জাতীয় মহাসভার পুষ্টিসাধনের উপায় মাত্র। কেবলমাত্র রাজাকে জ্ঞাপন করিবার জন্যই সকলে একত্র হইয়া আমাদের দুঃখ কষ্টের বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক, তাহা নহে। আমরা সকলে সমবেত হইয়া আমাদের সমস্ত দুঃখ

কষ্টের বিষয় আলোচনা করিলে আমাদের কোন্ অভাবটী গুরুতর, কোন্‌টীর প্রতিবিধান জন্য সর্ব্বপ্রথমে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য এবং কিরূপ ভাবে চেষ্টা করিতে পারিলে সেই অভাবটী সত্বরে দূর হইবার সম্ভাবনা এ সমস্ত বিষয় নিজেও বিশেষরূপে বুঝিতে পারি, এবং রাজপুরুষগণকেও বিশেষরূপে বুঝাইতে পারি। নিজ নিজ প্রদেশে এ সব বিষয় যেরূপ বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইতে পারে মহাসভায় তাহা হইতে পারে না, এজন্যও প্রাদেশিক সমিতির আবশ্যক আর এক কথা এই যে জাতীয় মহাসভায় সকলেই যোগ দিবার সময় ও সুবিধা পান না, প্রত্যেক প্রদেশ হইতে অল্প মাত্র সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া মহাসভায় যান, প্রত্যেক প্রদেশে সভা হইলে তৎপ্রদেশীয় অধিক লোক ইহাতে যোগ দিতে পারেন, এবং এইরূপ রাজনৈতিক বিষয়ের ক্রমাগত আন্দোলন ও আলোচনা করিতে করিতে দেশীয় লোক ক্রমে স্বায়ত্বশাসনের উপযোগী শিক্ষা লাভ করিতে পারেন এই সকল নানা কারণে প্রাদেশিক সমিতির সৃষ্টি। তবেই দেখিতেছি প্রাদেশিক সমিতির মূল উদ্দেশ্য (১) রাজার নিকট আমাদের দুঃখের কথা আবেদন করা (২) আমাদের দুঃখ কিরূপে দূর হইতে পারে তাহার উপায় স্থির করা (৩) ক্রমাগত রাজনৈতিক আলোচনা জাগাইয়া রাখা (৪) দেশ মধ্যে স্বায়ত্ব শাসনের উপযোগী শিক্ষা বিস্তার এবং (৫) সকলে যাহাতে নিজ নিজ দুঃখ আলোচনায় যোগ দিতে পারেন তাহার সুবিধা করা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভবানীগোবিন্দ চৌধুরী।

---

# কবিতা ও গান।

## ধিক্।

না জানি কি চাহে প্রাণ—
দিন মাস বর্ষ ধরি
সেইরূপ ধ্যান করি
শেষ— ক্ষত বুক। হত মান।

জীবনের রক্ত বিন্দু
বিন্দু বিন্দু করি,
যার তরে ঢালিলাম
এত দিন ধরি।

যার তরে সুখ সাধ
জলাঞ্জলি দিয়া
দুরন্ত বৈরাগ্য-দণ্ডে
শাসিলাম হিয়া।

যার মুখ পানে চেয়ে
শত আশা ভুলে যাই;
যার কথা মনে হলে
মরিতেও ভয় নাই।

জীবনের দীর্ঘ পথে
অতিশয় ক্লান্ত দেহে
একটু বিশ্রাম আশে
যার প্রতি আছি চেয়ে।

সেই সে নয়ন দুটি,
সেই সে কোমল কর,
সেই বুকে সেই স্নেহ
সেই সে মধুর স্বর।

স্বপন প্রসূত বলে—
তাও যদি ভুলি হায়।
কবির কল্পনা আহা।
ধিক্ তায় ধিক্ তায়।

"প্রেমাশ্রু"-রচয়িতা।

---

## জুবিলী-সঙ্গীত।

রাগিণী ইমনকল্যাণ— তাল আড়াঠেকা।

জীব-জগত জননি,
ভারতের রাজরাণি,
আয়ুষ্মতী সুখে থাক
হে দীনপালিনি।
ষষ্টিতম বর্ষ ভ'বে
রাজদণ্ড দৃঢ় করে
ধরিয়াছ শ্বেত দ্বীপে
সাগরবাসিনি।
পালিছ জননী-সম,
সুতগণে নিশি দিন,
শান্তি, সুখ, প্রেম, ধর্ম্ম,
দিতেছ আপনি।
সুখে থাক সুখে রাখ,
বারেক নেহারি দেখ,
সুদূর জলধিপারে।
এ পুণ্য ভারত-ভূমি।
জীর্ণ, শীর্ণ, অন্ন হীন,
সোণার মুখ মলিন,
ঘিরিয়াছে অন্ধকারে
বিষাদ-রজনী।
নাহি বাস, নাহি বাস,
সতত হৃদয়ে ত্রাস,
সাহসে হেরে না কভু
আপন বদন খানি।
জুড়াও হৃদয় তার,
হাসি মুখে একবার,
প্রেমময় আঁখি তুলি,
নেহার আপনি॥
আঁধার হৃদয়ে ভাতি,
দেও তারে পুণ্যবতি,
স্মর পূর্ব্ব ইতিহাস
সত্যের রতন-খনি।
সুখে থাক, সুখে রাখ,
বারেক নেহারি দেখ,
কেমনে কঙ্কাল ভেদি
উঠিছে উল্লাস ধ্বনি।
প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা
জীবনের মহাআশা
একত্র জড়িত হ'য়ে,
কহিছে কি মহাবাণী।
সেই উপহার ল'য়ে,
জীব আয়ুষ্মতী হ'য়ে,
সন্তান সন্ততি সহ
হে দীনপালিনি।

শ্রীশশধর রায়।

# অজ্ঞেয়-বাদ।

( সমালোচনা। )

## তৃতীয় অধ্যায়—অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলিতে কি পরিমাণ জ্ঞান বুঝায়?

এই পরিদৃশ্যমান জগতের 'আদি-কারণ' আছে, ইহা মানিতে গেলেই প্রকারান্তরে ইহাও মানিয়া লইতে হইবে যে, এইরূপ মানিবার অবশ্যই যুক্তি-সঙ্গত কারণ আছে এবং তাহা মানবজ্ঞানের নিকট জ্ঞাত অথবা জ্ঞেয়; যদি বল যে তাহা আমরা জানি না অথবা জানিতেও পারিব না, তাহা হইলে আদৌ যে অনন্তশক্তিমান্ সর্ব্বব্যাপী 'আদি-কারণ' আছে তাহা কেমন করিয়া জানিতেছ? সুতরাং হার্বার্ট স্পেনসার জগতের আদি-কারণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, অন্ততঃ তাহার অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতে যতটুকু জ্ঞানের আবশ্যক তাহার অভাব নাই। ইহার সঙ্গে তাঁহার প্রচারিত 'অজ্ঞেয়বাদের' তুলনায় সমালোচনা করিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—'অজ্ঞেয় বলিতে কি পরিমাণ জ্ঞান বুঝিব?' যদি বল যে পরমেশ্বর সম্বন্ধে মানুষের পূর্ণজ্ঞান নাই এবং হইতে পারে না বলিয়া তাঁহাকে 'অজ্ঞেয়' বলিতে হয়, তাহা হইলে এক কথায় সকল বিবাদের মীমাংসা হইয়া যায়। অখণ্ড অনন্ত আদি কারণকে মানবজ্ঞানে সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া শেষ করিতে পারিলে তবে বলিব তিনি 'জ্ঞেয়'—যদি কেহ এইরূপ তর্ক করেন, জগতের আস্তিকগণ চিরদিনই তাঁহাকে সমস্বরে বলিবেন তাহা অসম্ভব। ভারতবর্ষের তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ সেইজন্য বলিতেন "যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্।"*

* সামবেদীয় তলবকার উপনিষৎ ১১ শ শ্রুতি।

অর্থাৎ যিনি বলেন আমি বুঝি নাই তিনিই বুঝিয়াছেন। যিনি বলেন বুঝিয়াছি তিনি কিছুই বুঝেন নাই। তত্ত্বজ্ঞানীরা তাঁহার অন্ত না পাইয়া বলেন তিনি অবিজ্ঞাত।' কিন্তু মূঢেরা তাঁহাকে না জানিয়াই বলে 'তিনি বিজ্ঞাত। যে যত জানে সে তত জানে না এবং যে যত জানে না সে তত জানে বলিয়া মনে করিয়া থাকে। সুতরাং পরমেশ্বর 'জ্ঞাত ও জ্ঞেয়' বলিতে গিয়া আস্তিকগণ কখন এমন সিদ্ধান্ত করিতে বলেন না যে তিনি সম্পূর্ণ জ্ঞাত ও জ্ঞেয় বস্তু। এক বিন্দু শিশির কিংবা রেণুপরিমাণ ধূলিকণা মানবজ্ঞানের সম্পূর্ণ 'জ্ঞাত' হইবে না, আর জগদতীত সর্ব্বকারণ-কারণ পরমেশ্বর সম্পূর্ণ রূপে জ্ঞাত হইবেন—ইহা কি মানব মনের উন্মত্ত কল্পনা নহে?

অধ্যাপক স্পেনসার নিজ প্রতিভাপূর্ণ অকাট্যযুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, মূলীভূত সত্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া না লইলে এই পরিবর্ত্তনময় জগতের কোন দৃশ্যই মানবজ্ঞান বুঝিতে পারে না। 'আদি-কারণ' স্বীকার না করিলে 'কার্য্য-স্বরূপ' এই ব্রহ্মাণ্ডের কোন তত্ত্বই আমাদের জ্ঞানগম্য হইতে পারে না।

আমরা এই পরিদৃশ্যমান জগতে প্রধানতঃ দুইটী দৃশ্য দেখিতে পাই,—বুঝিবার সুবিধার জন্য একটিকে 'রূপ' অপরটিকে স্বরূপ নামে অভিহিত করিব। জগৎ এই 'রূপ' ও 'স্বরূপের' সমষ্টি মাত্র এবং এই 'রূপ ও স্বরূপের' এমনি নিকট সম্বন্ধ যে একটিকে ছাড়িয়া দিলে অপরটির প্রকৃতজ্ঞান হইতে পারে না। ইহার মধ্যে যাহা বিবর্ত্তনশীল, আজ একরূপ কাল অন্যরূপ, এখন একরূপ তখন অন্যরূপ, তাহাকে 'রূপ' ও যাহা অপরিবর্ত্তনীয় নিত্যবস্তু তাহাকে 'স্বরূপ' নামে অভিহিত করিতে পার। এই 'রূপ ও স্বরূপ' অবশ্য আপেক্ষিক—যাহাকে তুমি স্বরূপ মনে করিতেছ তাহা আবার অন্য সূক্ষ্মতর স্বরূপের রূপমাত্র; এইরূপে বিশ্লেষণ করিতে করিতে যখন মৌলিক নিত্যবস্তুতে উপনীত হও, তখন তাহাকে 'আদি স্বরূপ' বলিতে পার। এখন একটি দৃষ্টান্ত লইয়া আলোচনা করিয়া দেখ এই স্বরূপজ্ঞান ছাড়িয়া দিলে রূপের প্রকৃতজ্ঞান হইতে পারে কি না? বিজ্ঞান এই 'রূপ ও স্বরূপের' অসীম রহস্যের নিত্য নূতন তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া সরলভাবে বুঝাইয়া দিতেছে, যে পরিমাণে স্বরূপকে ছাড়িয়া মানুষ 'রূপ তত্ত্ব বুঝিতে চাহিয়াছে সেই পরিমাণে অবৈজ্ঞানিক অসত্য সিদ্ধান্ত স্থান লাভ

করিয়াছে, এবং যে পরিমাণে স্বরূপানুসন্ধান করিয়া 'রূপতত্ত্ব' বুঝিবার চেষ্টা হইতেছে সেই পরিমাণে মানুষ বাহ্যজগতের সত্যতত্ত্ব জানিবার উপযুক্ত হইতেছে। জল কি বস্তু তাহা আমরা সকলেই জানি। এই জল কখন তরল, কখন কঠিন, কখন বা বাষ্পাকারে প্রকৃতির মধ্যে বিরাজ করিতেছে। জল, তুষার ও মেঘ যদিও ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির, যদিও তাহাদের 'রূপ' সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী তথাপি তাহাদের 'স্বরূপ' যে জল, ইহা যে পর্য্যন্ত না জানা যায় সে পর্য্যন্ত মানুষ জলের দেবতা হইতে মেঘের দেবতাকে পৃথক্ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। সুতরাং তুষার ও বাষ্প যাহার বাহ্যরূপ মাত্র, সেই স্বরূপের জ্ঞান না হইলে রূপের প্রকৃতজ্ঞান হইতেই পারে না। যে জলকে তুষার ও বাষ্পের 'স্বরূপ' বলিয়া মনে করিতেছ তাহার আর একটু বিশ্লেষণ কর, দেখিতে পাইবে যে সেই জল 'রূপ' মাত্র, oxygen. hydrogen নামক দুইটি মৌলিক গ্যাস তাহার 'স্বরূপ'। আবার সেই দুইটি গ্যাস একত্র হইলেই জল হয় না, তাহার মধ্যে বিশেষ নিয়মানুসারে একটি শক্তিসঞ্চার করিলে তবে জলাকার ধারণ করে। সুতরাং সেই অলঙ্ঘ্য-নিয়মাধীন-শক্তি প্রয়োগই জলের যথার্থ স্বরূপ, কিন্তু শক্তিশালী নিয়ামক ভিন্ন নিয়মানুসারে কে শক্তি প্রয়োগ করিবে? সুতরাং সেই শক্তিশালী আদি কারণই জলের 'আদিস্বরূপ।' এই আদিস্বরূপ-তত্ত্ব যদি ছাড়িয়া দেও, জলের প্রকৃততত্ত্ব তুমি কখনও জানিতে পারিবে না। এই মহাসত্য প্রচার করিয়া অধ্যাপক স্পেনসার বলিয়াছেন যে 'নিত্যবস্তুর জ্ঞান না পাইলে অনিত্যবস্তুর জ্ঞান হইতে পারে না।' সুতরাং নিত্যবস্তু যতই অজ্ঞেয় রহস্যে পূর্ণ হউক না কেন, তাহার কিছু কিছু তত্ত্ব জানা প্রয়োজন এবং সেই তত্ত্ব যে পরিমাণে দৃশ্যমান জগতের সঙ্গে সংযুক্ত আছে, সেই পরিমাণে মানবজ্ঞান তাহা জানিতে বুঝিতে অনুভব করিতে সক্ষম। ঠিক এইরূপ বিচার-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষের তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মনিষ্ঠ মহর্ষিগণ বলিতেন—"অসন্নেব স ভবতি নাস্তি ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।"— কেহ যদি মনে করে যে ব্রহ্মবস্তু নাই, তাহাতে ব্রহ্মবস্তুর অস্তিত্ব লুপ্ত হয় না, যে এইরূপ বলিতে চায় তাহার নিজের অস্তিত্বই অপ্রমাণিত হইয়া পড়ে!

সামবেদীয় তলবকার উপনিষদের প্রারম্ভেই গুরুশিষ্যের যে ব্রহ্মবিচার-বিষয়ক প্রশ্নোত্তর আছে তাহার সর্ব্বপ্রথম প্রশ্ন এই—

"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমীমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি?"

মন কাহার ইচ্ছাপ্রেরিত হইয়া বিচার্য্যবিষয়ের চিন্তা করে, কোন্ দেবতার আজ্ঞায় সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রধান প্রাণ আত্মকার্য্যে নিযুক্ত হয, আমরা যে কথা কহিয়া থাকি কাহার আজ্ঞায় সেই শব্দস্ফূর্ত্তি হয়, কোন দেবতাই বা এই চক্ষু কর্ণকে আপনাপন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকেন? শিষ্যের এই প্রশ্ন মানবজাতির সাধারণ প্রশ্ন; এই প্রশ্ন সকল দেশে সকল জাতির মধ্যে সকল জ্ঞানলিপ্সু লোকেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। ইহার উত্তরে গুরু বলিতেছেন "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচোহবাচং স উ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুরিতি।" (তিনি যদিও অপার অনন্ত তথাপি রূপ ও স্বরূপের আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে) তিনিই চক্ষুর চক্ষু শ্রোত্রের শ্রোত্র বাক্যের বাক্য প্রাণের প্রাণ; অর্থাৎ সমুদায় শক্তির তিনিই মূলশক্তি। আদিকারণকে মানুষ যদি এইরূপ করিয়া সকল শক্তির মূল বলিয়া বুঝিতে পাবে তবুও কি বলিতে হইবে আদি-কারণ সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়? অবশ্য বাহিরে বাহিরে দেখিতে গেলে সেই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিতে হয়, কেন না বাহিরে বাহিরে দেখিতে গেলে সকলই রূপময় বলিয়া বোধ হয়, রূপের অন্তরালে যে স্বরূপ আছে তাহা কেবল বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই তত্ত্বকথা যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষদে অতি সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। কেন সাধারণ লোকের নিকট এই স্বরূপতত্ত্ব অজ্ঞাত থাকে? কারণ,—

"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥"

৩ বল্লী ১২ শ্লোক॥

এই নিত্যবস্তু সর্ব্বভূতের অন্তরালে গূঢ়রূপে বিরাজ করিতেছেন সেই জন্য অজ্ঞানী ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে পায় না, সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতেরা সূক্ষ্মবুদ্ধির

সাহায্যে তাঁহাকে দেখিয়া থাকেন—তিনি যে এই রূপময় সংসারের প্রকৃত স্বরূপ তাহা বিচারপরায়ণ তত্ত্বদর্শীরাই জানিতে পারেন। সুতরাং তত্ত্বদর্শনহীন অজ্ঞানীর নিকট স্বরূপ লুক্কায়িত, রূপই প্রকাশিত বলিয়া কি বলিব যে মানব-মাত্রের নিকটেই তাহা 'অজ্ঞেয়'? অজ্ঞানী ব্যক্তি এই সংসারে বহু শক্তি দেখিয়া থাকেন; জ্ঞানবান্ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন যে তাহা ভুল—জগতে একমাত্র শক্তি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হইতেছে, প্রকৃতপক্ষে স্বরূপতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে যে তাহা এক। ইহাই বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবমণ্ডিত সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের মীমাংসা হওয়ার পর হইতে বর্ত্তমান জ্ঞানগর্ব্বিতযুগের বৈজ্ঞানিকগণ নূতন দৃষ্টিতে জড়জগতের দিকে চাহিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং এক শক্তি দ্বারা বহুবিধ রূপতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার জন্য উৎসাহের সঙ্গে বিজ্ঞানালোচনায় নিযুক্ত হইয়াছেন। জগতে 'স্বরূপ' এক—'রূপ' শত শত; কিন্তু সেই শত শত রূপের অন্তরালে এক অদ্বিতীয় 'স্বরূপই বর্ত্তমান, তাহাই বুঝাইবার জন্য কঠোপনিষৎ বলিতেছেন—

> "অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
> একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব বহিশ্চ॥
> বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
> একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব বহিশ্চ॥"
>
> ৫ বল্লী ৯। ১০॥

একমাত্র অগ্নি যেমন কাষ্ঠাদির অবয়বভেদে কোন স্থানে ত্রিকোণ কোথায়ও চতুষ্কোণরূপে প্রকাশিত হইলেও তাহার স্বরূপ এক, সেইরূপ কি অধ্যাত্ম জগতে, কি বহির্জগতে সকল ভূতের অন্তরাত্মা রূপে সেই 'আদিস্বরূপ' বর্ত্তমান রহিয়াছেন, কেবল ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে রূপ ভিন্ন ভিন্ন দেখা যাইতেছে মাত্র। বায়ু যেমন এক অথচ স্থানভেদে নানা রূপে প্রকাশিত, সেইরূপ এই শত শত রূপময় অন্তর ও বাহ্যজগতে সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপে একমাত্র 'আদিস্বরূপ' বিরাজ করিতেছেন। সেই এক অদ্বিতীয় মহাশক্তি জগতের আদিস্বরূপ হইলেও সাধারণ লোকে তাহা বুঝিতে না পারিয়া নানা সিদ্ধান্ত করিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে। যাঁহারা সকল বস্তুর আত্মস্থ আদিস্বরূপ বুঝিতে পারিতেছেন সেই

ধীর প্রাজ্ঞজনেরাই স্থায়ী সুখ পাইতেছেন, অজ্ঞানীর সে সুখ কোথায়? সেই জন্য উপনিষৎ বলিয়া থাকেন;—

"তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥"

যাহা রূপ তাহাই অনিত্য চিরপরিবর্ত্তনময়, আজ একরূপ কাল অন্যরূপ! যাহা রূপ তাহা শত শত বিভিন্নরূপে বর্ত্তমান, দেখিয়া বোধ হয় যেন সকলই অনিয়ম, সকলই 'অজ্ঞেয়'! কিন্তু যখনই মানবজ্ঞান শত শত 'রূপের' মূলে এক অদ্বিতীয় 'স্বরূপের' অস্তিত্ব অনুভব করে, তখনই অজ্ঞেয় রূপতত্ত্ব সুজ্ঞেয় হইয়া যায়—যেখানে অনিয়মের খেলা দেখিয়া মন প্রাণ অবসন্ন হইতেছিল সেইখানেই সুনিয়মের লীলা দেখিয়া হৃদয় মন আনন্দে আপ্লুত হয়। বিজ্ঞান যেমন এই সত্য প্রচার করিতেছেন, ভারতের প্রাচীন উপনিষৎও সেইরূপ সেই একই কথা শতকণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন, যথাঃ—

"নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একো বহূনাং যোবিদধাতিকামান।
তমাত্মস্থং যেঽনপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥"

৫ বল্লী। ১৩॥

সমুদয় পরিবর্ত্তনশীল অনিত্য বস্তুর অন্তরালে তিনিই নিত্যরূপে বর্ত্তমান, সমুদয় চেতনের মূলে চৈতন্যরূপে সমুদায় বহুত্বের মূলে তিনিই অদ্বিতীয়রূপে বর্ত্তমান থাকিয়া কাম্যবস্তু সকল বিধান করিতেছেন। সর্ব্বভূতান্তরাত্মারূপে ধীর ব্যক্তিরা তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়া চিরসুখ প্রাপ্ত হন, অজ্ঞানীরা সে সুখের অধিকারী নহে।

জড়বিজ্ঞান বহুরূপপূর্ণ এই জগৎ সংসারে এক অদ্বিতীয় শক্তির মহা-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আজ ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়াছে, উপনিষৎ অতি প্রাচীন কাল হইতেই সংসারকে সেই অচলভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া ব্রহ্মবিজ্ঞানের চরম উন্নতি লাভ করিয়া গিয়াছে! বর্ত্তমান বিজ্ঞানকে জিজ্ঞাসা কর 'এই সংসার-বৃক্ষের মূল কোথায়? বিজ্ঞান বলিতেছে—'আদি স্বরূপ মহাশক্তি' ইহার অপরিবর্ত্তনীয় মূল, সংসার অনিত্য পরিবর্ত্তনের সমষ্টিমাত্র। উপনিষৎকে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিবেন :—

"ঊর্দ্ধমূলোঽধাকশাখ এষোশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রঃ তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃসর্ব্বে তদু তাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈতৎ॥"
৬বল্লী। ১॥

এই যে আবহমানকাল প্রচলিত সংসার বৃক্ষ, ইহার মূল ঊর্দ্ধদেশে, শাখা প্রশাখা নিম্নগামী, অর্থাৎ যদি ইহার মূল অনুসন্ধান করিতে যাও, সেই 'আদিস্বরূপে' উপনীত হইবে, যদি শাখা প্রশাখা অর্থাৎ বাহ্যরূপ অনুসন্ধান করিয়া সময় কর্ত্তন কর নিম্নভূমির অজ্ঞের-রাজ্যে বিচরণ করিতে হইবে। এই 'আদিস্বরূপের' নামই ব্রহ্ম, তাঁহাকেই 'অমৃত' বলিয়া থাকে। সমুদায় বিশ্বসংসারের ভূত সকল সেই 'আদিস্বরূপকে' আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তাঁহাকে আশ্রয় না করিয়া কেহই স্বতন্ত্র স্বাধীন নিরপেক্ষভাবে প্রকাশিত হইতে পারে না। এখন বিচার করিয়া দেখ তত্ত্বদর্শি ঋষি-মুখবিগলিত "অসন্নেব স ভবতি নাস্তি ব্রহ্মেতি বেদচেৎ" এই মহাবাক্য কত গভীর অনন্ত তত্ত্বে পরিপূর্ণ!

এই 'আদিস্বরূপের' অস্তিত্ব অস্বীকার করা দূরে থাকুক বরং তাহা সুন্দর রূপে স্পেনসার প্রতিষ্ঠিত করিতে চান, সেই জন্যই তিনি বলেন, যে এই বিশ্বাস এত দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত যে কোন যুক্তিবলেই তাহা বিচলিত হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহার যেন বিশ্বাস যে এই পর্য্যন্ত আসিয়াই 'জ্ঞানের' শক্তি শেষ হইয়া যায়! আমরা জানি যে 'আদি-কারণ' আছে, কিন্তু তাহা যে কিংস্বরূপ তাহা আমরা জানিতে পারি না—ইহাই হার্বার্টের মতের সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত। ইহার সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে একবার চিন্তা করা উচিত যে হার্বার্ট মানবজ্ঞানের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সীমা নির্দ্দেশ করিতে চাহেন বাস্তবিক তাহা যুক্তিদ্বার সমর্থিত হইতে পারে কি না? আমরা নিজে তাহার কোন উত্তর না দিয়া প্রবীণ দার্শনিক অধ্যাপক মার্টিনু তাঁহার কৃত Study of Religion নামক পুস্তকে যাহা বলিয়াছেন তাহারই কিয়দংশ ভাষান্তরিত করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। যথা:—"যে বিষয় শেষ পর্য্যন্ত আমাদের নিকট সুক্ষম

থাকিয়া যাইতেছে, তাহা যে সত্য সত্যই পাছে এমন নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাস হইতে পারে কি? (আদি কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছ) কিন্তু সে অস্তিত্ব যে সত্যই বর্ত্তমান তাহা কি আমরা চিন্তাশূন্যতা দ্বারা জানিতেছি, না চিন্তাদ্বারাতেই জানিয়া থাকি? যদি বল যে তাহা চিন্তাশূন্যতা দ্বারা জানি, তবে কেমন করিয়া বল যে জ্ঞাতার শূন্যজ্ঞানে সে জ্ঞাতব্য বস্তু জানিতেছে? আর যদি বল সে চিন্তা দ্বারাতেই জানি, তাহা হইলে আদৌ চিন্তিতব্য কিছু না থাকিলে কিসের চিন্তা কর? এই 'আদিকারণকে' শক্তি নামে অভিহিত করিয়া নিশ্চয়ই স্পেনসার ইহাকে অজ্ঞেয়-রাজ্য হইতে অন্ততঃ এক পদও জ্ঞেয়রাজ্যের দিকে টানিয়া আনিয়াছেন! শুধু তাহাই নহে, স্পেনসার বলেন যে "আমরা এই শক্তিকে সর্ব্বব্যাপি অনন্ত অদ্বিতীয় ও সকল রূপের 'আদি-স্বরূপ' বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য।" যদি তাহাই হয়, তবে সেই আদি-কারণের যতগুলি স্বরূপ স্পেনসার মানিয়া লওয়ায় বাধ্যতা স্বীকার করিতেছেন তাহা ধর্ম্মের পক্ষে অপ্রচুর হইলেও অজ্ঞেয়বাদ খণ্ডনের পক্ষে প্রচুর নহে কি? আমি যেখানেই এক বস্তু হইতে আর একটীকে পৃথক্ করিয়া বাছিয়া লইতে সক্ষম হই সেখানেই আমার জ্ঞান থাকা প্রমাণিত হয়। এই 'আদি-স্বরূপকে' কি সকল রূপ হইতে পৃথক্ করিয়া বাছিয়া লইয়া তবে ইহাকে 'আদি-কারণ' বলিতেছি না? ইহাকে কি স্থান কাল বস্তু প্রভৃতি অন্যান্য স্বরূপ হইতে পৃথক্ করিয়া বুঝিতেছি না? যদি আদি-কারণ' সম্বন্ধে এতগুলি স্বরূপের জ্ঞান হইতে পারে তবে আর তাহাকে সম্পূর্ণ 'অজ্ঞেয়' বলিয়া কেমন করিয়া স্বীকার করিতে পারি? কোন একটী বস্তুর অস্তিত্বমাত্র আছে তাহা নিশ্চয় জানি অথচ তাহা যে কিংস্বরূপ তাহার কিছুই জানি না—এমন মনে করা অসম্ভব, কেননা তাহা অসঙ্গত।" মহাত্মা মার্টিনুর কথাগুলি ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখ, 'অজ্ঞেয়বাদের' ভিত্তি কোথায়?

অজ্ঞেয়বাদিগণ যখন আদি-কারণের অস্তিত্বের জ্ঞান হইতে পারা স্বীকার করেন তখন এইরূপ সংযুক্ত স্বরূপজ্ঞান হইতে পারার ক্ষমতা অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহারা বলিতে চান যে ঐটুকু যৎসামান্য জ্ঞানে যাহা জানি তাহার তুলনায় যাহা জানি না তাহা অনন্ত অপার! সুতরাং এই সামান্য জ্ঞানস্ফুলিঙ্গ থাকা না থাকা উভয়ই সমান কথা, তাহার ক্ষীণালোকে

কোন তত্ত্বই প্রকাশিত হইতে পারে না। ইহা যে কেবল তর্কের জন্যই তর্কমাত্র, কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

সকলেই জানেন, "আমরা সৃষ্টির প্রভু" বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকি। জ্ঞানবলে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিয়া জগতের যে সকল শক্তি কাল অজ্ঞাত ছিল আজ তাহাদিগকে আমাদের পদানত দাসী করিয়াছি। কাল যাহাকে পরাক্রান্ত ইন্দ্রের বজ্র বলিয়া সভয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া পূজা করিয়াছি, আজ আজ্ঞামাত্রে সেই বজ্র—বিদ্যুৎ আমাদিগের রাজপথের আলোকস্তম্ভে আলোক দিতেছে, ইঙ্গিতমাত্রে ভৃত্যের মত দেশ বিদেশে মানববার্ত্তা বহন করিয়া বেড়াইতেছে। কাল যাহা বরুণ দেবের একছত্র রাজত্বের অলঙ্ঘনীয় সীমা ছিল এবং যেখানে গিয়া স্বহস্তে কোলের সন্তান বিসর্জ্জন দিয়া 'ধর্ম্মোপার্জ্জন' করিয়া আসিয়াছি আজ সেই বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া তাহার উপর দিয়া পোতবক্ষে চলিয়া যাইতেছি! কাল যে অগ্নিদেবের মনস্তুষ্টির জন্য সদ্যোজাত হবিঃসংযোগে মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া স্বর্গের সোপান প্রতিষ্ঠিত করিবার আশায় সর্ব্বস্ব পুরোহিতের চরণপদ্মে দক্ষিণা দিতে ব্যাকুল হইয়াছি, আজ আ[illegible] অগ্নি ভৃত্যের মত লৌহবর্ত্মের উপর দিয়া মাসের পথ একদিনেই [illegible] স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইতেছে। কাল যে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডদেবকে স[illegible] গদ্গদ কণ্ঠে গললগ্নী-কৃতবাসে 'জবাকুসুম সঙ্কাশং' বলিয়া করযোড়ে প্রণাম করিয়াছি, আজ সেই উজ্জ্বল দেবতাকে তুলাদণ্ডে উঠাইয়া কখন তাহার ভারিত্ব, কখন তাহার পরিধি, কখন বা ব্যাসার্দ্ধের পরিমাণ লইতেছি! সৃষ্টির উপর যতই মানবকর্তৃত্ব পরিচালিত হইতেছে ততই আমরা সৃষ্টির প্রভু বলিয়া অহঙ্কার করিবার অধিকারী হইতেছি! কিন্তু বলিতে পার এই সকল সৃষ্টির বিচিত্র শক্তির উপরে আমাদের যে কর্ত্তৃত্ব তাহার মূল্য কত? আমরা কি ইহাদের সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান পাইয়াছি, না কেবলমাত্র আংশিক জ্ঞান পাইয়াই সৃষ্টির প্রভু সাজিয়া বসিয়াছি? যে বহির্জ্জগতের প্রভু বলিয়া আমাদের এত অহঙ্কার, বলিতে পার তাহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কোন্ শ্রেণীর—পূর্ণ না অপূর্ণ, প্রচুর না যৎসামান্য? অন্যবস্তুর কথা ছাড়িয়া দিয়া মানুষের কথাই আগে আলোচনা কর। মানুষ কখন মানুষকে সম্পূর্ণরূপে চিনিয়াছে কি?

শিশু মাতাকে, ভ্রাতা ভগিনীকে, স্বামী স্ত্রীকে, বন্ধু বন্ধুকে, আমি তোমাকে, তুমি আমাকে কখন সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছ কি? এক বার ইংলণ্ডের সচিব-শ্রেষ্ঠ মহাত্মা গ্ল্যাডষ্টোন বলিয়াছিলেন "তোমরা কি বলিতে পার আমি কখন্ কোন্ ইচ্ছাদ্বারা চালিত হই, কখন্ কোন্ উদ্দেশ্যে কি কার্য্যের সূত্রপাত করি; তোমরা বাহির বাহির দেখিয়া যতটা অনুমান করিতে পার তদনুসারে কখন নিন্দা কখন বা প্রশংসা কর, কখন অনুরাগ কখন বা বিরাগ প্রদর্শন কর। কিন্তু আমাকে সম্পূর্ণরূপে কখন জানিয়াছ কি? তথাপি আমাকে ভক্তি কৃতজ্ঞতা দেখাইতেছ, প্রশংসা অভিনন্দন দিতেছ, কত সময়ে কত প্রার্থনাই না জানাইতেছ! এ সকলই কিন্তু যৎসামান্য অসম্পূর্ণ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। তদ্রূপ অসম্পূর্ণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য চলিতেছে, শিল্পবিজ্ঞানের আলোচনা হইতেছে, কেবল পরমেশ্বর সম্বন্ধেই পূর্ণজ্ঞান নাই বলিয়া হাত পা গুটাইয়া বসিয়া রহিয়াছ কেন?"

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

---

# রাজনীতি।

সুহৃদ্বরেষু——আসুন, আজ একটু রাজনীতির আলোচনা করা যা'ক। হাতে কাজ না থাকলে পরনিন্দা ও রাজনীতির আলোচনায় সময় বেশ কাটিয়া যায়, এ বিষয়ে বোধ হয় আপনাদের মধ্যে মতভেদ নাই। আজ রবিবার, বিশ্রামের দিন, রাজনীতির আলোচনার এমন ফুরসত্ আর হইবে না। বিশেষতঃ আজ কাল দেশের যে অবস্থা হইয়াছে তাহাতে রাজনীতি ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের অবতারণা করিলে আসর জমে কি না সন্দেহ।

এই যে দেশব্যাপী আসমুদ্রহিমাচল দুর্ভিক্ষ, অন্নকষ্ট, হাহাকার, তব-লীলাসংবরণ, ইহার কারণ কি? সভা সমিতিতে, বৈঠকে, বাজারে, কন্‌গ্রেসে,

কন্‌ফারেন্সে, কাগজে কলমে, অনেকে অনেক কারণ বলিতেছেন। যাহাতে চাঁদে চাঁদে দুর্ভিক্ষ না হয় তাহার জন্য ব্যবস্থা পত্রও দাখিল করিতেছেন। এ ব্যাপার যে শুধু আজ হইতেছে তাহা নহে; যখনই ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে অন্নকষ্ট ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তখনই আমাদের রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহার কারণনির্ণয় করিতে বসেন এবং তৎপ্রতিকারের ব্যবস্থা করেন। তাহার পরে যে চুপ সে চুপ।

আমাদের দেশের লোকের কেমন একটা বদ্‌স্বভাব তাহারা যে মরিবে তবুও বক্ বক্ করা ছাড়িবে না। আমাদের দেশের শস্য বিদেশে চলিয়া যাইতেছে, আমাদের উপর ট্যাক্সের চাপ বেশী, একস্‌চেঞ্জের জ্বালায় আমাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে, বড় বড় চাকুরীগুলা ইংরাজে দখল করিয়া বসিয়াছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি, নানাপ্রকার কাঁদুনী আমরা কাঁদিয়া থাকি; শুধু রাস্তায় ঘাটেই কাঁদি না;—যথারীতি সভাসমিতি করিয়া প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া সেই সব কাঁদুনীর উপর প্রস্তাব করি, সমর্থন করি, এবং শেষে তাহা resolution ভুক্ত করিয়া কঠোর কর্ত্তব্যের দায় হইতে অব্যাহতিলাভ করিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি।

আমরা দেখিতেছি আমাদের দেশে অন্নকষ্ট, যাহাকে ইংরাজেরা আফিসের কাগজে simple scarcity বলেন, তাহা ত বার মাসই লাগিয়া আছে! যেবার ক্ষেতে ধান হইল না, সেবার কৃষকের অদৃষ্টে অনাহার—অপমৃত্যু; যেবার ক্ষেতে প্রচুর জন্মিল, সেবারও অর্দ্ধাহার—রোগ শেষে অপমৃত্যু। বাঙ্গলার কৃষকের মৃত্যু নিশ্চিত, তা দুর্ভিক্ষই হউক আর যথেষ্ট ফসলই হউক। আপনারা চাঁদা করিয়া কয়দিন চালাইবেন; ভিক্ষার-অন্নে কয়দিন মানুষের জীবন চলে? বঙ্গের কৃষক মরিবার জন্যই জন্মিয়াছে; অনাহারে, রোগে কঙ্কালসার হইয়া মরিবার জন্যই এই স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গদেশে তাহাদের জন্ম। বঙ্গভূমি "সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা শস্য শ্যামলা" হইলে কৃষকের কি? তাহার যে অনাহার সে অনাহার। যে বৎসর শস্য জন্মিল না সে বৎসর লাঙ্গল গরু বেচিয়া খাইল, তাহাতেও যখন কুলাইল না তখন মহাজনের কাছে টাকায় চারি আনা মাসিক সুদে টাকা ধার করিতে লাগিল, যে ধার পাইল সে ভবিষ্যতে মরণের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিল, যে ধার পাইল না সে তখনই সপরিবারে মরণের জন্য প্রস্তুত হইল। যাহারা মরিল তাহাদের হিসাব শোধ হইয়া গেল;

কিন্তু যাহারা বাঁচিল তাহাদের মরণ আরও ভয়ানক। ভগবানের কৃপায় ভাল ফসল হইল, কৃষকের গৃহে ধান্য উঠিল; আর কোথা হইতে মহাজনের গোমস্তা খাতা বগলে আসিয়া উপস্থিত হইল। খাতা খুলিয়া সুদে আসলে হিসাব করিয়া দেখাইল যে ৫১৲ টাকায় এই তিন বৎসরে ২১২৲ টাকা হইয়াছে; বরাহ-পরিবারও বোধ হয় এত অল্প দিনে এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না! কৃষকের মুখ শুকাইল. কৃষকপত্নী যে এবার ঘটা করিয়া মেয়ের বিবাহ দিবার কল্পনা মনে মনে আঁটিয়াছিল তাহা উড়িয়া গেল, কৃষকের শস্যরাশি মহাজনের বিশালোদর গোলাঘর দাখিল হইল; তাহাতেও দেনা শোধ হইল না; মুনসফী আদালতের দ্বার খোলা আছে, অবশিষ্ট দেনার জন্য কৃষকের নামে এক নম্বর দাখিল হইল; তিন মাস যাইতে না যাইতেই কৃষক স্ত্রী পুত্রের হাত ধরিয়া ঘরের বাহির হইল। এ ঘটনা কল্পনা নহে, সুদিনে দুর্দ্দিনে বার মাস আমরা এই দৃশ্য দেখিতেছি। এই আমাদের সম্মুখেই দুই তিন শত টাকার কত মহাজন পাঁচ সাত বৎসর না যাইতেই দশ হাজার টাকা নগদ ও আড়াই শত বিঘা জমির অধিপতি। কোথা হইতে এ ধন সম্পত্তি আসিল। মহাজনের গৃহে কি আলাদ্দিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ আছে? শত শত দরিদ্রের সর্ব্বনাশ করিয়া এই ধনসম্পত্তি।

তাহার পর বাঙ্গলার কৃষকগণ অশিক্ষিত, সুতরাং অপরিণামদর্শী; তাহারা বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি উপলক্ষে ঘটা করিতে বড়ই ভালবাসে। মহাজনের নিকট গেলেই টাকা পাওয়া যায়, খত দিয়া টাকা লইয়া কৃষক ছেলের বিবাহ দিল। ধার করিয়া নবাবী অনেক শিক্ষিত লোকেই করেন, কৃষকেরা ত মোটেই শিক্ষা পায় নাই।

এই সব কারণে কৃষকগণ মারা যাইতেছে। তাহাদের উদ্ধার সাধনের উপায় কি? উপায় মহাজনের কবালগ্রাস হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করা। গবর্ণমেণ্ট কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করুন, দেশের ধনকুবেরগণ প্রজাদিগকে কোথায়ও বা অল্প সুদে, কোথায়ও বা বিনাসুদে প্রয়োজন মত টাকা ধার দিন; তাহা হইলে কৃষকের প্রাণ বাঁচিবে। কৃষকগণকে রক্ষা করিবার আর অন্য উপায় নাই।

তাহার পর অন্নকষ্টে আরও একশ্রেণীর জীবের ভবযন্ত্রণা শেষ হয়। ইহারা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ; ইহাদের জমি নাই, সুতরাং ইহারা মহাজনের নিকট টাকা ধার

পায় না। চাকুরী ইহাদের জীবনোপায়। কুড়ি টাকা বেতনের একজন কেরাণী, তাহার ঘরে খাইতে ১২ জন লোক; যেবার খুব ভাল বৎসর, সে বৎসরেও এই ১২টী লোকের মাসিক চাউলের খরচ ১০৲ টাকার কমে হয় না; অর্দ্ধেক গেল চাউল কিনিতে। আর ১০৲ টাকায় কি হইবে! তেল লবণ কিনিতেই যে ফুরাইয়া যায়। এ শ্রেণীর জীবের কি হইবে? ইহাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। এই শ্রেণীর লোকের ছেলেদের জন্য শিল্পবিদ্যালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠায় অনেক উপকার হইবে। ইংরাজী পড়িবার খরচই বা যোগায় কে? আর পাশ হইলেও ত ছয় টাকা মাহিয়ানার চাকুরী! তাহার পরিবর্ত্তে যদি মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলেরা শিল্পবিদ্যালয়ে শিক্ষা পায় তাহা হইলে তাহাদের আয়ের পথ প্রশস্ত হয়, এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কষ্ট কথঞ্চিৎ লাঘব হয়।

এই প্রকার শিল্পবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আমার কয়েকটী কথা আছে, তাহা বারান্তরে বলিব।

শ্রীজলধর সেন।

---

# প্রতিবাদ।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের "উৎসাহে" মাননীয় বাবু সারদাচরণ মজুমদার, নেপোলিয়ন বোনাপার্টের চরিত্র-সমালোচন-উপলক্ষে, দুইটি গুরুতর ভ্রম করিয়াছেন; (১) নেপোলিয়নের নৈতিক জীবনের উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করিতে গিয়া; (২) তাঁহার দাম্পত্যপ্রীতির অসাধারণত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া। নিরপেক্ষ ইতিহাস ইহার প্রতিকূল সাক্ষ্য দিতে পশ্চাৎপদ নহে।

নেপোলিয়নের ইতিবৃত্ত নানা কারণে সাধারণের চিত্তাকর্ষক। ক্ষুদ্র একটি দ্বীপবাসী সামান্য ব্যবহারজীবীর পুত্র, স্বীয় অনন্যসাধারণ রণপাণ্ডিত্য, রাজনীতিজ্ঞান, অদম্য অধ্যবসায়, ও অপরিমেয় সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া

এক দিকে ফ্রান্সের সাধারণতন্ত্রপ্রয়াসী দেশহিতৈষী সম্প্রদায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্য করায়ত্ত করিয়াছিলেন; এবং অপরদিকে তদানীন্তন ইয়ুরোপীয় রাজন্যবর্গ ও জনসাধারণকে, সিংহতাড়িত মৃগের ন্যায় ভীতিবিহ্বল রাখিয়াছিল; ইহা এক পক্ষে যেমন প্রবল বিস্ময়ের উদ্রেক করে, পক্ষান্তরে তেমনি 'অসম্ভব' কথাটার গৌরব অনেক খানি লঘু করিয়া ফেলে। এ হিসাবে নেপোলিয়ন জগতের ইতিহাসে সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভের যোগ্যপাত্র। আলেক্জাণ্ডার, হানিবল, সিজর প্রভৃতি খৃষ্টপূর্ব্ববর্ত্তী সভ্যতম জাতীর নেতৃগণ, নিজ নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া, যথেষ্ট খ্যাতি, প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; ইতিহাসও সে গুণ-গৌরব ও বাহুবলের প্রশংসা শতমুখে কীর্ত্তনে পরিশ্রান্ত নহে; কিন্তু তাঁহাদের উন্নতির পথ পিতৃপুরুষগণই অনেকাংশে প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত রাখিয়া গিয়াছিলেন। প্রতিকূলতার সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রামে একটা জয়লাভ বোধ হয় কাঁহারই আবশ্যক হয় নাই। কিন্তু সম্ভাবনার বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব না থাকিলেও কেবল নিজ শারীরিক, মানসিক ক্ষমতার সাহায্যে যে দুর্দ্দমনীয় তেজস্বী মহাপুরুষ জগতে পুরুষকারের জয় ঘোষণা করিয়াছিলেন, তিনি এবং তাঁহার উন্নতির ইতিবৃত্ত যে অতুল্য, অপিচ প্রত্যেক উন্নতিকামীরই অনুশীলন যোগ্য, ইহা ইতিহাসজ্ঞকে বুঝাইবার প্রযোজন দেখি না। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, প্রতিভা, কার্য্যকুশলতা, তেজস্বীতা, ধৈর্য্যশীলতা প্রভৃতি অনুকরণীয় এতগুলি গুণ সমাবেশ সত্তেও নেপোলিয়ন নৈতিক উপদেষ্টা ও দাম্পত্য প্রীতির উচ্চাদর্শ হইবার উপযুক্ত নহেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার মানসিক অভিব্যক্তি ও কার্য্যকলাপ অনেকাংশে হীন। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যিনি সে সংবাদ প্রচার বা তদনুরূপ আচরণ করিবেন, তিনি বস্তুতঃই মহাভ্রমে পতিত হইবেন। এ ক্ষেত্রে সারদা বাবুও সে ভ্রমের হাত এড়াইতে সক্ষম হন নাই।

নেপোলিয়ন-জননী লিটিসিয়া রামোলিনী বাস্তবিকই সর্ব্বাংশে অনুকরণযোগ্যা বা আদর্শরমণী ছিলেন। চরিত্রের পবিত্রতা ও দৃঢ়তা, মনের ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য, কর্ত্তব্যে অনবহেলা, ন্যায়ে অনুরাগ ইত্যাদি এবং অন্যান্য নানা সদ্‌গুণ তাঁহার স্বভাবকে অলঙ্কৃত রাখিয়াছিল। নেপোলিয়ন কতকটা উত্তরাধিকারসূত্রে, এবং কতকটা সংসর্গজ শিক্ষার ফলে, মাতৃপ্রকৃতির অনেক গুণ আয়ত্ত

করিয়াছিলেন; এবং ইহা তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ন্যায় ও সত্যে অচলা ভক্তি এবং দাম্পত্যপ্রেমে প্রগাঢ় অনুরাগ ইত্যাদি চরিত্রের পবিত্রতাসূচক কোন গুণই তিনি লাভ করেন নাই; অথবা করিয়া থাকিলেও দুরাকাঙ্ক্ষা সিদ্ধির অন্তরায় ভাবিয়া উত্তরজীবনে বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দৃষ্টান্তের অনুগমন করিলেই ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয়।

ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ তুলিতে প্রযোজনাতিরিক্ত মসি লইয়া নেপোলিয়নের আলেখ্য প্রচুর কালিমাময় করিয়াছেন, সত্য; কিন্তু যথার্থ গুণভাগ কোন কোন নিরপেক্ষ চরিতাখ্যায়কের চক্ষে ঢাকা পড়ে নাই। পক্ষান্তরে তাঁহার প্রসাদপুষ্ট, অনুগত স্বদেশী ঐতিহাসিকদের কেহ কেহ তাঁহাকে দোষ-স্পর্শ শূন্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাও অতিরঞ্জনপুষ্ট। বস্তুতঃ ন্যায়পর তত্ত্বানুসন্ধিৎসু একটু পরিশ্রম স্বীকার করিলেই, এরূপ বিরুদ্ধ মতবাদের মধ্য হইতেও নেপোলিয়নের বাস্তব দোষ, গুণ বাছিয়া লইতে পারেন। তাঁহার গুণভাগের আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, দোষের কথাই বলিতেছি, (১) নেপোলিয়নের নৈতিকজীবন বিশুদ্ধ ছিল না সুতরাং এপক্ষে তিনি সাধারণের আদর্শ হইবার অযোগ্য; (২) তাঁহার দাম্পত্যনীতিও অপকৃষ্ট ছিল অতএব ইহাতেও তাঁহাকে শিক্ষাস্থল জ্ঞান করা অনুচিত।

ন্যায় ও সত্যে অকপট বিশ্বাস এবং অনুরাগ, নৈতিক উৎকর্ষের বিশিষ্ট পরিমাপক। দুর্ভাগ্যের বিষয় উন্নতির জীবনে নেপোলিয়ন, এই দুই পদার্থের জ্যোতিঃ হইতে যথাসম্ভব দূরে অবস্থান করিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার অশাসিত দুরাকাঙ্ক্ষাই সে পথে বিষম প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। কিন্তু আবার সত্যানুরোধে বলিতে হয়,—ন্যায় ও সত্যে এবম্প্রকার অভক্তিই তাঁহাকে সাংগ্রামিক ও রাজনৈতিক জীবনে সৌভাগ্যশালী ও উন্নত করিয়াছিল। নতুবা জগতের ভীতি ও বিস্মিতির গৌরবময় আসনে তিনি কদাচ উপবিষ্ট হইতে পারিতেন না; পরন্তু আজ তাঁহার জীবনের প্রতি ঘটনার তন্ন তন্ন অনুসন্ধানেও সভ্য জগতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঐতিহাসিক মস্তিষ্ক আলোড়িত হইত না। বাল্যে নেপোলিয়নের এই দুরাশা বিশেষ স্ফূর্তি পায় নাই; বরং ছাত্রজীবনের কঠোর সংযম, ও বিলাস নিস্পৃহতা তাঁহার বিপরীত ভাবই

প্রমাণ করিত। যুদ্ধক্ষেত্রের ক্রমসাফল্য ও পদোন্নতিই তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষাকে শনৈঃ শনৈঃ অদম্য করিয়া তোলে; এবং মধ্যজীবনে তিনি মোহাচ্ছন্নবৎ তাঁহার দাস হইয়া পড়েন।

বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদের পর নেপোলিয়ন "লাফিয়ার" নামক ফরাসী সেনাদলের লেফ্‌টেন্যাণ্ট পদে বৃত হন। একই পদে ক্রমান্বয়ে সাত বৎসর সন্তুষ্টির সহিত কর্ত্তব্যসম্পাদন করিয়াছিলেন। একদিনের জন্যও পদোন্নতির কারণ বিশেষ জেদ্‌ বা অনুমতির জন্য আবদার অথবা অসন্তোষ-প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং দেখা যায়, যৌবন প্রারম্ভ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবন ন্যায় ও সত্যের শাসনে নিয়ন্ত্রিত ছিল। অতঃপরই তদীয় জীবনে দুরাশার তুমুল ঝটিকা উপস্থিত হয়, এবং তৎপ্রভাবে অনেকগুলি সুন্দর ও সুকুমার, মনোবৃত্তি এবং চিত্তবৃত্তি উন্মূলিত হইয়া যায়।

ইতিবৃত্তবিৎ পাঠক জ্ঞাত আছেন, ফরাসীবিপ্লবসূচনার কিছু পূর্ব্বে, অর্থাৎ রাজা ও প্রজাসাধারণের মধ্যে যুদ্ধ ঘটিবার কিঞ্চিৎ অগ্রে নেপোলিয়ন সৈন্য দলে প্রবিষ্ট হন। বিপ্লব সময়ে তিনি প্রজাসাধারণের স্বার্থরক্ষার্থ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া, সাধারণ তন্ত্রীদলের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিলেন; এবং বিরুদ্ধপক্ষদিগের সঙ্গে অনেক সময়ে জয়লাভও করিয়াছিলেন। কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রজাসাধারণ সর্ব্বাপেক্ষা সুখী হইতে পারে, তিনি একসময়ে উদারতামূলক এতদ্‌বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াও, কোন এক প্রজাসাধারণ সভাকর্ত্তৃক, পুরস্কৃত হন। এই সকল ঘটনাদ্বারা বুঝা যায়, ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার্থ চিরকালই তাঁহার সাধারণতন্ত্র মতের পক্ষপাতী থাকা, এবং অন্যায় উপায়ে সাম্রাজ্য গ্রহণ না করা উচিত ছিল। কিন্তু পরিণামে তিনি কি সে পবিত্র প্রতিজ্ঞাবাণী রক্ষা করিয়াছিলেন? ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, তিনি কেবল সে প্রতিজ্ঞার অন্যথাচরণে, সত্যের গৌরবহানি করিয়া ক্ষান্ত হন নাই; পরন্তু সাধারণ তন্ত্র অনুমোদনকারী অনেক দুর্ভাগ্য জীবকে, অযথা অপমানিত এবং সময় বিশেষে কাহারও কাহারও জীবন পর্য্যন্ত ধ্বংশ করিয়াছেন। প্রধানত তিনি সৈনিক সম্প্রদায়ের ভক্তি ভাজন ছিলেন; সেই ভক্ত সম্প্রদায়ের সাহায্যে কেমন অন্যায় কৌশলে, দেশের শিক্ষিত ও রাজনীতিজ্ঞ সমাজের মত উপেক্ষা করিয়া, ফ্রান্স সাম্রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন; ইহা ইতি-

হাসে উজ্জ্বল ভাষায় লিখিত আছে। নৈতিক জ্ঞান অথবা ন্যায় ও সত্যপরা-য়ণতায় ইহা কি প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত ?

ন্যায়ে অবহেলার ন্যায়, পবিত্র প্রণয়ের অসম্মান ও নেপোলিয়নদ্বারা সংঘটিত হইয়াছে। দাম্পত্য প্রীতিও তাঁহার দুরাশার সংঘর্ষণে নিষ্পেষিত হইয়াছে। যৌবন প্রত্যুষে কলম্বায়ার নাম্নী একটি কিশোরীকে তিনি প্রেমের কুহেলিকাময় মোহিনীমন্ত্রে ভুলাইয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহে অসম্মত হন, ইহাতে দাম্পত্য-প্রীতির না হউক প্রণয়ের যথেষ্ট অনাদর করা হইয়াছিল, নিঃসংশয়। যৌবন-মধ্যাহ্নে "মার্কুইস ডি বোহারণের" বিধবা পত্নী জোষেফাইন, তাঁহার প্রণয়-আকর্ষণে আকৃষ্ট করিতে কথঞ্চিৎ সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহার অদৃষ্টও চিরকাল প্রসন্ন ছিল না। এই দুর্ভাগিনী রমণী, বিলাসিতাজনিত অমিতব্যয়িতায় নেপোলিয়নকে অনেক সময় উত্তপ্ত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সরল অন্তঃকরণে তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগিণী ছিলেন, এবং হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে প্রণয়ভাজনের মঙ্গল কামনা করিতেন। চরমে নেপোলিয়ন এই সরলহৃদয়া অব-লার পবিত্র প্রণয়ের যে পুরস্কার দেন, তাহা কোনও সভ্যদেশীয় দাম্পত্যপ্রীতির উচ্চাদর্শ হইতে পারে না, এবং হওয়া উচিতও নহে। যে দুরাকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির জন্য তিনি অসদুপায়ে ফ্রান্স সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, সেই উদ্দাম দুরাশাবশেই অন্যায়লব্ধ রাজপদ বংশানুক্রমিক করায়ত্ত রাখিবার অভিপ্রায়ে যৌবন অবসানে অষ্ট্রিয় রাজকুমারী মেরিয়া লুইসাকে বিবাহ করিবার প্রলোভনে, পবিত্র প্রণয়-ব্রতধারিণী জোষেফাইনকে পরিত্যাগ করিয়া, আদর্শ দাম্পত্যপ্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ছিলেন। অবশ্য এই পত্নীত্যাগ সমর্থনের যুক্তির অভাব হয় নাই। তাঁহার স্তাবক ঐতিহাসিকগণ "ফ্রান্সের মঙ্গলেচ্ছায় প্রণোদিত হইয়াই, সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এই বিবাহ-বিচ্ছেদে সম্মত হইয়া উদারতার পরিচয় দিয়া-ছিলেন," ইত্যাদি হেতুনির্দ্দেশে, সাধারণের চক্ষে ধূলি দিবার চেষ্টা পাইয়াছেন; কিন্তু বুদ্ধিমানের নিকট তাহার সারবত্তা কিছুই নাই। তাঁহার সহোদর কয়েকটি ভ্রাতা তখন জীবিত ছিলেন, সুতরাং সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর অভাব ছিল না। তাঁহার জীবনান্তে ভ্রাতৃবর্গেরই যে কেহ রাজপদের অধিকারী হইবেন ইহা তিনিও অনেক সময় প্রকাশ করিয়াছেন। ফলতঃ স্বার্থপরতাকে একটু সঙ্কুচিত রাখিলেই তিনি পূর্ব্ববিবাহের কলঙ্কদায় হইতে অব্যাহতি পাই-

তেন। কিন্তু তাহা তাঁহার অভিলষিত ছিল না, আর সেই কুমতিবশে জোষে-ফাইনের বর্জ্জন ও মেরিয়ালুইসার অর্জ্জন সাধিত হইয়াছিল। স্ত্রী জীবমানে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ কখনই দাম্পত্যপ্রীতির সুলক্ষণ হইতে পারে না।

সারদা বাবু নেপোলিয়নের দাম্পত্যপ্রণয়ের মহত্ত্ব প্রমাণ করিবার জন্য যে উদাহরণ দিয়াছেন তাহা অসত্য বা ইতিহাসবিরুদ্ধ নহে; কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহার নিজ চরিত্রের গৌরব সন্তোষজনকরূপে প্রতিপন্ন হয় না। পরের সদসৎ আচরণে সহানুভূতি অপেক্ষা, নিজের পারিবারিক ও সাংসারিক ব্যবহারই চরিত্রের গুরুত্ব, লঘুত্ব বুঝিবার প্রকৃষ্ট পন্থা। অন্যের আচরণে সহানুভূতির সঙ্গে বিস্তর কপটতার অস্তিত্ব সম্ভব, কিন্তু নিজের ব্যবহারে ততটা হইতে পারে না। নেপোলিয়নচরিত্র যে প্রচুর অসরলতার আশ্রয়ভূমি ছিল ইহা সকল ইতিহাসজ্ঞই জ্ঞাত আছেন। হইতে পারে সৈনিকপত্নীর বিপদে সহানুভূতি সেই কপটাতরই অঙ্গ বিশেষ, অথবা ইহাও অসম্ভব নহে যে সৈনিকপত্নীর বিপদে এবং তথাবিধ অবস্থাতেও স্বামীর প্রতি অগাধ ভালবাসায়, বাস্তবিকই তাঁহার হৃদয় গলিয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার চরিত্রের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয় না, কেননা সৎকার্য্যের এমনই মুগ্ধকারীতা যে অতি বড় পাষণ্ডও সময় এবং অবস্থা বিশেষে তাহাতে আকৃষ্ট হইতে পারে।

মুখবন্ধে সারদা বাবু লিখিযাছেন, "নেপোলিয়ন কেবল যে বিখ্যাত রাজনীতিবিৎ ও অদ্বিতীয় রণপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার ইতিহাস পাঠ করা উচিত, তাহা নহে। ইঁহার আশৈশব জীবনবৃত্ত সর্ব্বশ্রেণীর মানবগণের পক্ষেই শিক্ষাপ্রদ।" আমিও বলি বাল্যে বুদ্ধিমত্তা, কার্য্যদক্ষতা, বিদ্যালয়ে কঠোর সংযম ও বিলাসবিদ্বেষ, যৌবনে বিদ্যানুরাগ, রণপাণ্ডিত্য, রাজনীতিজ্ঞান, ধৈর্য্যশীলতা, বিপদে নির্ভীকতা, অক্লান্তশ্রমে অনুরক্তি ও আলস্যে বিরক্তি প্রৌঢ়জীবনেও ঐ সমস্ত অসাধারণ গুণের সমাবেশ ইত্যাদি কারণে নেপোলিয়ন আখ্যায়িকা সকলেরই আলোচ্য, চিন্তনীয়, শিক্ষণীয়। চিন্তাশীল লেখকবর্গের ঐ সমস্ত বিষয়ের উদাহরণই খুজিয়া খুজিয়া সাধারণ্যে প্রচার করা উচিত নৈতিক জীবনের উৎকর্ষবিধান এবং দাম্পত্যনীতি-শিক্ষার আশায় কেহ যেন তাঁহার জীবনীপ্রচার বা পাঠ না করে। তাহাতে ইষ্টাপেক্ষা অনিষ্টের সম্ভাবনাই অধিক।

শ্রীব্রজমোহন ঠাকুর।

# জুয়ারী জাতি।

চীনদেশবাসীর জুয়া খেলাই প্রধান আমোদ। সকল প্রকার অদৃষ্ট পরিমাপক ক্রীড়ারই তাহারা ভারী ভক্ত। অতি তুচ্ছ জিনিষের জন্যও তাহারা সচরাচর পণ করিয়া বসে। এই ক্রীড়ানুরাগ এতই প্রবল যে সকল শ্রেণীর প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীপুরুষের ত কথাই নাই, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা পর্য্যন্ত পাকা জুয়ারী।

রাস্তার মধ্যে যেখানে সেখানে ক্রীড়াগৃহ ও তন্মধ্যে অতি প্রত্যুষ হইতে গভীর রাত্রিপর্য্যন্ত ক্রীড়কবর্গের সমাগম দৃষ্ট হইয়া থাকে। এমন কি বাজারের মধ্যে সামান্য ফলের দোকানগুলিতেও বালক বালিকারা অদৃষ্ট পরীক্ষায় ব্যাপৃত রহিয়াছে। কেবল ফল লইয়া অবিরাম খেলা চলিতেছে।

অন্যান্য দেশের ন্যায় জুয়া-খেলা চীনদেশের আইনানুসারে নিষিদ্ধ হইলেও অসৎপ্রকৃতি কর্ম্মচারীরা এই সমুদায় ক্রীড়ালব্ধ লাভের অংশ পাইবার নিমিত্ত হৃষ্টমনে ইহার প্রশ্রয় দিয়া থাকে।

ক্রীড়াগৃহ নানাবিধ। 'তানকুন' নামক ক্রীড়াগৃহে দুইটী করিয়া কুঠরী থাকে। ইহার প্রথমটীতে 'চিঙ্গিটান' নামে এক প্রকার ক্রীড়া হইয়া থাকে। সাধারণতঃ একটা উচ্চ টেবিলের উপর এই খেলা হয়। এই টেবিলের ঠিক মাঝখানে একখানা সমচতুষ্কোণ কাঠের বোর্ড আটকান থাকে। এবং এক, দুই, তিন, চারি করিয়া তাহার চারিধারে নম্বর দেওয়া থাকে।

'খেলুরা টেবিলের চারিধারে ঘিরিয়া বসে। 'ক্রুপিয়ার' * তখন এক মুষ্টি তাম্রমুদ্রা তদুপরি স্থাপিত করিয়া তৎক্ষণাৎ উহা একটী টিন পাত্র দিয়া ঢাকিয়া দেয়। অবশ্য খেলুরা ইতিমধ্যে গুণিয়া লইবার অবসর পায় না। এক্ষণে জুয়ারীরা ঐ পাত্রাভ্যন্তরে যতটী মুদ্রা আছে তাহাকে চারিভাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট রহিবে তাহাই বলিতে চেষ্টা করে ও তদনুসারে পণ করিয়া থাকে। সকলে নিজ নিজ অনুমানুসারে মুদ্রার সংখ্যা বলিবার পর ঐ চতুষ্কোণ বোর্ডের

---

* যে ক্রীড়াস্থলে মুদ্রাদি সংগ্রহ করিয়া থাকে।

একধারে কি অন্যধারে পণমুদ্রা রাখিয়া দিয়া পর ক্রুপিয়ার ঢাক্না তুলিয়া ফেলে। এবং হাতীর দাঁতের একখানি হ্রস্ব যষ্টি লইয়া এক একবারে চারিটী করিয়া সমস্ত মুদ্রা গণনা করে। মনে কর, কোন খেলু ঐ চতুষ্কোণ বোর্ডের ১নং ধারে তাহার পণ রাখিয়াছিল; এখানে যদি সমস্ত মুদ্রা চারিভাগ করিয়া এক অবশিষ্ট থাকে তাহা হইলে সে বাজী জিতিল, যদি দুই, তিন অবশিষ্ট থাকে তাহা হইলেও তাহার মুদ্রা বাঁচিয়া যায়, কিন্তু যদি কিছুই না থাকে তাহা হইলে সে বাজী হারিল।

ঐ টেবিলের উপর আর এক রকম খেলা হয় তাহার নাম 'নিম'। এই খেলার খেলোয়ারেরা যাহা পণ ধরে তাহার দ্বিগুণ আদায় করে। ইহাতে বাজী পাইবার একবার আশা আছে কিন্তু দুবার হারিবার আশঙ্কা। ইহাও চিঙ্গটানের ন্যায় খেলা হইয়া থাকে। যদি চারিভাগ করিয়া নগদ 'দুই' অবশিষ্ট থাকে তাহা হইলে যে ৪নং ধারে বাজী ধরিয়াছিল সেই জিতিয়া যায়।

'ফ্যান' খেলাতে খেলুরা যাহা পণ করে তাহার তিন গুণ পায়। কিন্তু যদি ঠিক সংখ্যাটী বলিতে পারে তবেই বাজী পায় নইলে অন্য কোন সংখ্যা বলিলেই হারিল। এবং 'লক' বলিয়া আর একপ্রকার খেলা আছে তাহাকে পণমুদ্রা দুই সংখ্যার মধ্যস্থলে রক্ষিত হয়। অবশিষ্ট সংখ্যা এই দুই সংখ্যার মধ্যে কোনটীর সহিত মিলিলেই বাজী জিতিল নইলে হারিতে হয়। তানকুনের প্রথম কুঠরীতে কেবল তাম্র মুদ্রাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় কুঠরী উচ্চবংশীয় ও ধনী জুয়ারীদিগের জন্য। এখানে রৌপ্য মুদ্রা ব্যবহৃত হয়। খেলার নিয়ম প্রায় সমস্তই প্রথম কুঠরীর ন্যায়। হয়ত কোন বদমায়েস হারিতে হারিতে উন্মত্তপ্রায় হইয়া হঠাৎ কোন কুঠরী হইতে বাহির হইয়া সমস্ত ছিনিয়া লইয়া যাইতে পারে, এই ভয়ে পণ-মুদ্রা বোর্ডের উপর রক্ষিত হয় না। তৎপরিবর্ত্তে খেলুদিগের পণসংখ্যা নিরূপণের জন্য তাহাদের স্ব স্ব তাস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে খেলুদেরও চিনিয়া রাখা যায় এবং কে কে কত পণ রাখিয়াছে তাহাও ঠিক থাকে।

যদিও আরও অধিক সাবধান হইবার নিমিত্ত জুয়াদারেরা বাজীর হার ও সংখ্যা খাতায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে তথাপি প্রায়ই কোন না কোন গোলযোগ বাধিয়া যায়।

কোন রকম খেলাতেই খেলুদের চেয়ে ব্যাঙ্কের বেশী সুবিধা নাই। যদি পণ বেশ সমান ভাগে চারি সংখ্যায় প্রদত্ত হয় তাহা হইলে ব্যাঙ্কের কিছুই লাভ হয় না। তবে যে জিতিয়া যায় তাহার লাভ হইতে কিয়দংশ কমিশন স্বরূপ কাটিয়া লওয়াতেই যাহা লাভ। সচরাচর শতকরা প্রায় সাত মুদ্রা কমিশন পাইয়া থাকে। অবশ্য যখন প্রত্যেক দিনই এই ক্রীড়াগৃহগুলিই লোক পরিপূর্ণ হয় তখন লাভও যথেষ্ট হয়, কিন্তু অর্থগৃধ্নু কর্ম্মচারীরা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইবার নহে। তাহারা লাভের আশায় এই আইনবিরুদ্ধ ব্যাপারে প্রশ্রয় দেয় সুতরাং দিন দিন ক্রিড়ার মাত্রা চড়াইয়া জুয়ারীদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া থাকে। কেহ কেহ শুধু অর্থ হারাইয়াই ক্ষান্ত হয় না বস্ত্র পর্য্যন্ত পণ করিয়া হারিয়া যায়। কোন কোন সময়ে খেলুরা একেবারে বিবস্ত্র বা এক খণ্ড চটের সাহায্যে কোন মতে লজ্জাসংবরণ করিয়া ক্রীড়াগৃহ হইতে বাহির হইয়া আসে।

অন্য একপ্রকার ক্রীড়াগৃহ আছে সেখানে কেবল হেঁয়ালী লইয়া খেলা হইয়া থাকে। এই খেলাটী বেশ কৌতূহলজনক এবং চীনদেশবাসীরই একরূপ বিশেষত্ব। অন্য দেশে ইহা কদাচ দৃষ্ট হয় না। এই খেলার নাম "বৃদ্ধের সভা"। যাহারা জন্মান্তরে মনুষ্য ভিন্ন অন্য জীব ছিলেন একরূপ ছত্রিশ জন লোকের একটী তালিকা আছে। এই খেলা সেই জন্য ঐরূপ নামাঙ্কিত হইয়াছে। এই সকল ব্যক্তিগণ নয় ভাগে বিভক্ত।

১। চারি ব্যক্তির নাম যাঁহারা সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং যাঁহারা পূর্ব্ব জন্মে পর্য্যায়ক্রমে মৎস্য, রাজহংস, শ্বেত শম্বুক ও ময়ূর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

২। পাঁচ জন বীরাগ্রগণ্যের নাম যাঁহারা পূর্ব্বজন্মে কীট, শশক, শূকর, ব্যাঘ্র এবং গাভী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

৩। সাত জন কৃতবিদ্য ব্যবসায়ীদিগের নাম যাঁহারা পূর্ব্বে রাক্ষস, মক্ষিকা, শ্বেত কুক্কুর, শ্বেত অশ্ব, হস্তী, বন্যমার্জ্জার এবং বোলতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

৪। চারি জন যাঁহারা পৃথিবীতে নিরবচ্ছিন্ন সুখসম্ভোগ করিয়াছেন এবং পূর্ব্বজন্মে ভেক ঈগল, বানর এবং রাক্ষস ছিলেন।

৫। চারি জন স্ত্রীলোক পূর্ব্ব জন্মে যাঁহারা চড়ুইপাখী, মুক্তা, শ্বেতচাতক, ও কপোত ছিলেন।

৬। পাঁচ জন ভিক্ষুক যাহারা পূর্ব্বে সিগল্, সর্প, মৎস্য, হরিণ ও মেষ ছিল।

৭। চারি জন বৌদ্ধ পুরোহিত যাঁহারা পূর্ব্ব জন্মে, কপোত, মুর্গী, এল্ক এবং গো-বৎস ছিলেন।

৮। দুই জন নির্ব্বাচিত পুরোহিত যাঁহারা পূর্ব্বে শ্বেতকায় মুর্গী এবং হরিদ্রাবর্ণদাগবিশিষ্ট বিড়াল ছিলেন।

৯। একজন শ্রমণ ( বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ) যিনি পূর্ব্বে খেঁকশিয়াল ছিলেন।

এই ক্রীড়া এইরূপে পরিচালিত হইয়া থাকে—গৃহস্বামী একজন বুদ্ধিমান ও চতুর লোক নিযুক্ত করেন। তাহাকে তাহার বেশ মোটা মাহিয়ানা দিতে হয়; কারণ এইরূপ বুদ্ধিশক্তি তেমন সুলভ নহে। এই খেলাগৃহ দিনের মধ্যে দুইবার খোলা হয়। প্রত্যেক হেঁয়ালীই উল্লিখিত কোন না কোন ব্যক্তিসংক্রান্ত ও তাহার অস্তিত্বের কোন না কোন অবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট। একটী হেঁয়ালীখেলা শেষ হইবামাত্র তাহা হাজার হাজার ছাপা হইয়া বিক্রীত হইতে থাকে। জুয়াদারেরা প্রথমতঃ ইহ' বিক্রয় করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করে, পরে হেঁয়ালীর উত্তর প্রকাশ হইলে ততোধিক অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে।

ক্রেতা বা ক্রীড়কবর্গেরা এখন সেই কাগজের উপর আপন নাম, ধাম, হেঁয়ালীর উত্তর, এবং কত পণ ধরিবে সব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেয়। সমস্ত উত্তর সংগৃহীত হইলে যে হেঁয়ালী রচনা করিয়াছিল সেই ব্যক্তি উল্টাইয়া উল্টাইয়া ঠিক উত্তর গুলি বাছিয়া লয় ও তাহাদের পণ পরিশোধ করিয়া দেয়।

এতদ্ব্যতীত ইহার সহিত বহু অর্থ সংবলিত একটী পুরস্কার আছে তাহা ঠিক উত্তরদাতাদিগের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়।

শ্রীমোহিনীমোহন রায়।

# ভাষা

ও

# আদিরস।

(২)

এই আদি বৃত্তিই যে ভাষা-উৎপত্তির মূল কারণ, ইহা অন্য প্রকারেও হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। এতক্ষণ আমরা পতঙ্গ জাতিকে নীরব বিবেচনা করিতেছিলাম, এবং মৎস্য জাতির উল্লেখ মাত্রও করি নাই। মৎস্যদিগকে পক্ষী ও সরীসৃপের মধ্যবর্তী বলা যায়, এবং পক্ষিগণ যদিও জীবরাজ্য মধ্যে অনেক দূর নিম্নস্থান অধিকার করে, তথাপি ভাষা বিষয়ে ইহাদিগকে অনেক সুপটু দেখা যায়, কিন্তু মৎস্যগণ তাদৃশ নহে।

কামবৃত্তির সহিত সৌন্দর্য্যানুভব শক্তি জড়িত আছে; এবং এই শক্তির আকর্ষণে যে আনন্দময় অনুভূতি হইয়া থাকে, তাহা হইতে আসঙ্গ-লিপ্সা উৎপন্ন হয়। ইহারই ফলে জীবোৎপত্তি। এই বিধি উচ্চ শ্রেণীস্থ জীবগণ মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই প্রযোজ্য। সুতরাং ভাষাও তাহাদিগের মধ্যেই লক্ষিত হয়। অতি নিম্নশ্রেণীস্থ জীবগণ অর্থাৎ যাহারা প্রায় উদ্ভিজ্জগণের নিকটবর্ত্তী, তাহাদিগের বংশবৃদ্ধির দুই উপায় দেখা যায়; (১) বর্জ্জন, (২) বর্দ্ধিতবর্জ্জন।* জীবদেহ অংশতঃ খণ্ডিত অথবা বিভক্ত হইয়া পৃথকরূপে প্রত্যেক খণ্ড স্বতন্ত্র জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ করাকে বর্জ্জন, এবং সময়ানুসারে জীবশরীর অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে ঐ বর্দ্ধিত অংশ পৃথকরূপে জীবিকানির্ব্বাহ করাকে বর্দ্ধিতবর্জ্জন কহে। এই দুই জীববৃদ্ধির উপায় আসঙ্গ লিপ্সার সহিত কোন সংস্রব রাখে না। কারণ ইহাতে জীবদ্বয়ের আবশ্যক নাই, এবং আসঙ্গ-লিপ্সার প্রতি নির্ভর না করায় ভাষাও এই জীবগণের মধ্যে লক্ষিত হয় না। যাহারা উল্লিখিত দুই উপায়ে জীবোৎপত্তি করে, তাহাদিগের কামবৃত্তির সম্পূর্ণ অভাব; এবং ভাষা উৎপাদনোপযোগী যন্ত্রও নাই। কীটরাজ্যমধ্যেও এই কারণেই ভাষা লক্ষিত হয় না। পতঙ্গ, পক্ষী, মৎস্য ও সরীসৃপগণের ইন্দ্রিয় সকল ও শরীরযন্ত্র

(১) Geuemation: (২) Fissure.

যতই উন্নত ও উপযোগী হইয়াছে, ততই ঋতুকালে ইহাদিগের প্রাকৃতিক ও শারীরিক কারণ বশতঃ ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং ভাষাও সেই পরিমাণে পরিস্ফুট ও প্রকাশিত হইয়াছে। পক্ষী ও মৎস্যগণ, সরীসৃপ ও পশুগণ অপেক্ষা সৌন্দর্য্যপ্রিয়, এবং অনেক স্থলেই ইহাদিগের আসঙ্গ-লিপ্সা ঋতুকালে অতি প্রবল দেখা যায়। ইহারা জল ও বায়ু-মধ্যে সন্তরণ করে বলিয়া ইহাদিগের শরীরস্থ শ্বাসযন্ত্র এবং কণ্ঠনালী অপেক্ষাকৃত সমুন্নত। সুতরাং পক্ষী ও মৎস্যগণ কখনই মুখর ভিন্ন হইতে পারে না। কিন্তু মৎস্যগণের ইন্দ্রিয়-পার্থক্যজনিত স্ত্রী পুংভেদ থাকিলেও তাহারা ইন্দ্রিয় সংযোগজাত জীবগণের ন্যায় প্রবল কামবৃত্তিবিহীন হওয়ায় শরীরযন্ত্রের উন্নত অবস্থা সত্ত্বেও তাহারা ভাষা-বিষয়ে তাদৃশ পটু নহে। মনুষ্যেতর প্রাণিগণমধ্যে পক্ষিগণই সর্ব্বাপেক্ষা সুপটু, কারণ সর্ব্বাপেক্ষা কামমোহিত।

পক্ষী, মৎস্য, সরীসৃপ ও পশুগণ-মধ্যে যাহার যে পরিমাণ সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা, আসঙ্গ-লিপ্সা ও চিত্তচঞ্চলতা লক্ষিত হইবে, তাহার অধিকাংশ স্থলেই সেই পরিমাণে ভাষা-পারদর্শিতাও দেখা যাইবে। এতদ্দ্বারা কামবৃত্তিই যে ভাষা-উৎপত্তির মূল তাহা সহজেই অনুমিত হইবে। কিন্তু ভাষার প্রথম আবির্ভাব জীবগণের ইচ্ছা নিরপেক্ষ বলিয়া বোধ হইতে পারে। কারণ ঋতুকালে নিম্ন জীবগণের শারীরিক ও প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইলে যে প্রবল তরঙ্গ শরীরমধ্যে সঞ্চালিত হয়, তাহার ফলে তাহারা স্বতঃই শব্দায়মান হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ঐ শব্দ চেষ্টাপ্রসূত না হইলেও না হইতে পারে। কিন্তু কালক্রমে উহারা সেই স্বতঃ প্রসূত শব্দ স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনযোগ্য বুঝিতে পারিলে চেষ্টা-দ্বারা উহা উৎপন্ন করিবে। বিবেচনা করুন্ কোন কোন মৎস্যগণ ঋতুকালে স্বতঃ প্রসূত শব্দ উত্থিত করে! পর পরবর্ত্তী ঋতুকালে ঐ শব্দের পুনরাবৃত্তি হইলে ইন্দ্রিয় ব্যাপারের সহিত উহা স্মৃতিমধ্যে জড়িত হইয়া যায়। তখন পুং-জাতীয় জীব স্ত্রী জাতীয়কে অথবা স্ত্রীজাতীয় জীব পুংজাতীয়কে আহ্বান করিবার জন্য আসঙ্গ-লিপ্সা-প্রণোদিত হইয়া চেষ্টাপূর্ব্বক ঐ ধ্বনি উৎপন্ন করিবে। এবং তদ্দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হইলে উহাকে চর্চ্চা দ্বারা উন্নত করিবে।

কামবৃত্তির সহিত জীবচিত্তে ক্রমে অন্যান্য বৃত্তির উদয় হয়। একাধিক প্রাণী এক প্রাণীর প্রতি আকৃষ্ট হইলে ক্রমে লোভ, ক্রোধ, মোহ ইত্যাদি বৃত্তি

সকলও সঞ্জাত হইবে। এই সকল বৃত্তি শরীরযন্ত্রকে উৎকটরূপে আলোড়িত করিলে, তদ্দ্বারাও ভাষার অনেক উন্নতিসাধন হয়। প্রথমতঃ যে ভাষা কাম-সঞ্জাত, চেষ্টানিরপেক্ষ, পরে তাহা জীবগণের উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী হইলে জীবগণ তাহা চেষ্টাদ্বারা উৎপন্ন করে ও পরস্পরে তাহার অর্থ বোধ করে, এবং তজ্জন্য পরস্পরের নিকট আকৃষ্ট হয়। তখনই প্রকৃত ধ্বন্যাত্মক ভাষার (অর্থযুক্ত ধ্বনি বলিলেও হয়) সৃষ্টি হয়। একবার এইরূপে ভাষার সৃষ্টি হইলে, পরে চিত্তের অন্যান্য প্রবল বৃত্তির সাহায্যে উহা উৎকর্ষ ও বহুলতা লাভ করে। এবং ক্রমে মিশ্র বৃত্তির আবির্ভাবে জীবচিত্ত যতই বহুবৃত্ত, ও জীবদেহ যতই জটিল অঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদি সংযুক্ত হইতে থাকে ভাষা ততই জটিলতা ও বাহুল্য প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ চিত্তচাঞ্চল্য হইতেই ইহার অঙ্কুর। আসঙ্গ লিপ্সায় ইহার পুষ্টি, এবং ইন্দ্রিয় ব্যাপারে ইহার বিকাশ। এই হেতুতেই যে জীবগণের পুংজাতীয়-গণ অধিক চঞ্চল, তাহাদিগের মধ্যে পুংজাতীয়গণই অধিক শব্দায়মান, এবং যাহাদিগের স্ত্রীজাতীয়গণ অধিক চঞ্চল, তন্মধ্যে স্ত্রীগণই অধিকতর মুখরা দেখা যায়। ফলতঃ অনেক স্থলেই পুংজাতীয়গণ অপেক্ষাকৃত অধিকতর চঞ্চল হওয়ায় অধিকতর মুখর হয়। এক বংশে ভাষা আবিষ্কৃত হইলে পরবংশে তাহা পূর্ব্ব পুরুষাগত বৃত্তি রূপে পরিণত হইয়া থাকে।

কামবৃত্তি কেবল যে ভাষারই মূলকারণ তাহা নহে। ক্রমে ঐ বৃত্তি হইতে ক্রোধ, মোহাদি উপস্থিত হওয়ায় জীবগণের পরস্পর দ্বন্দ্ব বিগ্রহাদি সংঘটিত হয়। এবং তাহা হইতে নখ, শৃঙ্গ দন্ত আদি বিশেষ বিশেষ দ্বন্দ্বোপযোগী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলেরও আবির্ভাব হয়। আদিরস কেবল ভাষারই আদিকারণ তাহা নহে, উচ্চ জীবগণের শরীর গঠন ও শরীরের শোভাবর্দ্ধন বিষয়েরও প্রধান কারণ বলিতে হইবে। সুতরাং জীবগণ অশেষ প্রকারে এই বৃত্তির নিকট ঋণী। ইহা অতি শ্রদ্ধেয়, পবিত্র বৃত্তি, প্রকৃতির উদ্দেশ্য-সাধনে একমাত্র কার্য্যকর উপায়। যাহারা ঈদৃশ পবিত্র বৃত্তিকে তাহার যথাযোগ্য উচ্চাসন হইতে নিম্নে নামাইয়া ঘৃণাস্পদ করিয়া তুলে, অথবা তুলিয়াছে, তাহারা সর্ব্ব-তোভাবে ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্য, সন্দেহ নাই। এই বৃত্তির সাহায্যে মানবগণ উন্নত হইয়াছে এবং আরও হইবে। যাহারা ইহার উচ্চ আদর্শের অপভ্রংশ করে, তাহারা মানবের উন্নতিপথের বিঘ্ন স্বরূপ, ও সম্পূর্ণ বর্জ্জনীয়।

শ্রীশশধর রায়।

# বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি।

## ( রাজসাহী )

( ১ )

ইংলণ্ডের মহাওজস্বী বক্তা সহৃদয় জন ব্রাইট এক স্থানে বলিয়াছেন "জাতির প্রকৃত আবাসগৃহ কৃষকের পর্ণকুটীরে।" * বাস্তবিক পক্ষেও জাতীয় শক্তি, জাতীয় সম্পদ, জাতীয় গৌরব সমস্তই দেশের কৃষক ও শ্রমজীবিগণের উন্নত অবস্থার উপর নির্ভর করে। যে দেশের কৃষক ও শ্রমজীবিগণ মূর্খ ও দরিদ্র এবং যে দেশের জনসাধারণ নিজ নিজ উন্নতিকল্পে নিশ্চেষ্ট, সে দেশের শ্রেণী-বিশেষ হাজার শিক্ষিত ও সম্পন্ন হইলেও দেশ প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। কৃষক ও শ্রমজীবিগণ প্রকৃত পক্ষে জাতীয় দেহের মস্তক-স্বরূপ। ইংলণ্ডবাসী একথা বুঝিয়াছেন সেই জন্য জনসাধারণের কথা, জন-সাধারণের শিক্ষা, জনসাধারণের উন্নতিকল্পে ইংলণ্ডবাসী এতদূর মনোযোগী। এত দিন আমাদের দেশের শিক্ষিত ও সম্পন্ন ব্যক্তিগণ মনে করিতেন যে শ্রেণী-বিশেষের শিক্ষা ও উন্নতিদ্বারা দেশের উন্নতি হইবে, শ্রেণীবিশেষ শিক্ষিত ও উন্নত হইলেই দেশে সর্ব্বপ্রকার উচ্চ অধিকার প্রদত্ত হইবে এবং সভ্য জগতের চক্ষে দেশ স্বায়ত্তশাসনোপযোগী বলিয়া পরিগণিত হইবে। এতদিনে তাঁহা-দের সে ঘুমঘোর ভাঙ্গিয়াছে; তাঁহারা বুঝিয়াছেন ইংলণ্ডবাসিগণ শ্রেণী-বিশেষের শক্তিকে জাতীয় শক্তি বলিয়া মনে করিবার লোক নহেন, প্রকৃত জাতীয় শক্তির অভ্যুত্থান না বুঝিতে পারিলে তাঁহারা ভারতবাসীকে কোন রূপ উচ্চ অধিকার দিতে প্রস্তুত নহেন, এবং ইহা বুঝিয়াছেন বলিয়াই সাধারণের শক্তির উদ্বোধন ও নিজ শক্তির সহিত তাহার সম্মিলনজন্য তাঁহারা এতদূর বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। কৃষক ও জমিদারশ্রেণীর স্বার্থ যে একতারে বাঁধা এ ভাব ইতঃপূর্ব্বে কোন জমিদার প্রতিনিধি স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করেন নাই। শিক্ষা ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে জমিদারবর্গের মনে এই ভাব ক্রমে

* "Nation dwells in the Cottage"

পুষ্ট হইয়া এক্ষণে স্থির মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কন্‌ফারেন্সে উত্তর বঙ্গের জমিদার বর্গের প্রতিনিধিস্বরূপ নাটোরের মহারাজ বাহাদুর বলিয়াছেন—"Politically speaking, are not the masses and the classes exactly on the same footing? অর্থাৎ রাজনৈতিক হিসাবে বলিতে গেলে জমিদার ও প্রজার স্থান কি একই ক্ষেত্র নহে?

আর এক স্থানে সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন—We (zemindars) have to move with them (masses) in order to advance in the scale of national existence to secure farther political rights and to have a larger share in the administration of our country. অর্থাৎ জাতীয় জীবনের উচ্চ পদবীতে অগ্রসর হইতে হইলে, রাজনৈতিক অধিকার অধিকতর রূপে প্রাপ্ত হইতে হইলে, এবং স্বদেশের শাসনকার্য্যে অধিকতর অংশভাগী হইতে হইলে, জমিদারগণকে প্রজার সহিত একত্রে চলিতে হইবে। বহুদিন পর দেশীয় শিক্ষিত ও ধনিগণ জনসাধারণের শক্তির প্রভাব উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছেন ইহা আমাদের বড় আশার বিষয়। জনসাধারণের শক্তিকে, জনসাধারণের মতকে ইংলণ্ডবাসিগণ চিরকাল আদর ও পূজা করিয়া থাকেন। যতদিন ইংলণ্ডে জনসাধারণের মত ও শক্তির প্রভাব অনুভূত না হইয়াছিল, ততদিন তাহারা প্রায় সর্ব্বপ্রকার অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। জনসাধারণের মত ও শক্তিসমন্বিত হইয়া যখন যে প্রতিবিধান চাহিয়াছে, যখন যে অধিকারের আবদার করিয়াছে তাহা একেবারে অস্বীকৃত হয় নাই। ইংলণ্ডবাসিগণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে "জনসাধারণের মত ঈশ্বরের মতের অভিব্যক্তি মাত্র।" "*Vox populi, vox Dei*" এবং ইহাই আমাদের আশা। এক্ষণে আমাদের দেশের শিক্ষিত ও ধনিশ্রেণী বুঝিয়াছেন যে, জনসাধারণের মত ও শক্তির পূর্ণ বিকাশ হইলে ইংলণ্ডবাসিগণ আমাদের অভাব ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না করিয়া পারিবেন না। শিক্ষিতশ্রেণী, ধনিশ্রেণী এবং কৃষক ও নিম্নশ্রেণীর শক্তি ও মতের সম্মিলন রাজসাহী কন্‌ফারেন্সে যেরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে এমন পূর্ব্বে কোন কন্‌ফারেন্সে হয় নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হইবে না। রাজসাহী কন্‌ফারেন্সে ধনিশ্রেণী সকল বিষয়ে যেরূপ প্রধান উদ্যোগিতা ও উচ্চ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ পূর্ব্বে অন্য কোন কন্‌ফারেন্সে

দেখা যায় নাই। যে জমিদারশ্রেণী প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইন প্রণয়নকালে প্রজাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে স্বার্থপোষণ করিয়া প্রজাদের স্বার্থের প্রতিকূলে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, আজ ১২।১৩ বৎসর মধ্যে তাঁহারাই সমবেত হইয়া প্রজাকুলের স্বার্থের সহিত নিজস্বার্থ এক বুঝিয়া, তাহাদের স্বার্থে স্বার্থ মিশাইয়া তাহাদের শক্তিবর্দ্ধন ও উন্নতিসাধন জন্য প্রাণপণে খাটিতেছেন, জাতীয় জীবনের এ উন্নতি কি লক্ষ্য করিবার বিষয় নহে? এবং জমিদার ও প্রজাদের মত ও শক্তির এই অপূর্ব্ব সম্মিলন রাজসাহী কন্‌ফারেন্সে সর্ব্বপ্রথমে পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইবার সুযোগ পাইয়াছে, এজন্য রাজসাহী কন্‌ফারেন্স কি গৌরব করিবার অধিকারী নহে? যে দিন মুসলমান শিক্ষিত ধনিবর্গ কন্‌ফারেন্সের কার্য্যে প্রাণপণে যোগ দিবেন, দেশের স্বার্থের সহিত আত্মস্বার্থ মিশাইয়া দেশের জন্য খাটিবেন, সে দিন কন্‌ফারেন্সের উন্নতির আর এক ক্রম বাড়িবে। রাজসাহী কন্‌ফারেন্সে শিক্ষিত মুসলমান-প্রতিনিধিগণ যোগ দিয়াছিলেন এবং নিশ্চিতই সে দিন সুদূরপরাহত নহে। আশা করি ঢাকা কন্‌ফারেন্স এ গৌরবের অধিকারী হইবেন।

রাজসাহী কন্‌ফারেন্সের আর একটি বিশেষত্ব এই যে এবার কন্‌ফারেন্সের কার্য্যপ্রণালী প্রধানতঃ বাঙ্গলা ভাষায় পরিচালিত হইয়াছিল। জাতীয়তার অন্যান্য বন্ধনীমধ্যে ভাষা ও পরিচ্ছদও যে এক একটী বন্ধনী এ কথা কে অস্বীকার করিবে? হৃদয় যাহাদের এক, অভিপ্রায় যাহাদের এক, ভাষা ও পরিচ্ছদ ও তাহাদের এক হওয়া প্রার্থনীয় নয় কি? জাতীয় সভায় জাতীয় বেদন জাতীয় ভাষায় অভিব্যক্ত হওয়া সঙ্গত, স্বাভাবিক ও প্রার্থনীয় নয় কি? এই হিসাবে ধরিতে গেলে রাজসাহী কন্‌ফারেন্সে আমরা অন্যান্য কন্‌ফারেন্স অপেক্ষা জাতীয়তার ক্রমিক বিকাশের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছি। যে বিলাতফেরত বাঙ্গালিগণ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ধুতি, চাদর, পিরাণ, প্রভৃতি বাঙ্গালী পরিচ্ছদ ভ্রমেও স্পর্শ করিতেন না—আজ রাজসাহী কন্‌ফারেন্সে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বাঙ্গালী পরিচ্ছদে বাঙ্গলা ভাষায় জাতীয় বেদন নিবেদন করিয়াছেন ইহা কি বঙ্গের জাতীয় উন্নতির ক্রম-বিকাশ নহে? এবং ইহা কি "ভারতে জাতীয়তার অঙ্কুর ক্রমে উদ্গম হইতেছে" সিলি সাহেবের এই উক্তির সত্যতার পরিচায়ক নহে? সেই প্রকৃত দেশহিতৈষী যাহার জাতীয় আশাও

পরিচ্ছদের উপর অনুরাগ আছে এবং স্বজাতির প্রতি অসীম প্রেম ও টান আছে। যদি সুদূর ভবিষ্যতে বঙ্গে কখনও জাতীয় জীবন সুন্দর ও সম্পূর্ণরূপে গঠিত হয় এবং কোন এক পরিচ্ছদ জাতীয় পরিচ্ছদরূপে গৃহীত হয় তখন পরিচ্ছদবিশেষ সম্বন্ধে বাঙ্গালীর এখনকার এই পরস্পরবিভিন্ন বিসদৃশ মূর্ত্তি কেহ বিশ্বাস করিবে কি? কাহারও মস্তকে হ্যাট্, কাহারও মস্তকে ক্যাপ কাহার বা মোড়াসা কাহারও বা সামলা কাহারও পাগড়ী কাহারও বা উষ্ণীষ কত লোকের মস্তক আবরণবিরহিত কাহার কাহার বা টীকিশোভিত—কাহারও গায়ে কামিজজামা, কাহারও গায়ে সাদা জামা কাহারও বা ফিরিঙ্গি কোট, কাহারও বা পার্শিকোট, কাহারও চীনাকোট, কাহারও পাঞ্জাবী জামা, কাহারও ধুতি, কাহারও ইজার, কাহারও পাণ্টুলেন। হায়, আমরা কবে জাতীয় পরিচ্ছদে জাতীয় সম্মিলনীতে যোগ দিতে সক্ষম হইব?

কেহ কেহ কন্ফারেন্সের কার্য্যপ্রণালী সম্পূর্ণ বাঙ্গলা ভাষায় চালাইতে ইচ্ছুক। আমরা সে মত সমর্থন করি না, কারণ তাহা হইলে আমাদের একটী প্রধান উদ্দেশ্য সফল হইবার সম্ভাবনা অনেক কমিয়া যায়। সে উদ্দেশ্যটী রাজার নিকট আমাদের দুঃখের কথা আবেদন করা। প্রত্যেক বিষয়ের প্রথম বক্তৃতাটী ইংরাজীতে হইলেই এ উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। রাজসাহী কন্ফারেন্সের কার্য্য অনেকটা এইরূপেই নির্ব্বাহ হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন এই যে বৎসর বৎসর কন্ফারেনস্ হইতেছে ইহাতে একাগ্রতা (earnestness) নাই, একপ্রাণতা নাই স্বার্থত্যাগ নাই, ইহা একটা বাহ্যজাঁক জমকের ফল মাত্র। 'যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে' তেমনি কথাময় দেশহিতৈষিতা কথাতেই আরম্ভ এবং কথাতেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়। কথাটা কি ঠিক? এত বড় একটা বৃহৎ ব্যাপার অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে একাগ্রতা, একপ্রাণতা ও স্বার্থত্যাগ ব্যতীত সম্ভবে কি? এই যে দেশের সকলে অকাতরে অর্থব্যয় করিতেছেন, নিরন্ন কৃষকও ইহার জন্য সাধ্যমত সাহায্য করিতেছে, এই যে নানা স্থানের লোক নিজ নিজ কার্য্য এবং আত্মীয়বন্ধুবান্ধব ত্যাগ করিয়া নানারূপ কষ্টসহ্য করিয়া আসিয়া ইহাতে যোগ দিতেছে, ইহা কি দেশবৎসলতা ও ত্যাগস্বীকারের পরিচায়ক নহে? যে জেলায় যেবার কন্ফারেনস্ বসিতেছে সে জেলার আবালবৃদ্ধ

শিক্ষিত অশিক্ষিত এই যে গায়ের রক্ত জল করিয়া প্রাণপণে খাটিতেছে ইহা কি তাহাদের কার্য্যময়, উৎসাহময়, সাহসময়, গৌরবময়, এবং অপরিমেয় তেজোময় জীবনের পরিচায়ক নহে। কেহ কেহ বলিতে পারেন বটে দাস-ব্যবসায় উঠাইয়া দিবার জন্য গ্রেনভিল, ক্লার্কসন, বাকষ্টন, উইলবারফোবস্, জেফরীমেকলে প্রভৃতি নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতা একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া যেরূপ অদম্য উৎসাহ ও অবিচলিত ধৈর্য্যের সহিত চেষ্টা করিয়াছিলেন, দাস ব্যবসায়ের রূপান্তরিতমাত্র কুলিব্যবসায় উঠাইবার জন্য সেরূপ সাত্ত্বিক চেষ্টা এই ত্রিশ কোটী ভারতবাসীর মধ্যে কৈ একটীরও ত দেখা যায় না।—কিন্তু উইলবারফোর্স্, হাউয়ার্ড, ওয়াসিংটন, ম্যাটসীনি, গ্যারিবল্ডী, কসুক, জাতীয় জীবনের যে অবস্থাতে কার্য্য করিবার অবসর পাইয়াছিলেন, আমাদের জাতীয় জীবনের এখনও সে ভাগ, সে অবস্থা আইসে নাই। স্বাধীন ভাবের তেজ, স্বাধীন ভাবের স্ফূর্ত্তি প্রকাশ করিতে এখনও আমাদের বিলম্ব আছে। ক্রমিক শিক্ষা ও ক্রমিক বিকাশব্যতীত সেরূপ হইবার আশা কোথায়? ক্রমে আমাদের এ বিষয়ে যে শিক্ষা হইতেছে কন্‌ফারেন্সের কার্য্যক্ষেত্র তাহারই একটা মাত্র উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভবানীগোবিন্দ চৌধুরী।

---

# ছোট কথা।

লোকরঞ্জনের জন্য লোকে অনেক সময়ে নিতান্ত অজ্ঞাতসারে লোকগঞ্জনার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। কেহ কেহ আবার লোকলোচনের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া আত্মগৌরব বিকশিত করিবার আশায়, জানিয়া শুনিয়া গায়ে পড়িয়া লোকগঞ্জনার অবতারণা করিয়া থাকে। গঞ্জনার অশেষ দোষ থাকিলেও একটি প্রধান গুণ এই যে ইহাতে ধন্বন্তরির মুষ্টিযোগের মত মুহূর্ত্তে ঔষধ ধরিয়া উঠে;—নিতান্ত উদাসীন প্রকৃতির লোকেও পরচর্চ্চা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠেন;—আসরটা বেশ সহজে জমিয়া যায়।

আসর জমান, নাম জাঁকান, লোক দেখান যাহাদের প্রধান লক্ষ্য তাহারা পরচর্চ্চা ছাড়িতে পারে না। তুমি তাহাদিগকে মিছা সদুপদেশ বিতরণ করিয়া মরিতেছ কেন? তুমি কি জান না যে জীববিশেষের পক্ষে যাহা রত্নহার, জীবেতরের নিকট তাহা কেবল দাঁতে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করার সামগ্রী মাত্র?

সকলে সকল কথা বুঝিতে পারে না,—ইহা একটি প্রাকৃতিক সত্য। এক শ্রেণীর সকল ছাত্রই গণিত বা বিজ্ঞান বা সাহিত্য বা দর্শনের সকল সমস্যা সমান বুঝিতে পারে না। কিন্তু যে যত বুঝিতে পারুক বা নাপারুক কোন ছাত্রই বুঝিবার ভাণ করিতে ছাড়ে না। বিদ্যালয়ের চতুঃসীমার বাহিরেও এই রহস্য দেখিতে পাইতেছি। ইহা সার্ব্বজনীন ক্ষুদ্রতা। যে এই ক্ষুদ্রতার সীমা অতিক্রম করিয়া আপনার অজ্ঞতার কথা আপন মুখে স্বীকার করিতে কাতর হয় না, সে যথার্থ শিক্ষালাভের অবসর পায়।

যাহা বুঝি না তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, যাহা জানি না তাহা শিখিবার জন্য আকুল হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু না বুঝিয়া বুঝিবার ভাণ করিলে, না জানিয়া সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী সাজিয়া বসিয়া থাকিলে, কোন কালে কাহারও চক্ষু ফুটিবে না।

আজ কাল লিপিকণ্ডূয়ন একটা সংক্রামক রোগের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। যে পারে সে লিখিবে, আর দশজনে তাহা পড়িয়া জ্ঞানলাভ করিবে,—সে দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন সাহিত্যসেবা—ভারতীসেবা শিক্ষিত সম্প্রদায় অতিক্রম করিয়া অর্দ্ধশিক্ষিত বা সম্পূর্ণ অশিক্ষিত দলেও শনৈঃ শনৈঃ প্রবেশলাভ করিতেছে। অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী,—সাহিত্যসেবার আরম্ভও সেইরূপ ভয়াবহ। এই শ্রেণীর সাহিত্যসেবকদিগের হাতে পড়িয়া অনেক কৌতুকাবহ অপিচ ভয়াবহ সাময়িক সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে।

ইহার গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিতে নাই, চেষ্টা করাও বৃথা। বাষ্পীয়-যন্ত্রে যেমন অতিরিক্ত বাষ্পোদগমের জন্য রন্ধ্রমুখ বসাইয়া দিতে হয়, অন্যথা বাষ্পযন্ত্রটি ফাটিয়া যায়, সেইরূপ সাহিত্যযন্ত্রেও এই শ্রেণীর সাহিত্যসেবকরূপ রন্ধ্রমুখ গুলা উন্মুক্ত রাখিয়া দেওয়াই ভাল। ইহাতে অনেক ধূমোদগম হইতে পারে, অনেকের শুভ্রযশঃ ধূমসংস্পর্শে মসিমলিন হইতে পারে, তথাপি ইহাতে

সাহিত্য-সমাজের প্রভূত কল্যাণসাধিত হইয়া থাকে। এমন যে গর্ব্বোন্মত্ত সাহিত্যমোদী সুসভ্য ইউরোপ সেখানেও এই শ্রেণীর লোক আছে, সেখানেও লক্ষ লক্ষ লোকে কত আগ্রহের সঙ্গে সেই সকল জঘন্য সাহিত্যগুলা উপাদেয় বস্তুবোধে পরম সমাদরে গলাধঃকরণ করিয়া থাকে।

---

# কবিতাকুঞ্জ।

## ভুল।

কোলাহল হ'তে
সে কেন গো দূরে যেতে চায়?
সোহাগের সুখের হিল্লোলে
ফুল্লকান্তি কেন বা শুকায়?

অনাদর উপেক্ষায়
প্রস্ফুটিত যে মুখকমল,
কে জানে তা পূর্ণ ক'রে—
আজ সেথা শুধু অশ্রুজল।

একটি অঙ্গুলি-স্পর্শ —
তাও নাহি সয়।
একটি চুম্বনে— অহো!
শত ধারা বয়।

স্বরগের স্বপনের
হবে কি সে কেহ?
নতুবা এমন ক'রে
শতবার ভেঙ্গে গড়ে
ক'মিল না একটুও স্নেহ।

একটি হাসির পিছে
আজও আছে শত অশ্রু ধার!
আজিও ব্রীড়াতে ঢাকা
ইতিহাস যার।

সাধনার উপবনে
সে আমার বনফুল।
সে আমার আশা-অশ্রু,
সে আমার শুধু "ভুল"।

"প্রেমাশ্রু" রচয়িতা।

## সোহাগ।

(১)

যদি আঁখি-জল ঝরে, মুছিতে ফেল না
কপোল ভাসায়ে দাও—
সে জল হইবে মালা,
হৃদয়ে করিবে খেলা,
দ্রবময়ী মালা গলে ফুল্ল কমল প্রায়,
ঈষৎ নাচিবে তুমি প্রেম-সোহাগ-বায়।

(২)

যদি হৃদয়-আবেগে দীর্ঘশ্বাস আসে
কি কাজ সম্বরি' তায়—
মৃত তরু ভবে যারা,
মঞ্জরিত হবে তারা,
পরশিয়ে তোর অই মলয়-অমিয়-শ্বাস,
সুধার মাঝেতে সে যে গোপনে করিছে বাস।

(৩)

নিদ্রাঘোরে যদি চরণ-যুগল
বক্ষেতে আসিয়া পড়ে—
ত্রস্ত কেন তার তরে,
ও পদ হৃদয়ে ধ'রে,
বঙ্কিম বিনোদ শ্যাম নাচিয়ে খেলিয়ে যায়,
আমিও নাচিব প্রিয়ে, প্রেম সোহাগ বায়।

(৪)

ভ্রান্ত আবেগে, বাহু দিয়া মোরে যদি
যতনে বেড়িয়া ধর—
সে বন্ধনে যায় যেন,
সুখআশা আর কেন,
প্রেম পয়োধি-নীরে সেই ত তলা
সোহাগেতে প্রিয়তমা ধরিলে গলা।

শ্রী[illegible]

# অজ্ঞেয়-বাদ।

( সমালোচনা )

## তৃতীয় অধ্যায়— অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলিতে কি পরিমাণ জ্ঞান বুঝায়?

---

একজন মানুষ আর একজন মানুষকে কেমন করিয়া জানিতে পারে? কেবলমাত্র বহিরাবরণস্বরূপ মানবাকৃতিমাত্র দেখিলেই কি মানুষ মানুষকে জানিয়া থাকে? তুমি আমি ত নিত্য কতশত লোকের আকৃতি দেখিতেছি, নদীতটে বিজয়া দশমীর দিনে কত অসংখ্য নরনারীর ত আকৃতি দেখিয়া থাক, গীতবাদ্যাভিনয়কালে বা সভামণ্ডপে ত কত শত শত মানুষের আকৃতি তোমার নয়নপথে পড়িয়া থাকে,—ইহাদের সকলকেই কি তুমি জান? চক্ষু দ্বারা দেখিয়া, হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া, বহিরিন্দ্রিয়সংযোগে আকৃতিমাত্র জানিয়া কি মানুষকে জানা যায়? সকলেই বলিবেন তাহা যায় না। আকৃতি দেখিয়া তবে মানুষকে জানা যায় না কেন? কারণ মানুষের, তোমার আমার আকার নাই; শরীরেরই আকার। তুমি যাহাকে 'তুমি' বলিতেছ, যাহাকে আমি 'আমি' বলিতেছি, তাহার কোন আকার, কোন বর্ণ, কোন দৈর্ঘ্য প্রস্থ নাই। তবে এই আকারহীন বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর স্পর্শশব্দহীন মানুষকে মানুষ কেমন করিয়া জানিতে পারে? কে দয়াবান্, কে নির্দ্দয়, কে দাতা, কে কৃপণ, কে জ্ঞানী, কে অজ্ঞান তাহা কেমন করিয়া জানা যায়? উপায় অতি সহজ ও সার্ব্বভৌমিক, নচেৎ অতি অল্পমাত্র বুঝিযাই একজন মানুষ আর একজনকে জানিয়া দয়াবানের প্রশংসা নির্দ্দয়ের নিন্দা করিতে পারিত না, দাতার শরণাপন্ন ও কৃপণকে পরিত্যাগ করিতে পারিত না, জ্ঞানীর নিকট জ্ঞানশিক্ষার্থ গিয়া অজ্ঞানকে দূরে বর্জ্জন করিতে পারিত না। অবশ্য এই জ্ঞান সম্পূর্ণ নহে,—যৎসামান্য মাত্র। কিন্তু এই যৎসামান্য জ্ঞানলাভের পথ আছে, তাহা পরিদর্শন

কার্য্যকলাপ দেখিয়া মানুষ মানুষকে চিনিয়া থাকে। আমি এইরূপ করিয়া মানুষকে জানি, তুমিও এইরূপ করিয়াই মানুষকে জানিয়া থাক, দ্বিতীয় আর কোন পথ নাই। একজনকে কৌশলময় যন্ত্র প্রস্তুত করিতে দেখিয়া তুমি তাহাকে কৌশলময় মনে করিতেছ, পুত্র কন্যা, বন্ধু বান্ধবদিগকে স্নেহ মমতা করিতে দেখিয়া অথবা যে সকল কার্য্য হইতে স্নেহ মমতা অনুমান করা যায়, সেই সকল কার্য্য করিতে দেখিয়া তাহাকে স্নেহময় মনে করিতেছ, কিন্তু কি কৌশল, কি স্নেহ কোন স্বরূপেরই অন্ত পাইতেছ না, সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া শেষ করিতে পারিতেছ না! জ্ঞানীর জ্ঞানপ্রভা কত আলোকময়ী তুমি তাহা সম্পূর্ণ বুঝিতে পার কি? মাতার প্রাণে অপত্যস্নেহের কি অসীম মহিমা তাহা তুমি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পার কি?

অজ্ঞেয়বাদিগণের প্রধানতম তর্ক এই যে মানবজ্ঞান যখন সাপেক্ষিক, তখন তাহা দ্বারা পরমেশ্বরতত্ত্ব অবগত হওয়া অসম্ভব। জ্ঞাতা ও জ্ঞাতব্য দুইটির মধ্যে একটির দোষ থাকিলে জ্ঞানের অভাব হইয়া থাকে, ইহা আমরা স্থানান্তরে বলিয়াছি। যদি জ্ঞাতব্য বস্তুর দোষ অর্থাৎ 'অস্তিত্ব' না থাকে, জ্ঞাতার জ্ঞানশক্তি থাকিলেও তাহা অজ্ঞেয়, আর যদি তাহার অস্তিত্বও থাকে, তাহা হইলেও জ্ঞাতার জ্ঞানশক্তির অভাব থাকিলে তাহাকে জ্ঞাতা জানিতে পারে না। অজ্ঞেয়বাদিগণ ইহার মধ্যে মানবজ্ঞানের সাপেক্ষিকত্ব দ্বারা জ্ঞাতার জ্ঞানশক্তির অভাব প্রমাণ করিয়াছেন মাত্র, সুতরাং জ্ঞাতব্য পরমেশ্বর অজ্ঞেয় বলা সঙ্গত নহে, বরং বলা সঙ্গত তিনি জ্ঞাতব্য কি না, তিনি জ্ঞেয়, কি অজ্ঞেয় মনুষ তাহা জানিতে পারে না। কিন্তু তাহা আর বলিবার উপায় নাই, কারণ অজ্ঞেয়বাদী জানিতে পারেন যে, তিনি 'আদি কারণ'। সাপেক্ষিক জ্ঞানে কি নিরপেক্ষজ্ঞানগম্য বস্তু জানা যায় না? তাহাই আলোচনা করিয়া দেখ।

আমরা আত্ম বিষয়সম্বন্ধে নিরপেক্ষ জ্ঞানের অধিকারী। তোমার যে অস্তিত্ব আছে, জ্ঞান আছে, ভালবাসা আছে, সৌন্দর্য্য পিপাসা আছে, ভালমন্দ বিচারশক্তি আছে, তাহার কোন আকৃতি নাই, তাহা তোমার অন্তরে, নিরাকার বৃত্তিমাত্র। কে বলিল যে তোমার ঐ সকল বৃত্তি আছে? তুমি বলিবে কেহ না বলিতে পারিলেও, কাহারও সহিত তুলনা না করিলেও সত্যসত্যই যে ঐ সকল বৃত্তি তোমার আছে, তাহা তুমি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতে

পার,—ইহাই নিরপেক্ষ জ্ঞান। তোমার বুদ্ধিজ্ঞানাদি তোমার যেমন নিরপেক্ষ জ্ঞানের বিষয়, আমার বুদ্ধি জ্ঞানও সেইরূপ আমার নিরপেক্ষ জ্ঞানগম্য। কিন্তু তোমার যে বুদ্ধি জ্ঞান আছে, তাহা আমি নিরপেক্ষ জ্ঞানে জানিতে পারি না, কারণ যাহা আমার বাহিরে তাহার জ্ঞান সাপেক্ষিক। পরমেশ্বর যখন আত্মাতিরিক্ত সত্তা তখন তাঁহাতে কি কি স্বরূপ, কি কি গুণগ্রাম আছে তাহার নিরপেক্ষ জ্ঞান সম্ভবে না; সুতরাং তিনি অজ্ঞেয়। ইহাই অজ্ঞেয়বাদের দার্শনিক মত। পরমেশ্বরের জ্ঞান সম্বন্ধে যেমন তোমার আমার নিরপেক্ষ জ্ঞান নাই, সেইরূপ আমার জ্ঞান সম্বন্ধে তোমার, এবং তোমার জ্ঞান সম্বন্ধেও আমার নিরপেক্ষ জ্ঞান নাই। আমার যে জ্ঞান বুদ্ধি, স্নেহ মমতা আছে তাহা নিরপেক্ষজ্ঞানে তুমি প্রমাণ করিতে পার না বলিয়া কি বলিতে পার আমি তোমার নিকট "অজ্ঞেয়"? অন্য মানুষের জ্ঞান প্রেম প্রভৃতি আমরা কেমন করিয়া জানি? কার্য্য দেখিয়া তাহা জানা যায়। তোমাকে একটি কঠিন তর্কবহুল প্রবন্ধ লিখিতে দেখিয়া তোমার জ্ঞান আছে বলিয়া বুঝি, কিন্তু তাহা যে জ্ঞানের পরিচয় দেয় কে বলিল? কে বলিল তোমার কার্য্য জ্ঞান হইতে সমুত্থিত হইতেছে, তাহা ত প্রত্যক্ষ করিতেছি না? ইহার উত্তর এই যে, আমি জানি ঐরূপ প্রবন্ধ জ্ঞান ভিন্ন আমি লিখিতে পারি না, সুতরাং তুমি যখন লিখিতেছ, তখন নিশ্চয় তোমার জ্ঞান আছে। এইরূপে আমরা কাহারও বুদ্ধি অল্প, কাহারও বুদ্ধি অসামান্য বলিবার সময়েও আমাদের সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকি, ইহাই সাপেক্ষিক জ্ঞান; এই জ্ঞানে যেমন করিয়া আমার বুদ্ধি জ্ঞান থাকা তুমি জানিতেছ, তোমার বুদ্ধি জ্ঞান থাকা আমি জানিতেছি, সেইরূপ তুমি আমি কি জগতের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া আদি কারণের বুদ্ধিজ্ঞানাদি বুঝিতে পারি না? পারি—কিন্তু তাহার পরিমাণ করিতে পারি না, তাহার বিস্তৃতি গভীরতা জানিতে পারি না, এই মাত্র প্রভেদ! যেমন তোমার অপেক্ষা আর একজন মানুষের জ্ঞান সংখ্যায় ও পরিমাণে অত্যধিক হইলে তুমি তাহাকে অধিক জ্ঞানী বলিয়া জানিয়া থাক, সেইরূপ যখন পরমেশ্বরের জ্ঞানের অস্তিত্ব জানিয়া তাহার সীমা জানিতে পার না, তখন তাঁহাকে অনন্তজ্ঞানময় বলিয়া সম্বোধন কর। সুতরাং বাস্তবিক তাঁহার স্বরূপাদি সম্বন্ধে কিছু জানা যায় কি না তাহাই আলোচনা

করা উচিত, সম্পূর্ণরূপে জানা যায় কি না তাহার তর্কের প্রয়োজন কি? আস্তিকগণ তাঁহার সীমা না পাইয়া বলেন তিনি অগম্য অপার। "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ" কিন্তু এমন কথা বলেন না যে তিনি একেবারেই অজ্ঞাত। যেমন পরমেশ্বর জ্ঞাত ও অজ্ঞেয়, বাহ্যবস্তুও কি সেইরূপ নহে? বাহ্যবস্তু ও নিত্যবস্তু উভয়ের সম্বন্ধেই সাপেক্ষিক জ্ঞানে যতদূর জানা যাইতে পারে ততদূরই মানুষ জানিতে পারে, সাপেক্ষিক জ্ঞানে যাহা জানা যায় না, যাহা জানিতে হইলে নিরপেক্ষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, তাহা চিরদিনই অজ্ঞেয় থাকিয়া যায়। সেই জন্য কেবল আদি-কারণ কেন, জগতের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল বস্তুই কতক পরিমাণে জ্ঞেয়, কতক পরিমাণে অজ্ঞেয়। আমাদের চারিদিকে যেমন এই অজ্ঞেয়-বাদের মহাসাগর তেমনি ইহার মধ্যে জ্ঞেয়-বাদের প্রশান্ত উপকূলেরও অভাব নাই! বাহ্যবস্তুর সম্বন্ধে এই উপকূলের উপর বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে. অতীন্দ্রিয় আদি-কারণ সম্বন্ধে এই উপকূলের উপর ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। কি ধর্ম্ম, কি বিজ্ঞান উভয়কেই জ্ঞেয়ের আলোক ও অজ্ঞেয়ের অন্ধকারে পর্য্যায়ক্রমে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, উভয়েরই চারিদিকে কতকদূর উজ্জ্বল, তাহার পরই সূচীভেদ্য অন্ধকারের রাজ্য—অনন্ত অপার!! বিজ্ঞান এবং ধর্ম্ম যাহা দেখিতে পায় না তাহাকে স্বদৃষ্ট বলা যেমন অসঙ্গত, সেইরূপ যাহা দেখিতেছ তাহা অস্বীকার করা মূর্খতা নহে কি?

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়.

---

# জুলিয়স সিজারে পোর্সিয়া।

---

মহাকবি বা স্বাভাবিক কবিগণের সহিত সাধারণ বা কৃত্রিম কবিগণের প্রভেদ অবশ্য যথেষ্ট। প্রথমোক্ত কবিগণের কল্পনা সর্ব্বদা পবিত্র ও অন্তস্তল-স্পর্শিনী। তাঁহারা স্বীয় ভাবসমুদ্রে ডুবিয়া যে সমস্ত অমূল্য রত্নরাজি উত্তোলন করেন তাহা জনগণের মন হরণ করে,—ক্ষণকালের জন্য পাঠকের আত্মবিস্মৃতি জন্মাইয়া দিয়া থাকে। মহাকবিগণের গুণগ্রামের আলোচনা

করা এস্থলে সম্ভব ও উদ্দেশ্য নহে। তবে প্রসঙ্গাধীন একটি কথা এই বলা যাইতে পারে স্বভাবের প্রিয় শিশু কবি সামান্য একটি রেখা পাতে, সামান্য একটি কথায় অথবা সামান্য একটু ইঙ্গিতমাত্রে যে কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন, অন্য লোককে তাহা প্রকাশ করিতেই যথেষ্ট সময় ও বাক্যব্যয় করিতে হয় এবং এতটা করিয়াও হয়ত সেরূপ সুন্দররূপে কার্য্যোদ্ধার করিতে সক্ষম হন না; হয়ত শিব গড়িতে বানর গড়িয়া ফেলেন। স্বাভাবিক কবি কালিদাস বা ভবভূতি যে ভাব একটি কথায় ফুটাইয়া দিয়াছেন, সামান্য কোন কবি হয়ত সে ভাবধারণাই করিতে পারেন না, অন্যকে বুঝান ত দূরের কথা। ভবভূতির উত্তর চরিতে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে। রামচন্দ্র যখন দুর্ম্মুখের নিদারুণ বাক্যে ব্যথিতহৃদয় হইয়া নানা বিলাপ ও পরিতাপপূর্ব্বক নিদ্রিতা সীতাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন তখন সীতা দুঃস্বপ্ন দৃষ্টে চমকিয়া উঠিয়া চঞ্চল চিত্তে রামচন্দ্রের অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু পাইলেন না। প্রণয়িহৃদয় সদাই অভিমানপূর্ণ, নিদ্রিতাবস্থায় এরূপ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ায় সীতার অভিমান হইল,—ক্রোধ নহে,—অভিমান, সীতা অভিমানভরে বলিলেন "অহং তস্সৈ কোবাসি, জইতং দিট্টা অত্তনং পভবামি"। এই শেষ কথাটিতে সীতা-চরিত্রের কেমন উজ্জ্বল স্ফুরণ হইল পাঠক বিবেচনা করুন, "যদি তাঁহাকে দেখিয়া আমার নিজের উপর কর্তৃত্ব থাকে তবে আমি রাগ করিব!" কবি এই কথাতেই সীতার রামের উপর ভালবাসা কত প্রগাঢ়, আত্মবিসর্জ্জন কতদূর তাহা অতি সুন্দরভাবে দেখাইয়া দিলেন। একস্থলে বলিয়াছেন "তওস্স কিমপি বত্থু যো হি যস্স প্রিযোজনঃ।" এই এক "কিমপি" কথায় তিনি যে ভাব-সামগ্রী প্রকাশ করিয়াছেন অন্য কেহ শত কথাতেও তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। এইরূপ কোন চরিত্রাঙ্কনসময়ে সামান্য কয়েক রেখা পাতেই কবি এরূপে তাহা সাজাইতে পারেন যে তাহাতেই পাঠকের মনে একটা সুন্দর ছবি উপস্থিত করিয়া দেয়। ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান কবি জগৎপূজ্য অমর সেক্‌স্‌পিয়ারের জুলিয়স্ সিজার নামক উৎকৃষ্ট নাটকের পোরসিয়ানাম্নী রমণীর চরিত্রটী যখনই পাঠ করি, তখনই আমার এই কথা গুলি মনে হয়, তখনই আমি অমর কবিকে ভক্তিভরে নমস্কার করি। পোর্সিয়া-চিত্রে কবি বেশী স্থান বা বাক্যব্যয় করেন নাই,

কেবল দুইবার মাত্র আমরা তাহাকে দেখিতে পাই। সে দুইবারও বড় বেশীক্ষণের জন্য নহে সামান্য ক্ষণমাত্র, কিন্তু তাহাতেই আমরা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি।

জুলিয়স সিজরের ২য় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে যখন কেসিয়াস্ কাস্‌কা, ডেসিয়ান্‌, সিনা, মেটেলাস্ সিম্বার, টারবোলিয়াস প্রভৃতি ব্রুটাসের নিকট আসিয়া জুলিয়স্ সিজরের হত্যাসম্বন্ধীয় ষড়যন্ত্র করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং ব্রুটাস্ স্বীয় ভৃত্যকে ডাকিয়া তাহাকে নিদ্রিত দর্শনে ক্ষান্ত হইলেন তখন পোর্সিয়া প্রথম আমাদের সম্মুখে দেখা দিলেন। ব্রুটাস্ কতদূর সৎস্বভাব, ন্যায়পরায়ণ, সত্যব্রত ছিলেন তাহা বুঝাইবার স্থান এ নহে, কিজন্য তিনি সিজরের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিলেন তাহাও বলিবার স্থান এ নহে, কিন্তু তাঁহার ও শত্রুবর্গের কথাতেই তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। যখন ইতিপূর্ব্বেই কেসিয়াস্ এনটোনিকে মারিবার প্রস্তাব করিলেন তখনও ব্রুটাস্ বলিলেন—

* * *

Let us be sacrificers, but no butchers, Cassius,
We will stand up against the spirit of Cæsar :
And in the spirit of men there is no blood
O, that we then could come by Cæsar's spirit,
And not dismember Cæsar ! But, alas,
Cæsar must bleed for it !

* * *

এইরূপ আরও নানাস্থান হইতে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে ব্রুটাস স্বদেশের মঙ্গলার্থে ( Not that I loved Cæsar less, but that I loved Rome more ) একার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন। যাহাহউক উৎকণ্ঠিত ব্রুটাস্‌কে সেই অবস্থায় চমকিত করিয়া তাঁর ধর্ম্মপত্নী পোর্সিয়া ডাকিলেন "Brutus, my Lord" ব্রুটাস্ যেন চমকিত হইলেন। "পোরসিয়া, তুমি এ গভীর রাত্রে কেন উঠিলে, তোমার শরীর ভাল নয়, এরূপ শীত-বাতভোগ তোমার বিশেষ অস্বাস্থ্যকর অতি স্নেহের সঙ্গে ব্রুটাস্ এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যথিতা, দুঃখিতা স্ত্রী অতি কাতরে বলিলেন "তোমার শরীরই কি এত ভাল ? তুমি কেন এমন হইলে ? তুমি এরূপ গভীর রাত্রে গোপনে আমার শয্যাত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছ ! আহার বিহারে তোমার রুচি নাই। আমার দিকে মধ্যে মধ্যে

কর্কশ দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, কখন বা ভূমিতে পদাঘাত কর, এসব কি ?" প্রথম প্রথম আমি ভাবিতাম, এ সব ক্ষণস্থায়ী মানসিক উত্তেজনা মাত্র—শীঘ্রই দূর হইবে। এখন দেখিতেছি তাহা নয়। কোন দুশ্চিন্তা তোমার শরীর নষ্ট করিতেছে। বল প্রভো, তোমার দুঃখের কথা আমাকে বল। কি অন্তর্দাহে তুমি দগ্ধ হইতেছ ?" কোমল হৃদয়া রমণীর নিকট কিরূপে ব্রুটাস্ সে ভয়ানক কথা প্রকাশ করিবেন ? গুহ্য কথা রমণীর নিকট ব্যক্ত করিতে সমস্ত শাস্ত্রকার নিষেধ করিয়াছেন, কেমন করিয়া এতবড় ভয়ানক বৃত্তান্ত পোর্সিয়াকে ভাঙ্গিয়া বলিবেন ? অতএব আমতা আমতা করিয়া বলিলেন "আমার স্বাস্থ্য বড় ভাল নাই, এই আর কি!" পোর্সিয়া ছাড়িল না, সে ছাড়িবার নহে—অমনি বলিল তুমি বুদ্ধিমান্, তুমি বিজ্ঞ, শরীর যদি অসুস্থ হইয়া থাকে তবে তুমি নিশ্চয়ই উপশমের চেষ্টা করিতে।" ব্রুটাস্ পোর্সিয়ার নিকট হইতে মুক্তি পাইবার আশায় বলিলেন, "কেন সে চেষ্টা ত আমি করিয়া থাকি, প্রিয়তমে তুমি এখন শোওগে যাও।" কিন্তু পোর্সিয়া ভুলিল না, সে বুঝিল তাহার স্বামী তাহাকে গোপন করিয়া কোন এক অজ্ঞাত উৎকণ্ঠা হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন আজ সে কথা বাহির করিয়া লইতেই হইবে সে স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, অতএব সে যাইবে কেন ? সে মনের দুঃখে মনের কষ্টে আবেগের সঙ্গে বলিল—"যদি তুমি অসুস্থ, তবে এইরূপ অনাবৃত দেহে এই সময়কার বিষময় শীতল বাতাস ভোগ করিতেছ এটা কি উচিত ? যদি তুমি অসুস্থ তবে সুখময় শয্যাত্যাগ করিয়া রাত্রির বিষময় রোগের আকর শিশির ও শীতল বায়ু সেবন করা বুঝি তোমার হিতকর ? প্রিয়তম, প্রভো, এ সব মিথ্যা কথা; নিশ্চয়ই তোমার মনে কোন বিশেষ দুঃখ আছে তাহাতে সন্দেহ নাই

Which, by the right and virtue of my place
I ought to know of. And upon my knees beauty
I charm you, by my once commended
By all your vows of love, and that great vow
Which did incorporate and make us *one*
That you unfold to *me, yourself, your half,*
Why you are heavy * *

পোর্সিয়া বর্ম খুলিয়া প্রেমবন্ধন দেখাইয়া অভিমানময়তা প্রদর্শন করিয়া

বলিতেছে, 'বল কেন তুমি এত দুঃখিত ?' আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী, যে মহাবন্ধনে আমরা এক হইয়া গিয়াছি, "যদিদং হৃদয়ং মম তদিদং হৃদয়ং তব" হইয়া গিয়াছে অতএব তোমার কষ্ট, তোমার দুঃখ, আমি কেন জানিব না ? তোমার কষ্টের অংশভাগিনী যদি না হইলাম তবে আমি ধর্ম্মপত্নী কিসে ? পোর্সিয়া নতজানু হইয়া করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছেন দেখিয়া ব্রুটাস্ বিচলিত হইলেন। ধর্ম্মপত্নীর, প্রাণাপেক্ষা প্রণয়িনীর এরূপ অবস্থা সহ্য হয় না! তিনি পোর্সিয়াকে নিবারণ করিলেন। পোর্সিয়ার উদ্দাম হৃদয় তখন মুক্ত—আবেগ অপ্রতিহত ভাবে ছুটিয়াছে, আর বাধা মানে না, পোর্সিয়া বলিতে লাগিল—

Within the bond of marriage tell me Brutus,
Is it expected, I should know no secrets
That appertain to you? Am I yourself,
But as it were in *sort or limitation*,
To keep with you at meals comfort your bed,
Ane talk to you sometimes? Dwell I but in the suberbs
Of your good pleasure? If it be no more,
*Portia is Brutus' harlot not his wife*

উঃ! কি তীব্র উক্তি! ব্রুটাসের অন্তস্তল বিদীর্ণ হইল! তিনি চমকিয়া তাহা—সে উক্তি মুছিয়া দিবার জন্য, বাতাসে উড়াইবার জন্য, অস্তিত্ব লোপ করার জন্য বলিয়া উঠিলেন না, না, তুমি আমার সাধ্বী, পতিব্রতা, বহুমানভূষিতা ধর্ম্মপত্নী! আমার এই সামান্য দেহের প্রত্যেক রক্ত কণিকার ন্যায় আমার অতি প্রিয়তমা স্ত্রী তুমি! ব্রুটাসের কর্ণে তখনও পোর্সিয়ার শ্লেষাত্মক মর্ম্মবিদারক শেষ উক্তি ধ্বনিত হইতেছিল।

পোর্সিয়া তাহা শুনিয়া আরও উত্তেজিত হইলেন। মনের কষ্ট যেন দ্বিগুণ হইল। তিনি বলিলেন 'যদি এ কথা সত্য হইত, বাস্তবিক তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী বলিয়া মনে করিতে, তাহা হইলে আমাকে তোমার গুপ্ত কথা জানাইতে। স্বীকার করি আমি দুর্ব্বলহৃদয়া রমণী, গুপ্তরক্ষণে অক্ষমা, কিন্তু আমি কি সাধারণ রমণী হইতে একটুও অসাধারণ নহি? স্বীকার করি আমি রমণী, কিন্তু

"A woman that lord Brutus took to wife,
A woman, well reputed,—Cato's daughter

Think you, I am no stronger than my sex,
Being so fathered and so husbanded ?
Tell me your counsels, I willl not disclose them;
I have made strong proofs of my constancy
Giving myself a voluntary wound
Here in the thigh: can I hear that with patience,
And not my husband's secrets ?"

কি তেজের কথা! রমণী হইলে কি হয়? যে কেটো রোমের অধীনতা দেখিবেন না বলিয়া নিজ জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, সেই মহাত্মার কন্যা এবং এতবড় হৃদয়বান্ দৃঢ়ব্রত ব্রুটাসের স্ত্রী হইয়া এবং তাঁহাদের নিকট শিক্ষা পাইয়া কি আমার একটুও মনের বল, ধৈর্য্য জন্মে নাই? আমাকে তোমার মনের গুপ্ত কথা বল, আমি প্রকাশ করিব না। পোর্সিয়া তাহার পর বলিতে লাগিলেন "ইহাতেই আমি ক্ষান্ত হই নাই, এরূপ পিতার কন্যা ও এরূপ স্বামীর স্ত্রী হইয়াও আমি আমাকে প্রত্যয় করিতে পারি নাই, তদপেক্ষা দৃঢ় প্রমাণ দ্বারা আমার মনের দৃঢ়তার পরীক্ষা করিয়াছি। তার পর—সে প্রমাণ পাইবার পর তোমার গুপ্ত কথা জানিতে আসিয়াছি। আমি সে কষ্ট সহ্য করিতে পরিলাম আর আমার জীবনের সহচর প্রাণের বস্তু স্বামীর গুপ্ত কথা রাখিতে পারিব না? নিজ কষ্ট সহ্য করিতে পারিলাম তদপেক্ষা গুরুতর কষ্টদায়ক তোমার মঙ্গল ও অসুস্থতা,—তাহা নিবাকরণ করার জন্য তোমার গুপ্ত কথা গোপন রাখিতে পারিব না? নিশ্চয় পারিব! পাঠক সে দৃঢ় প্রমাণটা কি জানেন? পোর্সিয়া নিজ স্বামীর গুপ্ত কথা জ্ঞাত হইয়া তাঁহার অন্তরের গূঢ় ব্যথা দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার জন্য, আর সেই গুপ্তকথা যাহাতে স্ত্রীজনসুলভ বাচালতা দ্বারা প্রকাশিত হইয়া স্বামীর অমঙ্গল না ঘটে সে বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবার জন্য স্বীয় শরীরে ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্ষুরাঘাতে ক্ষত করিয়াছিলেন। আঘাতে জ্বরে আক্রান্ত হইলেন, তবু সে ব্যথা সহ্য করিয়া ব্রুটাসের গুপ্ত বিষয় জানিতে আসিয়াছিলেন। * (ক্রমশঃ)

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

* এ বিষয়ে প্লুটার্ক বলিয়াছেন:—This young lady (Portia) being excellently well seen in philosophy, loving her husband well, and being of a noble

# সবুজ সার।

'সবুজ সার' কথাটী ইংরাজীর ছাঁকা অনুবাদ। বিলাতে ইহাকে 'Green manure' বলে। ক্ষেত্রে কোন শস্য বপন কর, বায়ু ও উত্তাপের সাহায্যে বীজ অঙ্কুরিত হইল; দেখিতে দেখিতে ক্ষেত্রে শ্যামল পত্র পল্লবে পরিশোভিত হইল; এমন সময় তাহার উপর লাঙ্গল ও মৈ চালাইয়া ঐ শস্যকে ধরাশায়ী করিয়া মৃত্তিকার সহিত বিমিশ্রিত করিলে মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি যে বর্দ্ধিত হয়, তাহা ইংলণ্ডের কৃষকেরন্যায় আমাদিগের দেশের কোন কোন স্থানের কৃষকেরা ও পরিজ্ঞাত আছে।

নীল ও শণ এরূপ করিয়া কোন কোন স্থানে মৃত্তিকাবিমিশ্রিত করা হয়। ইহাতে পরবর্ত্তী শস্যের যে প্রকার 'চালন' হয়, তাহাতে কৃষকের লাভ ভিন্ন ক্ষতি হয় না। কোন কোন স্থানে "শ্যামাক তৃণের" বীজ বপন করিয়া, গাছ বাহির হইলে তাহাকে মৃত্তিকায় মিশাইয়া সেই ক্ষেত্রে ধান্য রোপণ করা হইয়া থাকে। কোথাও বা ক্ষেত্রের স্বভাবজাত ঘাস গুলি লাঙ্গল দ্বারা উল্টাইয়া ক্ষেত্রে জল বাঁধিয়া তাহা পচাইয়া, পরে ঐ ক্ষেত্রে ফসল বপন বা রোপণ করা হয়।

---

courage, as she was also wise: becouse she would not ask her husband what he ailed before she made some proof by herself: she took a little razor, such as barbar's occupy to pare men's nails, and causing her maids and women to go out of her chamber gave herself a great gush withal in her thigh, that she was straight all of a gore blood and incontinently after a vehement fever took her by the pain of her wound. Then perceiving her husband was marvelousy out of quiet * * even in her greatest pain of all she spake in this sort unto him:—I being O Brutus the daughter of Cato &c &c. I can find no cause of fault in thee touching our match, but for my part how may I shew my duty towords thee and how much I would do for thy sake, if I cannot bear a secret mischance or grief with thee which requireth secrecy and fidelity? I confess that a woman's wit commonly is too weak to keep a secret safely: but, yet, Brutus, good education and the company of virtuous men have some power to reform the defect of nature."

আমাদিগের দেশের মৃত্তিকায় সচরাচর দুইটী পদার্থের অভাব দেখিতে পাওয়া যায় (১) যবক্ষারযান (nitrogen) এবং (২) অঙ্গারযানজ পদার্থ (carbonaceous matter) কিন্তু এই দুই পদার্থই উদ্ভিদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ফল ফুল গঠনের প্রধান সহায়।

একজাতীয় উদ্ভিদ আছে তাহারা বায়ুমণ্ডলের যবক্ষারযানকে মৃত্তিকায় আনিয়া বাঁধিয়া রাখিতে বড়ই সক্ষম। ইহাদিগকে 'জাতীয় উদ্ভিদ' (leguminous) কহে। ডিম্বের শ্বেতাংশের ন্যায় এক প্রকার পদার্থকে 'লেগুমেন' (legumen or legume) বলে। এই পদার্থ যে সকল উদ্ভিদের বীজে পরিলক্ষিত হয়, তাহাদিগের নাম 'লেগুমিনাশ' অর্থাৎ লেগুমেনসংযুক্ত উদ্ভিদ। আমাদিগের বাবলা, নীল, শণ, ছোলা, মটর, অড়হর ও শিম প্রভৃতি এই জাতীয়। ইহারা যে মৃত্তিকায় জন্মে, সেই মৃত্তিকাতে অধিক পরিমাণ যবক্ষারযান বায়ুমণ্ডল হইতে আসিয়া আবদ্ধ হয়। জর্ম্মাণদেশীয় পণ্ডিত হেলবিজেল তিন বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া এই জাতীয় উদ্ভিদের এই অসাধারণ ক্ষমতা বুঝিতে পারিয়াছেন। এই উদ্ভিদের মূলাগ্রে গোলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়ব দেখিতে পাওয়া যায়। এই গোলাবয়বই যে যবক্ষারযান গ্রহণের প্রধান সহায় তাহা একপ্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে। ঐ অবয়বে অতীন্দ্রিয় জীবাণু আছে। এই জীবাণুই প্রকৃত প্রস্তাবে বাতাসের যবক্ষারযান চুরি করিয়া থাকে। হেলবিজেলের পরীক্ষাফল ঘোষিত হইলে পৃথিবীর নানা দেশের পণ্ডিতগণ ইহার সত্যতা জানিবার জন্য প্রবৃত্ত হন। বিলাতে, ফ্রান্সে ও রুষিয়ায় হেলবিজেলের পরীক্ষা পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত হয়। অনেক বড় বড় কৃষিরসায়নবিৎ ও উদ্ভিদবিদ্যাবিশারদগণই জর্ম্মাণ পণ্ডিতের সহিত একমত হইয়াছেন। তবে, অধ্যাপক ফ্রাঙ্কপ্রমুখ একদল পণ্ডিতের মত এই যে, সমুদায় হরিৎপত্রবিশিষ্ট তরুই বায়ুমণ্ডলের যবক্ষারযান সংগ্রহ করিতে পারে; কিন্তু তাহাদিগের বীজনিহিত যবক্ষারযান নিঃশেষিত হইলে ধান্য প্রভৃতি অনেক উদ্ভিদ্ দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত যবক্ষারযান সংগ্রহ করিতে পারে না; সেইজন্য তাহাদিগকে সাররূপে যবক্ষারযান যোগাইতে হয়; লেগুমেন জাতীয় উদ্ভিদের মূলাগ্রে ক্ষুদ্র গোলাবয়ব থাকায় উহার মূল প্রসারণের বিশেষ সুবিধা আছে; এবং সেই জন্য উহারা মৃত্তিকা হইতেই যবক্ষারযান অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করিতে পারে। কোন্ মতটী শুদ্ধ তাহার বিচারে

প্রয়োজন নাই; কিন্তু ইহা স্থির যে লেগুমিনাশ উদ্ভিদ যবক্ষারযান সংগ্রহে পারদর্শী। উহারা বায়ুমণ্ডলের অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে তাহা গ্রহণ করে, কিংবা নিম্নতলস্থ মৃত্তিকা হইতে শোষণ করিয়া লয়, তাহা না বুঝিলেও, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে এবং পরীক্ষাদ্বারা প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে কোন ক্ষেত্রে মটরাদি শস্যের চাষ করিলে তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক যবক্ষারযান সঞ্চিত হয়। ঐ সকল উদ্ভিদের মূলাগ্রে যে গোলাকৃতি অবয়বের কথা উল্লিখিত হইল, তন্মধ্যে প্রকৃত জীবাণু মৃত্তিকা হইতে আসিয়া মূলাগ্রে সংলগ্ন হইয়া উহাকে গোলাকৃতি করে কিনা, অথবা উহা জীবাণু না হইয়া উদ্ভিদাণু হইবে তাহার নির্ণয় করিবার নিমিত্ত অধুনা অনেক মেধাবী পণ্ডিত ব্যাপৃত রহিয়াছেন। কার্য্য জানা গিয়াছে, কারণ ও কারণের প্রকার নিরূপণে তাঁহারা ব্যস্ত।

এ দেশের গবর্ণমেণ্টের অনেক গুলি পরীক্ষাক্ষেত্র আছে। শণ ও নীল বপন করিয়া তাহা কিছু বড় হইলে মৃত্তিকায় মিশাইয়া সেই ক্ষেত্রে অন্যান্য শস্য আবাদ করিয়া সবুজ সারের উপকারিতা পরীক্ষা করা হইয়াছে। কাণপুর এবং নাগপুরের পরীক্ষাক্ষেত্রে কয়েক বৎসর ধরিয়া সবুজ সারে গোধুমের যেরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহার গড় নিম্নে প্রদত্ত হইল——

| | কাণপুর | | নাগপুর |
|---|---|---|---|
| সবুজ সার | পৌণ্ড ১২০৬ | পৌণ্ড ১২৭৩ | পৌণ্ড ৮০৩ |
| বিনা সার | ১০৫২ | ৭১ | ৮০২ |

ডোমরাঁও পরীক্ষাক্ষেত্রে দুই বৎসর আলু, তিন বৎসর গম এবং এক বৎসর ধান্য চাষ করিয়া সবুজ সারের উপকারিতা পরীক্ষা করা হয়। দুই বৎসরই সবুজ সারপ্রদত্ত ক্ষেত্রে আলুর ফলন অত্যধিক হইয়াছিল; ধান্য প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছিল; কিন্তু তিন বৎসরের মধ্যে দুই বৎসর সবুজ সারপ্রদত্ত ক্ষেত্রে গোধুম কম হইয়াছিল। কেন যে কম হইয়াছিল, তাহা ঠিক জানা যায় নাই।

সকল পরীক্ষা ক্ষেত্রেই নীল অথবা শণ এই দুই উদ্ভিদকেই সবুজ সার-রূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। 'শ্যামাক তৃণ" বা অন্য কোন উদ্ভিদ এইরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে কিনা, জানি না। যদি না হইয়া থাকে তবে তাহা হওয়া উচিত।

যবক্ষারযানজ ভিন্ন অঙ্গারযানজ পদার্থপ্রদানে ও সবুজ সারের উপকারিতা সামান্য নহে। বালুকাপ্রধান ক্ষেত্রে অঙ্গারযানের বিশেষ আবশ্যক। বালুকা-প্রধান ক্ষেত্রে সবুজ সারের বহুল প্রচার প্রয়োজন। যে ক্ষেত্রে নদীর জল উঠিয়া থাকে, তাহাতে সার ব্যবহার করিবার প্রয়োজন নাই। বন্যার জলের সহিত উদ্ভিদোপযোগী অনেক পদার্থ তাহাতে আসিয়া জমিতে পারে। কিন্তু যে সকল বালুকাপ্রধান ক্ষেত্রে বন্যার জল উত্থিত হয় না, তাহাতে সবুজ সার প্রয়োগ করিলে মৃত্তিকার বালুকাভাগের হ্রাস হয়। সুতরাং মৃত্তিকা জল ও জলীয় বাষ্প সংরক্ষণে পটু হইয়া উঠে। ভূটান, দুয়ার ও নেপাল তরায়ের মৃত্তিকা বালুকাপ্রধান, কিন্তু হিমগিরিধৌত সবুজ সার তাহাতে পতিত হইয়া উহাকে দিন দিন তেজস্বী করিতেছে। বৃষ্টি অধিক পরিমাণে হয় বলিয়া তথা-কার মৃত্তিকা সরস থাকে। নতুবা তথায় সমতল দেশের ন্যায় অল্প পরিমাণ বৃষ্টি হইলে কৃষকের সর্ব্বনাশ হইত।

বিলান ভূমিতে কোন প্রকার সার প্রয়োগ করা বিড়ম্বনামাত্র। কিন্তু যে জমি জলমগ্ন হয় না তাহাতে সবুজ সার ব্যবহার করা বিশেষ আবশ্যক। রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমে ধান্যই প্রধান শস্য। রাঢে বরং নানাপ্রকার ফসল হইয়া থাকে কিন্তু বরেন্দ্র দেশবাসিগণের একমাত্র ধান্যই সম্বল। বরেন্দ্রবাসিগণ অধিকাংশ নিরক্ষর ও অল্পে সন্তুষ্ট বিনাযত্নে যে ধান্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতেই তাহারা আপনাদের অভিমত স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করে। সুতরাং কি করিয়া এক মণের স্থলে দুই মণ ধান্য লাভ করিবে এ চেষ্টা তাহাদিগের মনে কদাচ উদিত হয় না। বরেন্দ্রবাসীদিগের মধ্যে কেহ কেহ লেখা পড়া শিখিয়াছেন; তাঁহারা যদি আপন আপন ক্ষেত্রের কিয়দংশে সবুজ সার ব্যবহার করিয়া দেখেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগেরও লাভ হয় এবং লোকশিক্ষা বিস্তৃত হইয়া দেশের বহুবিধ উপকার হয়। এক বিঘা ভূমিতে অর্দ্ধসের পরিমাণ শণের বীজ বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাসে একটা চাষ দিয়া ছিটাইয়া দিয়া ধান্য রোপণ

করিবার দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে উহাতে ভাল করিয়া লাঙ্গল ও মৈ দিয়া রাখিতে হয়। তৎপর বৃষ্টি হইলে ঐ ক্ষেত্রে ধান্য বপন করিলে ভাল ফল পাওয়া যায় কিনা তাহা এক বৎসর কি দুই বৎসর দেখিলেই হইতে পারে। এইরূপ নীল, শিম বা "শ্যামাক তৃণ" লাগাইতে পাবেন। শ্যামাক তৃণ অবশ্য লেগুমেনজাতীয় উদ্ভিদ নহে। তথাপি অঙ্গারযানজ পদার্থ প্রদানে ইহা বেশ উপকারী।

বিল ও পুষ্করিণীর দাম এবং পানা অতি উপাদেয় সার। ইহাদিগকে পচাইয়া মৃত্তিকায় প্রয়োগ করিলে ভাল হয়। সামান্য পরিমাণ চূণ মিশ্রিত করিয়া এক গর্ত্তে উহাদিগকে রাখিয়া মৃত্তিকাদ্বারা আবৃত করিয়া রাখিলে উহারা দুই মাস মধ্যে পচিয়া গিয়া অতি উৎকৃষ্ট সার হয়।

আমাদিগের সম্মুখে যে সকল সার রহিয়াছে, যাহাকে আবর্জ্জনা বলিয়া ঘৃণা করি, বুদ্ধি করিয়া তাহাদিগের ব্যবহার করিলে আমাদিগের কত ফল হয়। যে দেশে বনবিভাগের কঠোর শাসনে অরণ্য সন্নিহিত প্রদেশবাসীকেও অনুপায় হইয়া গোময় পোড়াইতে হয়, তথায় সবুজ সারের বহুলপ্রচলন হওয়া উচিত।

শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস।

---

# রাজসাহী।

স্রোতস্বতী পদ্মাবতীর বিপুল জলরাশি যাহার পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত, সেই সুজল সুফল বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডকে 'রাজসাহী' বলিয়া সকলেই চিনে। এই রাজসাহী নামের ব্যুৎপত্তি কি, উৎপত্তি কোথা হইতে, এসব কথা লোকে বড় একটা মনে করে না। আবার মনে উঠিলেও দেশীয় রাজ-(জমিদার) কুল-অধ্যুষিত বর্ত্তমান প্রদেশ তাঁহাদের বাস জন্যই 'রাজসাহী' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে ভাবিয়া সে কৌতূহল অনেকেরই "উত্থায় হৃদিলীয়ন্তে" মত হইয়া যায়। (১)

---

(১) আমাদের রাজসাহীর কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু বলেন তাঁহার ধারণা "বঙ্গদেশে মোগল শাসন সময়ে যত 'রাজ' অর্থাৎ রাজ্য ছিল তন্মধ্যে 'সাহী' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বা সর্ব্বপ্রথম বলিয়া নিজ চাক্লা রাজসাহীর নাম রাজসাহী হয়।" আমরা এ বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না।

প্রকৃতপক্ষে রাজসাহী নামের ব্যুৎপত্তি ও ইতিহাস বড় একটী জটিল প্রশ্ন। পণ্ডিতবর ব্লকম্যান্ সাহেব বলেন সমগ্র বঙ্গের স্বাধীন হিন্দু রাজা কংস হইতেই রাজসাহী নামের উৎপত্তি। (২) তাঁহার তর্ক এইরূপ—"রিয়াজ উস্ সালাতিন গ্রন্থকার বলেন রাজা কংস ভাতুড়িয়ার রাজা। এই ভাতুড়িয়া রাজসাহী জেলার উত্তরাংশ বরেন্দ্র ভূমির অন্তর্বর্ত্তী। ডাক্তার ওযাইজ (Wise) আমায় বলিয়াছেন যে তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের শ্রেণী বিভাগ করেন। তাহেরপুর ভাতুড়িয়ার মধ্যে—সুতরাং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কথায় ঐতিহাসিক রাজা কংস কে এইটী নির্ণয় করার সঙ্কেত পাওয়া যাইতেছে। 'রাজসাহী' জেলা রাজা কংসের নামের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে এসম্বন্ধে আমার কোনই সন্দেহ নাই। কারণ মামুদসাহী বার্ব্বেকসাহী প্রভৃতি রাজসাহীর সমীপবর্ত্তী প্রাচীন সরকার (জেলা) গুলির নাম যেমন মামুদসাহ, বার্ব্বেকসাহ প্রভৃতি বঙ্গাধিপের নাম হইতে উৎপন্ন—রাজসাহী নামকর্ত্তা সেইরূপ একজন রাজাকে বুঝায় যিনি 'সাহ' ছিলেন। অর্থাৎ যে হিন্দু রাজা মুসলমান সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন। অবশ্য 'রাজসাহী' নামটী এক অপরূপ মিশ্রণ—হিন্দি—রাজ, ও পার্সী—'সাহী'।"

মহাত্মা বিভারিজ্ সাহেব ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন (৩) রাজা কংসের নামের সহিত রাজসাহী নামের ব্যুৎপত্তি যোজনা করা যাইতে পারে না। কারণ রাজসাহী নাম অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং দেখা যাইতেছে এই নাম প্রথমে যে ভূমিখণ্ডকে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা রাজা কংসের রাজ্য হইতে বহুদূরে ভাগীরথীর পশ্চিমপার্শ্বে আধুনিক মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর পশ্চিম কোণাংশে স্থিত। রেণেল সাহেবের মানচিত্রে (৪) দৃষ্ট হয়, রাজসাহী ভাগীরথীর পশ্চিমপার্শ্বে—বর্ত্তমান সাঁওতাল পরগণার পাকোড় সবডিভিসনের স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। হণ্টার সাহেবকৃত বঙ্গীয় ষ্টাটিষ্টিক্যাল্ একাউণ্টে

কারণ প্রাচীন রাজসাহী পরবর্ত্তী রাজসাহীর স্থায় বৃহৎ বা প্রসিদ্ধ ছিল না। আর যখন পরগণার নাম 'রাজসাহী' হইতে জমিদারীর নামকরণ হইয়াছে তখন এ কথা নিষ্প্রয়োজন। অধিকন্তু "রাজ" (Raj) অর্থে রাজ্য ইংরেজী আমল হইতেই বুঝিতেছি।

(২) Journal, Asiatic Society, 1875, No. 3, p. 287.

(৩) Proceedings, Asiatic Society, January, 1893.

(৪) Rennel's Bengal Atlas.

দেখা যায় 'রাজসাহী' পরগণা রাজসাহী জেলায় নাই—মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমির পরগণাসংখ্যার মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে। বাস্তবিক রাজসাহী পরগণা এখন ও পাকোড় সবডিভিসনের কিয়দংশ। পার্সী ভাষায় লিখিত বাঙ্গালার ইতিহাসে এবং কোম্পানীর সেরেস্তাদার গ্রাণ্ট সাহেবের রাজস্ববিষয়ক প্রস্তাবে লিখিত আছে (৫) এই রাজসাহীর প্রাচীন ভূস্বামী উদয়নারায়ণ আত্মহত্যা করার পর মুর্শিদকুলী খাঁ রাজসাহী জমিদারী নাটোর বংশের স্থাপয়িতা রঘুনন্দনের ভ্রাতা রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত করিয়া দেন। এই রাজসাহী পরগণা নাটোর রাজবংশের হস্তে যাওয়ায় পদ্মার পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ বিভাগের সাধারণ নাম রাজসাহী হইয়া পড়ে। এই সমস্ত উল্লেখ করিয়া রিভারিজ সাহেব বলেন "তথাপি ব্লকম্যানের ইঙ্গিত অনুসারে রাজসাহী নামের ব্যুৎপত্তি স্থির করা যাইতে পারে। রাজসাহীর নাম বীরভূমির রাজা হইতে উৎপন্ন ইহাই সম্ভব, কারণ বীরভূমির রাজারা পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন। চিরাগত প্রবাদ অনুসারে দুই জন মুসলমান সামন্ত প্রাচীন হিন্দু রাজগণকে উৎখাত করিয়া বীরভূমি অধিকার করেন। কিন্তু ইহারা মুসলমান হইলেও আপনাদিগকে রাজা ও স্ত্রীগণকে রাণী বলাইতেন। অথবা সম্ভবতঃ সিয়ার উল্ মুতাক্ষরীণের অনুবাদক যাহা লিখিয়াছেন তাহাই সত্য। তিনি বলেন বীরভূমির রাজারা হিন্দু, পরে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। মুর্শিদকুলী খাঁর নিয়ম ছিল, রাজস্ব দানে অশক্ত জমিদারবর্গকে তিনি মুসলমান ধর্ম্মপরিগ্রহ করাইতেন, সম্ভবতঃ বীরভূমির রাজগণের অদৃষ্টে ইহাই ঘটিয়াছিল।" (৬)

---

(৫) Persian History of Bengal (1694 1756)—translated in Gladwin's Narrative; Riaz-us-Salatin and Fifth Report

(৬) সাহেব মহোদয় স্বকীয় মতের সমর্থন জন্য মুতাক্ষরীণ অনুবাদক মুস্তাফার সংগৃহীত মুর্শিদাবাদের রাজার গুজবের আশ্রয় লইয়াছেন ইহাই দুঃখের বিষয়। মুস্তাফা নিজকৃত টীকায় এইরূপ অনেক অদ্ভুত গল্পের অবতারণা করিয়া আমাদিগকে আপ্যায়িত করিয়াছেন। যাহা হউক, বীরভূমির রাজবংশ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি যে সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক তাহা প্রমাণ করিতে বেশী দূর যাইতে হইবে না—মুসলমানগণের রচিত ইতিহাসেই এবিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে। Annals of Rural Bengal গ্রন্থে হণ্টার সাহেবের পণ্ডিত (নবীন বাবু) বীরভূমির যে ইতিহাস দিয়াছেন তাহার অধিকাংশই প্রামাণিক। তিনি মুসলমান সামন্ত আসদ উল্লা ও জয়নন্দীর হিন্দুরাজা উচ্ছেদ ব্যাপার সবিশেষ বর্ণন করিয়াছেন। 'মুর্শিদ কুলী খাঁ রাজস্বদানে অশক্ত জমিদারগণকে মুসলমান করিতেন' মুসলমানী ইতিহাসে এই একটী কথা পাইয়াই বীরভূমি সম্বন্ধে তাহা ব্যবহার

উল্লিখিত মন্তব্যে ব্লক্‌ম্যান সাহেবের ভ্রম দেখাইয়া দিয়া পরক্ষণেই বীরভূমির রাজবংশ হইতে 'রাজসাহী' নামের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়া বিভারিজ মহোদয় বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বীরভূমির মুসলমান রাজারা জমিদার মাত্র। প্রথমে একটু স্বাধীনভাবে কার্য্য করিলেও তাঁহারা 'সাহ' উপাধির অধিকারী কোন ক্রমেই হইতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা কখনই হিন্দু ছিলেন না—সমসাময়িক সমস্ত ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। একজন অনুবাদকের প্রমাণশূন্য বাক্য নিতান্তই অবিশ্বাস্য। অধিকন্তু, প্রাচীন 'রাজসাহী' যে কোন কালে বীরভূমির রাজগণের রাজ্যভুক্ত ছিল তাহার প্রমাণাভাব। বরং 'রাজসাহীর প্রাচীন হিন্দু রাজবংশ' এই কথায় ইতিহাস তাহার প্রতিকূলে সাক্ষ্য দিতেছে। উল্লিখিত প্রবন্ধদ্বয়ে সাহেব মহোদয়গণের অন্য যে দুই একটী সামান্য ভ্রম আছে এখানে তাহার উল্লেখ আবশ্যক বোধ হয় না।

হস্তলিখিত প্রাচীন মুসলমানী ইতিহাসে লিখিত আছে (৭) "রাজসাহী জমিদারীর প্রাচীন হিন্দুস্থানী ভূস্বামিবংশীয় উদয়নারায়ণ স্বীয় দক্ষতা ও কর্ম্মকুশলতায় মুর্শিদ কুলী খাঁর সবিশেষ প্রিয় ও বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন। কুলী খাঁ ইঁহাকে নিজ জমিদারী ব্যতীত পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগের ও খাল্‌সা (অর্থাৎ জায়গীর ভিন্ন রাজকীয়) রাজস্ব আদায়ের ভারার্পণ করিয়া তাঁহার নিকট গোলাম মহম্মদ ও কালীয়া জমাদার নামক দুই জন সেনানীর অধীনে দুই শত অশ্বারোহী সৈন্য নিযুক্ত করিয়া দেন। ইহারা উদ্ধতভাবে প্রাপ্য বেতনের দাবী করিয়া হাঙ্গামা উপস্থিত করিলে মুর্শিদ কুলী খাঁ স্বীয় অনুগত দাস (চেলা)

---

করা বিভারিজের মত ঐতিহাসিকেও কর্ত্তব্য হয় নাই। যে প্রাচীন মুসলমানী ইতিহাসে মুর্শিদাবাদের প্রথম ভাগের ইতিহাস আছে আমরা অজ্ঞাতনামা লেখকের সেই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিয়া তারিখ বাঙ্গলা নাম দিয়া মুদ্রণ জন্য এসিয়াটিক সোসাইটীতে পাঠাইয়াছি। ইহার গ্লাড্‌উইন্ কৃত অনুবাদ ও এদেশে দুর্লভ, বিভারিজ মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া লেখককে বিলাত হইতে তাঁহার নিজ খণ্ড খানি পাঠাইয়াছেন। এই পুস্তক এবং রিয়াজ উস্ সালাতিন, মুতক্ষরীণ প্রভৃতি মুসলমানী গ্রন্থে বীরভূমির জমিদারগণের বিশেষ উল্লেখ আছে। তাঁহারা হিন্দু হইতে মুসলমান হইলে ইহারা সে কথার উল্লেখ করিতে কখনই ক্ষান্ত থাকিতেন না। মুর্শিদ কুলীর সমসাময়িক বীরভূমির জমিদার আসদ উল্লা খাঁর বিশেষ বিবরণ এই সমস্ত ইতিহাসেই আছে। মুর্শিদ কুলী খাঁর জমিদারগণকে মুসলমান করার কথা স্থানান্তরে বিশেষরূপে আলোচিত হইতেছে।

(৭) Gladwin's Narrative (pp. 61-62) & Riaz us-Salatin p. 256.

মহম্মদ জানকে একদল সৈন্যসহ তাহাদের শাসনার্থ প্রেরণ করেন। রাজবাড়ীর অনতিদূরে উভয় পক্ষের যুদ্ধে মহম্মদ নিহত হন এবং উদয়নারায়ণ মুর্শিদ কুলী খাঁর আক্রোশের ভয়ে আত্মহত্যা করেন। মুর্শিদ কুলী খাঁ অতঃপর রাজসাহী পরগণা রামজীবন ও কালু কোঁর নামক গঙ্গার (পদ্মার) পূর্ব্ব পার্শ্বের দুই জন জমিদারকে বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ইঁহারা রীতিমত রাজস্ব আদান বিষয়ে বঙ্গের অন্যান্য জমিদার অপেক্ষা সিদ্ধহস্ত ছিলেন।" রিয়াজ গ্রন্থকার উল্লিখিত পার্সী ইতিহাসের অনুসরণেই অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশের ইতিহাস লিখিয়াছেন—প্রায় নকলই করিয়াছেন। বিভারিজ সাহেব মূল গ্রন্থ না দেখিয়া কেবল গ্লাড উইন্ কৃত অনুবাদদৃষ্টে যে পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা অনুবাদকের ত্রুটি মাত্র। ষ্টুয়ার্ট সাহেব উল্লিখিত অংশটি পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় বলিয়াছেন 'উদয়নারায়ণ যুদ্ধ-ঘটনায় এত মর্ম্মাহত ও ব্যস্ত হন যে আত্মহত্যা করেন'। কিন্তু এ-মর্ম্মাহত হওয়ার কারণ তিনি অনুগ্রহ করিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই (৮)। প্রকৃতপক্ষে এখানে একটু গোল আছে। বিভারিজ সাহেব অনুমান করেন—সম্ভবতঃ গোলাম মহম্মদ উদয়নারায়ণের নিকট বেতনের দাবী করিলে, কুলী খাঁ তাহার সাহায্যার্থই সৈন্য প্রেরণ করেন, বিপক্ষে নহে। কিন্তু ইহাতেও গোলের নিবৃত্তি হইল না। গোলাম মহম্মদ যুদ্ধে নবাবের সেনা দ্বারা যে নিহত হন এ কথা ক্ষিতীশবংশাবলীতে লিখিত আছে—ইহারই অপরাংশ সাহেব মহোদয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমার বোধ হয় গোলাম মহম্মদ রাজার বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই—তাঁহার অনুকূলেই যুদ্ধ করেন, সুতরাং গোলাম মহম্মদ প্রভৃতি হত হইলে বন্দী হইবার ভয়ে উদয়নারায়ণ আত্মহত্যা করেন। ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতের বিবরণ ও স্থানীয় প্রবাদ এই মতের সমর্থন করিতেছে। ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতে (৯) লিখিত আছে পিতার বন্দী অবস্থায় রঘুরাম মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময়ে সুবাদার রাজসাহীর রাজা উদয় রাজার বিরুদ্ধে লাহরী মল্লের অধীনে বৃহৎ এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন। এই রাজা নবাবের সহিত বিবাদ করিয়া বীরকাটি নামক গ্রামের নিকট সৈন্যসমাবেশ করেন। রঘুরাম

(৮) Stewart's History of Bengal, 2nd Ed. p. 237.

(৯) ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতম্—Edited & translated by Lr. Perksch (Berlin 1852)

নবাব-সেনাপতির সহিত ঐ যুদ্ধে গমন করেন। বীরপ্রবর রঘুরামের হস্তে সেনাপতি গোলাম মহম্মদের নিধন, যুদ্ধে নিপতিত শত্রুর প্রতি শেষ মুহূর্ত্তে রঘুরামের বীরোচিত শুশ্রূষা ইত্যাদি দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের বাঙ্গলা 'ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতে' সুন্দর বর্ণিত আছে। এই দুই পুস্তকে কোথাও 'রাজসাহী' স্থানে রাজেশর (Rajasar) বীরকাটি স্থানে বারাকোটী এবং 'উদয়-চাঁদ' 'আলি মহম্মদ' প্রভৃতি যে সব অশুদ্ধি আছে তাহা বক্তব্য নহে। পার্সী ইতিহাসে কেবল 'রাজবাড়ীর নিকট যুদ্ধ হয়' এই কথা আছে—কিন্তু এখানে বীরকাটি নাম পাওয়া গেল। তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বিভারিজ সাহেব পাকোড়-সবডিভিসনাল অফিসার স্মিথ্ সাহেবের যোগে স্থানীয় সংবাদ লইয়াছেন। আমরাও পরে স্থানীয় অভিজ্ঞ লোকমুখে কিছু কিছু বিবরণ শুনিয়াছি। স্মিথ্ সাহেবের পত্রের সংক্ষেপ মর্ম্ম এই——

মুরারই রেল ষ্টেশনের (Loop Line, E I R) পশ্চিমে মহেশপুরের পূর্ব্ব-দক্ষিণ বীরকিটি নামক গ্রাম আছে, ইহা বর্ত্তমানে সুলতানাবাদ পরগণার অন্ত-র্গত। সপ্তদশ শতাব্দীর উদয়নারায়ণ এই দেশের রাজা ছিলেন। দেবীনগর তাঁহার রাজধানী, ইহা বীরকিটি হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে। এখানে সমসূত্রে স্থাপিত দম্‌দমা, বীরকিটি ও নারায়ণগড় নামক স্থানে এক একটী গড়ের আয়তন এখনও বর্ত্তমান। বীরকিটির গড়টী আকারে ক্ষুদ্র কিন্তু গড়খাত গুলি বেশী গভীর ও ভিত্তি উচ্চস্থানে স্থাপিত। এই স্থানে রাজার ধন নিহিত ছিল বলিয়া প্রবাদ রহিয়াছে। স্থানীয় লোকে অর্থানুসন্ধানে ইহার মধ্যে অনেক গর্ত্ত কাটিয়াছে। বৃহত্তর দুর্গে তাঁহার সেনানিবাস ছিল। ইহা মুর্শিদা-বাদ হইতে যে বড় রাস্তা গিয়াছে তাহার নিকটে একটী ক্ষুদ্র পাহাড় বা উচ্চ ভূমির নীচে। এখান হইতে চতুর্দ্দিকের সমতল ক্ষেত্র লক্ষিত হয়। এখানে একটী যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া লোকে ইহাকে মুড়মুড়েডাঙ্গা বা মুণ্ডমালা বলে। প্রথম যুদ্ধে রাজা উদয়নারায়ণ জয়লাভ করেন। পরে নবাব বৃহৎ এক দল সৈন্যপ্রেরণ করিলে যুদ্ধের পরিণাম শোচনীয় হইবে চিন্তা করিয়া, রাজা সপ-রিবারে নৌকায় উঠিয়া দেবীনগরের নিকটবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র হ্রদের মধ্যভাগে জীবন বিসর্জ্জন করেন। এই হ্রদ বা বিল এখনও বর্ত্তমান। অদ্যাপি কৃষক-গণ বীরকিটির নিকটে দগ্ধ মৎকন্দক, প্রস্তরবর্ত্তুল প্রভৃতি পাইয়া থাকে।

বীরকিটি হইতে ৬ মাইল দূরে মুরারই ষ্টেশনের দক্ষিণে রাজবাড়ী নামক গ্রাম আছে—কিন্তু এখানে কোন যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ নাই। উদয়নারায়ণ হিন্দুস্থানী কায়স্থ, এখানকার লোকে তাঁহাকে লালা উদয়নারায়ণ বলে। সুলতানাবাদ পরগণায় (পাকোড়, মহেশপুরের নিকটস্থ স্থান) রাজসাহী নামে কোন গ্রাম নাই, কিন্তু পরগণা রাজসাহী সুলতানাবাদের পার্শ্ববর্ত্তী এবং উল্লি-খিত যুদ্ধক্ষেত্রের অতি নিকটবর্ত্তী ভূমি ও কনকপুর প্রভৃতি গ্রাম রাজসাহী পরগণার অন্তর্ভূত, এবং এগুলি উদয়নারায়ণের রাজ্যভুক্ত ছিল। (স্মিথ্ সাহেব বীরকিটিকে Birkhiti করিয়া, বীরক্ষিতি প্রভৃতি ব্যুৎপত্তি যোজনা করিয়াছেন।)

এক্ষণে দেখা গেল প্রাচীন রাজসাহী কোথায়। ভাতুড়িয়া রাজসাহীর উত্তর পূর্ব্ব। তাহেরপুর ভাতুড়িয়ার অন্তর্গত নহে। আইন আকবরীতে রাজসাহী পরগণার নাম নাই। প্রাচীন পরগণা হইলে তাহেরপুরের ন্যায় রাজসাহীর নামও উক্ত গ্রন্থে দেখিতে পাইতাম। অতএব ব্লকম্যান্ সাহেবের নির্দ্দেশ অনুসারে রাজা কংসের নামে পরগণা রাজসাহীর নাম হইতে পারে না। তাহেরপুরের রাজা কংস নারায়ণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন 'রাজা কংসনারায়ণ তাহেরপুর জমিদারবংশের মধ্যে সবিশেষ বিখ্যাত।* ইনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। নান্নাসীগ্রামী (নন্দনাবাসী) পুরুষোত্তম বেদা-ন্তীর † বংশসম্ভূত। ইহার প্রপৌত্রের নাম রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ। লক্ষ্মীনারায়ণের

---

* তাহেরপুরস্থ আধুনিক রাজগণ রাজা কংসের বংশসম্ভূত নহেন। রাজা কংস নন্দনাবাসী, সিদ্ধ শ্রোত্রিয়, পক্ষান্তরে শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর প্রভৃতি আধুনিক রাজগণ ভাদুড়ী, কুলীন। উ, স।

† পুরুষোত্তম বেদান্তী সুবিখ্যাত পণ্ডিত কুল্লুকভট্টের সহোদর। কুল্লুক রাজসাহীতে জন্ম গ্রহণ করি-য়াছিলেন ইহা রাজসাহীবাসীর গৌরবের বিষয়। কুল্লুক সম্বন্ধে Sir William Jones বলিয়াছেন— "At length appeared Kullaka Bhatta, a Brahmana of Bengal, who after a painful course of study and the collation of numerous manuscripts produced a work, of which it may, perhaps, be said very truly, that it is the shortest yet the most luminous, the least ostentatious yet the most learned, the deepest yet the most agreeable commentary ever-composed on any author, ancient or modern, European or Asiatic." কুল্লুক স্বকৃত মন্বর্থ মুক্তাবলী নাম্নী টীকায় এইরূপ আত্মপরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন :—

গৌড়েনন্দনবাসি নাম্নি সুজনৈর্ব্বন্দ্যে বরেন্দ্র্যাং কুলে।
শ্রীমদ্ভট্টদিবাকরস্য তনয়ঃ কুল্লুকভট্টোঽভবৎ।
কাশ্যামুত্তরবাহী জহ্নুতনয়াতীরে সমং পণ্ডিতৈঃ
তেনেয়ং ক্রিয়তে হিতায় বিদুষাং মন্বর্থমুক্তাবলী।

কন্যার সহিত নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দনের জ্যেষ্ঠ সহোদর মহারাজ রামজীবনের ঔরসপুত্র রাজকুমার কালিকাপ্রসাদের বিবাহ হয়। কালিকা-প্রসাদের নাম কালুকোঙার বলিয়া ইতিহাসে লিখিত। কালুকোঙার ১৭২৫ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। প্রতি পুরুষে ৩৩ বৎসর ধরিলে কংস-নারায়ণের সময় = লক্ষ্মীনারায়ণের সময় + ৩৩ + ৩৩ + ৩৩ = ১৭২৫ খৃষ্টাব্দের এক শতাব্দী পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৬২৫ খৃষ্টাব্দের অধিক পূর্ব্বে হয় না। সুতরাং তাহেরপুরের কংস যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের কংস বা গণেশ নহেন তাহা বুঝিতে কোন ইতস্ততের কারণ নাই।'

রিভারিজ সাহেবের মতও সঙ্গত নহে দেখা গিয়াছে। সুতরাং রাজসাহী নামের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বমত অজ্ঞই থাকিলাম। আমাদের মনে অপর একটী ব্যুৎপত্তির কথা উদয় হয়। রাজা মানসিংহ রাজমহলে বঙ্গের মুসলমান রাজধানী স্থাপন করিয়া দুর্গাদি নির্ম্মাণে ঐ নগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। রাজসাহী পরগণার নাম এই 'সাহী' রাজার প্রদত্ত বলিয়া অনুমান করার বিশেষ কারণ আছে। অতঃপর সুলতান সুজার সময়ে পুনরায় রাজমহলে রাজধানী করা হয়। সুলতানাবাদ পরগণার নামের জন্য আমরা তাঁহার নিকট ঋণী কিনা তাহাও বিবেচ্য। দুইটী পরগণাই রাজমহলের বড় বেশী দূরে নহে, দুইটীকে একস্থানে পাওয়াতেই আমাদের উক্তরূপ ধারণা জন্মিয়াছে। দ্বিতীয় কথা দুইটী নামই যে আকবর বাদসাহের সময়ের পরবর্ত্তী তাহার প্রমাণ, আইন আকবরীতে ঐ প্রদেশের পরগণা মধ্যে ইহাদের নাম নাই। আমাদের অনুমান নির্দ্দেশ করিলাম, এক্ষণে প্রামাণিক অন্য কোন ব্যুৎপত্তি পাইলে সাদরে গ্রহণ করিব।

প্রাচীন রাজসাহী জমিদারী নাটোর পরিবারের হস্তে যাওয়ায় তাঁহারা রাজসাহীর রাজা বলিয়া খ্যাত হন। কালক্রমে 'নিজ চাক্‌লা রাজসাহী' নিলাম হইয়া তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইলেও জমিদারীর যাহা অবশিষ্ট থাকিল তাহাই রাজসাহী বলিয়া পরিচিত রহিল। ইংরেজ অধিকারের প্রথমে এই রাজসাহী জমিদারীর সহিত এক কালেক্টরীভুক্ত জমিদারী সমষ্টি লইয়া রাজসাহী জেলা গঠিত হয়। বারান্তরে এ সমুদয়ের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

# ২০৲

আমাব বেতন ভাই ঠিক কুড়ি টাকা!
শাদা শাদা, গোল গোল, রজতেব চাকা!
দীর্ঘ তিরিশ দিন
কাল গর্ভে হ'লে লীন
ক্ষণেকেব তবে সেই দিয়ে যায দেখা—
শাদা শাদা, গোল গোল, বজতেব চাকা!

আমাব বেতন ভাই ঠিক কুড়ি টাকা!
সাকাব কি নিবাকাব,
তত্ত্ব নাহি বুঝি তাব,
এই তাবে ধ'বে বাখি—নাহি যায় বাখা!
একটু পবশসুখ—
দু'মিনিট চাওযা মুখ—
অমনি সে উড়ে যায কিবা ক্ষিপ্র পাখা!
শাদা শাদা, গোল গোল, বজতেব চাকা!

ঠিক কুড়ি টাকা ভাই আমাব বেতন!
মাসেব প্রথম ভাগে
কত আশা মনে জাগে
ইহা কবি-উহা কবি-যাহা চায মন!
যেন সে 'বিশেতে' ভাই
আদি আছে অন্ত নাই
নাযেগ্রাব অফুবন্ত পুণ্য প্রস্রবণ!
হায! কি কপাল দোষ!
মর্ম্মান্তিক আপশোষ
মাসান্তে ছুঁতে না ছুঁতে কবে পলায়ন,
কেবাণীব ভাদ্রবধূ বজত কাঞ্চন!

আমার বেতন ভাই ঠিক কুড়ি টাকা—
শাদা শাদা, গোল গোল, বজতেব চাকা!
এক দুই তিন কবি
গ'ণে না ফুবা'তে পারি—
আনন্দ উদ্বেগ কত নাহি "লেখা যোখা"।
যেন বা ছাতাব শলা
গ'ণে নাহি যায বলা

দুই, চার, ছয়, আট,—কত গণি একা ?
কতবার করি গোল,
কি মধুর গণ্ডগোল !
কি সুন্দর—কি সুন্দর, তার প্রতি রেখা !
অই যা গিয়েছি আমি—
রক্ষা কর অন্তর্যামি—
যমরূপী মুদী ভায়া ঐ যায় দেখা !
মাসের পহেলা আজ,
অই যে বজকবাজ
তেলি তাঁতি উ'ড়ে আসে খুলে খাতা-পাথা !
হায় রে সে এক কুড়ি
এক ফুঁয়ে গেল উড়ি'—
এই ছিল ভরা হাত—এই যে গো ফাঁকা।
গৃহিণী কাতর স্বরে
চে'য়েছিল কত করে—
মল নয়—বালা নয়—এক জোড়া শাঁখা !
ছে'লে ভার ক'রে মুখ
"স্পেলিঙ্গের" মিনিং বুক
চে'য়েছিল কত বার নাহি তার লেখা !
হায় সে বধির "বিশ"
শুনিল না অহর্নিশ
তাহাদের আবেদন—আবদার মাখা।
আমার বেতন ভাই ঠিক কুড়ি টাকা !

আমার বেতন ভাই কুড়ি টাকা ঠিক।
তুমি বুঝি মনে কর
কেরাণী কাতর বড়—
হাঁ করিয়া চে'য়ে আছ আঁখি অনিমিষ।
"হা(ও)লাত বরাত" তার—
প্রতিবেশী চমৎকার !
হৃদয়ের ধা তার ক্রেডিট্ বণিক্ !
ও'র নেয় দেয় তা'রে
পড়ে নাকো কোন ফেরে,
অপরূপ চলে তার কার্য্য সাংসারিক।
সে চলে উড়ায়ে কোঁচা
বুক টান মাথা উঁচা

অন্তঃসারশূন্য আহা! নীরস রসিক!
সাটি কোট কম্ফার্টার,
এ নহে পোষাক তার,
শরীরের শত ক্ষত ঢাকিয়াছে ঠিক!
উঠে যে উদ্গার তার,
গুরু নহে সে আহার,
খালি পেটভরা বায়ু চলে উর্দ্ধদিক্!
সে যে গো সংসার ভারি
সতত্তই খায় 'খাবি'—
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হারা জ্ঞান দিগ্‌দিক্!
মা ষষ্ঠীর অনুগ্রহে,
ভরা তার ক্ষুদ্র গৃহে,
অন্ন-দুগ্ধ-সংহারক সখের সৈনিক!
নলে করে অহর্নিশ
"বিশ" হ'তে ভাল বিষ—
সে যেন রে রক্ষা পায় হ'লে এক দিন্।
কন্যারত্ন প্রসবিত্রী
হায় তার গৃহকর্ত্রী—
বিপদ্ উপরে তার বিপদ্ অধিক!
"প্রজাপতি" ভাবে—আর
হেরে সব অন্ধকার,
কন্যার জনক ঐ বেহায়া বেল্লিক!
আমি দিব্য চক্ষু মেলি
দেখি আর অশ্রু ফেলি—
নৃত্যতত্ত্ব করে হয় চুলার মাণিক!
আমার বেতন ভাই কুড়ি টাকা ঠিক!

জনৈক কেরাণী।

# ছোট কথা।

প্রত্নতত্ত্বালোচনা কঠিন হইলেও আমরা দশজনে মিলিয়া প্রভূত অধ্যবসায়বলে তাহাকে অনেকটা সহজ করিয়া তুলিয়াছি। বিশ্বাস না হয়,—যে কোন এক খানি মাসিক বা অন্য সাময়িক পত্রিকা উদ্ঘাটন কর, দেখিবে যে তাহার দুই

সংযুক্ত পত্রপুটান্তরালে কত কি পুরাকাহিনী "কল কল নাদে কাহিনী কহিবার" জন্য নীরবে পাঠকের স্নেহদৃষ্টির অপেক্ষা করিতেছে।

এই সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ বা দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে। হাসিতেছে— কেন না, এ দেশে প্রত্নতত্ত্বালোচনার প্রচুর ক্ষেত্র থাকিতেও আমরা যে ভাবে কর্ত্তব্যসম্পাদন করিতেছি রসজ্ঞ পাঠকের নিকট তাহা হাসিবার বস্তু ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কাঁদিতেছে— কেন না, প্রত্যেক প্রবন্ধে আর কিছু না পারি ইহা বেশ বুঝাইয়া দিতেছি যে "আমরা কি ছিলাম আর কি হইয়াছি!" ইহা পাঠ করিয়া কে না অশ্রুবিসর্জ্জন করিবে? আর দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে— শুধু সম্পাদক ভায়া—কেন না, এমন দুর্ব্বোধ প্রবন্ধে আর কোন ফল না হউক, ভায়ার পত্রকলেবর খুব জমকাল হইয়া উঠিতেছে।

সকল বিষয়েরই একটা না একটা প্রত্নতত্ত্ব বাহির হইতেছে; বোধ হয় অতি অল্পদিনের মধ্যে আর লিখিবার বিষয় খুঁজিয়া পাওয়া ভার হইবে। তাই আজ অতি তাড়াতাড়ি— সম্পাদক ভায়ার পোষ্টকার্ড দশখানি, জরুরি চিঠি পাঁচ খানি, রেজেষ্টারী চিঠি তিন খানি এবং টেলিগ্রাম দুই খানি পাইবার পর— আফিসের খাটুনী সাহেবের খিঁচুনী, বাড়ীর বকুনী, ইত্যাদি যথাশাস্ত্র গলাধঃকরণ করিয়া গলদ্ঘর্ম্মকলেবরে অতি তাড়াতাড়ি এই প্রত্নতত্ত্বের প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি।

কি লিখিব? কবি কি লিখিবেন তাহা বেশ ঠাহর করিয়া ধীরে ধীরে ঘসিয়া মাজিয়া, কাটিয়া ছাঁটিয়া আপনি পড়িয়া বন্ধুজনকে জোর জবরদস্তির সঙ্গে পড়াইয়া তাহার পর কবিতা শেষ করেন। সুতরাং কবি কখনও জিজ্ঞাসা করেন না— কি লিখিব? কিন্তু তাঁহার কবিতা পাঠ করিয়া পাঠকবর্গ প্রায়ই সঙ্গোপনে জিজ্ঞাসা করেন— কি লিখিয়াছে? প্রত্নতত্ত্বের পক্ষে সে দুশ্চিন্তা নাই। লেখক একবারও ভাবেন না বা জিজ্ঞাসা করেন না —কি লিখিব? বরং প্রবন্ধ শেষ করিয়া, টীকা টিপ্পনী তৈয়ার করিয়া, ছাপাখানায় পাঠাইবার সময়েও দশবার জিজ্ঞাসা করেন—কি লিখিলাম? কিন্তু পাঠকবর্গ একবারও তাহা জিজ্ঞাসা করেন না কেন না প্রত্নতত্ত্ব কেহ পড়ে না,

পড়িতেও চাহে না। সুতরাং কি লিখিব সে কথা আদৌ ভাবিবারই প্রয়োজনাভাব।

কি ভাষায় লিখিব—তাহাও ভাবিবার কথা নহে। যাঁহারা ভাবের সঙ্গে ভাষার সামঞ্জস্য রক্ষা করা লিপি কৌশলের পরিচায়ক বলিয়া স্বীকার করেন তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন যে প্রত্নতত্ত্বের ভাষা অবশ্যই ভাবোপযোগী হওয়া চাই। যে ভাবে যে ভাষায় লিখিয়া যাও তাহাই সাজিবে। কেন না প্রত্নতত্ত্বের ভাবের বাঁধুনী নাই, ভাষার বাঁধুনী থাকিবে কেন?

তবে কি প্রত্নতত্ত্ব লিখিবার সময়ে ভাবনার বিষয় কিছুই নাই? আছে—এবং আছে বলিয়াই সম্পাদক ভায়ার এত পীড়াপীড়িতেও প্রবন্ধ লিখিয়া শেষ করিতে পারি নাই। ভাবনার বিষয় মোটে একটা, কিন্তু সেই একটীতেই এক সহস্র—প্রবন্ধের নামকরণ লইয়াই সকল ভাবনা। যোগ জাগে নামকরণটি স্থির করিতে পারিলেই—বস্। নামকরণে কিছু নাই,—গোলাপকে গোলাপ না বলিয়া আর কিছু বলিয়া ডাকিলেও তাহার মধুগন্ধ উড়িয়া যাইবে না—এ সকল নিতান্ত কবিজনসুলভ স্তোভবাক্য। প্রত্নতত্ত্ববিদের নিকট ইহার মর্য্যাদা নাই। কে বলিল নামে কিছুই নাই?—প্রত্নতত্ত্বের প্রবন্ধের নামই যথাসর্ব্বস্ব। নাম পড়িয়াই লোকে বুঝিতে পারে কত গভীর গবেষণায় প্রবন্ধকলেবর পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, এবং নাম পড়িয়াই অধিকাংশ পাঠক সসম্ভ্রমে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া লেখকের পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধের "তারিফ" করিতে থাকেন। কেবল নামকরণের জোরে লোকে না পড়িয়াও প্রশংসা করে সমালোচকবর্গ থতমত খাইয়া দাঁড়ায় এবং কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিবে শুধু সেই ভয়ে না পড়িয়াই প্রশংসা করে। এ হেন নামকরণকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিলে প্রত্নতত্ত্ব লিখিব কেমন করিয়া। আমাকে একটা উৎকট— শ্রুতিপ্রসাদনবিরোধী—অপিচ শ্রবণবিবরবিমথনকারী—শিরোনাম স্থির করিতেই হইবে। "পৌণ্ড্রবর্দ্ধন"—"উচীথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি"—"জমা কামেন তুমারী"— এ নাম গুলি বেশ। কিন্তু বেশ হইলে কি হইবে—উহা যে একবার ছাপার কাগজে উঠিয়া গিয়াছে! আমি আকাশ পাতাল খুঁজিয়া এবার নাম বাহির করিতে না পারিয়া সেই গুরুভার পাঠকের স্কন্ধে অর্পণ করিলাম।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়টি অত্যন্ত সরল,—আমরা আজ যে "সুজলা

সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা” বসুন্ধরার উপর বিচরণ করিয়া কত অনাবৃষ্টি, কত দুর্ভিক্ষ, কত গুমুঠ গরম সহ্য করিতেছি এই ভূতধাত্রী কি ইতিপূর্ব্বে কখন ধ্বংশপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন না? বিষয়টি সবিশেষ ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য এবং লেখক পাঠকের সমবেত চেষ্টায় ইহার একটা মীমাংসা হওয়াও প্রয়োজন। পৃথিবী নবীনা না প্রবীণা—ইহা কি নিতান্ত উপেক্ষার বিষয়?

প্রত্নতত্ত্বের প্রবন্ধ লিখিবার সময়ে তাহা কাহাকেও পড়িয়া শুনাইতে নাই; আমি সর্ব্বদা এই গুরূপদেশ পালন করিয়া থাকি। আজ হঠাৎ আমার অনবধানতাবশতঃ দেখিতেছি যে আমার কোন একজন বন্ধু প্রবন্ধটি আদ্যোপান্ত পড়িয়া ফেলিয়াছেন। বন্ধুর নিকট ইহা যে “অরসিকেষু রহস্যনিবেদনং” হইয়াছে তাহা লিপিবাহুল্যমাত্র। তিনি প্রীতিপ্রফুল্লমুখখানি আজ ঘনঘনাবৃত—প্রাবৃট্‌প্রদোষজলদোদয়বৎ গম্ভীর করিয়া বলিয়া উঠিলেন “ছাপার কাগজে বাতুলতা করিয়া মুখ হাসাইতে বসিয়াছ কেন?” বন্ধুর কথায় সহসা চেতনা হইল, সহসা শৈশবস্মৃতি জাগিয়া উঠিল, সহসা সুচিক্কণ শিখাসমন্বিত বেত্রহস্ত শ্রীমদধ্যাপক মহাশয়ের তরুণারুণানন্দিত সুকুঞ্চিত নেত্রযুগলের কথা মনে হইল, সঙ্গে সঙ্গে শৈশবপাঠ স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠিল—সুতরাং অজ্ঞাতসারে বলিয়া উঠিলাম——

সুহৃদাং হিতকামানাং যঃ শৃণোতি ন ভাষিতং
আপৎ সন্নিহিতা তস্য স নরঃ শত্রুনন্দনঃ ॥

—o—

# বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি।

## ( রাজসাহী )

মনুষ্যপ্রকৃতির পরিবর্ত্তন-গতি এতই ধীর, এতই মৃদুমন্দ যে এক দেশের এক সময়ের রাজনৈতিক শিক্ষা অন্য দেশে পরবর্ত্তী সময়ে অতি আশ্চর্য্যভাবে যথাযথরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আমাদের পক্ষে ইহা একটী অতি সৌভাগ্যের বিষয় যে অতীত ইতিহাসের এইরূপ একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সম্মুখে রাখিয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইয়াছে। যে মহিমা

মান্বিত ইংরেজ জাতির নিকট আমরা রাজনৈতিক অধিকারের জ্ঞান ভাস লাভ করিয়াছি, যে গৌরবান্বিত জাতির নিকট আমরা শিখিয়াছি যে স্বদেশের শাসন ও বিচারকর্ত্তৃত্বে আমাদের মুখ্যভাবে অংশ-থাকা আমাদের জন্মস্বত্ব, এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সেই জাতির অতীত ইতিহাস হইতে গৃহীত। ইংলণ্ডের ইতিহাসবিৎ পাঠকগণ অবগত আছেন কিরূপ কতিপয় স্বার্থান্ধ ইংরেজ ভূস্বামী শস্য-আইন স্থাপন দ্বারা বিদেশ হইতে শস্যআমদানী বন্ধ করিয়া ইংলণ্ডের দরিদ্র ও শ্রম-জীবিগণের অতি ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত করিয়াছিলেন। ওয়াটারলুর যুদ্ধ হইতে রিফরম্ বিল পাশ না হওয়া পর্য্যন্ত সপ্তদশবর্ষ ব্যাপিয়া ইংলণ্ডে এমন একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হয় নাই যাহাতে এই আইনের বিরুদ্ধে কিছু না কিছু বলা না হইয়াছে।

কিন্তু তখন পার্লামেণ্টে মেম্বর মনোনীত করিবার ভোট ও অধিকার জন-সাধারণের ছিল না সুতরাং পার্লামেণ্ট সংস্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের জয়-লাভের কোন আশাও ছিল না—রিচার্ড কবডেনের জীবনচরিত-লেখক গোয়িঙ্গ সাহেব একস্থানে বলিয়াছেন "এমন কি কবডেন এবং শস্য-আইনবিরোধী সভা কিছুতেই শস্য আইন রদ করিতে সমর্থ হইতেন না যদি ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রিফরম্ বিলের জয় না হইত"। * দেশান্তর হইতে স্বদেশে শস্য না আসিতে দেওয়ায় ইংলণ্ডবাসীদের যে কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল আমাদের দেশ হইতে অন্য দেশে শস্য ও অর্থ চালিত হওয়ায় আমাদেরও সেই কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। যতদিন আমরা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় আমাদের প্রতিনিধি মনো-নয়ন করিবার আরও উচ্চ অধিকার না পাই, ততদিন প্রাদেশিক সমিতির বহু চেষ্টাতেও আমাদের নানাপ্রকারের অসুবিধা ও অভাব ঘুঁচিবার সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই লাটসভায় প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার লাভ করাই আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে স্থান পাইয়াছে। ইংলণ্ডের ন্যায় দেশেও সামান্য রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিতে হইলে এবং সামান্য শাসনদুর্নীতির নিরাকরণ করিতে হইলে কত কঠোর চেষ্টা ও অক্লান্ত উদ্যমের আবশ্যক হয় এবং কত প্রকারের বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিবা, কত গণ্যমান্য ব্যক্তির উপ-হাসকে উপহাস করিয়া অবিচলিতচিত্তে অভীষ্টসিদ্ধির পথে চলিতে হয় ইংল-

* Gowing's Brief Biography of Richard Cobden

ণ্ডের কবডেনপ্রমুখ শস্য-আইনবিবোধি-সভাব দুর্দ্দমনীয় উৎসাহ ও অবিচলিত অধ্যবসায় তাহাবও একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং আমাদের কন্‌ফাবেন্সের পথ-প্রদর্শক আলোকস্তম্ভস্বরূপ। ইংলিশম্যান পাওনীযর ও বঙ্গবাসীব সম্পাদকগণ এবং কতকগুলি রাজকর্ম্মচাবী প্রাদেশিক সমিতিব ন্যায্য অধিকার লাভের চেষ্টাকে "প্রাংশুলভ্যে ফলেলোভা দুদ্বাহুরিব বামনঃ" বলিয়া যেরূপ উপহাস কবিতেছেন এবং আমাদেব সঙ্গত প্রার্থনাকে যেরূপ অন্যায্য ও অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিতেছেন, ইংলণ্ডে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেলবোর্ণ, সাব রবার্ট পিল এবং সাব জেমস্ গ্রেহাম প্রভৃতি বড বড লোক শস্য আইনবিবোধি-সভার দাবী দাওয়াকেও এইরূপ অন্যায্য ও অসম্ভব বলিয়া উপহাস কবিয়াছিলেন। কিন্তু অক্লান্ত অধ্যবসাযেব কি অপবিসীম ক্ষমতা!—সাত বৎসবেব মধ্যে শস্য-আইন-বিবোধি-সভাব জয হইল, শস্য আইন বহিত হইল,—ইংলণ্ডে অবাধ বাণিজ্যের মহিমা কীর্ত্তিত হইল। ইংলণ্ডবাসীবা যতদিনেব চেষ্টায অভীষ্টলাভে কৃতকার্য্য হইযাছিল আমাদেব অভীষ্টলাভ কবিতে নিশ্চয়ই তদপেক্ষা অনেক বেশী দিন লাগিবে, কিন্তু আমাদেব হতাশ হওয়াব কোন কাবণ নাই। ইংবেজদের নিকট হইতেই আমবা শিখিযাছি যে প্রজাদেবন্যায্য অধিকাবলাভের ও শাসনদুর্নীতি-নিবাকবণেব চেষ্টা কখন বিফল হয না। ইংবেজ-ইতিহাস-সঙ্গত ও আইনানুমোদিত গ্রন্থ হইতেই আমবা শিখিযাছি—

> "Freedom's battle once begun
> Bequeathed from weaned sire to son
> Though baffled oft is ever won.

হাজার বাধা বিপত্তি আসুখ, প্রবল উপহাসেব স্রোত বহুক, যুগযুগান্তব কাল-সাগরে মিশিযা যাউক—অক্লান্তভাবে চেষ্টা কবিলে আমাদের চেষ্টার ফল আমবা ভোগ করিতে পাবি বা না পাবি, আমাদেব বংশধরগণ ইহাব ফলভোগ করিবে ইহা একরূপ স্থিবনিশ্চয। পূর্ব্বে সাধাবণ মত গঠিত হয়, পরে তদনু-তানুযাযী কার্য্যসিদ্ধিব চেষ্টা হয ইহাই সর্ব্বদেশে সর্ব্বপ্রকাব সংস্কাবেব সাধারণ নিযম। এতদিন ধবিযা প্রাদেশিক সমিতি কেবল সাধারণ মত গঠনের চেষ্টা করিয়াছেন ও তাহা গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন, এখন সমিতির গতি অন্য দিকে চালিত করিবার সময আসিযাছে। এতদিন প্রাদেশিক সমিতি কেবল সাধারণ মত-গঠনকারী ও সাধারণ-মত জ্ঞাপনকারী সভা মাত্র ছিল,

এক্ষণে সমিতিকে একটী প্রকৃত সজীব ও কার্য্যকরী সভা করা আবশ্যক হই-যাছে। এই জন্যই সভাপতি মহাশয় তাহার বক্তৃতায় বিশেষরূপে বলিয়াছেন, "Let us strive thus to make our Conferences a real living and working body in which resolutions are to be passed only to be followed up by earnest and sustained attempts at reducing them to practice অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষা-বিস্তারদ্বারা, শিল্প ও কৃষির উন্নতিদ্বারা, সামাজিক দুর্নীতির দূরীকরণদ্বারা এবং এদেশের অভাবোপযোগী দাতব্যালয়-স্থাপনদ্বারা ক্রমে আমাদের প্রাদেশিক সমিতিকে সজীব ও কার্য্যকরী সভা করিয়া তুলিতে হইবে এবং ইহাতে যে সমস্ত প্রস্তাব অনুমোদিত হয় সেগুলি যাহাতে আমরা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি তদ্বিষয়ে আমাদের চেষ্টা করা আবশ্যক হইবে। প্রাদেশিক সমিতির ক্রমোন্নতির ইহাও একটী স্তর। এবার রাজসাহী কন্‌ফারেন্সে সভাপতি মহাশয় আমাদের নিজ কর্ত্তব্য যেরূপ পরিস্ফুট-রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন, পূর্ব্বে অন্য কোন সভাপতি এরূপভাবে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করিয়াছেন বলিয়া স্মরণ হয় না। এবার সভাপতি মহাশয় আমাদের নিজ কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিয়াছেন আমাদের সামাজিক দুঃখ ও অভাবের নিবারণ-জন্য শাসনকর্ত্তাদের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিলে চলিবে না, সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য অপেক্ষা করিলে চলিবে না, আমাদিগকে প্রকৃত একটী জাতিতে পরিণত হইতে হইলে নিজ-শক্তির উপর নির্ভর করিয়া অনেক কাজ করিতে হইবে,—যাহারা নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে, ভগবান্ তাহাদের সহায়।

গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে সিভিল সার্ব্বিস ও শিক্ষাবিভাগে আরও অধিক পরিমাণে কর্ম্ম দিতেছেন না বলিয়া আমরা আন্দোলন করিতেছি এবং গবর্মেণ্টের প্রতি নানারূপ দোষারোপ করিতেছি, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট নিজ অর্থব্যয়ে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য আমাদিগের মধ্যে যাহাদিগকে বিলাতে পাঠাইয়া কৃষিবিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া আনিতেছেন তাহারা দেশে আসিয়া কৃষিবিদ্যার আলোচনা না করিয়া এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতিদ্বারা দেশে ধনাগমের চেষ্টা না করিয়া পুনরায় গবর্ণমেণ্টের সামান্য চাকুরীর জন্য লালায়িত হইতেছেন ইহার উপায় কি?

(ক্রমশঃ)

শ্রীভবানীগোবিন্দ চৌধুরী।

# কবিতাকুঞ্জ।

## অভয় বাণী।

দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছি
    ল'য়ে শূন্য হৃদিখানি
প্রকৃতি লো। দ্বার খুলো—
    দাও সে অভয়-বাণী।
চারিদিকে ঘিরে ওই—
    অমার আঁধার রাশি,
রহিয়া রহিয়া— বায়ু
    গীত কার আনে—ভাসি।
মনে হয়,— শৈশবের
    সেই সে স্নেহের ছায়া,
কৈশোরের চিত্রগুলি—
    অযাচিত প্রীতি-মায়া,
প্রিয়তম জন্মভূমি
    স্বাদু নদী-সরোজল—
গোচারণ-মাঠখানি,,
    সুমিষ্ট গাছের ফল,
গোধূলির মিটি আলো
    ঊষার কনক ভাতি,
মধুর বিহগ-কণ্ঠ
    নীড়েতে প্রভাতী-গীতি,—
মনে হয়, আজি—সব
    কিন্তু হায়, কোথা তারা ?—
রাখিয়ে স্মৃতির রেখা
    তা'রা যে হয়েছে ছাড়া।
মর্ম্মস্পৃক্ যন্ত্রণার
    অব্যক্ত বিষাদ-ধ্বনি,
বাজিছে হৃদয়-যন্ত্রে—
    কোথা সে অভয়-বাণী।
        "নীহার বিন্দু" রচয়িতা।

## মেঘ ও রৌদ্র।

সে নয়নে এক বিন্দু— প্রেমময় মহাসিন্ধু,
    সংসার ডুবায়ে দেয় অতলের মাঝে।
আমার সে 'আমি' হায়। কোথায় লইয়া যায়,
    খুঁজিলে মেলে না তাহা আপনার কাছে।
এক বিন্দু সেই জলে, হৃদয় তো ভিজে গলে,
    তন্দ্রা সুপ্তি স্বপ্নময় সে যে হ'য়ে যায়।
বিদায় মাগিতে যাই, কি যেন কি হ'য়ে যাই,
    ভুলা ভুলে চুমা খে'য় বসে পড়ি হায়।
অমনি তরল হাসি, আঁখি কো'ণে উঠে ভাসি',
    ফুটে প'ড়ে সুধারাশি যুগল অধরে।—
এই কি শিশির স্নাত প্রসূন স্বরগ জাত,—
    এই কি উষার আলো প্রলয়ের পরে ?

---

# সমালোচনা।

**উদ্দীপনা,** মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। আমরা উদ্দীপনার তিন সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। সম্পাদকের ও লেখকগণের নাম অপ্রকাশ। উদ্দীপনার প্রথম তিন সংখ্যার মধ্যে "উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত" শীর্ষক প্রবন্ধটী

সুপাঠ্য। লেখক অতি সুন্দররূপে কবিপ্রবর নবীনচন্দ্রের ঐতিহাসিক ভ্রম সমূহ সপ্রমাণ করিয়াছেন। বাস্তবিক আমাদের দেশের বড় বড় লেখকগণকেই ঐতিহাসিক ভ্রমে পতিত হইতে দেখা যাইতেছে। সাহিত্য গুরু বঙ্কিমচন্দ্রও এই বিষম দোষ হইতে অব্যাহতি পান নাই। সুপরিচিত ঐতিহাসিক বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় ৺বঙ্কিম বাবুর চন্দ্রশেখর উপন্যাসস্থিত ভ্রম গুলি তাঁহার মিরকাসিমশীর্ষক প্রবন্ধে সম্যক নির্দ্দেশ করিতেছেন। সীতারামেও তাঁহার ঐরূপ ভ্রম-প্রমাদ পরিলক্ষিত হইয়াছে। অক্ষয় বাবু তাঁহার সিরাজদ্দৌলায় নবীন বাবুর পলাশীর যুদ্ধের কয়েকটী ভুল বিশেষরূপে দেখাইয়াছেন। সমালোচ্য প্রবন্ধ-লেখকও তাঁহার যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধে রৈবতক প্রভৃতির ভ্রমগুলি উল্লেখ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের সবিশেষ হিতসাধন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। উদ্দীপনার দীর্ঘ জীবন আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি।

**ব্রহ্মতত্ত্ব,** ত্রৈমাসিক পত্র। ২য় ভাগ. ১ম সংখ্যা। বিখ্যাত দার্শনিক বাবু সীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ সম্পাদিত। সীতানাথ বাবু যে অতীব চিন্তাশীল, ব্রহ্মতত্ত্বে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রহ্মতত্ত্ব রীতিমত পরিচালিত হইলে বঙ্গ সাহিত্যের একখানি অপূর্ব্ব ও অনুপম গ্রন্থ হইবে। ভাষা প্রাঞ্জল এবং অধিকাংশ স্থলেই বিশুদ্ধ। 'বেদান্ত প্রতিপাদিত ব্রাহ্মধর্ম্ম' শীর্ষক প্রবন্ধটী পড়িয়া আমরা বড়ই প্রীত হইয়াছি। ইহাতে লেখক স্বীয় অসীম উদারতার ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।

**সাবিত্রী,** ১ম খণ্ড ৮ম সংখ্যা—সাবিত্রী নামটী আমাদের কাণে বড়ই ভাল লাগিয়াছে। হিন্দুসমাজে স্ত্রীশিক্ষার পুস্তক অতি বিরল। সম্ভবতঃ স্ত্রী পাঠ্য মাসিক পত্র এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। বিলাতী ধরণের স্ত্রীশিক্ষা ও আর্য্যশাস্ত্রানুমোদিত স্ত্রীশিক্ষা দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক্। সাবিত্রী পড়িয়া বোধ হইতেছে সাবিত্রী প্রাতঃস্মরণীয়া সাবিত্রী সতীর ন্যায় আমাদের উদাহরণ স্থল হইবেন। সাবিত্রী দীর্ঘ জীবিনী হইয়া আমাদের Anglicized ভারত-মহিলাদিগকে পুনরায় আর্য্যমহিলা করুন্ ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

# অজ্ঞেয়-বাদ।

( সমালোচনা )

## তৃতীয় অধ্যায়—অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলিতে কি পরিমাণ জ্ঞান বুঝায় ?

(২)

---

বাহ্যবস্তুতত্ত্বের কতকাংশ আমরা জানিতেছি, কতকাংশ অজ্ঞাত থাকিয়া যাইতেছে। এই জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতের মধ্যে যে চিরব্যবধান বর্ত্তমান, জড়-বিজ্ঞান আজ পর্য্যন্ত তাহা সম্পূর্ণরূপে দূর করা দূরে থাকুক ক্রমেই বুঝিতেছে যে এই ব্যবধান একদিকে অল্পতা প্রাপ্ত হইবামাত্র অপরদিকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে—বাহ্যবস্তুতত্ত্ব যতই অধিক জানিতেছে ততই স্পষ্টতররূপে বুঝিতেছে যে আরও অধিকতর তত্ত্ব অজ্ঞাত থাকিয়া গেল। প্রাচীনকালে অনুন্নত মানবসমাজ অশিক্ষিত লোকের ন্যায় যেমন অল্প তত্ত্বই জানিত সেইরূপ অল্প তত্ত্বই অজ্ঞাত থাকিল মনে করিত। প্রাতঃকালে সূর্য্য প্রতিদিন উদিত হইয়া সায়ংকালে প্রতিদিনই অস্তগমন করে কেন? ইহার মধ্যে অসভ্যজাতি অতি অল্প তত্ত্বই অজ্ঞাত থাকিল বলিয়া বুঝিতে পারে। তাহারা যে কোন একটি সিদ্ধান্ত করিয়া মনে করে যে তাহাতেই এই সূর্য্যতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যাত হইতেছে। অপেক্ষাকৃত উন্নততর সমাজে মানুষ যখন এই দৈনন্দিন অপার রহস্যের মূলে অনন্তকোটী গ্রহনক্ষত্র-সমন্বিত বিশাল সৌরজগতের অলঙ্ঘনীয় মহানিয়মের আভাস দর্শন করে, তখনই কেবল জ্ঞাত অপেক্ষা আরও যে অজ্ঞাততত্ত্ব রহিয়াছে তাহা হৃদ্বোধ হইতে থাকে। সুতরাং মানবজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতের চিরব্যবধান বিলুপ্ত না হইয়া ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া মানুষ ক্রমে বুঝিতেছে যে, বাহ্যবস্তুর জ্ঞান সমুদ্রতীরে এতদিন সে "কয়েকখণ্ড উপল মাত্র সংগ্রহ করিয়াছে—সম্মুখে অখণ্ড জ্ঞান-

সাগর অক্ষুণ্ণ পড়িয়া রহিয়াছে!” অসভ্যজাতিরা অল্পজ্ঞানে সকল তত্ত্বই বুঝিয়াছে বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে, সভ্যজাতিরা কিছুই বুঝিল না ভাবিয়া নৈরাশ্যে বিষণ্ণ হইতেছে। অজ্ঞতার প্রধান দোষ এই যে সে নিজে কত মূর্খ তাহা বুঝে না, আর জ্ঞানের প্রধান গুণ এই যে সে নিজে এখনও কত অজ্ঞান তাহা অনুভব করিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া কি বলিব জ্ঞানীই অজ্ঞ আর অজ্ঞই পণ্ডিত? ঋষিগণ বলিতেন “যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ”—যে জানে না বলে সেই জানে, যে জানে বলিয়া মনে করে সে কিছুই জানে না। উপনিষদের এই মহাবাক্যই কি অধিকতর সত্য নহে? বাহ্যবস্তুর অজ্ঞাত অংশ যখন অনন্ত, অপার বলিয়া বোধ হয় তখন আমরা হতাশ হইয়া মনে করি “বাহ্যবস্তুতত্ত্ব বুঝি অজ্ঞেয়—অপার”! এইরূপ মনে করা মানুষের স্বভাব, কিন্তু তাই বলিয়া বাহ্যবস্তুতত্ত্ব যখন আমরা ‘অজ্ঞেয়’ বলিয়া বর্ণনা করি তখন কি এমন কথা বুঝিয়া থাক যে তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের কোনই ‘জ্ঞান’ নাই?

ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধেও এইরূপ জ্ঞাত ও অজ্ঞাত—জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয় ব্যবধান চিরদিনই থাকিয়া যাইতেছে এবং যাইবে। যতই জ্ঞানের উন্নতি হইবে ততই এই ব্যবধান দূরতর হইয়া ক্রমেই জ্ঞাত অপেক্ষা অজ্ঞাত, জ্ঞেয় অপেক্ষা অজ্ঞেয়ের রাজ্য বিস্তৃতিলাভ করিতে থাকিবে—তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই জন্য ঈশ্বরতত্ত্বকে যেমন ‘অজ্ঞেয়’ বলিবে তেমনি তাহার ‘জ্ঞেয়’ অংশকে চিরদিনই অবনত মস্তকে মানিয়া লইতে হইবে। এইজন্য ভারতবর্ষের তত্ত্বদর্শি-ঋষিগণ যে মুখে বলিতেন যে ঈশ্বর-বাক্য মনের অগোচর সেই মুখে সেই সঙ্গেই বলিয়া রাখিতেন যে তিনি বাক্যমনের নিয়ামক; সুতরাং বাক্য মন তাঁহাকে না পাইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেও ইহা জানিয়া প্রত্যাবৃত্ত হয় যে বাক্য ও মনকে তিনিই নিয়মিত করিতেছেন,—তিনি মহান্, অনন্ত, অপার, অজ্ঞেয়, অথচ তাঁহাকে যতদূর জানা সম্ভব তাহা মানুষ জানিতে পারে। এই মহাসত্য আমাদিগের প্রাচীন ব্রহ্মবিদ্যাগ্রন্থে পত্রে পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। কৌতূহল চরিতার্থের জন্য আমরা পাঠকগণকে দুই চারিটী উপহার দিতেছি।

“যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতং।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যৎ শ্রোত্রে ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতং।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"

তলবকার শ্রুতি ৪—৮॥

বাক্‌শক্তি বিবিধ শব্দপ্রয়োগ করিয়াও যাহার তত্ত্ব প্রকাশ করিতে অক্ষম, অথচ যিনি বাক্যসকলকে বিবিধার্থপ্রকাশক শক্তি দিয়া বাক্‌শক্তির বিধান করিতেছেন; মন যাহাকে মননদ্বারা ভাবিতে গিয়া পরাস্ত হইয়া পড়ে, অথচ সেই মনকে যিনি জানিতেছেন, লোকে চক্ষুর্দ্বারা যাঁহার রূপ দর্শন করিতে পারে না, অথচ যিনি সমুদায় পদার্থই দর্শনের শক্তি মানব চক্ষুতে প্রদান করিতেছেন; কর্ণদ্বারা লোকে যাহার কথা শুনিতে পায় না, অথচ যিনি সকল কর্ণকে শুনিতেছেন; ঘ্রাণেন্দ্রিয় যাহার সৌরভ অনুভব করিতে অক্ষম, অথচ যিনি ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে ঘ্রাণশক্তি দিয়া সৃষ্টি করিতেছেন,—(আচার্য্য কহিতেছেন) "হে শিষ্য! তুমি তাঁহাকেই 'ব্রহ্ম' বলিয়া জানিও, লোকে যাঁহাকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া পূজা করে তাহা ব্রহ্ম নহে!" ইহা অপেক্ষা সরলভাবে জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয়তত্ত্ব আর কে বুঝাইয়া দিবে?

অসভ্য জাতিরা জগতের বাহ্যবস্তু সকলকে ভিন্ন ভিন্ন দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে এবং মনে করে তাহারা ঈশ্বরতত্ত্ব সকলই জানিয়াছে! সুসভ্য ধর্ম্মপরায়ণ জাতিরা প্রকৃত ধর্ম্মামৃত আস্বাদন করিয়া বুঝিতে পারেন যে, ঈশ্বরতত্ত্ব অল্পই জানিয়াছেন অধিক জানিতে পারেন নাই। বাহ্যবস্তুজ্ঞানের মধ্যে বিজ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই যত অজ্ঞেয়ত্বের আভাস প্রকাশিত হইতেছে, ঈশ্বরতত্ত্বেও সেইরূপ বলিয়া তাহার সকলই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলিতে পার না। সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়বাদ বিজ্ঞানসম্মত হওয়া দূরে থাকুক ইহা অপেক্ষা অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত আর হইতেই পারে না।

যদি এমন একটি পথ দিয়া তোমাকে গন্তব্যস্থানে যাইতে হয যে সে পথের অবসান নাই—যত যাও ততই অপার, তাহা হইলে তুমি যতই অগ্রসব হইবে ততই তাহাকে আবও অপাব বলিযা মনে হইতে থাকিবে! পথ দীর্ঘ কি হ্রস্ব, সান্ত কি অনন্ত ঘবে বসিযাই তাহা জানা যায না; সেই দীর্ঘ অনন্ত পথে হাঁটিযা তাহাব কিয়দংশ দেখিযা তবেই তাহাকে দীর্ঘ অথবা অনন্ত বলিতে পার। এই পথেব অনন্তত্ব যতই হৃদযঙ্গম কবিতে থাকিবে, যতই ভাবিয়া দেখিবে যে সমুদায জীবন হাঁটিলেও তাহাব শেষ হইবে না, ততই বলিবে তাহা তোমার পক্ষে 'অজ্ঞেয,' কিন্তু সম্মুখেব দিকে চাহিযা ইহাকে যেমন 'অজ্ঞেয়' বলিবে পশ্চাতেব দিকে চাহিযা কি বলিতে পাবিবে যে ইহাব তুমি কিছুই জান নাই? জিজ্ঞাসা মাত্রেই তুমি বলিবে যে যদিও এই অনন্ত পথেব অতি অল্পই তুমি দেখিযাছ, যদিও ইহাব সম্মুখভাগ অনন্ত অজ্ঞেয অংশে পূর্ণ, তথাপি ইহাকে তুমি সম্পূর্ণ 'অজ্ঞেয' বলিতে পাব না। যদি ঘবে বসিয়া কেবল তর্ক কবিবাব জন্যই তর্ক কবিতে হয, তুমি তাহাকে সম্পূর্ণ 'অজ্ঞেয' বলিবে বৈ কি। কিন্তু নিজে চক্ষু কর্ণেব বিবাদভঞ্জন কবিযা পথে দাঁড়াও, বলিবে এই অদ্ভুত পথ "জ্ঞাত ও অজ্ঞাত!" যাহা জানি না তাহা অনন্ত হইলেই যাহা জানি তাহা অজ্ঞেয হইযা যায না, যাহা পাই নাই তাহা অপ্রাপ্য হইলেই যাহা পাইয়াছি তাহাকে অপ্রাপ্ত বা অপ্রাপ্য বলিতে পাবি না। তুমি বড় দবিদ্র, শুনিয়াছ সমুদ্রে অনন্ত বত্ন আছে, তাহা পাওনাই বা পাইবাব শক্তিও তোমাব মত দরিদ্রেব নাই। নাই বলিযা দুঃখ কবিতে পাব, কিন্তু তোমার বাক্সের মধ্যে যে সামান্য ধন বত্ন আছে তাহাকে কি সেই সঙ্গে 'নাই' বলিতে পার? হইতে পাবে যে সমুদ্রের তুলনায শিশিববিন্দুব মত, অজ্ঞেয়েব তুলনায় জ্ঞাত বা জ্ঞেয় অংশ অকিঞ্চিৎকব, কিন্তু অকিঞ্চিৎকরের নাম কি 'অজ্ঞেয়'? আর আজ যতটুকু অজ্ঞেয়, চিবদিনই কি ততটুকু অজ্ঞেয় থাকিবে? জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞেয় অংশ চিবদিনই যে বাড়িবে তাহা কি মানব ইতিহাসে দেখিতে পাইতেছ না? কোথায অসভ্য আমমাংসভোজী নগ্ন দেহধাবী পর্ব্বতকোটর-বাসী বর্ব্বরজাতির জড়োপাসনা, আর কোথায় সুসভ্য পবিত্রকীর্ত্তি দিগন্ত-বিস্তৃতযশা আর্য্যঋষিব অতুল ব্রহ্মবিদ্যা—শিশিরবিন্দু আর সমুদ্রে কি ইহা হইতে বড়ই অধিক প্রভেদ?

মানবজ্ঞান ক্ষুদ্র, কিন্তু অনন্ত উন্নতিশীল—ইহা একটী দার্শনিক সত্য। বাল্যকালে যাহা 'অজ্ঞাত' যৌবনে তাহা 'জ্ঞাত' হয়, অশিক্ষিতাবস্থায় যাহা 'অজ্ঞাত' শিক্ষায় তাহাই 'জ্ঞাত' হয়; ইন্দ্রিয় বিশেষ পরিপক্ক হইবার পূর্ব্বে যাহা অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়, পরিপক্কদশায় তাহাই 'জ্ঞাত ও জ্ঞেয়' হইয়া থাকে; এক যুগে যাহা মানবজ্ঞানের অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় ছিল তাহাই পরবর্ত্তী যুগে জ্ঞেয় ও জ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছে। যদি জ্ঞেয় বস্তু সান্ত হইত, মানবজ্ঞান তাহার সীমা একদিন না একদিন লাভ করিত, কিন্তু জ্ঞেয় তত্ত্ব অপার বলিয়াই মানুষ যতই ঈশ্বরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে ও হইবে ততই নিত্য নূতন অজ্ঞাততত্ত্ব জ্ঞাত হইলেও নিত্য নবীন অজ্ঞেয় তত্ত্ব সম্মুখে দেখিতে পাইবে—এইমাত্র প্রভেদ। কথাটি শুনিয়া অনেকে ইহাকে বিজ্ঞানবিরোধী মনে করিতে পারেন। অনেকে হয়ত বলিবেন মানবজ্ঞান নিত্য নূতন ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে পারিলেও অনন্তকালেও সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিবে না, ইহা কি সম্ভবপর কথা? আজ যাহা জানি না কাল তাহা জানিব অথচ অজ্ঞাত রাজ্য সমান অজ্ঞাত থাকিবে, ইহা কি কখন সম্ভব হইতে পারে? উপরে উপরে দেখিলে তাহাই বোধ হইয়া থাকে; মনে হয় প্রতিদিন একগণ্ডূষ করিয়া অনন্তকাল ভরিয়া সমুদ্রের জল পান করিলে কালে সমুদ্র শুকাইবে না কেন? মানবজ্ঞান ও ঈশ্বরতত্ত্বের স্বরূপ আলোচনা না করিলে ইহার উত্তর দেওয়া যায় না। ঈশ্বরতত্ত্বের যে অংশ মানবের আপেক্ষিক জ্ঞানের বিষয়ীভূত সেই অংশে মানবজ্ঞান ক্রমেই অনন্ত নূতন তত্ত্ব জানিয়া ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইবে, আর যে অংশ মানবজ্ঞানের অগম্য তাহা ক্রমেই মানুষ অধিকরতরূপে জানিতে পারিবে। চিরদিনই মানবজ্ঞান "ধরি ধরি, ধরিতে পারি না" এই কথা অবনত মস্তকে স্বীকার করিবে। গণিতজ্ঞ পাঠক জানেন যে হাইপার-বোলা (Hyperbola) নামক অনন্তপ্রসারিত মহাবৃত্তাভাসের 'এসিমটোটিস' (Asymptote) যদিও ক্রমেই নিকটতর হইতে থাকে তথাপি ধরিতে পারে না কেন? উভয় রেখার মৌলিক স্বরূপই এইরূপ যে, 'ধরি ধরি' করিবে ধরিতে পারিবে। ইহাই দ্বৈতবাদের ভিত্তি।

'অজ্ঞেয়' বলিতে যদি এখনও সম্পূর্ণ 'অজ্ঞেয়' বলিয়া বিশ্বাস থাকে, তাহা—হইলে একবার আলোচনা করিয়া দেখ মানবজ্ঞানের ঐরূপ ধারণা করিবার

আদৌ শক্তি আছে কিনা? অজ্ঞেয়বাদিগণ বলেন, পরমেশ্বরকে 'জ্ঞেয়' বলিবার শক্তি মানবজ্ঞানে নাই, আমরা বলি পরমেশ্বরকে 'অজ্ঞেয়' বলিয়া প্রমাণ করিতে এবং তদনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে মানবজ্ঞান অক্ষম! একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দ্বারা আস্তিকগণ এই সিদ্ধান্ত বুঝাইয়া থাকেন। মনেকর, তুমি একাকী সমুদ্রবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে পতিত হইলে, তোমার সঙ্গে জনমানব নাই, দ্বীপেও কেবলমাত্র একভাগ লোকের বসতি আছে বলিয়া তুমি শুনিয়াছ, কিন্তু তাহাকেও দেখিতে পাইতেছ না। এখন সেই একমাত্র দ্বীপবাসী মনুষ্য সুসভ্য কি অসভ্য, দয়াবান্ কি নিষ্ঠুর, আশ্রয়দাতা কি নরমাংসভোজী তাহা জানা তোমার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। তুমি তাহাকে না দেখিয়া কোন সিদ্ধান্ত করা অন্যায় মনে করিয়া সমস্তদ্বীপ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে, কিন্তু ঘটনাচক্রের এমনি অদ্ভুত বিবর্ত্তন যে তুমি যখন পশ্চিমে, দ্বীপবাসী তখন পূর্ব্বদিকে; তুমি যখন উত্তরে, তিনি তখন দক্ষিণে বেড়াইতেছেন, তুমি সমুদায় দ্বীপ এক সময়ে একেবারে সকল স্থানব্যাপী চক্ষুতে যদি দেখিতে পারিতে, তবেই তাহাকে দেখিতে পাইতে; তাহা যখন অসাধ্য, তখন তোমার দেখা হইল না! দেখা হইল না বলিয়া কি 'অজ্ঞেয়' বলিতে পার—অজ্ঞেয় বলিবার পূর্ব্বে কি অনন্তজ্ঞান থাকা তোমার পক্ষে আবশ্যক নহে? সুতরাং মানুষের যখন সেরূপ পরিপূর্ণ জ্ঞান নাই, তখন তুমি এইমাত্র বলিবে যে, তুমি দেখিতে না পাইলেও সেই দ্বীপবাসীকে 'অজ্ঞেয়' বলিতে পার না। আর যদি সেই দ্বীপে পদার্পণ করিয়াই দেখিতে পাও যে মানব-বাসোপযোগী গৃহ ও বস্ত্রাদি রহিয়াছে, গৃহপালিত পশু পক্ষীর আহারের জন্য খাদ্য সঞ্চিত আছে, তাহাহইলে এই অত্যল্পমাত্র চিহ্ন দর্শন করিয়াই কি তুমি সেই দ্বীপবাসী মানুষের জ্ঞানাদির পরিচয় পাইবে না? তারপর যদি প্রতিদিনই নূতন নূতন আয়োজন দেখিতে পাও, অথচ সেই মানুষের সঙ্গে দেখা না হয়, শুধু চক্ষে দেখিতেছ না বলিয়া কি তাহার এই সকল কার্য্যদ্বারা তাহার সম্বন্ধে তুমি কিছুই জানিতে পারিবে না? এইরূপে জগৎতত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখ, ইহার মধ্যে সেই আদিকারণের স্বরূপাদির কোন চিহ্ন বর্ত্তমান আছে কি না। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

# যামিনী।

## প্রথম অধ্যায়।

ফাল্গুনেব জ্যোৎস্নাশালিনী বজনী প্রায শেষ হইযাছে, হাস্যমযী ঊষার স্থবর্ণ মুকুট-দীপ্তি গগনেব স্থদূব পূর্ব্ব সীমান্তে ধীরে ধীবে বিকাশ পাইতেছে, দুই একটি নিদ্রোত্থিত কল-কণ্ঠ বিহঙ্গ ঊষাব মঙ্গল আবতিব স্থমঙ্গল গাথা গাহিতে আবম্ভ কবিযাছে, শিশিবস্নাত প্রাতঃসমীব পুষ্পিত কুস্থম-বনেব ভিতব দিযা সৌবভরাশি বহন কবিযা লইযা যাইতেছে, সেই স্থস্নিগ্ধ ঊষাব তরল অন্ধকাবে শয্যাগৃহে স্বামী-পার্শ্বে দাডাইযা, স্বামীব কবপল্লব নিজ কবপল্লবে ধবিযা অশ্রুময়ী যামিনী বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল "তোমাব পাযে পডি আমাকে ফেলিযা যাইও না, আমাকে সঙ্গে কবিযা লইযা যাও"।

"কেন যামিনী এত দিনেব পব একথা কেন?" স্ত্রীব প্রশ্নে সংক্ষেপে এই উত্তর দিযা জ্ঞানেন্দ্রনাথ একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

যামিনীব দুই তিন বিন্দু অশ্রু জ্ঞানেন্দ্রনাথেব হাতেব উপব পডিল, বলিল এত দিনেব পব ত নয, আমি তোমাকে কতবাব বলিযাছি—তোমাব মনে নাই।

জ্ঞানেন্দ্র। কৈ আবত কখন বল নাই।

যামিনী। অনেকবাব বলিযাছি, অনেকবাব বলিব বলিব মনে কবিযাছি, লজ্জায় বলিতে পারি নাই।

জ্ঞানেন্দ্র। আমাব কাছে বলিতে কি তোমাব লজ্জা হয়?

যামিনী। আগে হইত, এখন আব হয না।

জ্ঞানেন্দ্র। আগে হইত এখন আব হয় না কেন?

যামিনী। তাহা আমি জানিনা, তুমি আমাকে ভুলাইও না, আমি ছাড়িব না, এবাব তোমাব সঙ্গে যাইব।

জ্ঞানেন্দ্র। এত জিদ্ কেন? মাযেব কাছে থাকিতে কি কষ্ট হয়?

যামিনী। মায়ের কাছে থাকিতে আবাব কিসেব কষ্ট।

জ্ঞানেন্দ্র। তবে থাকিতে চাহিতেছ না কেন?

যামিনী। আমি তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। তুমি না থাকিলে আমার সকলের কাছেই থাকিতে কষ্ট হয়।

জ্ঞানেন্দ্র। সত্য সত্যই যদি তাই হয়, তাহা হইলে আরও কিছুদিন তোমাকে একষ্ট সহিতে হইবে।

যামিনী। কেন? আমি কি দোষ করিয়াছি? আমি কি তোমার পদ-সেবার দাসী নই?

জ্ঞানেন্দ্র। তাহা কি আমি বলিতেছি? তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই আমারও একান্ত ইচ্ছা বটে, কিন্তু বাবা কি মা কেহই একথা তুলেন নাই, তাঁহারা কেহ কিছু না বলিতে আমি আপনা হইতে বলিলে তাঁহারা মনে করিবেন কি?

যামিনী। কেহই কিছু মনে করিবেন না, তুমি যখনই এস তখনই নানা প্রকার অসুবিধার কথা বল, সেই জন্য তাঁহারা কিছু বলিতে পারেন না, আমি জানি তাঁহাদের অমত নাই।

জ্ঞানেন্দ্র। তবে সে কথা এতদিন আমাকে বল নাই কেন? তাহা হইলে সেইরূপ বন্দোবস্তই করিতাম।

যামিনী। তুমি এত তাড়াতাড়ি যাইবে তাহা আমি কেমন করিয়া জানিব, তোমার একমাস ছুটী, এক মাস পরে যাইবে তাহাই জানিতাম, ভাবিয়াছিলাম ছুটী ফুরাইবার তিন চারি দিন আগে তোমাকে বলিব।

জ্ঞানেন্দ্র। কেন? এত শীঘ্র যাইবার কথা ত তোমাকে দুই তিন দিন বলিয়াছি।

যামিনী। বলিয়াছিলে বটে, কিন্তু আমি তখন তাহা বিশ্বাস করি নাই।

জ্ঞানেন্দ্র। তবে আর এখন কাঁদিলে কি হইবে? কাঁদিওনা এইবার আসিয়া তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব। জ্ঞানেন্দ্রের শেষ কয়টী কথা যামিনী শুনিতে পাইল না, বাতায়ন-পথ দিয়া ঊষার স্বর্ণরশ্মি গৃহভিত্তি-সংলগ্ন একখানি আলেখ্যের উপর পতিত হইয়াছে, যামিনী অবিচলিত দৃষ্টিতে সেইখানি দেখিতেছে। পঞ্চবটী বনে পর্ণকুটিরদ্বারে নবদূর্ব্বাক্ষেত্রে অজিনাসনে মৃগয়াশ্রান্ত রামচন্দ্র বসিয়া আছেন, পতিগতপ্রাণা জনকনন্দিনী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যেন জগৎসংসার ভুলিয়া সতৃষ্ণনয়নে স্বামিমুখপানে চাহিয়া আছেন,

আর অঞ্চল দিয়া রামচন্দ্রের ললাটদেশের ঘর্ম্মবারি মুছাইয়া দিতেছেন। আলেখ্য খানিতে এই চিত্র অঙ্কিত ছিল, জ্ঞানেন্দ্রের সহিত কথা কহিতে কহিতে তাহার দৃষ্টি যেমন সেই খানির উপর পড়িয়াছে, অমনি সেই আলেখ্য খানির ভিতর আপন চিত্তটুকু হারাইয়া ফেলিয়াছে, নির্ণিমেষে ভাবিতেছে আমি কি পাপ করিয়াছি তাই সীতার সুখ আমার ভাগ্যে ঘটিবে না? যামিনী অন্যমনস্কে জ্ঞানেন্দ্রের শেষ কথাটি শুনিতে পাইল না।

জ্ঞানেন্দ্র বলিল "যামিনী তবে আমি বিদায় হই, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই যাত্রা করিতে হইবে, ঐ শুন—ওঘরে সকলেই উঠিয়াছেন।

যামিনীর বুকের ভিতর দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল, তাহার অশ্রুধারা উছলিয়া পড়িল; গাঢ় আলিঙ্গনে স্বামীকে বেষ্টন করিয়া অশ্রুসিক্ত মুখখানি জ্ঞানেন্দ্রের বুকের উপর লুকাইয়া, ভগ্নস্বরে বলিল "তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে না—তাহা আমি জানি, আর আমি সে অনুরোধ করিব না, আমার একটী অনুরোধ রাখ—আ'জ তুমি যাইও না।

জ্ঞানেন্দ্র। ছি তুমি যে নিতান্ত বালিকার মত কথা বলিতেছ, সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন ঠিক্ হইয়াছে, সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়াছি, এখন আবার যাত্রা ভঙ্গ করিলে সকলে মনে করিবেন কি?

যামিনী। কেহ কিছু মনে করিবেন না। তোমার পায়ে পড়ি মাথা খাও আজিকার দিনটি যাইও না।

জ্ঞানেন্দ্র। তাই কি হয়?

যামিনী। কেন হইবে না? আরও ত কতবার এমন হইয়াছে, ছুটী ফুরাইয়া যাওয়ার পরও তো কতবার যাত্রা ভঙ্গ করিয়াছ, তখন তো কেহ কিছু বলেন নাই।

জ্ঞানেন্দ্র। তখনকার কথা, আর এখনকার কথা কি সমান? যা'ক ওসব কথায় আর কাজ নাই, যাত্রার সময় আর বাধা দিও না, কাঁদিও না।

যামিনী। আমি কি সাধ করিয়া কাঁদিতেছি? আমি কি অপরাধ করিয়াছি তাই আমাকে কাঁদাইয়া যাইতেছ?

জ্ঞানেন্দ্র। আচ্ছা যামিনি, সত্য করিয়া বল তুমি আ'জ এত ব্যাকুল হইতেছ কেন? আজ তো আমি এই নূতন বিদেশে যাইতেছি না; আগে আগে

যখন যাইতাম তখন তো কৈ এত উতলা হইতে না।

যামিনী। তখন বিদেশে যাইতে, ভাবিতাম আবার ফিরিয়া আসিবে, আমার ধন আবার আমি ফিরিয়া পাইব, এবার যে—

বলিতে বলিতে যামিনীর কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া গেল, কি এক অজ্ঞাত অবরুদ্ধ-যাতনা-স্রোত নয়ন পথে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইল, বিন্দুর উপর বিন্দু পড়িয়া দুইটী গণ্ড ভাসিয়া গেল।

জ্ঞানেন্দ্র বলিলেন "এবার কি?"

যামিনী অঞ্চল দিয়া চক্ষু জল মুছিল, তেমনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "এবার কি তাহা কি তুমি জান না?"

জ্ঞানেন্দ্র। কৈ আমি ত কিছু জানি না।

যামিনী। কেন জানিবে না, আচ্ছা বল দেখি তুমি বাড়ী আসিয়া অবধি যাই যাই করিতেছ কেন? তুমি আগেকার মত তেমনি করিয়া একটী দিনের জন্যও হাসিতে পারিলে না কেন? কি যেন একটা কথা তোমরা বাড়ী শুদ্ধ সকলেই আমার কাছে যেন গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছ কেন?

জ্ঞানেন্দ্র। কৈ সে সকল তো আমি কিছুই জানিনা।

যামিনী। সকলই তুমি জান, আমার কাছে কেন আর গোপন করিতেছ, আমি তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে পায়ে ঠেলিও না, তুমি আমার স্বামী, তোমার কাছে গোপন করিবার আমার কিছুই নাই, সত্য করিয়া বলিতেছি আমি সকলই শুনিয়াছি।

জ্ঞানেন্দ্র। বল, বল, কি শুনিয়াছ?

যামিনী। বলিব, বল আ'জ থাকিবে?

জ্ঞানেন্দ্র। আ'জ আর যাত্রা ভঙ্গ করিব না।

যামিনী। তবে আমিও আ'জ আর বলিব না, যাও বাধাও আর দিব না, যেখানে থাক, সুখে থাক, তোমার সুখেই আমার সুখ। কিন্তু স্মরণ রাখিও তুমি ভিন্ন অভাগিনীর আর কেহই নাই।

এইবার জ্ঞানেন্দ্রের নয়ন দুটি সজল হইল, সজল নয়নে যামিনীর সেই অকপট প্রেম-পরিপূর্ণ—অশ্রু-অভিষিক্ত মুখমণ্ডল পানে চাহিলেন, সেই মলিন মুখমণ্ডলের কাতর দৃষ্টি যেন অসহনীয় বোধ হইতে লাগিল, জ্ঞানেন্দ্র আর

সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না; যন্ত্রণাযুক্ত হৃদয়ে যামিনীর সে সুদৃঢ় বাহু-পাশ সবলে ছিন্ন করিলেন, সস্নেহে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন "যামিনি! বেলা হইল আর বিলম্ব করিব না, বিদায় হইলাম, বৃথা সন্দেহে আর কাঁদিও না।" প্রভাতের আলোকে তখন সমস্ত গৃহ আলোকিত হইয়াছে; জ্ঞানেন্দ্র শয়ন-গৃহের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বাহির হইলেন।

নয়নজলে যামিনীর দৃষ্টি-রোধ হইল, বাহিরে কল কল রবে পাখী ডাকিল, যামিনী শুনিতে পাইল না, প্রাতঃসূর্য্য-কর শিশিরমণ্ডলে প্রতিফলিত হইল, যামিনী দেখিতে পাইল না, নিশ্চিন্ত ভাবে ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া কিছুক্ষণ কি জানি কি ভাবিল, অতিনিঃশব্দে কিছুক্ষণ প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল, তাহার পর সেই শূন্য শয্যাতলে শরীর ঢালিয়া অন্তরের উচ্চ রোদনে ডাকিল "মরণ! কোথা তুমি? এস, অসহায়া যামিনীর তুমি ভিন্ন আর কেহ সহায় নাই।"

---

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

মনোহর উপত্যকা প্রদেশে, কলনাদিনী নির্ঝরিণী-তীরে প্রকৃতির সোহাগ-পালিত কুরঙ্গশিশু যেমন মনের আনন্দে ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়, আজ সতের বৎসর পূর্ব্বে মালিনীর শুভ্র সৈকত ক্ষেত্রে, আপনার হৃদয়ভরা হর্ষ লইয়া, শৈশবের সেই সুখের দিনে যামিনী সমবয়স্কা সঙ্গিনী সঙ্গে—তেমনি ভাবে কত খেলা খেলিত, সন্ধ্যার জ্যোৎস্নালোকে মালিনীর জল উজ্জ্বল হইত, তারাপুরবাসী কৃষকগণের মৃণ্ময় গৃহগুলির প্রতিবিম্ব সেই নীল জলের ভিতর পড়িত, সন্ধ্যার বাতাসে তীরস্থ তরু লতাগুলি ঈষৎ আন্দোলিত হইত, নদীর উপর দিয়া দুই একখানি নৌকা ভাসিয়া যাইত, সে সময় সেখানে যাহারা থাকিত তাহারা দেখিতে পাইত—সেই নদীকূলে দাঁড়াইয়া একটি বালিকা নীল জলের ভিতর দিয়া চন্দ্রোদয় দেখিতেছে। যামিনী তখন সাত বৎসরের বালিকা!

যামিনীর সেই শৈশবের লীলা-নিকেতন ক্ষুদ্র গ্রাম খানির নাম তারাপুর। গ্রামে অধিকাংশ কৃষকগণের বসতি। গ্রামের নিম্নেই মালিনী নদী, নদীর

তীর-দেশ এবং গ্রাম খানির আশে-পাশে নবদূর্ব্বাদলমণ্ডিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্যামল প্রান্তর! তাহার মাঝে মাঝে লতা গুল্মপরিবৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন, সেই শ্যামল প্রান্তরে কৃষক-বালকগণ আপন আপন ধেনুর পাল চরাইত, কৃষক রমণীগণ মৃণ্ময় কলসী কক্ষে যামিনীর নীল জল তুলিয়া লইত, গুল্মবনে রাশি রাশি বন মল্লিকার ফুল ফুটিয়া থাকিত, যামিনী তারাপুরের কৃষক বালিকাগণ সঙ্গে বনে-বনে বেড়াইয়া আঁচল ভরিয়া বন-মল্লিকার ফুল তুলিত। কৃষকবালিকা-গণ সেই বনমল্লিকার ফুলে যত্ন করিয়া মালা গাঁথিয়া যামিনীর প্রতি-অঙ্গ সাজাইয়া দিত, পুষ্পময়ী যামিনী পুষ্পাভরণভূষিতা হইয়া বনদেবীর মত হাসিতে হাসিতে মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইত, জননী সস্নেহে যামিনীকে কোলে তুলিয়া লইয়া মুখ চুম্বন করিতেন, সেও আজ সতের বৎসরের কথা।

যামিনী তাহার পিতা মাতার একমাত্র স্নেহের সামগ্রী ছিল। যামিনীর পিতা রমাপ্রসাদ রায় সেই তারাপুরের জমিদার ছিলেন. সেই কৃষক পল্লীতে রায় মহাশয়ের প্রভূত সম্মান ছিল। সেই তারাপুরের কৃষক প্রজাগণ তাঁহার অধিকারে বাস করিয়া কখন দারিদ্র্য-ক্লেশ-ভোগ করে নাই। প্রজাগণকে তিনি আপনার সন্তানের মত দেখিতেন, প্রজারাও তাহাকে পিতৃতুল্য ভক্তি করিত। সেই কৃষক-পল্লীর ভিতর সরলা কৃষক-রমণীগণের সহিত বাস করিয়া যামিনীর সুখময় বাল্যজীবন অতীত হইয়াছিল। যামিনী বালিকা-বিদ্যালয়ে যায় নাই, বালিকা হৃদয় ক্ষেত্রে বিলাসিতার বিষবীজ অঙ্কুরিত হয় নাই, তাহার সুখময় শৈশব জীবন বিশ্বগ্রাসিনী আকাঙ্ক্ষা লইয়া বর্দ্ধিত হয় নাই, সে সেই পল্লীগ্রামে পিতা মাতার কাছে থাকিয়া পিতা মাতার ব্যবহার দেখিয়া দেখিয়া শিখিয়াছে—অতিথি ফিরাইতে নাই, পাপ করিতে নাই, কাহাকেও মন্দ কথা বলিতে নাই, পরের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিতে হয়, ঠাকুরদেবতাকে, গুরু-জনকে ভক্তি করিতে হয়।

বিদ্যুদ্দাম-কটাক্ষ-বর্ষিণী সুমধ্যমা সুন্দরী পাঠিকা হয়ত হাসিয়া বলিবেন—যামিনীর রূপ কেমন তাহাত কৈ শুনিলাম না। যামিনী রূপ দেখাইবার জন্য এ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে নাই, তাহার সেই ক্ষুদ্র হৃদয় খানি যে সকল গুণরাশির আধার ছিল তাহার জীবনের অশ্রুময় অভিনয় ক্ষেত্রে সেই গুলিই একটি একটি করিয়া দেখাইবার জন্য বুঝি এ মর জগতে আসিয়াছে;

পাঠিকাগণ ক্ষমা করিবেন যামিনীর রূপের কথা এ আখ্যায়িকায় উল্লিখিত হইবে না।

রমাপ্রসাদ রায় অবস্থাপন্ন লোক, অন্য কোন সন্তান সন্ততি না থাকায় একটী সুপাত্র আনিয়া ঘরজামাতা রূপে গৃহে রাখিবেন এই তাঁহার বাসনা ছিল; সেই অভিপ্রায়সিদ্ধি-মানসে নয় বৎসরের সময় জ্ঞানেন্দ্রের সহিত যামিনীর বিবাহ দিয়া জ্ঞানেন্দ্রকে নিজগৃহে আনিলেন। যামিনী নয় বৎসর বয়সের সময় জীবনের সাথী পাইলেন, তাহার খেলাঘর উঠিয়া গেল, বালিকা সেই কোমল বয়স হইতে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কি কর্ত্তব্য তাহা শিখিতে লাগিল, রায় মহাশয় জ্ঞানেন্দ্রনাথের বিদ্যা শিক্ষার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন।

যামিনীর শ্বশুরবাড়ী কুসুমপুর গ্রামে, গ্রামটী বৃহৎ, গ্রামে বহু ধনী এবং ভদ্রলোকের বাস, যখন যামিনীর বিবাহ হয় তখন জ্ঞানেন্দ্রের পিতা বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায়ের অবস্থা তাদৃশ ভাল ছিল না, তিনি জমিদার সরকারে সামান্য একটী চাকুরী করিতেন। যামিনীর সহিত জ্ঞানেন্দ্রের বিবাহ দিয়া তিনি পুত্রসম্বন্ধে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, রমাপ্রসাদ রায়ের অবর্ত্তমানে তাঁহার বিষয় সম্পত্তি জ্ঞানেন্দ্রেরই হইবে এ চিন্তাটি তিনি প্রতিমুহূর্ত্তেই করিতেন।

বিবাহের পর চারি বৎসর হইয়া গেল, যামিনী যৌবন সীমায় পদার্পণ করিল, সংসারের সুখের চিত্রগুলি একটি একটি করিয়া তাহার সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু সম্পূর্ণ সুখ তাহার ভাগ্যে ঘটিল না, চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা বৎসরের মধ্যেই পিতৃ-মাতৃহীনা হইল, যামিনীর করুণ আর্ত্তনাদে তারাপুর গ্রামের চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইল, তারাপুরে যামিনীর এক পিসি ভিন্ন তাহার আমার বলিতে আর কেহ থাকিল না।

উপযুক্ত সময় বুঝিয়া জ্ঞানেন্দ্রের পিতা যামিনীকে আনিবার জন্য তারাপুরে গমন করিলেন; তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা রমাপ্রসাদ রায়ের সমস্ত গৃহস্থালী উঠাইয়া কুসুমপুরে আনয়ন করেন। যামিনী ভাল মন্দ কিছু বলিল না, কিন্তু যামিনীর পিসি তাহাতে অমত করিলেন, কিন্তু মুখোপাধ্যায় মহাশয় সে বিষয়ে কর্ণপাত করিলেন না। যামিনীর পিসির থাকিবার জন্য ক্ষুদ্র একখানি ঘর রাখিয়া অপর সমুদয় গৃহ বিক্রয় করিয়া এবং সমস্ত গৃহ সামগ্রী ও গরু বাছুর

কুসুমপুরে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তখন গ্রামের কৃষকেরা এক জোট হইল। প্রথমতঃ তাহারা করযোড়ে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, বিনয় করিয়া উপস্থিত বিষয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিল; মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে গালি দিলেন, তাহারাও তখন উগ্রমূর্ত্তি ধরিয়া বলিল "আমরা বাঁচিয়া থাকিতে রায় মহাশয়ের এক গাছি খড় অন্যস্থানে যাইতে দিব না।" যতদিন পিসি ঠাকুরাণী থাকিবেন, ততদিন রায় মহাশয়ের ভিটায় প্রদীপ তিনিই দিবেন।

জ্ঞানেন্দ্রের পিতা ক্রোধে অন্ধ হইলেন, মনে মনে তাহাদের ভিটামাটি উৎসন্ন করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাঁহার আশা আর পূর্ণ হইল না; তখন তিনি যামিনীকে বলিলেন যে "এ সকল সম্পত্তি তোমার, তুমি সঙ্গে করিয়া লইয়া চল নতুবা তোমার পিসি সমুদায় বিক্রয় করিয়া আত্মসাৎ করিবেন।" ভাল হউক আর মন্দই হউক যামিনী কিন্তু ইহাতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা প্রকাশ করিল; মুখোপাধ্যায় মহাশয় যামিনীর উপরও যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন; মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, সংবৎসরের ভিতর পুত্রের আবার বিবাহ দিব।

যামিনীর পিতার যদি ভূসম্পত্তি না থাকিত, তাহা হইলে মুখোপাধ্যায় মহাশয় হয়ত যামিনীকে কুসুমপুরে আনিতেন না। যামিনী তারাপুরে থাকিলে হয়ত ভূসম্পত্তির আয়ও তাহার পিসি আত্মসাৎ করিবেন, এই তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল সেই জন্যই তিনি যামিনীর পিসির নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও জেদ করিয়া যামিনীকে কুসুমপুরে লইয়া আসিলেন। যামিনীর আসিবার সময় তারাপুরের কৃষকগণ কাঁদিতে কাঁদিতে বহুদূর পর্য্যন্ত যামিনীর শিবিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল, যামিনী সজল নয়নে তাহাদিগকে বিদায় দিল।

রমাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের ভৈরব ভট্টাচার্য্য নামে একজন প্রাচীন কর্ম্মচারী ছিলেন; তারাপুরের আদায় তহশিলের কার্য্য তাঁহার হাতে ছিল, যামিনীকে তিনি বড় স্নেহ করিতেন, রায় মহাশয় তাঁহাকে যথেষ্ট বিশ্বাস করিতেন। তিনি রায় মহাশয়ের একজন পরিবারভুক্ত বলিয়াই বোধ হইত। মুখোপাধ্যায় মহাশয় কুসুমপুরে আসিযাই তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া যামিনীর নাম সহি করিয়া পরওয়ানা দিলেন। বৃদ্ধ যামিনীর নাম সহিযুক্ত সেই পরওয়ানা পইয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে যামিনীর নিকট আসিয়া বলিলেন,

"মা! এ বৃদ্ধ বয়সে আর কোথায় যাইব?" বৃদ্ধকে কাঁদিতে দেখিয়া যামিনীও কাঁদিল,—বলিল "আমি ইহার কিছুই জানি না।" তখনই শাশুড়ীকে দিয়া শ্বশুরকে অনুরোধ করাইল—তাঁহার জীবনকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে যেন কর্ম্মচ্যুত না করা হয়। কুসুমপুরের কৃষকেরা যে একজোট হইয়াছিল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশ্বাস এই বৃদ্ধই তাহার মূল; তিনি যামিনীর এই অনুরোধ শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, তথাপি বৃদ্ধকে আর কর্ম্মচ্যুত করিতে পারিলেন না কিন্তু যামিনীকে জীবনের এক কণ্টক বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

বৎসর না ফিরিতেই তারাপুরের কৃষকগণের উপর যামিনীর পক্ষ হইতে বাকী খাজানা, জমাউচ্ছেদ প্রভৃতি নানা প্রকারের মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইল, তাহারা দলে দলে যামিনীর নিকট আসিয়া বলিল, মা! একি? যামিনী বড় অপ্রতিভ হইল, শ্বশুরকে অনুরোধ করিল, তাহাদের উপর নালিশ করিয়া কাজ নাই। পুত্রবধূর এতাদৃশ আচরণে মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রতিজ্ঞা করিলেন যে পুত্রবধূ শ্বশুরের অবাধ্য তিনি তেমন পুত্রবধূর মুখ-দর্শন করিবেন না।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কূট বুদ্ধি তখন হইতে যামিনীর সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত যামিনীর নামে বিষয় থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে চেষ্টা বৃথা, সেইজন্য যামিনীর বিষয় নিলাম করিবার চেষ্টা করিলেন, চেষ্টা ফলবতীও হইল, তারাপুর মহালের আশ্বিন কিস্তির লাটের টাকা দাখিল হইল না, মহাল নিলামে উঠিল, কৌশলী মুখোপাধ্যায় নিলামের দিন নিজ নামে নিলাম ডাকিলেন, তারাপুরে যামিনীর নাম ঘুচিল, যামিনীর অদৃষ্টাকাশে কাল মেঘের ছায়া পড়িল! মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কূট কৌশলে যামিনী কি অন্য কেহ তাহা জানিল না।

যে সময় এই সকল ঘটনা হয় সে সময় জ্ঞানেন্দ্রনাথ প্রবাসে, তিনি স্বীয় শ্বশুরের যত্নে বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত বিদ্যাভ্যাস করিতেন অবকাশ মত বাটী আসিতেন, কিন্তু সংসারের কোন বিষয় জানিবার তাঁহার আবশ্যক হইত না, ছুটীর অধিকাংশ সময় তারাপুরেই থাকিতেন, দুই এক দিনের জন্য কুসুমপুরে আসিয়া পিতা মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেন, তাঁহার শ্বশুরের মৃত্যুর পর বাটী হইতে তিনি কিন্তু আর তারাপুরে যান নাই; লোকে বলে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই যাইতে দেন নাই। যাহাই হউক জ্ঞানেন্দ্র-

নাথও সেই অবধি তারাপুরের কোন খোঁজ খবর রাখিতেন না, ভিতরে ভিতরে যে এত কাণ্ড হইয়া গেল জ্ঞানেন্দ্রনাথও তাহা জানিলেন না, বিশেষ পিতা বর্ত্তমানে বৈষয়িক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা তিনি অসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

যেবার তারাপুর নিলাম হইল, সেবার যামিনী আঠার বৎসরে পড়িয়াছে জ্ঞানেন্দ্রনাথও সেই বৎসর বি. এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, যামিনীর বড় আহ্লাদ—কিন্তু অভাগিনী জানিত না যে তাহার জীবনের সুখ টুকু কাড়িয়া লইবার জন্য তাহার শ্বশুর কিরূপ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন; জ্ঞানেন্দ্রনাথের বি, এ, পাশের সংবাদ আসিবামাত্র তিনি সংকল্প করিলেন, এই বৎসরই জ্ঞানেন্দ্রের পুনরায় বিবাহ দিব, তিনি লাভজনক আর একটা বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

যামিনী জ্ঞানেন্দ্রের কাছে একটা বড় অপরাধের কাজ করিয়াছিল, জ্ঞানেন্দ্র শিক্ষা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যামিনীকে লেখা পড়া শিখাইয়া প্রতিদিন তাহার নিকট পত্র লিখিতে অনুরোধ করিতেন, যামিনী বলিত আমার লজ্জা করে, তিনি যামিনীকে মুখে পাউডার মাখিতে, গায়ে সাবান ঘসিতে, অঙ্গে কাঁচলী আঁটিতে অনুরোধ করিতেন, যামিনী বলিল ছি! আমি পারিব না, আমার আরও লজ্জা করে, জ্ঞানেন্দ্র তাহাতে বড় ক্ষুব্ধ হইতেন, বন্ধু বান্ধবের সম্মুখে স্ত্রীর কথা উঠিলে, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বড় লজ্জিত হইতেন। এই সকল কারণে যামিনী জ্ঞানেন্দ্রের সমস্ত হৃদয় টুকু অধিকার করিতে পারে নাই. জ্ঞানেন্দ্রের হৃদয়ের বহুস্থান খালি পড়িয়া ছিল।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছি. তখন যামিনীর বয়স চব্বিশ বৎসর, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চাকুরীতে নিযুক্ত, মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ পর্য্যন্ত তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি করিতে পারেন নাই, কিন্তু যামিনীর অদৃষ্টাকাশ ক্রমে ঘোর ঘন-ঘটায় আচ্ছন্ন হইয়াছে, যামিনীকে একবাক্যে সকলেই বন্ধ্যা বলিতেছে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় উপযুক্ত সময় পাইয়াছেন; ইহার পূর্ব্বে জ্ঞানেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বিবাহের প্রকৃত কৈফিয়ৎ লোককে দিতে পারিতেন না, লোকে সতীনের উপর মেয়ে দিতে সঙ্কুচিত হইত; এবার তিনি যামিনীর বন্ধ্যাত্ব গম্ভীর শব্দে ঘোষিত করিলেন, জ্ঞানেন্দ্রকে বলিলেন বাপু! তুমি

একমাত্র সন্তান, বংশরক্ষা না হইলে পিতৃপুরুষেরা এক গণ্ডূষ জল পাইবে না। "তুমি আবার বিবাহ কর।" জ্ঞানেন্দ্র জানিতেন পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে নাই, তিনি মত দিলেন, দুঃখিনী যামিনীর প্রসন্ন অদৃষ্ট ভাঙ্গিল।

অতি সংগোপনে মুখোপাধ্যায় মহাশয় রূপসী এক পাত্রী স্থির করিলেন; পুত্রের দ্বিতীয় বিবাহে জ্ঞানেন্দ্রের জননীর একবারেই মত ছিল না, সেই জন্য মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকেও বিবাহের কথা জানাইলেন না। পুত্রকে গোপনে পত্র লিখিলেন, এবং বিবাহপ্রসঙ্গ প্রকাশ হইলে কোন একটা বিশেষ ক্ষতি হইবে ইহাও বিশেষরূপ বুঝাইয়া দিলেন, জ্ঞানেন্দ্র এক মাসের ছুটী লইয়া বাটী আসিলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাটী আসিলে বিবাহের কথা লইয়া একটু আধটু কাণা ঘুষা হইল, জ্ঞানেন্দ্রের জননী শুনিয়া স্বামীকে বলিলেন "এখন বিবাহ দিলে আমি খুনোখুনি করিব।" যামিনীর অজ্ঞাতসারে দুই তিন দিন ধরিয়া এইরূপ গোলযোগ চলিল, শ্বশুর সর্ব্বদা বিরক্ত, শাশুড়ী ম্লানমুখী, জ্ঞানেন্দ্র চিন্তাযুক্ত, দেখিয়া শুনিয়া যামিনী বড় বিষম সন্দেহে পড়িল।

ওদিকে মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিবাহের দিন স্থির করিয়া পাত্রীপক্ষকে পত্র লিখিয়াছেন, দিন ক্রমে সন্নিকট হইয়া আসিয়াছে; ইহার মধ্যে আবার পাত্র দেখা রূপ একটা অন্তরায় আছে, বড়ই বিব্রত হইয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় জ্ঞানেন্দ্রনাথকে বলিলেন "পাত্রীর পিতার মত তুমি স্বয়ং গিয়া পাত্রী দেখ, বিশেষ অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, না যাওয়াটা ভাল হয় না, অতএব তুমি বাটীতে 'কর্ম্মস্থানে যাইতেছি' বলিয়া আগামী কল্যই তথায় যাত্রা কর, কারণ স্ত্রীলোকেরা জানিলে অনেক বিঘ্ন বাধার সম্ভাবনা।" পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে নাই, সুতরাং জ্ঞানেন্দ্রনাথ আহ্লাদের সহিত স্বীকৃত হইলেন।

সন্ধ্যা বেলায় যামিনী শুনিল তাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে, গোয়ালাদের রঙ্গিনীর মা যামিনীর কাণে কাণে এই সংবাদ দিয়া গেল, যামিনী একবার বিশ্বাস করিল, একবার করিল না, সহসা একথা কাহারও কাছে জিজ্ঞাসা করিতেও তাহার সাহস হইল না, তাহার ছেলে হয় নাই বলিয়া তাহার মনের বলও অনেকটা কমিয়া গিয়াছে, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে স্থির করিল—আর কাছ ছাড়া হইব না। তাই যামিনী যাইবার সময় জ্ঞানেন্দ্রের হাতে ধরিয়া

কাঁদিতে কাঁদিতে বলিযাছে "আমাকে পায়ে ঠেলিও না, আমাকে সঙ্গে কবিয়া লইযা যাও।"

অন্ধ জ্ঞানেন্দ্র সবলাব সে করুণ আর্ত্তনাদে কর্ণপাত করিলেন না, কুসুম-কোমল হৃদয়খানি চবণে দলিত কবিলেন, মঙ্গল-কলস চবণে ঠেলিলেন; অলক্ষিতে দুই জনেব নিয়তি-ক্ষেত্রে বিষবৃক্ষেব বীজ অঙ্কুবিত হইল।

শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

# জগৎ শেঠ।

প্রকৃতিব ভৈববীমূর্ত্তি মরুস্থলী বা মাববাবভূমি বাঠোব বিজয়-পতাকা হৃদযে ধাবণ কবিযা এককালে সমগ্র বাজস্থানে আপনাব গৌববপ্রভা বিস্তাব কবিয়াছিল। এই মাববাব প্রদেশে নাগব নামে এক প্রসিদ্ধ নগব আছে। মাববাবেব রাজধানী যোধপুবেব পবই নাগব উক্ত প্রদেশেব প্রধান স্থান বলিযা পবিকীর্ত্তিত। খৃষ্টীয ১৩৮২ অব্দে নাগব বাঠোবকুলশ্রেষ্ঠ চণ্ড কর্ত্তৃক অধিকৃত হয, তদবধি উহা যোধপুরেব যুববাজগণেব বৃত্তিভূমি রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিতেছিল। বাঠোরগণেব প্রভুত্বকালে নাগব হইতে বার্ষিক ৭৫ হাজাব টাকা বাজস্ব আদায়ের কথা শ্রুত হওযা যায। নাগব অনেকবাব মুসলমানদিগেব দ্বাবা অধিকৃত হইযাছিল। মোগলকেশবী আকবব সাহ একবাব ইহাব বক্ষে বিজযবৈজযন্তী প্রোথিত কবিযা বীকানীব বাজাকে উক্ত নগব সমর্পণ কবিযাছিলেন, কিন্তু অবশেষে উহা পুনর্ব্বার যোধপুব-বাজ্যেব অন্তর্ভূ্ত হয়। কাহাবও কাহারও মতে এই নাগর হইতে দেবনাগব অক্ষবেব উৎপত্তি হইযাছে। মাববাবেব অন্তর্গত এই সুপ্রসিদ্ধ নাগবই বাঙ্গলার শেঠবংশীযদিগেব পূর্ব্বনিবাস। নাগবে বহুকাল হইতে জৈনধর্ম্মাবলম্বী বণিগ্‌গণ বাস করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মেব অবসানেব পর জৈনধর্ম্ম কিছু দিনের জন্য ভাবতেব কোন কোন স্থানে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, রাজপুতানার অনেক স্থান জৈনদিগের বাসভূমি হইয়া উঠে। নাগব তন্মধ্যে একটী প্রধান স্থান। বাঙ্গলার শেঠগণ প্রথমতঃ উক্ত জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাঁহারা

জৈনদিগের শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য হইতেন। সাধারণের অবগতির জন্য আমরা প্রথমতঃ শেঠগণের পূর্ব্বধর্ম্মের কথঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিতেছি।

যৎকালে ভারতবর্ষে শাক্যসিংহের প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম্ম দিন দিন হীনপ্রভ হইতে লাগিল, সেই সময়ে জৈনধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে আপনার প্রসার-বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করে, বৌদ্ধধর্ম্মের নীতিমালার উপরই ইহার ভিত্তি সংস্থাপিত হয়, কিন্তু অন্যান্য উপকরণ মিশ্রিত হওয়ায় তাহার ভিত্তি তাদৃশ সুদৃঢ় হইতে পারে নাই। সেই জন্য ইহা কেবলই ভারতবর্ষে আবদ্ধ হইয়া থাকে, ভারত ব্যতীত অন্য কোন দেশে ইহার স্থান হয় নাই। জৈনধর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তার নাম অর্হৎ, ইনি দক্ষিণ কর্ণাট নিবাসী ও বেঙ্কট গিরির অধীশ্বর ছিলেন। অর্হৎ নৃপতি ঋষভ-দেবের চরিত্র আদর্শ করিয়া তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ হইবার জন্য উদাসীনবেশে ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হন। হিন্দুদিগের মতে ঋষভ দেব ভগবান্ বিষ্ণুর অংশাবতার। জৈনেরা তাঁহাকে প্রথম অর্হৎ বলিয়া ব্যক্ত করিয়া থাকেন। জৈনগণ পরমেশ্বরের অস্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে অর্হৎই পরমেশ্বর। ইঁহাদের পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, রাগদ্বেষাদি সমস্ত দোষজয়ী, ত্রিলোকমান্য ও সত্যবাদী। জৈনমতে ধর্ম্মই একমাত্র মুক্তির পথ। ধর্ম্ম দ্বারা বন্ধক্ষয় হইলে জীব মুক্ত হয়, অর্থাৎ স্বভাবপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। মুক্তির স্বরূপ সতত ঊর্দ্ধ-গমন। এই মতে দুইটী মাত্র মূলতত্ত্ব জীব ও অজীব, তন্মধ্যে বোধস্বরূপ জীব ও অবোধাত্মক অজীব। কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে জীবাজীবেরও ভেদ আছে,—জীব দ্বিবিধ, সংসারী ও মুক্ত। অননঙ্ক, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পুদ্গল (শরীর), অস্তিকায় (তত্ত্ব) প্রভৃতি ভেদে অজীব বহুবিধ। সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ চরিত্র এই তিনটী মোক্ষের পথ। জৈনেরা এই তিনটিকে রত্নত্রয় নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। জৈন মতে ধর্ম্মাধর্ম্ম জীবের বিবিধ পরিণামের কারণ। বৌদ্ধদিগের ন্যায় জৈনেরাও অহিংসাকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। জৈনদিগের যে সমস্ত নীতি প্রচলিত আছে তন্মধ্যে কতিপয় প্রধান নীতির উল্লেখ করা যাইতেছে।

যেখানে গুণবান্ লোক, সত্য, শৌচ, প্রতিষ্ঠা, গুণগৌরব, এবং যেখানে বাস করিলে অপূর্ব্ব জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা সেই স্থানেই বাস করা কর্ত্তব্য।

উত্তম ব্যক্তিরা জীর্ণ কি মলিন বস্ত্র পরিধান করিবেন না।

যদি প্রাজ্ঞ হও তবে দেবতা ও বৃদ্ধদিগের প্রতারণা করিও না—প্রতিভূ হইও না—সাক্ষী হইও না।

পেষণ-যন্ত্র, ছেদন-যন্ত্র, পাকস্থান, জলাধার, বর্দ্ধনী (গাড়ু, ঘটী,) এই পাঁচটী ব্যবহার্য্য বস্তু হইতে গৃহস্থদিগের ধর্ম্মবাধক পাপ জন্মে, অর্থাৎ এই সকল স্থানে হিংসা ঘটিবার সম্ভাবনা।

দয়া, দান ইন্দ্রিয়সংযম, দেবপূজা, গুরুভক্তি, ক্ষমা, সত্য, শৌচ, তপস্যা, চৌর্য্যবিমুখতা এই গুলি গৃহস্থদিগের ধর্ম্ম।

ধর্ম্মের অবয়ব বহুবিস্তৃত হইলেও তৎসমস্তের সার পরোপকার।

পতিতের উদ্ধার, অহিংসা, বিনয়, ইন্দ্রিয়সংযম, ন্যায়পূর্ব্বক জীবিকা গ্রহণ, মৃদুতা, এই সকল ধর্ম্ম পাপ নাশ করে।

অতিথি, যাচক, দুঃস্থ ব্যক্তি গৃহাগত হইলে যথাশক্তি ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে তাহাদিগকে কৃতার্থ করিয়া পশ্চাৎ আহার করান উচিত।

পীড়িত, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর ও ভয়যুক্ত হইয়া যদি কোন ব্যক্তি আগমন করে, তবে তাহাকে বিশেষরূপে অর্চ্চনা করিবে।

দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়া এমন কার্য্য করিতে হইবে যে, যাহাতে এক মুহূর্ত্তও যেন বৃথা না যায়।

এই সমস্ত নীতি যে হিন্দু নীতিশাস্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মের নিকট যে অনেক বিষয়ে ঋণী তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

জৈনেরা চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্কর বা মহাপুরুষের পূজা করিয়া থাকেন, ইঁহারা জিন নামে অভিহিত হন। মন্দিরে তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া পূজা করা হয়। ঋষভ, অজিত, সম্ভব, অভিনন্দন, সুমতি, পদ্মপ্রভা, সুপার্শ্ব, চন্দ্রপ্রভা, পুষ্পদন্ত, শীতল, শ্রেয়াংস, বসুপূজ্য, বিমল, অনন্ত, ধর্ম্ম, শান্তি, কুন্থ, অরা মালি, সুব্রত, নাম, নেমি, পার্শ্ব ও মহাবীর এই চতুর্বিংশ জন জৈনদিগের জিন বা তীর্থঙ্কর। ইঁহাদের মধ্যে পার্শ্বনাথের মত ভারতের সর্ব্বস্থানেই প্রচলিত। পার্শ্বনাথ কাশীধামের অশ্বসেন নামে জৈন রাজার পুত্র, ইঁহার মাতার নাম বামা। বামাদেবী স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, আদি জিনেশ্বর তাঁহার গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন পার্শ্বদেব গর্ভে অবস্থান কালে বামাদেবীর এইরূপ

জ্ঞান হইত যেন তিনি নিজপার্শ্বে একটী সর্প ধারণ করিতেছেন, এই কথা তিনি মুখেও ব্যক্ত করিতেন। সেই কারণে তাঁহার পিতা তাঁহাকে "পার্শ্ব" বলিয়া অভিহিত করেন। পার্শ্বনাথের বাল্যকাল ও যৌবনকাল নির্দ্দোষে অতিবাহিত হইয়াছিল, বার্দ্ধক্যে তিনি কাশীবাস পরিত্যাগ করিয়া সম্মেত পর্ব্বতে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি শত বৎসর জীবিত ছিলেন, তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কালই উপদেশ প্রদান ও ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতি সদনুষ্ঠানে অতিবাহিত হইত। জৈনদিগের চতুর্বিংশতিতম তীর্থঙ্কর মহাবীর ও জৈন ধর্ম্ম প্রচারের জন্য অপরিসীম যত্ন করিয়াছিলেন। আবু, গির্ণার শত্রুপুর ও পার্শ্বনাথ পর্ব্বত জৈনদিগের প্রধান তীর্থস্থান। ইহাদের মধ্যে শত্রুপুর-মাহাত্ম্যই প্রসিদ্ধ। জৈনদিগের পূজক ও সাধুদিগকে যতি কহিয়া থাকে। তাঁহারা জৈনধর্ম্মের দার্শনিক মতের বিষয় সম্যক অবগত নহেন। ইঁহারা ধর্ম্মই জগতের সার, যেহেতু ধর্ম্মই সুখমাত্রের প্রধান কারণ, ধর্ম্মের উৎপত্তি কারণ মনুষ্য, সেই কারণে মনুষ্য জীবের সার, যদ্দ্বারা মনুষ্যের উৎকর্ষ লাভ হয় তাহাই ধর্ম্ম ইত্যাদি কতিপয় স্থূল নীতি মাত্র অবগত আছেন। দেবমন্দিরে পাঠ, সাধুদিগের বন্দনা, তীর্থভ্রমণ, পরস্পর মিত্রভাবে অবস্থান, ও ইন্দ্রিয়দমন এই পাচটী যতিদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া উল্লিখিত হয়। মুখবন্ধন, পিচ্ছিকাগ্রহণ, কেশোল্লুঞ্চন প্রভৃতি কয়েকটী জৈনদিগের অসাধারণ ধর্ম্ম আছে, অন্য কোন জাতির মধ্যে এ সকল দৃষ্ট হয় না। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর ভেদে জৈনেরা সাধারণতঃ দুইটী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। তাঁহাদের সাধারণ লক্ষণ এই যে, শ্বেতাম্বরেরা ক্ষমাশীল, সঙ্গ-রহিত, কেশসংস্কার-বিহীন ও ভিক্ষান্নভোজী হইয়া থাকে। দিগম্বরেরা পিচ্ছিকা ও পয়ঃপাত্রধারী এবং নিরাবরণ অর্থাৎ উলঙ্গ। শ্বেতাম্বরেরা বস্ত্র পরিধান করে। তাঁহারা স্ত্রীসম্ভোগে একান্ত বিরত, কিন্তু দিগম্বরেরা রত। জগৎ শেঠগণ পূর্ব্বে উক্ত শ্বেতাম্বর জৈনসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, পরে বাঙ্গলার বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

# তোমরা ও আমরা। *

——o——

আমরা বাঁধিয়া বাড়িয়া আনিয়া দেই গো,
আর তোমরা বসিয়া খাও,
আমরা দু'বেলা হেঁসেলে ঘামিয়া মরি গো
আর ( খেয়ে দেয়ে ) তোমরা নিদ্রা যাও ,
আজ এ বিপদ, কাল ও-বিপদ করি গো,
হাতের দু'খানা গহনা ও টাকাকড়ি গো,
"না দিলে পরম প্রমাদে প্রেয়সী, পড়ি গো"
বলি, লয়ে চম্পট দাও। ১

স্বাধীনচিত্ত নিত্য রাত্রে ঘুরিবে,
কত পায়ে ধরি শুনিবে না
নদিবে অচিরে সাঙ্গ পাইবে, বলিবে,
"সরি তোমাদেরি তবে দেনা"
সুদিনে ঘেঁসিয়া গায়েতে পড়িয়া ঢলি গো,
"চন্দ্রবদনি আর কি" সোহাগে গলি গো,
"জীবিতেশ্বরি", "প্রিয়তমে", "সখি", বলি গো,
স্বর্গে তুলিয়া দাও। ২

---

* "সাধনা" পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আমরা ও তোমরা' নামক রহস্য কবিতাটির প্রত্যুত্তরে লিখিত। পাঠকগণের পাঠসৌকর্য্যার্থে উক্ত কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত হইল।

আমরা খাটিয়া বহিয়া আনিয়া দেই গো,
আর তোমরা বসিয়া খাও,
আমরা দুপুরে আপিসে ঘামিয়া মরি গো,
আর তোমরা নিদ্রা যাও ?
বিপদে আপদে আমরাই প'ড়ে লড়ি গো,
তোমরা গহনা পত্র ও টাকা কড়ি গো
অমায়িক ভাবে গুছায়ে পাল্কি চড়ি গো
ধীরে চম্পট দাও। ১

সম্পদে ছুটি কোথা হ'তে আসি পড় গো,
আহা যেন কতদিন চেনা,
তোমরা দোকানী পসারি সেঁকরা ডাক গো,

যখন যা আসে শ্রীমুখে বলিয়া যাও গো,
শুনে আমরা স্তব্ধ রই,
রক্তবর্ণ এমনি চাহনি চাও গো,
দেখে ভয়ে জড সড হই।
কথায় কথায় ধরণী কাটাও রাগি গো,
আমরাই যেন সব নিমিত্তের ভাগী গো,
পায়ে ধরি সাধি অপরাধ ক্ষমা লাগি গো,
তবু লাথি মেরে চলে যাও। ৩

আমরা মাদুরে পড়িয়া নিদ্রা যাই গো,
আর তোমাদের চাই গদি;
আমাদের শাক পাতাটা হ'লেই চলে গো,
আর তোমরা বোলাও দধি!
তথাপি যদি বা কোন কাজে পাও ত্রুটি গো,
স্বাস্থ্যে হালুয়া লুচি ও ব্যাধিতে রুটি গো,
না হ'লে আমরি! কর কি ভ্রুকুটি গো,
কিংবা চড চাপডটা দাও। ৪

আমরা একটী চুলের বোঝার ভারে গো,
সদা জ্বালাতন হ'য়ে মরি,
তোমরা, সে জ্বালা সহিতে হয় না, থাক গো
সদা এলবার্ট টেরি করি।
আমরা দু'খানা শাঁখা ও লোহার খাডু গো
পেলেই তুষ্ট, কষ্ট হয় না কার গো,
তোমাদের চটী, চুরুট ও চেন চাক গো,
তবু খুঁত খুঁতি মেটে নাও। ৫

শ্রীরজনীকান্ত সেন।

---

আর আমাদের হয় দেনা,
সম্পদে আসি গায়েতে পড়িয়া ঢলি গো,
"নব কার্ত্তিক আর কি" আদরে গলি গো,
"প্রাণ বল্লভ" "প্রিয়তম" "নাথ" বলি গো,
কৃতার্থ করিয়া দাও। ২

তোমরা অবাধে যা'খুসী বলিয়া যাও গো,
ভয়ে, আমরা স্তব্ধ রই,
আমরা কহিতে পাছে কি বেফাঁস বলি গো
সদা সেই ভয়ে সারা হই

# রাজনীতি।

সুহৃদ্বরেষু— আমাদেব দেশে একটী প্রবাদ আছে যে একলক্ষ কথা পূর্ণ না হইলে একটা বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হয না। দুর্ভিক্ষসম্বন্ধে এই প্রকাব একটা প্রবাদ থাকিলে মন্দ হইত না, লক্ষ কেন কোটী কথা পূর্ণ হইলেও যদি দুর্ভিক্ষ দূর হইবাব প্রবাদ থকিত তাহা হইলে এই কয মাসেব মধ্যে এত কথা হইযাছে যে একটা কেন দশ পনবটা দুর্ভিক্ষকে দেশ ত্যাগ করিতে হইত। কিন্তু কি দুঃখেব বিষয়, কথায শুধু মনই ভিজিযা থাকে, চিপিটক নামক খাদ্য দ্রব্য-বিশেষকে ভিজাইতে হইলে অপব দ্রব্যেব দবকার। দুর্ভিক্ষনিবাবণসম্বন্ধে এ কথাটী বেশ খাটে। এই অন্ন কষ্টের উপবে এত বাক্য বর্ষিত হইযাছে যে এখন আব বেশী কথা বলিতে ইচ্ছা করে না। ইংবেজ বাঙ্গালী, দেশী

---

কথায কথায় ধবণী ভাসাও কাঁদি গো
আমবা না জানি কবেছি কি অপবাধি গো
পড়িযা চরণযুগল ধরিয়া সাধি গো
তবু ফিবে নাহি চাও। ৩

আমবা বেচাবি বাবসা চাকবি করি গো,
আব তোমরা কর গো আযেস,
আমবা সাহেব মুনিব বকুনি খাই গো
আব তোমরা খাও গো পাযেস,
তথাপি যদিবা তোমাদেবি মনোমত গো,
কার্য্য করিয়া না পূবাই মনোবথ গো
অবহেলে চলি যাও নাড়া দিয়া নথ গো,
অথবা মারিতে ধাও। ৪

আমবা দাড়ীর প্রত্যহ অতি বাড়ে গো
সদা জ্বালাতন হ'যে মবি,
তোমরা, সে ভোগ ভুগিতে হয না, থাক গো
খাশা বেশ বিন্যাস করি,
আমরা দুটাকা জোড়ায় কাপড় পবি গো,
তোমাদের চাই সোণা দশ বিশ ভরি গো,
বোম্বাই বাবাণসী বছর বছরি গো,
তবু মন উঠে নাও। ৫

বিদেশী কাগজে কলমে অনেক কথা বলিয়াছেন, পাপের বিরোধী মত খণ্ডনের জন্য বাগ্‌যুদ্ধও যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু দেশের অবস্থা যে অনাহার সেই অনাহার—চির ভিক্ষা-পাত্র সংবল।

আমরা আর কিছু পারি আর নাই পারি, গবর্ণমেণ্ট নামক একটা প্রকাণ্ডাকার জীবের স্কন্ধে সমস্ত দায়িত্বের বোঝা নিক্ষেপ করিয়া বেশ একটু সোয়াস্তি ভোগ করিবার প্রবৃত্তিটা আমাদের মধ্যে অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক দল আছেন তাঁহারা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া খালাস; শাস্ত্রে আছে রাজার পাপেই দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয; সুতরাং রাজা কায়মনোবাক্যে যেমন করিয়া হউক সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুক। ভাবটা এই যেন আমাদের কোন প্রকার কিছুই করিবার নাই। যাহা করিতে হইবে সমস্তই করিতে রাজা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য। শাস্ত্রের উপরে কথা বলিবার স্পর্দ্ধা রাখি না; সসম্ভ্রমে এ ক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি; এ শ্রেণীর মহাশয়গণের শাস্ত্র-সঙ্গত বিশ্রামের বাধা দিবার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি নাই। আর এক শ্রেণীর মহাত্মগণ আছেন, আর এঁদের সংখ্যাই এখন ভারতবর্ষে খুব বেশী এবং খুব প্রতাপশালী; তাঁহারাও সমস্ত চাপ গবর্ণমেণ্ট বেচারীর মস্তকেই নিক্ষেপ করেন; তবে তাঁদের যুক্তি অন্য প্রকারের; তাঁহারা শাস্ত্রের কথা বলেন না। তাঁহারা যে সমস্ত কারণে গবর্ণমেণ্টকে চাপিয়া ধরিয়াছেন তাহার প্রধান প্রধান গুলি অতি সংক্ষেপে বলিতেছি। (১) এ দেশের লোককে খুব বেশী ট্যাক্স দিতে হয়; (২) গবর্ণমেণ্ট সমস্ত টাকা সৈনিক বিভাগে ব্যয় করেন এবং সে ব্যয় ক্রমেই বাড়িতেছে; (৩) শস্য যাকিছু হয় তাহা বিদেশে চলিয়া যায়; (৪) বিলাতের লোকে মাহিয়ানা, পেন্সন, বিনিময়ের বাটা, এটা ওটা সেটা প্রভৃতিতে অনেক টাকা লইয়া যান; সুতরাং এ দেশের লোক দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে, অন্নকষ্ট লাগিয়াই আছে, তাহার পরে যদি এক বৎসর অজন্মা হইল তাহা হইলেই হাহাকার—অনাহারমৃত্যু। উপরিউক্ত কারণপরম্পরা প্রণিধান করিলে গবর্ণমেণ্ট এই অনাহারমৃত্যুর জন্য দায়ী, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁহাকেই করিতে হইবে। ইহা খাঁটী রাজনীতি; ইহার উপর কাহারও কথা বলা চলে না; বেওয়ারিস হিন্দুশাস্ত্র বেচারীকেও গলহস্তে বিদায় দিতে পারি, কিন্তু এ সব কঠোর রাজনৈতিক সত্যের অপলাপ করিবার যো নাই; আর সেই জন্যই বোধ হয় এই

মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য একাকী ইংলণ্ড দুর্ভিক্ষের জন্য সংগৃহীত এক কোটী এক ষষ্টি লক্ষ টাকা চাঁদার মধ্যে এককোটী ত্রিশ লক্ষই নিজ ভাণ্ডার হইতে দিয়াছে!

উচ্চ রাজনীতির মহা আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া দিশাহারা হইবার প্রবৃত্তি আমার মোটেই নাই, বলিতে কি সাহসেও কুলাইয়া উঠে না। কিন্তু একটী কথা না বলিয়াও থাকিতে পারিতেছি না। রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা আমাদের এই দারিদ্র্য তথা অন্নকষ্টের যে সমস্ত কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন তাহা সমস্তই যুক্তিযুক্ত, তাহার একটী কথাও অস্বীকার করিবার যো নাই। তবে কথা কি জানেন, ছেলেবেলায় একখানি ইংরাজী কেতাবে Poor Richard এর কতকগুলি কথা পড়িয়াছিলাম, তাহারই একটী কথা এই ক্ষেত্রে আমার মনে উঠিতেছে; তিনি বলিয়াছেন যে "এমন অনেক গবর্ণমেণ্ট আছেন যাঁহারা বেশী পরিমাণে ট্যাক্স আদায় করেন, but idleness taxes us much more" এ কথাটী আমাদের উপর ষোলআনা খাটে। গবর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত ট্যাক্স লইতেছেন; আমাদের আয়ের একটা প্রকাণ্ড অংশ তাঁহাদিগকে দিতেছি, একথা স্বীকার করি, কিন্তু আলস্য-রাক্ষসকে তাহার অপেক্ষাও বেশী ট্যাক্স দিই না? তবে শুধু গবর্ণমেণ্টকেই চাপিয়া ধরি কেন, গবর্ণমেণ্টের মস্তকেই দায়িত্বের বোঝা চাপাইয়া দিই কেন? সে বোঝার অংশ গ্রহণ করিতে কি আমরা ন্যায়তঃ বাধ্য নহি?

গবর্ণমেণ্টকে একেবারে বেকসুর খালাস দিতেছি না, আর সদাশয় ইংরেজ গবর্ণমেণ্টও দায়িত্ব ঝাড়িয়া ফেলিতে প্রস্তুত নহেন। আমি জিজ্ঞাসা করি আমাদের কি কিছুই কর্ত্তব্য নাই? এই দারিদ্র্য, এই অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য কি চিরদিনই পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইবে? রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত এ কথায় কি উত্তর দিতে চান?

গবর্ণমেণ্ট ট্যাক্স একটু কম করিলে ভালই হয়, ইনকম্ ট্যাক্স, লবণের উপর কর, বিচার-বিক্রয়, পথকর প্রভৃতি কমাইলেও ভাণ্ডারে যথেষ্ট টাকা থাকিবার কথা, যদি সীমান্ত প্রদেশের খরচটা কম হয়। তাহা হইলে দেশের দারিদ্র্য কিছু কমিতে পারে। ইংরেজ যে এমন সোজা কথাটা বুঝিতে পারেন না তাহা নহে; ইংরেজের মহাশত্রুও তাঁহাকে এতটা নির্ব্বোধ মনে করে না। কিন্তু

সৈনিক বিভাগের ব্যয় কমান যে কারণেই হউক ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। বিলাতের কমিশনে আমাদের দেশের শীর্ষস্থানীয় মহোদয়গণ অকাট্য প্রমাণ সহ দেখাইযাছেন যে সর্ব্বগ্রাসী সৈনিক বিভাগের ব্যয়েই ভারত গবর্ণমেণ্ট ঘোর অর্থকষ্টে পড়িযাছেন। যিনি যাহাই বলুন ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এ ব্যয় কমাইতে পরিতেছেন না, সুদূর ভবিষ্যতেও পারিবেন না। সুতরাং ওদিক দিয়া যে দেশব্যাপী হাহাকার নিবারণের সুগম পথ হইবে তাহাত দেখিতেছি না। তবে যখনই হাহাকারে লক্ষ লক্ষ জীবের ভবলীলা অবসান হইবে তখন ভারতবর্ষ ভিক্ষার ঝুলী স্কন্ধে করিয়া জগতের দ্বারে দ্বারে কাতর কণ্ঠে ভিক্ষা চাহিবে, তখন ইংলণ্ড সর্ব্বাগ্রে সে ভিক্ষার ঝুলীতে সাহায্য দান করিবে।

কিন্তু এমন করিযা কয়দিন চলিবে? ভিক্ষার অন্নে কোন দিন কি কাহারও উদর পূর্ণ হইযাছে? তবে উপায কি?

উপায ইংরেজমুখের দিকে না চাহিয়া একবার নিজের দিকে চাওয়া; পরের কাছে দরখাস্ত করা ছাড়িয়া দিযা নিজের শক্তি-বৃদ্ধি করা। আমি পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলিয়াছি যে মহাজনের করাল গ্রাস হইতে দরিদ্র কৃষকগণকে রক্ষা করিবার উপায কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন। বিলাতের সার উইলিযম ওয়েডার্‌বরণ (Sir William Wedderburn) সাহেবও এই প্রস্তাব করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যাহা পারেন করুন্ তাহা ছাড়া দেশের ধনকুবেরগণ কি স্থানে স্থানে কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারেন না?

দ্বিতীয় কথা দেশের লোককে নানা প্রকার কার্য্য শিক্ষা দেওয়া। পূর্ব্বে আমি যে প্রস্তাব লিখিযাছিলাম তাহাতে এই সম্বন্ধে পরে বলিবার কথা ছিল কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধ উৎসাহের ক্ষুদ্র কলেবরের হিসাবে দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষ পূজার মাসের কাগজে অন্নকষ্টের কথাটা একটু কম থাকাই ভাল। ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে বক্তব্য প্রকাশ করা যাইবে।

শ্রীজলধর সেন।

---

# ছোট কথা।

"সত্য বলিবে, প্রিয়বাক্য বলিবে, কিন্তু প্রিয়বাক্য বলিতে গিয়া কদাচ অসত্য বলিবে না"—ইহাই সনাতন ধর্ম্মের চিরাগত সদুপদেশ। এই উপদেশ জীবনে পালন করিতে পারিলে ধর্ম্মলাভ হয়, আনন্দলাভ হয়, অমৃতলাভ হয় এবং ধর্ম্মানন্দামৃত লাভ করিলে মানব আর কিছুতেই ভয়প্রাপ্ত হয় না।

এই ধর্ম্মোপদেশ অনেকবার শুনিয়াছি। ইহার স্বল্পাক্ষর আয়তনের মধ্যেই যে জীবনযাত্রার সমস্ত মূলনীতি নিবদ্ধ রহিয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু হায়! জনসমাজে ইহার আর সমাদর দেখিতে পাই না!

আমরা প্রিয়বাক্যেরই সমধিক পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছি এবং সর্ব্বদা প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিতে গিয়া নিজে মিথ্যার প্রশ্রয় দিয়া অপরকেও মিথ্যার প্রশ্রয় দিতে উৎসাহ প্রদান করিতেছি। সভ্যতা, সামাজিকতা, ভদ্রতা নামক কতকগুলি কৃত্রিম ভাব মানবসমাজে প্রবেশলাভ করিয়া আমাদের প্রতি-দিবসের কার্য্যপ্রবাহের মধ্যে একটা মিথ্যার স্রোত টানিয়া আনিয়াছে। আমি তোমাকে মোটেই দু'চক্ষে দেখিতে পারি না, কিন্তু তথাপি লোক দেখাইবার জন্য প্রকাশ্যে তোমার জন্য কত না 'আহা' 'উহু' করিতে হয়! তুমিও ভণ্ড আমিও ভণ্ড। মৌখিক আত্মীয়তার ভণ্ডামি এতই বাড়িয়া উঠিয়াছে যে তাহা আর কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তুমি আমি বুঝিয়াও অবুঝের মত প্রতিদিবসের কার্য্যে এই ভণ্ডামিকেই সত্য বলিয়া ব্যবহার করিতেছি!

ভণ্ডামি আমাদের অঙ্গের আভরণ হইয়া উঠিয়াছে! খাঁটি মানুষ যে কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে তাহার খোঁজ খবর পর্য্যন্তও মিলিতেছে না। আমাদের নিন্দা, আমাদের প্রশংসা, আমাদের আহা, উহু, আমাদের হায় হায়—সকলই ভণ্ডামিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে!

আপনার নিকট আপনাকে কিছু মাত্র ভণ্ডামি করিতে হয় না। আত্ম-পুরুষের কাছে আমার নগ্নবেশ সর্ব্বদাই দেদীপ্যমান। কেবল পরের নিকট

বাহির হইবার জন্যই ভণ্ডামির আচরণ প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। পরের নিকট পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য না পড়িয়াও কত অধ্যয়নের ভাণ করিতেছি, পরের নিকট ধনবান্ বলিয়া সম্মান লাভ করিবার জন্য কত দারিদ্র্যদুঃখ চাপিয়া রাখিয়া সার্টের উপর চেন ঝুলাইয়া কোঁচা দোলাইয়া আসিতেছি; পরের নিকট স্বদেশপ্রেমিক ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি সাজিবার জন্য কত কাপুরুষত্বের কদর্য্য গলিতকুষ্ঠ ঢাকিয়া রাখিয়া সভামণ্ডপে উচ্চ করতালি আকর্ষণ করিয়া দেশ বিদেশে বাগ্মিতা ছড়াইয়া বেড়াইতেছি; পরের নিকট ধর্ম্মবীরত্ব দেখাইবার জন্য বাহিরে কত না ধর্ম্মকার্য্যের ভাণ করিতেছি। যে দিক্ দিয়া দেখ—ভণ্ডামির অন্ত নাই!

এই ভণ্ডামি দেখিয়া যে ভীত হয় তাহার ভীতিও ভণ্ডামি কিনা তাহাই জিজ্ঞাস্য। কথাটি খুব ছোট, কিন্তু ইহার মীমাংসা করিতে বহুদিনের আবশ্যক হইয়া থাকে। পুরাকালে যে সকল ভণ্ডামির অভিনয় হইয়া গিয়াছে বর্ত্তমানে তাহার রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে, বর্ত্তমানে যে সকল ভণ্ডামির অভিনয় চলিতেছে, ভবিষ্যতের ইতিহাসে তাহার গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে। কিন্তু সে ভবিষ্যৎ কত দূরে তাহা কে বলিয়া দিবে? যদি সাবধান হইতে চাহ ত সময় থাকিতে সাবধান হও, নচেৎ ভণ্ডামির সমধিক আদান প্রদান করিতে গিয়া প্রকৃত চিত্র বেশী দিন লুকাইয়া রাখিতে পারিবে না। এ দেশের একজন পরিহাসরসিক কবি লিখিয়া গিয়াছেন——

"তাবচ্চ শোভতে কেউ কেউ যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে"

## মুর্শিদাবাদ-কাহিনী। *
### (সমালোচনা)

বাঙ্গলা সাহিত্যে কাব্য, উপন্যাস, ও নাটকের অভাব নাই। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস হইতে নবীন বাবু ও রবি বাবু পর্য্যন্ত অনেক প্রতিভাবান্ কবি সরস কবিতা লিখিয়া ও স্থায়ী কাব্য রচনা করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্য অলঙ্কৃত করিয়াছেন। শেষোক্ত কবিদ্বয় অন্যান্য সুপরিচিত কবির সহিত আজিও

* ঐতিহাসিক চিত্র। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি-এ প্রণীত। বহরমপুর হইতে প্রকাশিত।

মাতৃভাষার সেবায় নিযুক্ত আছেন। উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ও তারক বাবু অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর প্রত্যেক সুসভ্য দেশেই তাঁহাদের সুনাম বিস্তৃত হওয়ার যোগ্য। এতদ্ভিন্ন রমেশ বাবু, রবি বাবু, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রভৃতি লেখক ও লেখিকা উৎকৃষ্ট উপন্যাসরচনায় ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। নাটকের সংখ্যা বাঙ্গলা সাহিত্যে কম নহে। কিন্তু এপর্য্যন্ত স্থায়ী উল্লেখযোগ্য নাটক প্রকাশিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। আমাদের বিশ্বাস বাঙ্গলার কোন লেখকই নাটককারের প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু বিশুদ্ধ সাহিত্য গ্রন্থ ও ইতিহাস বাঙ্গলা সাহিত্যে অতি অল্পসংখ্যক। পূর্ব্বে লেখকগণের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি ছিল না, যাহাহউক চন্দ্রনাথ বাবু ও কালীপ্রসন্ন বাবু প্রভৃতি সুলেখক বিশুদ্ধ সাহিত্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ও অপর সুপরিচিত লেখকগণ মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া দেশীয় সাহিত্যের কলেবরপুষ্টি করিতেছেন। এবং ইতিহাসে আমাদের অক্ষয় বাবু ও সত্যচরণ শাস্ত্রী-প্রমুখ লেখকগণ যথেষ্ট অধ্যবসায় ও উপযুক্ত সাহস দেখাইয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে নূতন যুগের অবতারণা করিয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে নিখিল বাবু বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। মুর্শিদাবাদ কাহিনী তাঁহারই লেখনীপ্রসূত।

আপনার অধ্যবসায়ের ফল গ্রন্থাকারে পরিণত করার নিখিল বাবুর এই প্রথম উদ্যম; কিন্তু বহু পূর্ব্ব হইতেই তিনি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া সাহিত্য-জগতে পরিচিত হইয়াছেন। মুর্শিদাবাদ-কাহিনীর অনেক প্রবন্ধই পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ-হিতৈষী, সাহিত্য, নব্যভারত, সৎসঙ্গ, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদের প্রত্যেক বিখ্যাত স্থানের পূর্ব্ব ইতিহাস বিশেষ যত্নের সহিত এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে এবং তথাকার প্রধান প্রধান বংশের পূর্ব্ব পুরুষগণের জীবনী সুন্দররূপে আলোচিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের সহিত সমগ্র বঙ্গদেশের ইতিহাসের বিশেষ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। পাঠকগণ "অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার ইতিহাসের একটী চিত্র ইহাতে দেখিতে পাইবেন"। লেখকের পুস্তকখানি সুখপাঠ্য করিবার চেষ্টা সফল হইয়াছে, বঙ্গভাষার ইহা একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ—সন্দেহ নাই।

ভাষার পারিপাট্যে ও প্রবন্ধ-রচনার প্রণালীতে নিখিল বাবু প্রসিদ্ধ ঐতি

হাসিক মেকলের অনুসরণ করিয়াছেন। মেকলের বাল্য প্রবন্ধের সহিত আলোচ্য প্রবন্ধ গুলির অনেক সাদৃশ্য আছে। নিখিল বাবু মেকলেরন্যায় জলন্ত ভাষায় আবেগপূর্ণ হৃদয়ে এক একটী ঐতিহাসিক চিত্র পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। যেরূপ দক্ষতার সহিত চিত্রগুলি অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে পাঠকগণের হৃদয় নিশ্চয়ই আকৃষ্ট হইবে এবং প্রবন্ধের বিষয়ের সহিত তাঁহাদিগের সহানুভূতি স্বতঃই উত্তেজিত হইবে। মেকলের প্রাথমিক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ গুলিরও ইহাই প্রধান গুণ। কিন্তু প্রবীণ ঐতিহাসিকের উত্তেজনা ও আবেগশূন্য, শান্ত, নিরপেক্ষ বিচারশক্তির কিছু অভাব ইহাতে দৃষ্টিগোচর হয়। ইতিহাস-লেখক হৃদয়ের আবেগ-স্রোতে প্রবাহিত হইয়া চলিলে বিচারশক্তির কিছু ন্যূনতা ঘটিয়া থাকে এবং স্থানে স্থানে সত্যেরও অপলাপ হয়। ইহা নবীন ঐতিহাসিকের অবশ্যম্ভাবী দোষ। যাহা হউক, পাঠকগণ যদ্যপি কবির ভাবময়ী কল্পনা, চিত্রকরের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি, এবং স্বদেশহিতৈষীর মাতৃভূমির দুঃখে অকপট হৃদয়ে ক্রন্দনের সহিত যত্ন ও অধ্যবসায়দ্বারা লুপ্তরত্নের উদ্ধার এক সঙ্গে দেখিতে চান, তাহা হইলে নিখিল বাবুর মুর্শিদাবাদ-কাহিনী পাঠ করুন্। এবং যদ্যপি বিদেশী লেখকের হস্তে দেশীয় ইতিহাস কি প্রকার বিকৃত, ও তাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থে আমাদের দেশের মহাপুরুষগণের জীবনী কিরূপ অন্যায়কলঙ্কিত হইয়াছে—দেখিতে চান, যদ্যপি পাপে ঘৃণা, সৎকার্য্যে উৎসাহ, এবং সৎ ও অসৎ উভয়বিধ লোকের প্রতি, বিশেষতঃ তাঁহাদের বংশের প্রতি, সমান উদারতা অনুভব করিতে চান, তাহা হইলেও প্রত্যেকে এক এক খণ্ড মুর্শিদাবাদ-কাহিনী ক্রয় করিয়া পাঠ করুন্।

এই গ্রন্থে কিরীটেশ্বরী, কাশীমবাজার, রাজা উদয়নারায়ণ, কাটরার মসজীদ (জাহানকোষা তোপ), রোশনীবাগ (ফর্‌রাবাগ), জগৎ শেঠ, বঙ্গাধিকারী, গিরিয়া, একটী ক্ষুদ্র কাহিনী, আলিবর্দ্দির বেগম, ভগবানগোলা, মতিঝিল, হীরাঝিল, লুৎফ উন্নেসা, পলাশী, খোসবাগ, জাফরাগঞ্জ, উধুয়ানালা, বড়নগর, মহারাজ নন্দকুমার, কান্ত বাবু, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, দেবী সিংহ, ব্যারা, এক-দিনের স্মৃতি. এই পঁচিশটী প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শেষোক্ত প্রবন্ধটীর জন্য আমরা লেখককে কবির উচ্চ আসনে স্থান দিতে পারি। সুর, লয়, তানযুক্ত

হইলে ইহা বাঙ্গলা সাহিত্যে একটী সতেজ সুখপাঠ্য কবিতা হইত—সন্দেহ নাই। "একটী ক্ষুদ্র কাহিনী" লেখকের সহৃদয়তার পরিচয় দিতেছে। "অতীত কাল-সাগরে" একটী 'উজ্জ্বল রত্ন লুক্কায়িত" ছিল, নিখিল বাবু "বিস্মৃতিস্তর হইতে সেই জ্যোতির্ম্ময় রত্ন উদ্ধার করিয়া সাধারণকে উপহার প্রদান" করিয়াছেন। অপর প্রবন্ধ গুলির অধিকাংশই আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সহিত বিশেষ সংসৃষ্ট। বারান্তরে আমরা তাহাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগছী।

# কবিতা।

## বিরহান্তে (গান)।

সখি, শ্যামল যমুনাপুলিনে
অই যে বাজিছে শ্যামের মুরলী অমিয় মধুর নিস্বনে।
শুন কি মোহিনী ভাষা—
আশাময়ী লো!—
যেন, কত-কি—কত-কি মধুর স্মৃতি মণ্ডিত সুখ স্বপনে।
যেন, বুঝি বুঝি-বুঝি-বুঝিতে না পারি—হৃদয় পরাণ টানে।
সখি, জাগিছে বসন্ত ওই
বনে বনে লো!—
ত হে উছলে সুষমা মনোহারী ফুল্লকুসুম রতনে।
ওই, ভাসিছে সুকণ্ঠ বিহগ-গীতি মৃদু মলয় পবনে।
কিবা, তরল জোছনা ঢালা—
তীরে নীরে লো!—
হের, উজল অযুত রজত-দীপ খচিত নীল গগনে।
শোভে, উজল অযুত রজত-দীপ নীল যমুনা জীবনে।
সখি, চললো ভেটিব নাথে—
মধুযামী লো!—
আমি, বাঁধিব তাঁহারে প্রণয়ের ডোরে হৃদয়-কদম্ব-মূলে।
আমি, বাঁধিব কুটীর সইলো, তাঁহার প্রেম-যমুনা কূলে।
সখি, ভুলি দিবা বিভাবরী—
রহিব ধেয়ানে লো!—
এ হৃদয় নীরে শ্যাম চাঁদ-রূপ ভাসিবে কনক-কিরণে!
চললো—আকুল হৃদয়! ধাও লো মিলিতে নাথের চরণে!

শ্রীমনোমোহন সেন।

# অজ্ঞেয়-বাদ।

(সমালোচনা)

## চতুর্থ অধ্যায়—আদি-কারণ কিংস্বরূপ ?

———oo———

নাস্তিকদিগের বিশ্বাস, এই অসীম জগৎব্রহ্মাণ্ডের কোনও আদিকারণ নাই—এই জ্যোতির্ম্ময় জগৎব্রহ্মাণ্ড সূচীভেদ্য মহান্ধকারসাগরে অন্ধ জড়পরমাণু-রূপে সহসা ঘুরিতে ঘুরিতে কোটী কোটী বিবর্ত্তনের পর বর্ত্তমান অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু ইহার আদি অন্ত, অতীত ভবিষ্যৎ তুল্যরূপ অন্ধকারে আছে। ইহার স্রষ্টা পাতা রক্ষয়িতা নাই, যে বিচিত্র নিয়মশৃঙ্খলে সৌর-জগতের রেণুপরমাণু পরস্পর পরস্পরকে একসূত্রে বাঁধিয়া অনন্ত শূন্যপথে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার "নিয়ামক প্রভু" কেহই নাই! এই অন্ধ নাস্তিকতা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরোধী বলিয়া শিক্ষিত সমাজে ইহার আজ কাল বিশেষ প্রতিপত্তি নাই। তবে শত শত চক্ষুষ্মান্ পুত্র কন্যা প্রতিদিন ঘরে ঘরে জন্ম-গ্রহণ করিলেও দুই চারিটী জন্মান্ধ শিশুও যেমন জন্মিয়া থাকে, সেইরূপ কচিৎ দুই চারিটী অন্ধ নাস্তিক দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারাও মুখে নাস্তিক কি সত্য সত্যই নাস্তিক তাহারও এপর্য্যন্ত নিঃসংশয় মীমাংসা হয় নাই।

এই জগৎব্রহ্মাণ্ড যখন বিচিত্র কৌশলে পরিপূর্ণ, ইহার রেণুপরমাণু পর্য্যন্তও যখন অসীম রহস্যময় তখন ইহার লীলাময় সৃষ্টিকর্ত্তা থাকিলেও থাকিতে পারেন, কিন্তু যখন থাকা না থাকা দুইরূপই সম্ভাবনা আছে, তখন "আছে কি নাই" কিছুই বলিতে পারি না—ইহা সন্দেহবাদীদিগের মত। বরং অন্ধ নাস্তিকের কিছু উৎসাহ উদ্যমের চিহ্ন আছে, কিন্তু সন্দেহবাদীরা জড়-ভরতের দল। এরূপ বিচারবিমুখ আলস্যপ্রিয় সন্দেহবাদী যে মানবসমাজে একেবারেই নাই তাহা নহে; বরং অনেক দেশে ইঁহাদের সংখ্যাই অধিক। যাঁহারা ক্ষীণবুদ্ধি, পরমুখাপেক্ষী, গড্ডলিকার ন্যায় জীবনপ্রবাহে দশজনের সঙ্গে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত, তাহারা আস্তিকের কথা শুনিয়া বলেন 'আছে', আবার নাস্তিকের কথা শুনিয়া মনে করেন 'নাই'। এই 'আছে নাই'-

তরঙ্গে পড়িয়া কূলকিনারা অনুসন্ধান না করিয়া সন্দেহ-সাগরে মন প্রাণ ভাসাইয়া দেন। ইহাঁদের বিশেষ কোন দল বাঁধিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি নাই, কেননা উৎসাহহীনতাই ইহাদের প্রধান লক্ষণ, সুতরাং ইহাদের সঙ্গে সমাজের বিশেষ বিবাদ নাই।

অজ্ঞেয়বাদীরাই কেবল তর্ক, যুক্তি, বিচার লইয়া অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য ব্যাকুল—যেন তাঁহারা ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ না করিলে তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে অক্ষম! কিন্তু অস্তিত্ব পর্য্যন্ত প্রমাণ করিয়াই সমুদায় বিচারশক্তি ফুরাইয়া যায়, তাহার পর আর কোন স্বরূপতত্ত্ব আলোচনার অবসর হয় না। অকূল তত্ত্বসাগরের তীর পর্য্যন্ত আসিয়া তাহার অনন্ত অপার বিস্তৃতি দেখিয়া স্বতঃই মানিয়া লন আদি-কারণ 'অজ্ঞেয়'। এই 'অজ্ঞেয়' নাম দিবার পূর্ব্বে যতটুকু জানিয়া থাকেন, তাহাও সেই সাগরকূলে ফেলিয়া রাখিয়া 'অজ্ঞেয়বাদ' সম্বল করিয়া সংসার গৃহে প্রত্যাগমন করেন! অজ্ঞেয়বাদিগণের মত এই যে আদি-কারণ কিংস্বরূপ, তাহা মানবজ্ঞানের অগম্য, সুতরাং এই স্বরূপতত্ত্ব মীমাংসার উপরেই অজ্ঞেয়বাদের প্রকৃত সমালোচনা নির্ভর করে।

অধ্যাপক স্পেনসারের লেখা দেখিয়া বোধ হয় যে তাঁহার অস্তিত্বমাত্র স্বীকার করিয়া নিবৃত্ত হইবার কারণ এই যে, ধর্ম্মমতাবলম্বিগণ যে সকল স্বরূপ-জ্ঞানের অভিমান করেন তাহা তাঁহাদের কথামতই মানিয়া লওয়া যাইতে পারে না। তিনি বলেন "ধর্ম্ম চিরদিনই অল্লাধিক মাত্রায় অধর্ম্মের সঙ্গে জড়িত হইয়া আসিয়াছে এবং আজও তাহা আংশিকরূপে অধর্ম্মসংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। প্রথমতঃ দেখুন যে, যাহা সর্ব্বজ্ঞানাতীত তাহার সম্বন্ধে কতক কতক জ্ঞান থাকার কথা স্বীকার করিয়া ধর্ম্ম স্বকীয় শিক্ষার বিপরীত কথা প্রচার করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ যে মুখে ধর্ম্ম বলিতেছেন যে, আদিকারণ অগম্য—অপার, সেই মুখেই আবার "তিনি এইরূপ তিনি সেইরূপ" বলিয়া অগম্যকে জ্ঞানগম্য বলিতে চাহিতেছেন। যদিও অগম্যতত্ত্ব স্বীকার করায় ধর্ম্মের পক্ষে যথেষ্ট সরলতার পরিচয় পাওয়া যায়, তথাপি স্বরূপতত্ত্ব পুনঃ পুনঃ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া ধর্ম্ম কপটতার একশেষ প্রদর্শন করিতেছেন।"— এইখানে আসিয়া যে অজ্ঞেয়বাদী হাবুডুবু খাইবেন তাহা ধর্ম্ম বহুদিন হইতেই জানেন! আমি যে মুখে বলি তুমি আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় সেই মুখেই আবার বলিয়া থাকি তুমি

বুদ্ধিমান্, দয়ালু, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মহাপুরুষ। অমানিশার অন্ধকারে প্রাণান্তেও ঘরের বাহিরে আসিতে চাই না, আবার সেই আমিই প্রভাতের সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে জগতের কার্য্যক্ষেত্রে ছুটিয়া বাহির হই—এইরূপ অসঙ্গতি-দোষে আমার সমুদায় জীবনও কার্য্যপরিপূর্ণ, তুমিত কেবল একটি অসঙ্গতি দেখাইলে, আমি জানি আমার অসঙ্গতি অনন্ত--অপার! কিন্তু হে অজ্ঞেয়বাদিন্! আমার অসঙ্গতি দেখাইতে গিয়া তুমি যে ঘোরতর অসঙ্গতির মধ্যে পড়িয়াছ তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার কোন উপায় আছে কি? তুমিই না অন্ধ নাস্তিকবাদিগণকে চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়াছ জগতের 'আদি-কারণ' আছে এবং তাহা সর্ব্বব্যাপী অনন্তশক্তি? যদি সকলই অন্ধকার, সকলই অজ্ঞেয়, এই উজ্জ্বল জ্ঞানালোকপূর্ণ শান্ত শীতল প্রভাততপনের অরুণ জ্যোতিঃ কোথায় পাইলে? যদি কিছুই জান না, সর্ব্বব্যাপী মহাশক্তি বলিয়া কেমন করিয়া বুঝিলে? আমি তোমাকে কপটবিশ্বাসী বলিতে পারি না, যতটুকু বুঝিয়াছ ভাল করিয়া বুঝাইতে পার নাই এই মাত্র। কিন্তু আমার কপটতা কোথায়? আমি অমানিশার অন্ধকারে বাহির হই না, যাহা জানি না তাহাকে অগম্য বলি, তাহাতে তুমি আমার সরলতার সাধুবাদ দিয়াছ, তজ্জন্য তোমাকে নমস্কার। কিন্তু দিবালোকেও গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া না থাকিয়া যতটুকু জানি ততটুকু পর্য্যন্ত অস্বীকার না করিয়া সংসারে সেই সর্ব্বব্যাপী মহাশক্তির জয়ঘোষণা করি বলিয়াই কি আমি কপটাচারী ভণ্ড? তুমি বলিতেছ আদি-কারণ আছেন, আমি বলিতেছি সত্যম্। তুমি বলিতেছ সেই আদি-কারণ অসীম—অপার, আমি বলিতেছি অনন্তম্। তুমি বলিতেছ সেই আদি কারণে কোনই অপূর্ণতা নাই, আমি বলিতেছি পূর্ণম্। তুমি বলিতেছ সেই আদি কারণ সকলেরই আদি কারণ, আমি বলিতেছি বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজম্। তুমি বলিতেছ সেই আদি কারণ অনন্তশক্তিশালী, আমি বলিতেছি পরাৎপরম্। তুমি বলিতেছ আদি-কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সুজ্ঞাত ও সুপ্রকাশিত, আমি বলিতেছি স্বপ্রকাশম্। তুমি বলিতেছ সেই আদি-কারণ রূপবিকারবর্জ্জিত, আমি বলিতেছি নিরাকারং নির্ব্বিকারম্। তুমি বলিতেছ সেই আদিকারণ এক, আমি বলিতেছি অদ্বৈতম্। তুমি বলিতেছ সেই আদিকারণ যে রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছেন তাহার সর্ব্বত্র সুনিয়ম, আমি বলিতেছি সুন্দরম্। তুমি বলিতেছ সেই আদি-

কারণের রচিত জগতে সহস্র কৌশল বর্ত্তমান, আমি বলিতেছি জ্ঞানমনন্তম্। তুমি বলিতেছ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দিকে চাহিলে হৃদয, মনঃ, অপার বিজ্ঞানানন্দে পূর্ণ হয়, আমি বলিতেছি আনন্দরূপম্। তুমি বলিতেছ সেই আদিকারণের আর কারণ নাই, তিনি চিরদিনের নিত্যবস্তু, আমি বলিতেছি অনাদ্যনন্তমমৃতম্। তুমি অমানিশার অন্ধকার দূর হইল কিনা, অজ্ঞেয রজনীর প্রভাত হইল কিনা সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া তোমার আঁধার পাঠাগারে বসিযা বসিয়া বলিতেছ সেই আদিকারণ অসীম—অপার, পরিপূর্ণ সর্ব্বকারণ-কারণ, রূপবিকারবর্জ্জিত এক সুকৌশল সুনিযম পূর্ণ জগৎকারণ, আদি অন্তহীন মহাশক্তি কিন্তু অগম্য—অপার! আমি প্রভাতের তরুণ অরুণালোকে কলকণ্ঠ বিহগের স্বরমাধুরীর সঙ্গে ক্ষীণ কণ্ঠের ক্ষুদ্র স্বর মিলাইয়া জ্যোৎস্নালোকবিধৌত পবিত্র প্রকৃতি-মন্দিরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে নীলচন্দ্রাতপতলে দাঁড়াইয়া প্রাণের গভীরতম প্রদেশ হইতে বলিতেছি;—

সত্যং জ্ঞানমনন্তম্, আনন্দরূপমনাদ্যনন্তমমৃতম্।
পূর্ণমদ্বৈতং স্বপ্রকাশং নিরাকারং নির্ব্বিকারং পরাৎপরং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং
সুন্দরম্।

ইহার নাম কি কপটতা? আমি এই কপটতা লইযা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে 'জয় জগদীশ' বলিযা জীবন উৎসর্গ করিতে পারি, তুমি তোমার সরলতার জয় গান করিবার জন্য একটি কেশাগ্রও বলিদান দিতে পার কি? ইতিহাস খুলিয়া দেখ কাহার জয় কাহার পরাজয়!'

ধর্ম্ম বলিতেছেন সেই আদিকারণ জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয়। তোমরা বলিতেছ তিনি কেবলই অজ্ঞেয়! যদিও একেবারে অজ্ঞেয় বলিবার তোমার অধিকার নাই, যদিও মনেরভাব বুঝাইবার ভাষা না পাইযা বলিতেছ তিনি অজ্ঞেয়, তথাপি তোমার প্রকৃত মত এই যে আদি কারণের যে সকল স্বরূপ তুমি স্বীকার কর নাই তাহাই অজ্ঞেয়। নচেৎ তিনি যে আদিকারণ, তিনি যে সর্ব্বকারণ-কারণ, তিনি যে এক, অদ্বিতীয, অনন্ত, অপার, তিনি যে সর্ব্ব-ব্যাপী মহাশক্তি তাহাত তুমিই বলিতেছ, তাহা বলিতে কি বুঝায় তাহা

তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জান, নচেৎ আদিকারণের ঐ সকল স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিতে কি? তোমার প্রকৃত আপত্তি এই যে, ধর্ম্ম যে সকল স্বরূপের বর্ণনা করে তাহাই অজ্ঞেয়, তাহা মানিয়া লওয়া অনুচিত। বিচার করিয়া দেখ আদিকারণ কিং স্বরূপ? এক মুখে দুই কথা, এক মতের মধ্যেই জ্ঞেয় অজ্ঞেয়বাদ আছে বলিয়া উপহাস করিলে চলিবে কেন? সে অসঙ্গতি তো তোমারও অঙ্গের আভরণ, এই তত্ত্ব-প্রেমে যে মজে তাহাকেই এই কলঙ্কভার বহন করিতে হয়, কেবল সেই আদিকারণই কলঙ্ক ভঞ্জন করিতে পারেন! তুমিও এক মুখে অজ্ঞেয় বলিয়া সেই মুখেই যখন সর্ব্বশক্তিমান্ বল তখন কি জ্ঞেয় অজ্ঞেয় একত্র মিশিয়া যায় না? তাই বলি বৃথা তর্ক ছাড়িয়া জিজ্ঞাসুর ন্যায়, বিনয়ের সহিত বিচার কর—আদি-কারণ কিং স্বরূপ?

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

---

# উপন্যাসের উপযোগিতা।

আজকাল লেখক ও পাঠকদিগের মধ্যে উপন্যাস সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ দৃষ্ট হয়; একদল উপন্যাসের যেমন সপক্ষে, অপর দল তেমনই বিপক্ষে, একদল উপন্যাস-উপাসক, অপর দল উপন্যাস-উপেক্ষক। উপন্যাসের প্রতি উপন্যাস্-উপেক্ষকদিগের আক্রমণ এখন যেন ক্রমেই তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। ইহার কারণ নির্ণয় করা কঠিন নহে। আজকাল উপন্যাসের আদর ক্রমেই অধিক হইতেছে; বিগত দশ বৎসরের ইংরাজী সাহিত্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে বিখ্যাত ইংরাজ সমালোচক মিষ্টার গস্ স্পষ্টই বলিয়াছেন, যে ইংরাজী পাঠকদিগের মধ্যে উপন্যাসের আদর এতই বর্দ্ধিত হইতেছে যে, অনেক ইংরাজী লেখককে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া উপন্যাস লিখিতে হইতেছে; কেননা উপন্যাস ভিন্ন অন্য প্রকার রচনা পাঠকগণ পাঠ করিতে চাহেন না। উপন্যাসের এই অতিরিক্ত আদরে ঔপন্যাসিক ভিন্ন অনেক লেখক উপন্যাসকে গালি দিয়া গাত্রদাহ নিবারণের চেষ্টা পাইতেছেন।

প্রবন্ধারম্ভেই বলিয়া রাখা ভাল যে বর্ত্তমান লেখক উপন্যাসের বিশেষ পক্ষপাতী হইলেও আপনাকে অন্য প্রকার সাহিত্যের উপেক্ষক বলিতে সম্পূর্ণভাবে অপারগ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা উপন্যাসের উপযোগিতা বিচার করিব।

উপন্যাস সমাজের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব-চিত্র। উপন্যাস, উপকথা অর্থাৎ অবাস্তবের চিত্র মাত্র নহে।

উপন্যাসের উদ্দেশ্য কি? উপন্যাসের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দুই প্রকার—পাঠককে আনন্দ দান করা, পাঠককে জ্ঞান দান করা। উপন্যাস পাঠে কিরূপে পাঠকের জ্ঞানলাভ হইতে পারে, তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি।—

মানব-হৃদয়ের মত জটিল সমস্যা জগতে আর কিছু আছে কিনা সন্দেহ। কখন কি চিন্তায় তাহা আন্দোলিত হয়, কখন কি ভাবে তাহা পূর্ণ হয়, কখন কি উদ্দেশ্যে তাহা মানবকে কোন্ কার্য্যে প্রণোদিত করে, কখন কিরূপে তাহা শরতের আকাশের মত পরিবর্ত্তনশীল হইয়া উঠে তাহা নির্ণয় করা কিছুতেই সহজ নহে। আমরা ব্যক্তিবিশেষের কার্য্যের প্রশংসা বা নিন্দা করি; কিন্তু কি কারণে সে সেই কার্য্য করিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারি না, তাই হয়ত অনেক সময় ভুল বুঝিয়া তাহার উপর অত্যন্ত অবিচার করি। উপন্যাসে মানবের হৃদয়ের ভাব সকল, চিন্তা সকল, বিশ্লেষিত হয়; সুতরাং উপন্যাস পাঠককে মানব-চরিত্র বিষয়ে জ্ঞান দান করে।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে উপন্যাস পাঠে আমরা জ্ঞানলাভ করি; উপন্যাস পাঠে আমাদিগের হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা দূর হয়। এতদ্ভিন্ন আমাদিগের দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করি, উপন্যাসে আমরা সে সকল ভিন্ন আরও অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করি; আমাদিগের পরিচিত ভিন্ন আরও বহু প্রকৃতির লোকের সহিত প্রত্যক্ষভাবে না হউক পরোক্ষভাবে পরিচিত হই। আবার মহচ্চরিত্র ও মহদনুষ্ঠান দেখিয়া উন্নতি লাভ করি, কুচরিত্র ও অসদনুষ্ঠান দেখিয়া বিরক্ত হই ও শিক্ষা লাভ করি।

আমাদিগের এই শেষ কথা কয়টি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইলে, বুঝাইবার ও বুঝিবার বিশেষ সুবিধা হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কথা ধরা যাউক। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "দুর্গেশ-নন্দিনী" হইতে "রাজসিংহ" পর্য্যন্ত সকল উপন্যাসে

যত প্রকার চরিত্র চিত্রিত করিযাছেন, আমাদিগের একজনের জীবনে তত প্রকার বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট লোকের সহিত পরিচিত হওয়া অসম্ভব না হইলেও সহজ নহে। কাজেই এ কথা স্বীকার করিতে হয়, যে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া পাঠকের মানবচরিত্রজ্ঞানলাভ হয, জগতে মানব-চরিত্রজ্ঞান অন্য কোন প্রকার জ্ঞানাপেক্ষা অল্প গৌরবের নহে। আত্মসংযম-অভাবে কিরূপে মানবের অধঃপতন হয বঙ্কিমচন্দ্র "বিষবৃক্ষ" ও "কৃষ্ণকান্তের উইল" গ্রন্থদ্বযে তাহাই দেখাইয়াছেন। সামান্য বুঝিবার ভুলে সংসারে কি সর্ব্বনাশ হয "গোবিন্দলাল" ও "ভ্রমরের" জীবনের ইতিহাসে তাহাই বর্ণিত হইযাছে। পতিপত্নীর মধ্যে প্রকৃত প্রেম থাকিলে সংসার কিরূপ সুখময় হইয়া উঠে "কমলমণি" ও "শ্রীশচন্দ্রের" চরিত্রে তাহাই দেখান হইয়াছে। "ভ্রমর" ও "সূর্য্যমুখী", "কমলমণি" ও "লবঙ্গলতা" এই সকল রমণী চরিত্র, "প্রতাপ" ও "অমরনাথ", "হেমচন্দ্র" ও "শচীন্দ্র" এ সকল চরিত্রের বিষয পাঠ করিয়া যে আনন্দ ও জ্ঞান উভয়ই লাভ হয না, এমন কথা কে বলিতে পারে? সংযমহীন মানবের হস্তে অধিক ক্ষমতা থাকিলে, সামান্য কারণে তাহার কিরূপ অপব্যবহার হইতে পারে "সীতারাম"-চরিত্রে তাহাই দেখান হইয়াছে।

বঙ্গভাষার এখন শৈশব। ইংরাজী সাহিত্যের এখন পূর্ণ যৌবন—ইংরাজ ঔপন্যাসিকদিগের উপন্যাস পাঠ করিলে সত্যই মনে হয যে জগতের মানব-চরিত্রজ্ঞানদ্বার সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। স্কট, ডিকেন্স, থ্যাকারে হইতে আরম্ভ করিয়া হার্ডি, হ্যাগার্ড, হল্‌কেন পর্য্যন্ত ঔপন্যাসিকদিগের উপ-ন্যাসে জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রাচুর্য্য দেখিযা যুগপৎ আনন্দিত ও বিস্মিত হইতে হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে উপন্যাস পাঠে উপকার যথেষ্ট আছে। জ্ঞান-লাভের কথা বলিয়া আমরা এখন আবার উপন্যাস পাঠের অন্যতম লাভ—আনন্দলাভের কথা বলিব। এখন ইহা প্রমাণিত হইয়াছে, যে চক্ষের জল না ফেলিযাও শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। যে যুগে যাহাতে শিশুরা হাসিতে হাসিতে জ্ঞানলাভ করিতে পারে তাহার জন্য এত চেষ্টা হই-তেছে, সে যুগে প্রাপ্তবযস্কদিগের আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানলাভের পথরোধ করিবার চেষ্টা হাস্যোদ্দীপক বলিয়া মনে হয়।

যাঁহারা উপন্যাসের বিরুদ্ধে আজ কাল সংবাদপত্রে ও মাসিকপত্রে বাগ্‌-বৈদগ্ধ্যবিপ্লুত প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়া "জেহাদ" ঘোষণা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাঁহাদিগের চেষ্টা সফল হইবার কোনই সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। উপন্যাসের অপকারিতা সপ্রমাণ করিতে না পারিলে, পাঠক-সমাজের সহসা উপন্যাস-উপাসক হইতে উপন্যাস-উপেক্ষকে পরিণত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। এই কঠোর জীবনসংগ্রামের কালে, বিরামহীন-কর্ম্ম-ক্লান্ত মানবের পক্ষে আপনার দৈনন্দিন একঘেয়ে জীবনের অন্ধকারে, মানসিক আনন্দের এই রবিকর সহসা পরিত্যাগ করিবার কল্পনা, আকাশকুসুমেরই মত অসার ও অসম্ভব।

এই পর্য্যন্ত আমরা উপন্যাস পাঠের উপযোগিতা প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছি; এখন আর কয়টি কথা বলিয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব।

সুপ্রসিদ্ধ কবি এবং সমালোচক মিষ্টার সুইনবার্ণের ভাষায় যে সকল পুস্তক "Amuse our leisure, relieve our weariness, delight our fancy, enthrall our attention and refresh our sympathies" সে সকল পুস্তক কেন যে উপেক্ষিত,—ঘৃণিত হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

যাঁহারা উপন্যাসের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর, তাঁহারা বলেন যে লোকে এখন অতিরিক্ত মাত্রায় উপন্যাস-উপাসক হইয়া অন্য প্রকার সাহিত্যের উপেক্ষক হইয়া উঠিতেছে। একথা যে একেবারেই সত্য আমরা এরূপ বিশ্বাস করি না, তবে এই কঠোর জীবনসংগ্রামের যুগে কর্ম্মক্লান্তমানব যে স্বভাবতঃই আনন্দের সহিত জ্ঞান এবং জ্ঞানের সহিত প্রথম হইতেই আনন্দ লাভ করিতে চাহে, আমরা ইতিপূর্ব্বেই তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি। আমরা দেখাইয়াছি যে, উপন্যাসের অধিক আদর হইবার কারণ যথেষ্ট আছে।

যখন উপন্যাসের পক্ষীয় এবং বিপক্ষীয় উভয় দলই একথা স্বীকার করেন, যে সাধারণতঃ পাঠকসম্প্রদায় অন্য প্রকার সাহিত্য অপেক্ষা উপন্যাসেরই ভক্ত, তখন একথাও স্বীকার করিতে হয় যে উপন্যাসের প্রভাব পাঠকগণের উপর যথেষ্টই আছে। সুতরাং উপন্যাস পাঠে সাধারণ পাঠকগণ আনন্দ এবং শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন।

অতএব দেখা যাইতেছে, যে উপন্যাসের উপযোগিতা বড় অল্প নহে।

অধ্যয়নের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ;—আবার উপন্যাস পাঠে জ্ঞানলাভ, ভিন্ন আরও কিছু লাভ হয়—আনন্দ লাভ হয়। দর্শনপ্রিয় পেচকবৃত্তিধারী গম্ভীর তার্কিক যাহাই বলুন আমরা একথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি, যে মানবের পক্ষে আনন্দ অনাবশ্যক। পরন্তু আমাদিগের শরীরের জন্য বিশুদ্ধ বায়ু যেমন অত্যাবশ্যকীয়, আমাদিগের মনের জন্য বিশুদ্ধ আনন্দ তেমনই অত্যাবশ্যকীয়। অন্য প্রকার সাহিত্যসেবক "গুরু মহাশয়"; কেবল কবি ও ঔপন্যাসিক, শিল্পী। ঔপন্যাসিক গুরুর আসনে আসীন হইয়া উপদেশ ও শিক্ষা দেন না,—তিনি কেবল শিল্প রচনা করেন, তাঁহার নিকট কোন আশঙ্কা নাই; তিনি আমাদিগের পক্ষে আদৌ অনধিগম্য নহেন। ঔপন্যাসিক যে গুরু মহাশয় নহেন ইংরাজ ঔপন্যাসিক কিংস্‌লি এই কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই প্রবল আন্তরিকতা, সূক্ষ্মদর্শন এবং প্রাঞ্জল ভাষার মাধুরী সত্ত্বেও তাঁহার উপন্যাসগুলি তেমন অধিক আদর প্রাপ্ত হয় নাই। ঔপন্যাসিক শিল্প রচনা করেন,—কিন্তু প্রতিভাবান্ শিল্পীর প্রতিভা এমন করিয়া শিল্প রচনা করে, যে তাহা হইতে আমরা যুগপৎ আনন্দ এবং জ্ঞান লাভ করিতে পারি।

এতক্ষণ আমরা উপন্যাসের উপযোগিতা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি; আমরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে উপন্যাস অনাবশ্যকীয় হওয়া দূরে থাকুক বরং আবশ্যকীয়।

অপর প্রকার সাহিত্যের সহিত উপন্যাস বহুলভাবে প্রচারিত হইয়া মানবকে আনন্দ ও শিক্ষা দান করিতে থাকুক।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

——00——

# যামিনী।

## তৃতীয় অধ্যায়।

পলাসপুরের ঘোষাল মহাশয়ের কন্যার নাম পারুলবালা, গ্রামের ছোট বড় সকলেই বলে পারুল বড় সুন্দরী! পারুলের মা ও পাড়ার মেয়েরা সর্ব্বদাই পারুলের রূপের সুখ্যাতি করেন। পারুল বয়সে যদিও বালিকা, যদিও সে

দেহ কান্তিতে স্ফুটনোন্মুখী কলিকা সদৃশী, তথাপি দশ জনের মুখে প্রতিনিয়ত স্বীয় রূপের সুখ্যাতি শুনিয়া শুনিয়া তাহারও মনে একটু রূপাভিমান জন্মিয়াছে, সে নিয়তই স্বীয় রূপের ঔজ্জ্বল্যসাধনে যত্নবতী, জননী রূপবতী কন্যাকে সর্ব্বদাই বেশবিন্যাসে সাজাইয়া রাখেন। পারুল এখন ত্রয়োদশ-বর্ষীয়া বালিকা, সেই পারুলকে দেখিবার জন্য পারুলের ভাবী বর আমাদিগের পরিচিত জ্ঞানেন্দ্রনাথ আ'জ স্বয়ং পলাসপুর আসিয়াছেন। পাড়ার স্ত্রীলোকেরা আ'জ যেন একটা উৎসবের দিন পাইয়াছে।

ঘোষাল মহাশয়ের বৈঠকখানাটি আ'জ অন্যদিন অপেক্ষা কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত! মেজে ঢাকা একখানি সতরঞ্চ তাহার উপর সাদা ধপ্ধপে একখানি চাদর বিছান, আশে পাশে ভিত্তিসংলগ্ন চারি পাঁচটী তাকিয়া বালিশ, সম্মুখে পাতার নল লাগান দুইটী বাঁধা হুকা। জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেই ফরাসের মধ্যস্থলে একটী তাকিয়া আশ্রয় করিয়া বর দেখাইবার উপযোগী হাবভাবে সহাস্যমুখে উপবিষ্ট, পল্লীর কয়েকটী যুবক একদল বালকের সহিত তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়া গ্রামের ভাবী জামাতা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত রহস্যালাপ করিতেছে, রহস্যের কৌশল, বাক্যের কৌশল চলিতেছে; ছোট ছোট বালকেরা জ্ঞানেন্দ্রকে ঠকাইবার জন্য কড়া গণ্ডা ও নাম্তার ডাক জিজ্ঞাসা করিতেছে; প্রাচীনেরা কেহ এখন উপস্থিত নাই, বিজ্ঞ গাঙ্গুলী মহাশয় একবার আসিয়া পাত্রের হাতের লেখা পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রনাথ তাহাতে অস্বীকৃত হওয়ায় তিনি কিছু বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গিয়াছেন। গ্রামের বোনা নাপিত ভবিষ্যৎ লাভের আশায় অনন্যকর্ম্মা হইয়া অশ্রান্তভাবে তামাকু সাজিতে আরম্ভ করিয়াছে, কলিকার আগুণ নিবিতেছে না, তবু তামাকু দে তামাকু দে শব্দ হইতেছে, বালিকারা বৈঠকখানার অর্দ্ধোন্মুক্ত জানালার পার্শ্ব দিয়া উঁকী দিয়া পারুলবালার বর দেখিতেছে। ঘোষাল মহাশয় ভারী ব্যস্ত, তাঁহার বসিবার অবসর নাই, কখন বাটীর ভিতর যাইতেছেন, কখন গোয়ালার নিকট হইতে বৈকালিক জলযোগের ক্ষীর ছানা আনিতে লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন, কখন বা অন্য একটী গৃহে উপবিষ্ট ভাবী বৈবাহিক মহাশয়ের সহিত বিবাহ বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন। গোধূলি-লগ্নে বরকন্যার দেখাদেখি হইবে, পুরোহিত মহাশয় পঞ্জিকা দেখিয়া বলিয়া

দিযাছেন—গোধূলিলগ্নই শুভদৃষ্টিব সুপ্রশস্ত সময়। জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেই শুভলগ্নের প্রতীক্ষা কবিতেছেন।

বাটীব ভিতব মেযে মহলে পাকলবালাকে সাজাইবাব ঘটা পড়িযা গিযাছে। বেশবিন্যাসে নিপুণা দুই তিনটী যুবতী সযত্নে পারুলেব বেশবিন্যাস কবিতেছেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগেব মধ্যে সজ্জা সম্বন্ধে মতদ্বৈধহেতু গৃহ-বিচ্ছেদ উপস্থিত হইতেছে। কেহ খোঁপা বাঁধিবাব উদ্যোগ কবিতেছেন, কেহ তাহাতে বাধা দিযা বলিতেছেন "খোঁপা আবাব কেন? আ'জ কা'ল খোঁপা আবাব কে বাঁধে? এলোচুলই ভাল" এই বলিযা তিনি সমস্তচুল এলাইযা দিতেছেন, আব একজন তাহাতেও বাধা দিযা বলিতেছেন "এলোচুলও ভাল নয়, খোঁপাও ভাল নয, বেণীই ভাল" এই বলিযা তিনি বেণী বিনাইবার উদ্যোগ কবিতেছেন, যখন বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে তখন প্রবীণারা তাহাব মধ্যস্থা হইযা মীমাংসা কবিযা দিতেছেন, অধিকাংশ স্থলেই যে সুন্দবীব গা ভবা গযনা তাঁহাবই মত বজায থাকিতেছে। আবাব কেহ আপনাব মনোমত কবিযা একটী টিপ কাটিযা দিলেন, যিনি বেলের বড বাবুব পবিবাব তিনি আসিযা তৎক্ষণাৎ সে টিপ্‌টি মুছাইয়া দিযা বলিলেন "এত বড় টিপ্‌ কি মানায?" একজন পাকলেব ভ্রমবকৃষ্ণ নযন দুইটীতে ঈষৎ কজ্জল-বেখা দিবার মত প্রকাশ কবিলেন, আব একজন বলিলেন "ছি অমন চোখে আবাব কাজল কেন?" ইত্যাদি। পাকল বৃহৎ একখানি আযনা সম্মুখে রাখিয়া তাহাব প্রতিঅঙ্গের বেশভূষা নিবীক্ষণ কবিতেছে, তাহার অধবান্ত-বালের হাস্য ছিন্ন মেঘান্তবালবর্ত্তী চন্দ্রকবেব ন্যায বহিযা রহিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে।

প্রবীণাবা গ্রামেব কাহাব কেমন জামাই হইযাছে, কোন জামাইটী ভাল, কোন মেযেব কেমন অদৃষ্ট, সতীন-কাঁটা ভাল কি মন্দ, পাকলেব বব কেমন হইবে ইত্যাদি বিষয়েব আলোচনা কবিতেছেন। সাতপাকেব আগে বব ক'নেব শুভদৃষ্টি ভাল কিনা এই বিষয় লইয়া বঙ্গ ঠাকুবাণী ও শম্ভুব মায়ে ঘোব তর্ক উপস্থিত হইযাছে, রঙ্গ ঠাকুবাণী বলিতেছেন "সাত পাকের আগে বব ক'নেব চ'খোচোখী ভাল নয! শম্ভুব মা বলিতেছেন "না' ভাল নয়, তোমাব সকল কথাই আলাতুনি, আমাব দেওর তিনবার বিযে ক'রলে, তিন বাবই

নিজে চো'খে দেখে তবে বিয়ে করেছে"——

"তা করুক, ক'রেই বা কোন্ ভাল হ'ল, বোন্টা নিয়ে সুখে ঘরকন্না ক'র্‌তে পেলে বল দেখি।"

"অসুখটাই বা তুমি কি দেখ্‌লে?

"অসুখের বাকীই বা আবার কি? একটার মুখ দে'খ্‌লে না, একটা মরে গেল, ছোটটা সেও এখন লোকের দুয়ারে দুয়ারে বেড়াচ্ছে, আমরা সব জানি" এই বলিয়া রঙ্গ ঠাকুরাণী ঈষৎ একটু মুখ বাঁকা করিয়া নিকটস্থ আর একটী প্রবীণার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন।

শম্ভুর মা'র গলার বড় তেজ, পাড়া-কোন্দলে তিনি সর্ব্বাগ্রগণ্যা, এক রঙ্গ ঠাকুরাণী ভিন্ন বাগ্‌যুদ্ধে তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারে আর কাহারও এমন শক্তি নাই, সেইজন্য তাঁহার সহিত যুদ্ধে বড় একটা কেহ অগ্রসর হয় না, শম্ভুর মা'র সহিত কথায় কথায় যখন কেহ বেগতিক দেখে তখন সে নরম সুর কাটিয়া সরিয়া দাঁড়ায়,—রঙ্গ ঠাকুরাণীর বাক্যে তিনি পদদলিতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন, বলিলেন "কি সব জান? আমরাও লোকের বাড়ীর খবর জানি, এখনই কুলের খবর ব'ল্লে হাটে হাঁড়ী ভেঙ্গে যাবে।"

রঙ্গ ঠাকুরাণী বিমুখী হইয়াই বলিলেন "লোকেও সবারই কুলের খবর জানে, লোকেও হাটে হাঁড়ী ভাঙ্গতে জানে, আমর্—ভাল বল্লে মন্দ হয়, কালের ধর্ম্ম কিনা?"

'আমি কেন মর্‌বো লা? তুই মর্, তুই চো'খ ছরাদের মাথা খা, আমার ছোট জা লোকের দুয়োর দুয়োর বেড়াচ্ছে, তোর বেটার বৌ কি ক'র্‌ছে লা পাড়া কুন্দুলি" এই বলিয়া শম্ভুর মা উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘোর দ্বন্দ্বযুদ্ধে রঙ্গ ঠাকু-রাণীকে আহ্বান করিলেন।

রঙ্গ ঠাকুরাণীও কোমর বাঁধিলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বর সপ্তম ছাড়াইয়া উঠিল, সতেজে বলিলেন "তুই চোখ ছরদের মাথা খা, তোর জা কি ক'র্‌ছে তা বাড়ি শুদ্ধ লোক জানে, আমার বেটার বৌ'র নাম করিস্ তোর কি সাধ্যি লা? আমার বৌ'র যে নাম করে তার মুখে আমি সাত লাথি মারি।"

"আমার জা'র যে নাম করে তার মুখে আমি নুড়ো জেলে দিই; মলো মাগি, বল্‌তে লজ্জা হয় না?" শম্ভুর মা'র কণ্ঠস্বর আকাশমণ্ডল স্পর্শ করিল।

রঙ্গ ঠাকুরাণী চারিদিকে একটু নজর রাখিয়া কাজ করেন, তিনি ভাবিলেন পরের বাড়ী, একটা শুভকার্য্য উপস্থিত, এসময় এরূপ দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিলে বাড়ীর লোকে মনে করিবে কি? মুখের উপর কোন কথা বলিলে সহ্য করিতেও পারিবেন না;—সাত পাঁচ ভাবিয়া, তিনি আর কোন উত্তর না করিয়া দ্রুত পদক্ষেপে ঘোষাল-বাড়ী ত্যাগ করিলেন। শম্ভুর মা'র ক্রোধের সাগর উথলিয়া উঠিয়াছে, তিনি "চল্ তো পোড়ারমুখি, কোথা যাবি, আমি আ'জ তোর নাড়ী মাঠে মাঠে ক'র্‌বো," এই বলিয়া রঙ্গ ঠাকুরাণীর পশ্চাদ্ধাবিতা হইলেন।

জ্বলন্ত অগ্নিতে জলধারা পড়িল, উভয়ের অন্তর্ধানের পর যে যে নবীনা প্রবীণা উপস্থিত রহিলেন, তাঁহারা এখন বিবাহের কথা ছাড়িয়া দিয়া উভয়ের চরিত্রের সমালোচন আরম্ভ করিলেন। কেহ রঙ্গ ঠাকুরাণীর পক্ষ কেহ শম্ভুর মা'র পক্ষ অবলম্বন করিলেন, মল্লিকদের বড় বৌ বলিলেন "রঙ্গ পিসি যা ব'ল্‌ছিলেন, তা বড় মিথ্যা নয়, আগেত আর এসব ছিল না, এই সকলের জন্যই শাশুড়ী ননদ পাঁচটা নিয়ে ঘরকন্না করাও উঠে গিয়েছে, বৌও ঘরে আসে অম্‌নি শাশুড়ী ননদের সঙ্গে চুলোচুলি আরম্ভ হয়।"

চাঁদ ঠাকুরঝি বলিলেন "তা হবে কেন? ঘোষেদের বৌটী কেমন লক্ষ্মী দেখেছ তো? ওদের তো বিয়ের আগে এমনি দেখাদেখি হ'য়েছিল, দেখ দেখি কেমন ঘরকন্না ক'র্‌ছে, চ'ক্ষে দেখ্‌বে তাতে আবার দোষ কি?"

বড় বৌ বলিলেন "দোষ না থাক্‌লেই ভাল মা! তবে শাস্তরের কথা মান্‌তে হয়, পারুল সুখে থাক, রাজরাণী হ'ক্ জন্ম জন্ম সীঁথেয় সিঁন্দুর পরুক, এতে কার অনিচ্ছে,—"

"তা'ত বটেই" এই বলিয়া চাঁদ ঠাকুরঝি পারুলের জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বলি হাঁলা ছোট বৌ, মেয়ের সজ্জা নিয়েই থাক্‌লি যে, আমাদের সন্দেশ টন্দেশ দে।"

পারুলের জননী এতক্ষণ কন্যার সাজসজ্জা লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, অকস্মাৎ কলহ উপস্থিত হওয়ায় তিনি কিছু ক্ষুণ্ণ মনে বর্ষীয়সী নারীমণ্ডলীর নিকট আসিয়া দুঃখ করিয়া বলিতেছিলেন "দে'খেছ মা! শুভ কার্য্যের সময়, এসব কি ক'র্ত্তে হয়, এক্ষণে চাঁদ ঠাকুরঝির প্রশ্নে একটু হাসিয়া বলিলেন "সন্দেশ খাবার দিন'ত বটে ঠাকুরঝি? ভেবনা, শুধু মুখে যেতে দিব না।"

"না ভাই, আমাব বড় ভাবনা হ'যেছে, পাছে পাশ করা জামাই পেয়ে, আমাদেব কথা ভুলে যা'স।"

"এখনই কি জামাই পেযেছি, তোমবা এসেছ, দেখ্বে, আমার পারুলের যুগ্যি বব বটে কিনা বল্বে, তবেত জামাই হবে।"

"যদি বল্লি বৌ তবে শোন্, যখন নেমে আসে তখন আমি তোর জামাই দেখেছি। জামাই তোব ভাল হবে; তবে সত্যি কথা বল্তে গেলে পারু-লেব যুগ্যি হবে না। এ এক মেযে, সাক্ষাৎ প্রতিমে!"

হর্ষোৎফুল্ল মুখে পারুলেব জননী বলিলেন "পারুলের যুগ্যি যে হবে না, তা আমিও তখন বলেছি, কখনই বঙ্গে বঙ্গে মিল্বে না।"

এবাব বড বৌ উত্তব কবিলেন, বলিলেন "তা, বঙ্গে বঙ্গে না মিলুক, জামাই কিন্তু তোমাব রাজ জামাই হবে, বযস বেশী নয়, চারটে পাশ; আ'জ কা'ল হাজাব টাকা খবচ ক'ব্লে অমন পাত্র পাওয়া যায় না; তবে কিনা বু'কেব উপব একটা সতীন-কাঁটা ব'যেছে।"

পারুলেব জননীব মুখেব হাসিটুকু মিশাইয়া গেল, বলিলেন "তা থাকুক্ বাঁজী বৌ, জামাই তাকে ছুটী চক্ষুতে দে'খ্তে পাবে না, শ্বশুব শাশুড়ীবও দুই চক্ষুব বিষ, বাড়ীব ওঁদেব কাছে জামাইযেব বাপ বলেছেন পারুলকে সেখানে নিয়ে গিযেই তাকে বাপেব বাড়ী পাঠিযে দেবেন, জন্মে আব আন্বেন না।"

বড় বৌ। তাকি পাব্বে? সেও তো বেটার বৌ বটে, এখন যা বলুক আব যাই ক'ক, সতীনের জ্বালা ভুগ্তে হবে।

পারুলেব জননী ব্যগ্রতাব সহিত বলিলেন, "না গো না, তোম্বা কি আমায় তেম্নি কাঁচা মেযে পেযেছ, আমি বেহাইযেব সঙ্গে আগে সত্যি বন্দি কবাব ক'বে নিযেছি, তবে এতে হাত দিয়েছি?

বড় বৌ। তা না হ'লেই ভাল, সতীনেব জ্বালা বড় জ্বালা; ছেলে হ'ল না, ছেলে হ'ল না ব'লে মিত্তিবদের ললিত আবাব বিযে ক'বেছে কিন্তু ছোট বৌটার কি কষ্ট, বড় বৌ'এর জ্বালায়, চ'খের জল না ফেলে তার একটি দিনও যায় না।

চাঁদ ঠাকুবঝি বলিলেন "অত ভাব্তে গেলে আব কাজ চলে না; তোমরা যে যাই বল আমি কিন্তু বল্ছি সতীনের ভয় পারুলের নেই; ও যে সেয়ানা

মেয়ে ছুদিনে জামাইকে বশ করে ফেল্‌বে।" এই বলিয়া তিনি বেশকারিণী পারুলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "কেমন লা পারুল! পার্‌বি তো।"

পারুল অধরের হাসি অধরে রাখিয়া কণ্ঠমালা পরিতে পরিতে ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল "পারিব", পারুলের উত্তর শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিলেন, পারুল কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া সম্মুখে কতকগুলি চুলের দড়ি ছিল ছুড়িয়া বাহিরের দিকে ফেলাইয়া দিল।

বড় বৌ বলিলেন "তা রাগ করিস্ কেন বুন্‌, এই দশ দিন বৈতো সেই ঘরে যেতে হবে, তখন সব শিখ্‌তে হবে। এখনি যখন তোকে দেখাতে নিয়ে যাবে, তখন গিয়েই, বরকে আগে যেন দণ্ডবৎ করিস্।"

পারুল ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল "আমার দায় পড়েছে।"

চাঁদ ঠাকুরঝি বলিলেন "দায় পড়েছে বল্লে হবে কেন মা! সে তোমার বর—"

পারুল তেমনি ভাবে বলিল "তা বেশ্, তুমি চুপ ক'রে থাক।"

বড় বৌ বলিলেন "আমরা যদি চুপ করে থাক্‌বো তবে শিখ্‌বি কোথা হ'তে? বর যখন নাম জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে, তখন যেন মুখটী বুজে চুপ ক'রে থাকিস্ নে, পাছে আবার অমন মেয়ে বোবা বলে চ'লে যায়।"

"সে সব আমি জানি, তা তোমাদিকে শিখাতে হবে না।" এই বলিয়া পারুল সম্মুখস্থ আয়না খানি তুলিয়া ধরিয়া স্বীয় অধরের তাম্বুল-রাগ দেখিতে লাগিল।

চাঁদ ঠাকুরঝি পারুলের জননীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "তা বৌ, তোমার মেয়ে সেয়ানা বটে ওকে কিছু শিখাতে হবে না; তুমি মেয়ের মা তোমাকে একটা কথা শিখায়ে দিই, পাশকরা জামাই বলে যেন গহনা নিতে ছেড় না; সতীনের উপর দিচ্ছ, গা ঢাকা গহনা নিবে, বেহাই মিন্সের সঙ্গে দেখা হ'লে আমি এখনই বলে যেতাম।" স্মিতমুখে পারুলের জননী বলিলেন "একটু বস না, এখনই জল খাবার সময় তো বাড়ীর ভিতর আসচেন ছুকথা বলে যাও।"

চাঁদ ঠাকুরঝি। ব'ল্‌বো না'ত কি ছাড়বো, শীগ্‌গির করে জল খাবারের উজ্জুগ করে ডাক্‌তে পাঠা, জামাইও আর একবার ভাল করে দেখে যাই।

"জল খাবারের উজ্জুগ তো সব ঠিক্। জামাই বলেছেন, পারুলকে দেখার পর তবে জল খাবেন। যেও না, ব'স, আমি ঠাকুর ঘরের সন্ধ্যাটা জ্বালি, ঝি মাগী এখন কখন আস্‌বে তার ঠিক নাই" বলিয়া পারুলের জননী সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিতে কক্ষান্তরে গমন করিলেন।

যখন এই সকল কথোপকথন হইতেছিল, তখন গোধূলির কৃষ্ণচ্ছায়া ধীরে ধীরে পৃথিবী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, বাহিরে বৈঠকখানা দীপালোকে প্রভাসিত হইয়াছে, পুরোহিত মহাশয় শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা সান্ধ্য মুহূর্ত্তের প্রশস্ততা বর্ণন করিতেছেন, জ্ঞানেন্দ্রের পিতা ঘোষাল মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বেহাই মশায়, আর বিলম্ব কেন? গোধূলি উপস্থিত, পাত্রী আনুন, কেননা শুভস্য শীঘ্রং," ঘোষাল মহাশয় 'যে আজ্ঞা' বলিয়া পারুলকে আনিবার জন্য বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

দূরাগত বায়ুপ্রবাহ পারুলের নূপুরশিঞ্জিত পদধ্বনি জ্ঞানেন্দ্রের কর্ণমূলে বহন করিল, জ্ঞানেন্দ্র আরও একটু সভ্যভব্য হইয়া বসিলেন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

---

# জগৎ শেঠ।

## প্রথম অধ্যায়।

### আদিপুরুষ।

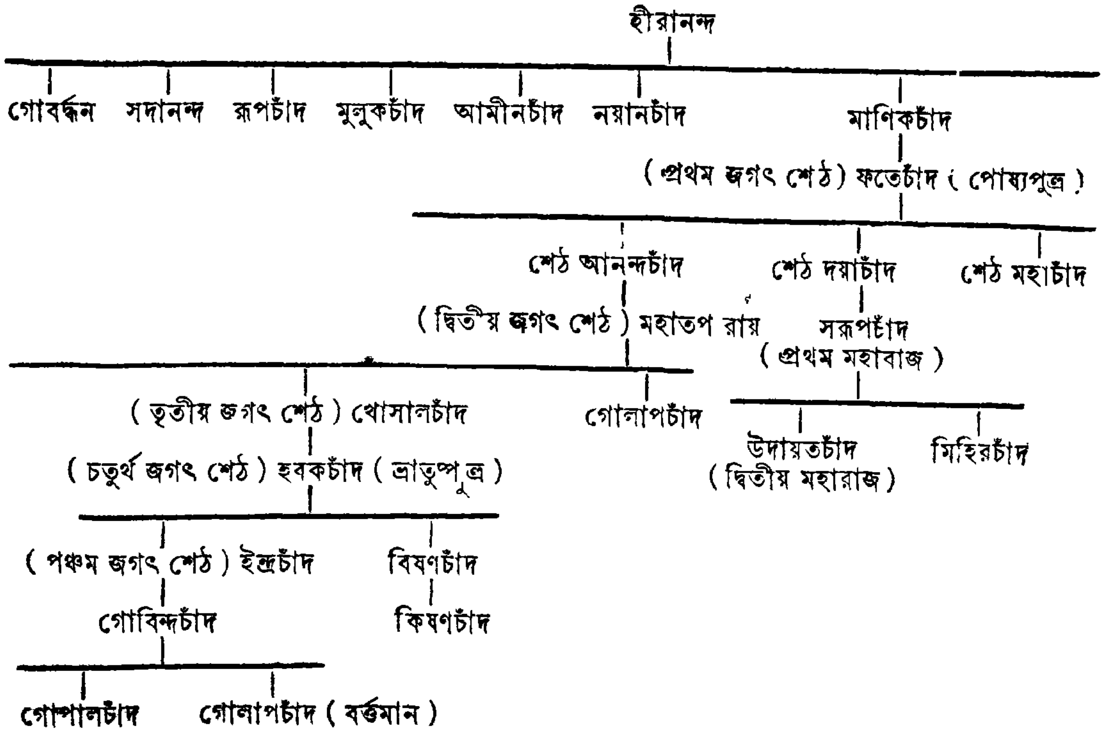
---

নাগরবাসী শ্বেতাম্বর জৈনদিগের মধ্যে হীরানন্দ নামে একজন সামান্য গৃহস্থ ছিল, মারবারিগণ চিরদিন হইতে ব্যবসায় বাণিজ্যে আপনাদিগের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়া আসিতেছে, তাহাদের মধ্যে জৈনগণই উক্ত কার্য্যে সবিশেষ পটু, ভারতবর্ষের এমন কোন নগর নাই, যেখানে অন্ততঃ দুই চারিজন মারবারী ব্যবসায়ের জন্য বাস না করিতেছে। কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থান তাহাদিগের এক একটী উপনিবেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কলিকাতার বড় বাজার ও মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জ বালুচর প্রভৃতি স্থান এই সমস্ত মারবারী বণিক্‌সম্প্রদায়ের প্রধান স্থান। মুর্শিদাবাদবাসী মারবারিগণের

মধ্যে অধিকাংশই জৈন বণিক্, কলিকাতায় অনেক হিন্দু মারবারীও আছে। ঐ সকল স্থান বাণিজ্যলক্ষ্মীর প্রিয় বাসনিকেতন হওয়ায় তথায় প্রতিনিয়ত উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। দুঃখের বিষয় মুর্শিদাবাদের জৈন বণিক্-সম্প্রদায় কথঞ্চিৎ শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। এই সমস্ত মারবারী বণিগ্‌গণ কেবল ভারতবর্ষে আবদ্ধ না থাকিয়া বিশাল সাগর অতিক্রমপূর্ব্বক জাঞ্জিবার, নেটাল প্রভৃতি আফ্রিকার উপকূল সমূহেও বাণিজ্যার্থে অবস্থিতি করিতেছে। তাহাদের এইরূপ সমুদ্রযাত্রা নিতান্ত আধুনিক নহে, বহুদিন হইতে তাহাদিগের মধ্যে উক্ত প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। হীরানন্দ সেই জাতির মধ্যে জন্ম পরিগ্রহ করায় নিতান্ত সম্বলহীন হইলেও তাঁহার মনে বাণিজ্য-পিপাসা বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি ব্যবসায়কার্য্যে উন্নতি লাভ করিবার ইচ্ছায় আপনার যৎ-কিঞ্চিৎ মূলধন লইয়া ছাতু, ভুট্টা, লঙ্কা ও লবণের আহারে পরিতৃপ্ত হইয়া পর্ব্বত, নদী, গ্রাম, নগর অতিক্রম করিতে করিতে প্রাচীন পাটলীপুত্র বা বর্ত্ত-মান পাটনা নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যৎকালে তিনি পাটনায় উপস্থিত হন সে সময় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ। বাণিজ্যব্যবসায়ে পাটনা শ্রীশালিনী হইয়া উঠিয়াছে। মোগল রাজত্বে ভারতবর্ষে যে বাণিজ্যের অভা-বনীয় উন্নতি হইয়াছিল ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। দেশীয় বণিক্‌সম্প্রদায় ব্যতীত ইউরোপীয় বণিগ্‌গণ তৎকালে পাটনায় কুঠী সংস্থাপিত করিয়া সুচারুরূপে বাণিজ্য-কার্য্য পরিচালনা করিতেছিল। শোণ, গণ্ডক ও গঙ্গা সম্মিলিত হইয়া পাটনাকে বাণিজ্যকার্য্যের উপযুক্ত স্থান করিয়া তুলিয়াছে। এইজন্য উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, নেপাল ও বাঙ্গলার বাণিজ্যের সহিত চিরদিন হইতে ইহার গাঢ় সম্বন্ধ ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইহার ব্যবসায়বাণিজ্য উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। তুলা, সর্ষপ, এরণ্ড, নীল, লবণ প্রভৃতির বাণিজ্যের জন্য ইহা চিরবিখ্যাত। হীরানন্দ ব্যবসায়বাণিজ্যে সর্ব্বদা কোলাহলময় পাটনা নগরীতে উপস্থিত হইয়া নিজ ভাগ্যোদয়ের জন্য যত্নবান্ হইলেন। পাটনা বাণিজ্যের প্রধান স্থান হওয়ায় তথায় অনেক মহাজনের গদী সংস্থাপিত ছিল, ব্যবসায়িগণ সেই সমস্ত গদী হইতে প্রয়োজনানুসারে অর্থ গ্রহণ করিতেন। যাঁহারা গদীয়ানের কার্য্য করিতেন, অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহারা বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইতেন। কোন গদীর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন

করিতে পারিলে অল্প দিনের মধ্যে ভাগ্যলক্ষ্মীর অনুগ্রহ লাভ হইবে বিবেচনা করিয়া হীরানন্দ সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু প্রথমতঃ ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইলেন না! তিনি যে গদীয়ানের নিকট পরিচিত হইতে যান তিনি তাঁহাকে নবাগত দেখিযা তাঁহাব প্রতি তাদৃশ বিশ্বাস স্থাপন করিতে অনিচ্ছুক হন। এইরূপে কোন গদীযানের নিকট পবিচিত হইতে না পারিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি মনঃকষ্টে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাব সুদুব জন্মভূমি মারবার পবিত্যাগ কবিয়া ভাগ্যোদয়েব জন্য কত কষ্ট সহ্য করিয়া পাটনায উপস্থিত হইলেন, কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মীর বিন্দুমাত্রও করুণা তাঁহার উপর নিপতিত হইল না। এইরূপে হতাশ অন্তঃকবণে তাঁহাকে সময় অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইতে হইল। একদিন বিষণ্ণ চিত্তে তিনি নগরের বাহিবে ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হন। কিয়দ্দূব যাইতে যাইতে তিনি একটী নিবিড় বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়েন। তাঁহাব অন্তঃকবণ এতদুব চিন্তাকুল ছিল যে, তিনি বুঝিতে পাবেন নাই যে তিনি একটী নিবিড় জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিযাছে, চন্দ্রালোকের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে শ্যামল বৃক্ষবাজি হাস্য কবিতেছিল, পাখীগুলি পাখার শব্দ করিতে করিতে বৃক্ষশাখায় আশ্রয় লইতেছিল, ক্রমে ঝিল্লীববে অরণ্যানী ঈষৎ মুখরিতা হইয়া উঠিল। প্রকৃতিব সেই মনোহাবিণী শোভা দেখিতে দেখিতে হীরানন্দ ক্রমে অরণ্যেব বহুদুবে আসিয়া পড়িলেন, সহসা এক যাতনাব্যঞ্জক আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণকুহবে প্রবিষ্ট হইল, সেই শব্দ শুনিবামাত্র তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। কোথা হইতে সেই শব্দ আসিতেছে, তাহাই জানিবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। ক্রমে ক্রমে সেই শব্দেব দিঙ্‌নির্ণয় করিযা তিনি তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। যে স্থান হইতে শব্দ আসিতেছিল, অনুসন্ধানের পর তিনি সেই স্থানের আবিষ্কারে সমর্থ হইলেন। দেখিলেন তাহা একটী ভগ্ন অট্টালিকা, সেই ভগ্ন অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, তাহার কোন প্রকোষ্ঠে একটী মুমূর্ষু বৃদ্ধ যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। হীরানন্দ বৃদ্ধের সেই অবস্থা দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাব শুশ্রূষায় বৃদ্ধের যন্ত্রণার কিছু উপশম হইল বটে, কিন্তু তাহার জীবনদীপ ক্রমশঃ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিল, হীরা-

## জগৎ শেঠদিগের বংশক্রম।



নন্দ শত চেষ্টা করিয়াও তাহাকে সেই মহাযাত্রা হইতে ফিরাইতে পারিলেন না। অল্পক্ষণের মধ্যে বৃদ্ধ চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিল। মরিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বৃদ্ধ হীরানন্দকে সঙ্কেত করিয়া গৃহের এক কোণে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যায়। হীরানন্দের সেবায় তুষ্ট হইয়া প্রত্যুপকারস্বরূপ যেন বৃদ্ধ ঐরূপ করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। হীরানন্দ একাকী যথাসাধ্য বৃদ্ধের সৎকার করিয়া পরে গৃহের সেই কোণদেশ খননে প্রবৃত্ত হইলেন, খনন করিতে করিতে বুঝিতে পারিলেন যে, বৃদ্ধ তাঁহাকে অপরিমিত ধনের অধিকারী করিয়া গিয়াছে। যতই খনন করেন ততই তাঁহার হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া উঠে। অবশেষে তিনি সেই সমস্ত অর্থ হস্তগত করিয়া মনে মনে ভাগ্যলক্ষ্মীকে কোটি কোটি প্রণাম করিতে লাগিলেন। সেই বিপুল অর্থরাশি লইয়া হীরানন্দ পাটনায় একটী গদী স্থাপিত করিলেন। এক্ষণে তিনি অন্যান্য গদীয়ানদিগকে আর গণনার মধ্যেই আনিতে চাহিলেন না। তিনি অন্যান্য গদীয়ান অপেক্ষা কিছু অল্প সুদে অর্থ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন, ক্রমে সমস্ত ব্যবসায়িগণই তাঁহার গদীর কথা অবগত হইল, এবং বহুলোকে তাঁহারই গদী হইতে প্রয়োজনানুসারে অর্থ গ্রহণ করিতে লাগিল, অল্প দিনের মধ্যে গদীয়ানের কার্য্য করিয়া তিনি বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইলেন। অর্থলাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুসন্তান-লাভেরও আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হীরানন্দ গোবর্দ্ধন, সদানন্দ, রূপচাঁদ, মুলুকচাঁদ, আমীনচাঁদ, নয়ানচাঁদ ও মাণিকচাঁদ নামে সাতটী পুত্র লাভ করেন। ধনবাই নামে তাঁহার একটী কন্যারও উল্লেখ দেখা যায়। শেঠ উদয়চাঁদ নামে কোন এক যুবকের সহিত তাহার পরিণয় সংস্থাপিত হয়। হীরানন্দের পুত্র সাতটীই পিতার সুসন্তান হইয়াছিল। তাহারাও পিতার ন্যায় কার্য্যপটু ও ব্যবসায়কার্য্যে যৎপরোনাস্তি অভিজ্ঞতা লাভ করে। এইরূপ 'ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ' করিয়া হীরানন্দ মহানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন, প্রথমে ভাগ্যলক্ষ্মীর অনুগ্রহবঞ্চিত হইয়া তিনি সর্ব্বদা নিজ জীবনকে যেরূপ অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিতেন, এক্ষণে সেই ভাগ্যলক্ষ্মী যেন নিজ হস্তে তাঁহাকে আশীর্ম্মাল্য পরাইয়া দিলেন এই চিন্তায় তিনি যারপর নাই উৎফুল্ল হইতে লাগিলেন। যখন তাঁহার গদীর কার্য্য অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া উঠিল, তখন তিনি উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ও বাঙ্গলার প্রধান প্রধান স্থানে ভিন্ন

ভিন্ন গদী সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। দিল্লী, আগরা, পাটনা, ঢাকা, প্রভৃতি সাতটী স্থানে তিনি সাত পুত্রের জন্য সাতটী পৃথক গদী সংস্থাপিত করিয়া দিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মাণিকচাঁদ ঢাকার গদীর ভার প্রাপ্ত হন। এই মাণিকচাঁদ হইতেই মুর্শিদাবাদের জগৎ শেঠগণের উৎপত্তি। এইরূপে সাত পুত্রের দ্বারা গদীর কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে দেখিয়া হীরানন্দ যথা-সময়ে এ জগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। উক্ত সাত পুত্রের মধ্যে মাণিকচাঁদের নামই ক্রমশঃ সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়া পড়ে। পর অধ্যায়ে আমরা মাণিকচাঁদের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিব।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

---

# ভারতে দুর্ভিক্ষ।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবাসিমাত্রেই যে দৈব বিড়ম্বনায় বিব্রত, তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা বোধ হয় সময়োচিত হইতে পারে। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যে ভীষণ অনল প্রজ্জ্বলিত হইযাছে কত শত নরনারী তাহাদিগের ক্ষুদ্র প্রাণ এ অনলে আহুতি দিয়াছে কে বলিতে পারে ?

ভারতের অন্নকষ্ট নূতন সামগ্রী নহে। ভারতবাসীর পক্ষে অন্নকষ্ট একরূপ পুরাতন ব্যাধি-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতবাসীর দারিদ্র্য লোকপ্রসিদ্ধ। ভারতের দরিদ্র প্রজাগণ অতি স্বচ্ছল অবস্থাতেও দৈনিক একবার মাত্র উদর পুরিয়া খাইতে পায়। সুতরাং দুর্ভিক্ষের সামান্য আক্রমণেই একেবারে শত শত ভারতবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে। যাঁহারা ভারতের বাহ্য আড়-ম্বরে এবং ভারতবাসীর বাহ্য উন্নতিতে মুগ্ধ তাঁহারা ভারতের এই শোচনীয় অবস্থা সম্যগ্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। কিন্তু যাঁহারা সুধু বাহ্য চাক-চিক্যে ভুলিয়া রহেন না, যাঁহারা ভারতের প্রকৃত কল্যাণ কামনা করেন তাঁহা-দিগের পক্ষে ভারতবর্ষের এই শোচনীয় অবস্থার বিষয় চিন্তা করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। আজকা'ল আমাদিগের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ভারতবর্ষে

একটা জাতীয়তা স্থাপন করিবার জন্য যত্নশীল হইয়াছেন এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়মধ্যে একতা স্থাপন করা যতদূর সম্ভব তাহাতে তাঁহারা কতক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়া অনুমান হয়। স্বজাতি-প্রেম ব্যতিরেকে জাতীয়তার অঙ্কুর হৃদয়ে স্থান পায় না। সকল দেশেই "জন সাধারণ" বলিয়া এক শ্রেণী আছে। যাঁহারা শিক্ষিত সভ্য এবং উন্নত তাঁহারা এই "জন সাধারণের" অন্তর্গত নহেন। যাহারা উচ্চ শিক্ষা লাভ করে নাই, যাহারা স্বদেশের মঙ্গলামঙ্গল প্রভৃতি গভীর বিষয় সকল সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অক্ষম যাহারা রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অন্যান্য প্রকার আন্দোলন হইতে দূরে রহে, তাহারাই দেশের "জন সাধারণ" বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমাদিগের দেশের কৃষকগণ এই জন সাধারণের অন্তর্গত। প্রত্যেক দেশেই জন সাধারণের মঙ্গলামঙ্গলের উপরই দেশের হিতাহিত নির্ভর করিয়া থাকে। দুই চারিজন কৃতবিদ্য ব্যক্তির উন্নতি বা অবনতিতে দেশের বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু দেশের যাহারা প্রাণ, যাহাদিগের অস্তিত্বের উপর দেশের সমস্ত আশা ভরসা সম্পূর্ণভাবে অধিষ্ঠিত, তাহাদিগের উন্নতি বা অবনতি প্রকৃত চিন্তার বিষয় বটে। আজকা'ল অনেকেই দেশহিতৈষী বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছুক। যাঁহারা প্রকৃত কল্যাণ ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের এই জনসাধারণকে পৃথক্ শ্রেণী বলিয়া গণ্য করা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহাদিগের স্মরণ রাখা উচিত এই জনসাধারণের অদৃষ্টের সহিত তাঁহাদিগের আপনার অদৃষ্ট অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ। বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের জনসাধারণের উন্নতির পথে যে সকল প্রধান অন্তরায় আছে সেগুলির বিশেষরূপ প্রতিকার করিবার জন্য সাধ্যমত আমাদিগের সকলেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে কৃষকগণই সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া থাকে, কেন না ভারতের কৃষক-শ্রেণীর শুভাশুভের উপরেই আমাদের সুখ দুঃখ অধিষ্ঠিত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এই কৃষক-শ্রেণীর উন্নতির পথে যে সকল অন্তরায় আছে তাহারই দুই একটির বিষয় আলোচনা করিব।

ভারতবাসী মাত্রেই "পুরাতনের" সেবক। যাহা পুরাতন তাহার প্রতি মনুষ্য মাত্রেরই একটা কেমন আন্তরিক শ্রদ্ধা দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যের হৃদয় পুরাতন ছাড়িয়া নূতন লইতে কেমন একরকম স্বাভাবিক অনিচ্ছা প্রকাশ

করিয়া থাকে। কিন্তু ভারতবাসীর ন্যায় অন্য কোন জাতির মধ্যে পুরাতমের প্রতি এরূপ প্রগাঢ় ভক্তি লক্ষিত হয় না। যাহা নূতন তাহা আমাদিগের পক্ষে অশেষ কল্যাণের আকর হইলেও আমরা তাহা গ্রহণ করিতে নানারূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকি। জনসাধারণের মধ্যেই এই ভাবটির বিলক্ষণ পুষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়। রাজনৈতিক ভাষায় বলিতে গেলে ভারতবাসীকে রক্ষণশীল (Conservative) দলভুক্ত বলা যাইতে পারে। ভারতবাসীর চক্ষে যাহা পুরাকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহাই গ্রহণযোগ্য এবং দেশহিতকর। পুরাতনের প্রতি ভক্তি এবং শ্রদ্ধা যখন সীমার বহির্ভূত হইয়া পড়ে, তখনই উন্নতির পথে বিঘ্ন জন্মাইয়া থাকে। যে জাতি প্রত্যেক বিষয়ে পুরাতনকে আদর্শ করিতে চায় এবং কখন চিরপ্রচলিত প্রথার এক পদ এদিক্ ওদিক্ যাইতে চায় না, সে জাতির উন্নতি সুদূরপরাহত। আমাদিগের দেশে কৃষকগণের মধ্যে এই দোষটী প্রবলভাবে কার্য্য করিয়া থাকে এবং কৃষকগণের উন্নতির পথে একটি প্রধান অন্তরায় হইয়াছে। বহুকাল পূর্ব্বে যে ভাবে যে প্রণালীতে ভারতবর্ষে কৃষির কার্য্যাদি পরিচালিত হইত, আজ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে অদৃষ্টের আবর্ত্তে নানারূপে বিক্ষোভিত হইয়া এবং সংসারের অশেষবিধ ঝঞ্ঝাবাতে ক্লিষ্ট হইয়াও ভারতবর্ষীয় কৃষক ঠিক একই ভাবে একই প্রণালীতে কৃষিকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছে। কত বৎসরের পর বৎসর, কত যুগের পর যুগ, কত শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে কিন্তু ভারতবর্ষের কৃষিপদ্ধতি অবিকৃত অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে চলিয়া আসিতেছে। ভারতের কৃষকগণের মস্তিষ্কের উপর কেমন একটা সুগভীর রেখা অঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি এই রেখার বাহিরে পদার্পণ করিতে অক্ষম। কালভেদে এবং ঘটনাবলীর অবস্থাভেদে কার্য্যপ্রণালীর পরিবর্ত্তন আবশ্যক। বহুকাল পূর্ব্বে যখন দেশের ধন দেশের বাহিরে যাইবার উপায় ছিল না, যখন লোকসংখ্যার অনুপাতে দেশে যাহা উৎপন্ন হইত তাহাই যথেষ্ট বলিয়া অনুমিত হইত, সে সময়ে যে প্রণালীতে চাষ আবাদ করিলে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইত, বর্ত্তমান সময়ে ঠিক সেই প্রণালীতে কার্য্য করিলে প্রচুর অন্নসংস্থানের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। লোকসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত অবাধ বাণিজ্যের খাতিরে ভারতবর্ষের শস্যাদি বহু পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইয়া চলিয়া যাইতেছে;

সুতরাং তৎপরিমাণে উৎপত্তিবৃদ্ধি না হইলে আমাদের এই বাৎসরিক অন্নকষ্ট অবশ্যম্ভাবী। ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি দ্বিবিধ উপায়ে বর্দ্ধিত হইতে পারে। (প্রথমতঃ যে সকল ভূমি যত্নের অভাবে পড়িয়া রহে সেই গুলি চাষোপযোগী করা। দ্বিতীয় উপায়, স্বল্প ব্যয়ে এবং স্বল্প পরিশ্রমে শস্যাদি উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা করা।) কৃষি-কর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতে হইলে এই দুই বিষয়েহ বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। জমির প্রকার-ভেদে উর্ব্বরতার অনেক তারতম্য ঘটিয়া থাকে। যে সকল ভূমি অপেক্ষাকৃত উচ্চ সে গুলি প্রায়ই আবাদ হয় না। যে সকল জমি নিম্ন, যে গুলি সহজেই চাষ করা যায় এবং স্বল্প ব্যয় ও পরিশ্রমে শস্যাদি উৎপন্ন হয়, আমাদিগের দেশের কৃষকগণ কেবল সেই গুলি চাষ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে। যে সকল জমি আবাদোপযোগী করিতে বহু অধ্যবসায় এবং পরিশ্রম আবশ্যক তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হয় না। ইহার প্রধানতঃ দুইটি কারণ লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রথম কারণ কৃষকগণের মূলধনের অভাব। দ্বিতীয় কারণ তাহাদিগের চিরপ্রচলিত প্রথার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। আমাদিগের দেশের কৃষকগণ প্রতি বৎসর মহাজনের নিকট ধার করিয়া আবাদের কার্য্যাদি চালাইয়া থাকে। যদি সৌভাগ্যক্রমে ফসল জন্মিল, তাহা হইলে মহাজনের দেনা শোধ হইল এবং দরিদ্র কৃষক কোন প্রকারে দুটী খাইয়া পরিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া আপনার প্রাণ বাঁচাইল; যদি দৈবাৎ বৃষ্টির অভাব হইল, তাহা হইলে মহাজনের দেনার দায়ে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রিজারীতে তাহার পুঁজিপাটা সকলই গেল। এইরূপে অতি স্বচ্ছল অবস্থাতেও দরিদ্র কৃষকগণ কিছুই সঞ্চয় করিতে পারে না এবং অর্থাভাবে আপনাদিগের দুর্দ্দশার কোনই প্রতিকার করিতে সক্ষম হয় না। (মূলধনের অভাব এবং চিরপ্রচলিত প্রথার প্রতি প্রগাঢ় আস্থা এই দুইটী আমাদিগের কৃষকগণের উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদিগের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মনোযোগ এই বিষয়ে আকৃষ্ট না হইলে ইহার প্রতিকারের কোন আশা করা যায় না। যতকাল আমরা এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়টী কৃষকদিগের বুদ্ধি এবং বিচার শক্তির উপর ন্যস্ত রাখিয়া আপনারা নিশ্চিন্ত রহিব, ততদিন আমাদিগের এই নিদারুণ অন্ন-কষ্ট এই দেশময় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা নিবৃত্ত হইবার নহে।) আমাদিগের মধ্যে অনেকে লেখাপড়া শিখিয়া কৃষিকার্য্যকে অতি হেয় বলিয়া

মনে করেন এবং অশিক্ষিত "চাষা" দিগেরই ইহা উপযুক্ত কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য এটী তাঁহাদিগের নিতান্ত বিকৃত বুদ্ধির পরিচায়ক। বর্ত্তমান সময়ে সভ্যজগতে নিত্য নূতন বৈজ্ঞানিক সত্যসকলের আবিষ্কার হইতেছে এবং প্রত্যেক বিষয়ে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কর্ম্মপ্রণালীর উন্নতি সাধন করিয়া অতিআশ্চর্য্যরূপ ফললাভ হইতেছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ের সাহায্যে আমাদিগের দেশের কৃষিপদ্ধতির অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে। অল্প ব্যয়ে এবং অল্প পরিশ্রমে যাহাতে শস্যবৃদ্ধি হইতে পারে তদ্বিষয়ে আমাদের বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহার জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ উদ্যোগী না হইলে কোনরূপ ফললাভের আশা করা যায় না। কি উপায়ে ভূমির উর্ব্বরতা বর্দ্ধিত হইতে পারে, কিসে বৃষ্টির অভাব হইলে অন্য উপায়ে জল সেচনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে কৃষকগণের শিক্ষার নিতান্ত অভাব। তাহারা পিতৃ পিতামহাদির পথে অনুসরণ করিয়া থাকে; কোন নূতন উপায় উদ্‌ভাবনের শক্তি অথবা ইচ্ছা ইহাদিগের নাই। আমাদিগের দেশে যাঁহারা ভূম্যধিকারী তাঁহারা নিজ নিজ জমি সকলের উৎকর্ষ সাধন-জন্য নূতন উপায় অবলম্বন করিতে পারেন এবং তদ্দ্বারা কৃষকগণের প্রকৃত শিক্ষা লাভ হইতে পারে। যাঁহারা অর্থশালী এবং স্বদেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাঁহাদের এই পরম হিতকর কার্য্যে পথপ্রদর্শক হওয়া উচিত। ভারতের এই অসামান্য অন্নকষ্টের প্রতিকার শিক্ষিত এবং অর্থশালী ভারতবাসীর হস্তেই নিহিত আছে। ভারতের দুর্ভিক্ষনিবারণ-জন্য অন্য যে কোন উপায় উদ্‌ভাবিত হইতে পারে অল্প ব্যয়ে এবং অল্প পরিশ্রমে অধিক শস্য লাভের জন্য ঐকান্তিক যত্নই ইহার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। পরের মুখ চাহিয়া পরের সাহায্যের জন্য বৃথা প্রতীক্ষা না করিয়া ভারতের কৃতবিদ্য সন্তানগণ যদি আপনাদিগের সুযোগ এবং সাধ্যমত প্রত্যেকে যতটুকু সম্ভব কৃষিকর্ম্মের উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হয়েন এবং প্রকৃত কার্য্যের দ্বারা ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে সক্ষম হন তাহা হইলেই ভারতবাসীর এই সাংবৎসরিক হা-হুতাশ, এই নিদারুণ জ্বালার অনেক পরিমাণে উপশম হইতে পারে তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

শ্রীযোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

---

# বিহঙ্গমের উপকারিতা।

বিহঙ্গমের বর্ণ বৈচিত্র আমাদিগের নয়নাভিরাম; বিহঙ্গের সঙ্গীতলহরি আমাদিগের শ্রবণে সুধা বর্ষণ করে। এ সকল কথার আবৃত্তি করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। উদ্ভিদের বিস্তার-বিষয়ে বিহগকুল সাক্ষাৎরূপে যে কার্য্য করিয়া থাকে তাহাও বলিতেছি না; অন্যান্য যে যে প্রকারে পক্ষিগণ কৃষকের উপকারে আইসে তাহারই আলোচনা করিব।

কতকগুলি পক্ষী আছে, তাহারা কীটপতঙ্গ আহার করে। অনেক কীট-পতঙ্গ শস্য নষ্ট করে; অঙ্কুরোদ্গমন্মুখ বীজ কাটিয়া তাহার সারাংশ উদরস্থাৎ করে, বর্দ্ধমান তরুমূল কাটিয়া দেয়, তরুত্বক বিদ্ধ করে, পত্রপল্লব ভোজন করে। কেহ পুষ্প কাটিয়া দেয়—কেহ বা কোমল ফল বিদ্ধ করিয়া তাহাতে ডিম্ব প্রসব করে—কেহ প্রসূনের পরাগ খাইয়া ফেলে—কেহ বা কৃষাণের আশা, ভূম্যধিকারীর ভরসা ও উত্তমর্ণের উপায়-স্বরূপ নবসমুদ্গত শস্য—যাহার অভ্যন্তর এখনও পরিপুষ্ট হয় নাই—যাহা কেবল ক্ষীরপূর্ণ—কাটিয়া দেশ হাহাকারে পরিপূর্ণ করে। পক্ষিগণ এই সকল সর্ব্বনাশক কীটপতঙ্গকে উদরস্থ করিয়া মানবজাতির সুমহান্ উপকার করিয়া থাকে। সকল সভ্য দেশে কীট-খাদক বিহঙ্গমদিগকে রাজশক্তি দুর্দ্দান্ত শিকারিগণের অব্যর্থ সন্ধান হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। এই সকল পক্ষিগণকে যাহাতে সকলে চিনিতে পারে, তদভিপ্রায়ে ইহাদিগের আকৃতি অঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করা হয়। কৃষিকার্য্যে কীটপতঙ্গ এক একসময় কি প্রকার প্রতিকূলাচরণ করিয়া থাকে তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। কীটপতঙ্গ নিবারণ করিবার উপায় এত স্বল্প, সুযোগ এত সামান্য যে পতঙ্গ-বিভ্রাটে কৃষকের ভরসা কেবল ঈশ্বর। তাই বুঝি, তিনি কীটপতঙ্গকে বিহঙ্গমগণের খাদ্য করিয়াছেন। এক একটী কীট এক একটী ধান্যের গাছ নষ্ট করে—এই প্রকার যদি ধরা যায়, এবং এক একটী পক্ষী প্রতিদিন অন্ততঃ এক শত কীটে উদরপূর্ত্তী করে, তাহা হইলে প্রত্যেক পক্ষী ছয় মাসে অষ্টাদশ সহস্র কীট নষ্ট করে, এবং প্রত্যেক ধান্যতরু যদি এক তোলা পরিমাণ শস্য প্রসব

করে ধরা যায, তাহা হইলে ৫ মণ ২৫ সের পরিমাণ ধান্য একটী বিহঙ্গমের কল্যাণে কৃষক প্রাপ্ত হইযা থাকে। এক টাকায় ৮০ তোলার ওজনের অর্দ্ধমণ পরিমাণ ধান্য যদি বিক্রীত হয় তাহা হইলে এক একটী কীটভুক্ পক্ষীর গুণে ১১।০ টাকা বৃদ্ধি হয়।

অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ-বিনাশ করিয়াই বিহঙ্গমগণ ক্ষান্ত থাকে না, তাহারা আর এক প্রকারে ধনবৃদ্ধির সহায়তা করে। ইহাদিগের বিষ্ঠা মহা তেজস্কর সার। বিলাতী অধ্যাপক এণ্ডারসন কপোতবিষ্ঠা বিশ্লেষণ করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং অধ্যাপক জনষ্টন ও স্যার চার্লশ কামিরণ তাঁহাদিগের কৃষি-রসায়নবিষয়ক সর্ব্ববাদিসম্মত উৎকৃষ্ট গ্রন্থে যাহা সন্নিবেশিত করিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল ঃ—

| | |
|---|---|
| জল | ৫৮·৩২ |
| জান্তব পদার্থ (এমোনিয়া উৎপাদক) | ২৮·২৫ |
| ফসফেট | ২·৬৯ |
| সালফেট অব লাইম | ১·৭৫ |
| আলকাইন সলট্স্ (ফসফরিক এসিডযুক্ত) | ১·৯৯ |
| বালুকা | ৭·০০ |
| | ১০০·০০ |

অধ্যাপক এণ্ডার্সন মোরগ, হংস ও রাজহংসের বিষ্ঠাও পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ফল নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

| | মোরগ | হংস | রাজহংস |
|---|---|---|---|
| জল | ৬০.৮৮ | ৪৬.৬৫ | ৭৭.০৮ |
| জান্তব পদার্থ | ১৯.২২ | ৩৬.১২ | ১৩.৪৪ |
| ফসফেট | ৪.৪৭ | ৩.১৫ | ০.৮৯ |
| কার্ব্বনেট অবলাইম | ৭.৮৫ | ৩.০১ | — |
| আলকাইন সলট্স্ | ১.০৯ | ০.৩২ | ২.৯৪ |
| বালুকা | ৬.৬৯ | ১০.৭৫ | ৫.৬৫ |
| | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ |

ফ্লাণ্ডার্স দেশের কৃষকেরাই ইউরোপের সকল দেশের কৃষকগণের শীর্ষস্থানীয়। তাহাদিগেরই কৃষিপ্রথা দেশকাল ও পাত্রভেদে ইউরোপের নানা দেশে প্রচলিত। যখন সমগ্র ইউরোপ মৃগয়ালব্ধ মাংসে উদরপূর্ত্তী করিত এবং অনায়াসোৎপন্ন ফলশস্য মাত্র ভোজনে তৃপ্তি লাভ করিত সে সময়েও ফ্লাণ্ডার্সবাসিগণ কৃষিনিপুণ। এই ফ্লাণ্ডার্স দেশে এক শত কপোতের এক বৎসরের বিষ্ঠার মূল্য বিংশতি হইতে পঞ্চ বিংশতি শিলিং। স্পেনের কাটালেনিয়া, আরাগণ প্রভৃতি প্রদেশে এক পৌণ্ড পরিমিত কপোতবিষ্ঠার মূল্য চারি পেন্স। তথায় ইহা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পুষ্পতরুতলে, মেলন ও টমাটো (বিলাতি বেগুন) ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। পেরুভিয়া দেশের উপকূলে ও তৎসন্নিহিত শৈলমালায় ও দ্বীপপুঞ্জে এবং আফ্রিকা মহাদেশের সাগবসন্নিহিত প্রদেশে এক প্রকাব জলপক্ষী রাত্রিকালে আশ্রয় গ্রহণ করে। নিশাকালে তাহাবা যে মল ত্যাগ করে তাহা অতি তেজস্কর সার বলিয়া সকল সভ্য দেশে আমদানী হইয়া থাকে। এক স্থানে বহুসংখ্যক পক্ষী একত্র হয় বলিয়া তথায় তাহাদিগের মল প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বিহগবিষ্ঠাকে গুয়ানো (guano) কহে। বহুকাল হইতে ইহা চিনচাস (Chinchas) নামক ক্ষুদ্র দ্বীপ হইতে ইউরোপে আসিত। এক্ষণে তথাকার গুয়ানো নিঃশেষিত হওয়ায় পুন্তা-দি-লোবো (Punta de Lobos) প্রভৃতি স্থান হইতে আসিতেছে। এই সকল স্থানে প্রায় একশত ফুট ঘন হইয়া গুয়ানো বিস্তৃত রহিয়াছে। পেরুর অধিবাসিগণ গুয়ানোকে এত আদর করে যে পূর্ব্বে কেহ এই মলত্যাগী বিহগ নষ্ট করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইত। আমাদিগের উপকূল প্রদেশে কি কোন জলচর পক্ষী আশ্রয় গ্রহণ করে না, এবং ভাড়াব স্বরূপ তাহাদিগের মল ত্যাগ করিয়া যায় না ?

আমাদিগের গৃহপালিত পক্ষিগণের মল যে এত উপকারী তাহা কৃষকগণ প্রায়ই মনে করে না। কিন্তু বিলাতের কৃষকেরা বিদেশ হইতে বিহগবিষ্ঠা ক্রয় করিয়া লইয়া আপনাদিগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতেছে। আর, আমরা আমাদিগের গৃহপালিত পক্ষিগণের মল অজ্ঞতানিবন্ধন আবর্জ্জনা বলিয়া ফেলিয়া দিয়া থাকি।

হিন্দুগণের অপেক্ষা মুসলমান কৃষকগণের গৃহপালিত পক্ষীর সংখ্যা অধিক।

হিন্দুগণ মোরগ পালন না করিয়া হংসাদি পালন করিয়া থাকে। হংসাদির দিবাভাগের বিষ্ঠা প্রায়ই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু রাত্রিকালে পবিত্যক্ত মল এক স্থানে জমা করিয়া রাখিয়া আবশ্যক মত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। মুসলমান মোরগের মল অনায়াসে সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারে। অনেকে কপোত পালন করিয়া থাকে। কোন কোন গৃহস্থের বাটীতে এবং ধনশালী জমিদারের প্রাসাদে শত শত কপোতকপোতী বিরাজ করিতেছে। তাহাদিগের পরিত্যক্ত মল সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য নহে।

সংগৃহীত বিহগ-মল এরূপ ভাবে রক্ষা করিতে হইবে যেন বৃষ্টির জল উহার কিয়দংশও ধৌত হইয়া না যায়। গোময় ইত্যাদি সারের ন্যায় পক্ষিমলও বারি-বিধৌত হইলে উহার তেজস্কর পদার্থের অধিকাংশ কৃষককে হারাইতে হয়। চুণের সহিত যাহাতে বিহগবিষ্ঠা মিলিত না হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কারণ, তাহা হইলে বিহগবিষ্ঠার এমোনিয়া—যাহা উদ্ভিদের বিশেষ প্রয়োজনীয়—উড়িয়া যাইবে।

বিহগবিষ্ঠা আলু প্রভৃতি ফসলে বিশেষ উপযোগী। কুসুমতরুতে, তামাকে, এবং এমন কি ধান্যেও উহা প্রয়োগ করিলে ফল হয়। ক্ষেত্রে উদ্ভিদ সকল কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, অর্দ্ধেক ভাগ মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিয়া, ব্যবহার করা ভাল। বীজ বপনের সময় উহা প্রয়োগ করিলে অনেকবার বীজ নষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে। অবিমিশ্রিত বিহগ-বিষ্ঠা কোমল তরুমূল স্পর্শ করিলে বৃক্ষের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। এই নিমিত্ত মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা। সুরাপায়ী হুইস্কীর সহিত জল মিশাইয়া লয়। চিকিৎসক তেজস্কর ঔষধের সহিত জল বা তৈল মিশাইয়া দেন। সেইরূপ বিহগবিষ্ঠার কর্কশতা দূর করিয়া, উহাকে তরুলতার গ্রহণোপযোগী করিবার জন্য মৃত্তিকাবিমিশ্রণ আবশ্যক।

শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস।

—০—

# রাজনীতি।

প্রবন্ধ আরম্ভেই পাঠকমহোদয়গণকে অভয় দিতেছি এ সম্বন্ধে এই আমার শেষ প্রবন্ধ। সাপ্তাহিক সংবাদপত্রসমূহ মাসের মধ্যে চারিবার করিয়া পাঠকগণের ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার পরীক্ষা করিয়া থাকেন; দৈনিকগণের প্রাত্যহিক রাজনীতির অত্যাচার অনেককে সহ্য করিতে হয়; তাহার উপর যদি আবার মাসিক কাগজের সম্পাদক মহাশয়েরাও রাজনীতি লইয়া বাজারে উপস্থিত হন তাহা হইলে কি ক্ষীণজীবী, কোমলমস্তিষ্ক বাঙ্গালী পাঠকগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয় না? কিন্তু আমার কৈফিয়ত আমি প্রথম প্রবন্ধেই বলিয়াছি; সময় ব্যয়ের এমন উপকরণ আর নাই!

গৌরচন্দ্রিকা সংক্ষেপে শেষ করিয়াই আমি খাঁটি 'রাজনীতি' ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছি।

দুর্ভিক্ষ নিবারণের যতগুলি উপায় কল্পিত হইয়াছে তাহার দুই একটীর কথা আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি। এইখানে একটী কথা পাঠকগণকে অতি আনন্দের সহিত বিজ্ঞাপন করিতেছি। সে দিন একখানি ইংরাজী সংবাদপত্রে পাঠ করিলাম, বোম্বাই অঞ্চলে কৃষকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য ইতিমধ্যেই একটী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। যাহাতে কৃষকগণ কৃষিকর্ম্ম ও জীবনধারণের জন্য অবশ্যপ্রয়োজন অর্থের অভাবে মহাজনের খাতায় যথাসর্ব্বস্ব না দেয়, এই ব্যাঙ্কের তাহাই উদ্দেশ্য। আমি পূর্ব্ব প্রস্তাবে ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলাম। ভগবানকে ধন্যবাদ দিই যে, বোম্বাইবাসিগণ দুর্ভিক্ষ নিবারণের এই উপায়ের কার্য্যকারিতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। আর আমাদের দেশে যাঁহাদের জন্য আমি প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম তাঁহারা আমাদের কথা হয়ত কাণেই তুলেন নাই। সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া আমার কর্ত্তব্য আমি ষোল আনা পালন করিলাম মনে করিয়া আমি যেমন নিশ্চিন্ত বা নিশ্চেষ্ট; যাঁহাদের জন্য লিখিয়াছিলাম তাঁহারাও প্রবন্ধ পাঠ করিয়াই নিশ্চিন্ত, তদতিরিক্ত যে কিছু

করা উচিত সে জ্ঞান আমারও যেমন, তাঁদেরও তেমনি। সুতরাং ভারতউদ্ধারের আর বেশী দিন বিলম্ব নাই!

নিম্নশ্রেণীর ও মধ্যবিত্ত জনগণের অবস্থার উন্নতির জন্য আর দুইটী বিষয় আবশ্যক। প্রথম শিল্পশিক্ষা। ইংলণ্ডে যতলোক বাস করে তাহাদের আহার্য্যদ্রব্য সমস্ত ইংলণ্ড আবাদ করিলেও জন্মে কিনা সন্দেহ। ইংরেজ তাহা জানে তাই ইংরেজ কৃষক শুধু জমির উৎপন্ন দ্রব্যের দিকেই সারা বৎসর চাহিয়া বসিয়া থাকে না। তাহারা অন্যান্য উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করে; ঘরে অর্থ থাকিলে পৃথিবীর সুদূর প্রান্ত হইতে খাদ্যদ্রব্য আসিয়া প্রতিদিন দ্বারদেশে উপস্থিত হইবে। বাজারে ক্রেতা উপস্থিত থাকিলে চারিদিক হইতে বিক্রেয় দ্রব্যের আমদানী হইয়া থাকে। ইংরেজ নানা উপায়ে অর্থলাভের চেষ্টা করে। আর বাঙ্গালী কৃষকের ক্ষেতে যদি একবার ধান না জন্মিল তাহা হইলেই সপরিবারে মরণের দ্বারে উপস্থিত হইল। কারণ জমিটুকু চাষ করা ব্যতীত আর কিছুত তাহার জানা নাই। এই অবস্থা দূর করিবার প্রধান উপায় শিল্পশিক্ষা। আমাদের দেশের গ্রামে গ্রামে শিল্পশিক্ষার বন্দোবস্ত করা উচিত, তাহা হইলে কি কৃষক কি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক সকলেরই অন্নের সংস্থান হয়। সে দিন একজন সাহেবের সঙ্গে আমার এই বিষয়ে কথা হইতেছিল; তিনি বোম্বাই প্রদেশের একটা বড় কলের একজন অংশীদার। তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন "তোমাদের কি ভ্রম, তোমরা এম-এ পাশ করিয়া ৬০৲ টাকা মাহিয়ানার কাজ করিবে, দুই বেলা সাহেবের বকুনী খাইবে তাহাও স্বীকার, তবুও একটু কলকারখানার কাজ শিখিয়া দুই তিন শত টাকা উপার্জ্জন করিতে চাহ না"। তিনি বলিলেন তাঁদের কলে কাজ করিবার জন্য বিলাত হইতে মোটা বেতনে লোক আনিতে হয়, কিন্তু তাহার বিশ্বাস যে এ দেশীয় লোক যদি সেই সমস্ত কাজ শিক্ষা করে তাহা হইলে তাহাদিগের দ্বারা কলের কাজ সুন্দররূপে চলিতে পারে, এবং কলের অধ্যক্ষগণের ব্যয়ও খুব কম হয়। এই যে আমাদের দেশের নদীর মধ্য দিয়া আজকাল দিবানিশি ষ্টীমার যাতায়াত করিতেছে, তাহার সারং প্রভৃতি এই দেশী লোক; তাহারা সকলেই বেশী বেতন পায়। চট্টগ্রাম অঞ্চলের মুসলমানগণেরা ষ্টীমারের কাজ একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে। আর কেহ কি এ কাজ শিখিতে পারে না? অনায়াসেই

পারে। কিন্তু কৈ কাহারও ত আগ্রহ দেখি না। এণ্ট্রান্স কি এফ্ এ পাশ করিয়া ১৫্ টাকা বেতনে ষ্টীমারের বাবু হইতে রাজী আছি, কিন্তু সারং কি সুখানী হইব না। তাহা হইলে যে কেহ বাবু বলিবে না! আমরা অনাহারে না মরিলে কে মরিবে? এই স্থানে একটা গল্প মনে পড়িল। আমাদের একজন সেকরা আছে তাহার নাম ভীমাচরণ; সে একজন উৎকৃষ্ট অলঙ্কার-প্রস্তুতকারী; তাহার আয়ও কোন মাসেই ৫০।৬০ টাকার কম হয় না। তাহার একটু একটু মদ খাওয়ার অভ্যাস আছে। তাহার ছেলেটীকে সে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছে। তাহাকে সকলেই 'ভীমে সেকরা' বলিয়া ডাকে। একদিন রাত্রে আমরা কয়েকটী বন্ধুতে বসিয়া আছি, এমন সময়ে সে সামান্য নেশা করিয়া রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। আমাদিগকে দেখিয়াই দাঁড়াইল এবং অতি বিনীত ভাবে একটী প্রার্থনা জানাইবার অনুমতি চাহিল। আমরা তাহার প্রার্থনা শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে সে বলিল "দেখুন মহাশয়, আমি ভীমাচরণ মাসে ৫০।৬০ টাকা উপার্জ্জন করি, কাহারও অধীন নই, লোকে আমাকে ডাকে 'ভীমে সেকরা' আর ঐ যে র—, তিন টাকা মাহিয়ানায় গোমস্তাগিরি করে, দিনরাত গালাগালি খায়, ও কিনা র—বাবু; তা মহাশয়েরা একটী কাজ কোরবেন, আমার ছেলেকে আর সেকরার কাজ শিখাইতেছি না, তাকে স্কুলে দিয়াছি, যাতে লোকে তাকে 'বাবু' বোলে ডাকে তার একটা ব্যবস্থা কোরতেই হবে।" কথাটা মদের মুখে বাহির হইয়াছিল বটে, কিন্তু পাকা কথা। আমাদের সকলের মনের মধ্যেই ঐ কথা; দোকানদার, সেকরা, সূত্রধর, কর্ম্মকার, কি ঐ প্রকার শিল্প ব্যবসায়িগণকে আমরা তেমন একটা ভাল দৃষ্টিতে দেখি না। আমাদের মরণ না হইবে কেন?

নানা প্রকারের শিল্পশিক্ষা হইলে নানা উপায়ে অর্থাগম হইবে, দেশ-বিদেশ হইতে আহারের দ্রব্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। তখন এক বৎসর কেন তিন বৎসর অজন্মা হইলেও আমাদের মধ্যে হাহাকার ধ্বনি উঠিবে না। দাসত্বের বোঝাও একটু হাল্কা হইবে। নতুবা শুধু দরখাস্ত, শুধু ক্রন্দন, শুধু এজিটেসন, শুধু ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে গালাগালি দিয়া দুর্ভিক্ষ দমন হইবে না! আর প্রতি বৎসর চাঁদার খাতা খুলিয়া পৃথিবীর দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়াইলেও পেট ভরিবে না। নিত্য ভিক্ষা কয় জন দিবে?

আমাদের অভাব দূর হইবার আর একটা উপায় সর্ব্বদাই আমার মনে হয়; কিন্তু যে প্রকার দেশের অবস্থা এবং আজ ১০।১৫ বৎসরে সে সম্বন্ধে যে প্রকার অভিজ্ঞতা আমরা শরীরের রক্তদানে লাভ করিয়াছি, তাহাতে সে প্রস্তাব উপস্থিত করিতে একটু সঙ্কোচের ভাব আমার মনে উঠিতেছে। তবে কর্ত্তব্যের অনুরোধে কথাটা বলিয়া ফেলাই ভাল। দেশের ধনবৃদ্ধি সুতরাং অবস্থার উন্নতির আর একটী প্রধান উপায় "যৌথ কারবার"। কথাটা সভয়ে বলিতেছি। বেঙ্গল প্রভিন্‌সিয়াল রেলওয়ে, স্পিনিং ও উইভিং কোম্পানী, দেশলাইয়ের কল কোম্পানী, ট্রেডিং কোম্পানী, সাহায্যভাণ্ডার প্রভৃতি হইতে আমরা অনেক শিখিয়াছি। আমরা দশজনে মিলিয়া সাফ্ কথা বলিবার জন্য, দরখাস্ত লিখিবার জন্য সভা সমিতি করিতে পারিলেও পারি; কিন্তু পাঁচজন মানুষ ট্রাম গাড়ীর এক বেঞ্চে বসিয়া যাইতে হইলেও ঠেলাঠেলী, ঝগড়াঝাঁটি করে। এ অবস্থায় যৌথ কারবারের কথাটা তুলিয়া আমি হাস্যাস্পদ হইব। কিন্তু পৃথিবীর সভ্য জাতির বর্ত্তমান ইতিহাস সোণার অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে, প্রতিদিন আমাদিগের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতেছে, ব্যবসাবাণিজ্য ব্যতীত কোনা জাতির আর্থিক উন্নতি হইবার উপায়ান্তর নাই; আর্থিক উন্নতি হইলে মনে বল হয়; সামাজিক জীবের অর্থ দরকার। তবে যাঁহারা 'মোহমুদ্গর' হাতে করিয়া "অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্" করিতেছেন তাঁহাদের কথা পৃথক্; আমার এ প্রবন্ধ তাঁহাদের জন্য নহে। ঘর গৃহস্থলী করিয়া বাস করিতে হইলে ক্ষুধা-নিবারণের উপায় করিতে হয়, শাস্ত্রগ্রন্থে মনের ক্ষুধা, আধ্যাত্মিক অনাহারের ঔষধিব্যবস্থা আছে, কিন্তু হরিনামে পেটের ক্ষুধা নিবারণ হয় না, তাহার জন্য মাধুকরী করিতে হয়।

যাহাই বলুন, সম্পাদক মহাশয়! অর্থেরি দরকার, নতুবা জীবাত্মা নামক পদার্থবিশেষ দেহ-মধ্যে তিষ্ঠিতে অসম্মত। তাহাকে বলিয়া কহিয়া না রাখিতে পারিলে পৃথিবী চলে না। কিঞ্চিৎ অর্থ না হইলে শরীর ধারণ হয় না; সেই অর্থাগমের সুগম পথ অনুসন্ধান কর্ত্তব্য। হিতবাদের হিসাবে ইহা সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্ম।

একটা আটপৌরে শাস্ত্রের বচন বলে "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী স্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি, তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং, ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ"। এই বচনটাকে

একটু বিশ্লেষণ করা যাউক। যেটা "নৈবচ নৈবচ" আমরা কন্‌গ্রেস হইতে বিলাতে টেলিগ্রাম করিয়া সেইটা আগে করিয়াছি; অবশ্য আমাদের প্রধান মনিব মহাশয়কে সংবাদ দেওয়াও সে টেলিগ্রামের অন্যতর উদ্দেশ্য ছিল। শাস্ত্রের শেষ আদেশ মানিলে এবার দেশের অনেকটা স্থান শূন্য হইত! তার পূর্ব্বের আদেশ 'রাজসেবায়াং',—তাতে ক্রটী নাই, তবে তাতে আর পেট ভরে না। সেকালের সে প্রবাদ বাক্য "যেমনতেমন চাকুরী ঘুধভাত" তা আর এখন নাই, এখন আর ৬০৲ টাকা বেতনে চাকুরী করিয়া মাতৃশ্রাদ্ধে নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করা যায় না। আমাদের মনিব সাহেবেরা বলেন, মাসে ৩০৲ টাকা বেতন হইলেই একজন নেটিবের সপরিবারে চলে। সুতরাং রাজসেবায় মোক্ষলাভ হইতে পারে, কিন্তু দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া সুকঠিন। তার পূর্ব্বের আদেশ "কৃষিকর্ম্মণি";—কাজ বেশ কিন্তু শুধু কৃষিকার্য্যে যে বিপদ তাহা ত দেখাইয়াছি। **সুতরাং** বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া রাখিতে হইবে

**"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"** ব্যবসা বাণিজ্য অনেক রকমের আছে, বিদ্যাসুন্দরের "হীরে মালিনী" কথার ব্যবসা করিত, আমরাও অনেকে করি। তাতে হইবে না। যথারীতি বাণিজ্য করিতে হয়। তাহার জন্য মূলধনের দরকার। দশজনে মিলিয়া মূলধন দিলে ব্যবসা ভাল চলে। পৃথিবীর মধ্যে যাহারা প্রধান ব্যবসায়ী তাহাদের সমস্ত ফারমই 'যৌথ ফারম'। একজন ধনী কোন একটা ব্যবসায়ে এক কোটী টাকা ফেলিতে সহজে সাহস পায় না, কারণ ক্ষতি হইলে তাহার যথেষ্ট যাইবে; কিন্তু এক হাজার লোকে অনায়াসে অংশমত কোটী টাকা দিতে পারে, এবং এমন একটা ব্যবসা নষ্ট হইয়াগেলেও তাহাদের তেমন একটা যায় আসে না। এই কারণেই সে সব ব্যবসায়ে এত উন্নতি। যৌথ কারবার ব্যতীত ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে পারে না। আর একটী সুবিধা এই, আমার মত দরিদ্র ব্যক্তিও বৎসরে দশ টাকার একটা অংশ কিনিতে পারে। দশ টাকা মূলধনে একটা ব্যবসা চলে না, কিন্তু যৌথ কারবারে সে দশ টাকায় বেশ আয় হইতে পারে। যৌথ কারবার ধনী, মধ্যবিত্ত, এমন কি সামান্য অবস্থার লোকের আর্থিক অভাব মোচনের একটা প্রধান উপায়।

উপায় ত দেখান হইল, কিন্তু আমাদের দেশে যে দশের কাজ চলে না তার কি হইবে। আর তার দশগণ্ডা প্রত্যক্ষ প্রমাণও রহিয়াছে। কিন্তু সে কথা ত পূর্ব্বেই বলিযাছি যে প্রস্তাব উপস্থিত করিতে আমার সঙ্কোচ বোধ হইতেছে। যাঁহারা দেশের প্রধান ব্যক্তি, যাঁহারা দেশের জন্য চিন্তা করেন, যাঁহাদের পদপসার আছে, তাঁহারা রাজনৈতিক সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিয়াই যেন কর্ত্তব্য হইতে খালাস না হন। আমি কন্‌গ্রেস্, কন্‌ফারেন্স, ভারতসভা, বৃটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন প্রভৃতির মহামহোপাধ্যায় স্বদেশ-হিতৈষী মহাত্মগণের সম্মুখে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি। দেশের ধনী দরিদ্র সকলকে ভাবিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীজলধর সেন।

# জুলিয়স সিজারে পোর্সিয়া।

যে রমণী স্বীয় স্বামীর মঙ্গলের জন্য, তাঁহার কষ্টের কারণ জানিবার জন্য এত কষ্ট সহিতে পারে সে সামান্য নহে, সে দেবী। পূর্ব্বে তিনি কেমন তেজের সঙ্গে বলিয়াছেন "আমি কি কেবল তোমার আহার বিহারের জন্য? আমি কি তোমার মনের কেহ নহি? বল দেখি পবিত্র বৈবাহিক বিধির মধ্যে কি একরূপ ব্যবস্থা আছে যে আমি তোমার কোন গুপ্ত কথা জানিব না? আমি কি কেবল আংশিকভাবে তোমার আত্মস্বরূপ তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী? তাহাই যদি হয় তবে আমি তোমার রক্ষিতা রমণী,—ধর্ম্মপত্নী নহি।" এই কথাতেই ব্রুটাস্ চমকিয়া গিয়াছিলেন! "শান্তং পাপং" বলিয়াছিলেন। এইরূপ কথাও প্রমাণের পর ব্রুটাস্ কি আর একরূপ স্ত্রীকে স্বীয় মনের গুপ্ত ভাব হইতে দূরে রাখিতে পারেন? তিনি সুবিধা ও সময় মত তাঁহাকে তাহা বলিলেন। এখন পোর্সিয়া কেমন করিয়া তাহা গোপন রাখিয়াছিলেন তাহা দেখিতে হইবে। এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি পোর্সিয়া স্বীয় স্বামীর মঙ্গলের উদ্দেশ্যে নিজ মনোবলের ভয়ঙ্কর পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন!

তিনি স্বামীর মঙ্গলের জন্য আত্ম দেহ ক্ষত করিয়া নিজের দৃঢ়তার প্রমাণ পাইয়াছিলেন। কিন্তু হায়, আজ যে কথা তিনি জানিলেন ইহা গোপন রাখিতে তদপেক্ষাও অধিক বল, অধিক দৃঢতার প্রয়োজন, সে দৃঢ়তা তাঁহার মত স্ত্রীলোকের পক্ষে অসম্ভব। কোমলবৃত্তি কুলাঙ্গনা, স্বামিসেবা ও সন্তান-পালনই যাহাদের প্রধান কার্য্য, স্বামীর হিতের জন্য হইলেও তাহাদের পুরুষ-জনোচিত এতবড় দুঃসাহসিক কার্য্যে যাওয়া এবং সিজারের হত্যার ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে গুপ্ত কথা জানা উচিত হয় নাই। কিন্তু তিনি স্বামীর মঙ্গলোদ্দেশ্যেই এ ভ্রম করিয়াছিলেন, আমরা দেখিতে পাইব যে স্বীয় জীবন দ্বারা তিনি এ ভ্রমের প্রতিকার করিয়াছেন, তথাপি প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত হন নাই।

Jameson তাঁহার 'Characteristic of women' পুস্তকে পোর্সিয়ার চরিত্র-সমালোচনায় তাঁহাকে লেডি পার্‌সির সঙ্গে তুলনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, প্রকৃত চরিত্র লেডি পার্‌সিতে নাই। কিন্তু পোর্সিয়াচরিত্র প্লুটার্কের আদর্শ অবলম্বনে অতি দক্ষতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন "Portia as Shakespere truly felt and represented the character is but a softened reflection af her husband, Brutus." ব্রুটাসের চরিত্রে স্ত্রী-জনোচিত কোমলতা। তাঁহার অতি গম্ভীর দার্শনিক মত দ্বারা শাসিত ছিল, তিনি বাহিরে Stoic, কিন্তু অন্তরে অন্যরূপ ছিলেন—বড় কোমল প্রবৃত্তির ছিলেন এবং তিনি স্বীয় মত ও ইচ্ছাশক্তির দ্বারা আপন স্বভাববিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া ফেলিতেন, পোর্সিয়াতেও এসবই দেখিতে পাই। Jamesonও তাহাই বলিয়াছেন। যাহা হউক এখন পোর্সিয়া কিরূপে গুপ্ত বিষয় রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, দেখা যাউক।

ঐ অঙ্কেরই ৪র্থ দৃশ্যে আমরা আর একবার পোর্সিয়ার দেখা পাই। ব্রটাস ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারিগণ সিনেটে গিয়াছেন। আজ সিজারের হত্যার দিন। স্বামী স্বীয় কার্য্যে কৃতকার্য্য হইলেন কি না এই ভাবনায় পোর্সিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। অতি উৎকণ্ঠিতচিত্তে ভৃত্য লুসিয়াসকে বলিতেছেন ;—

*Port.*— I pray thee, boy, run to the Senate house;
Stay not to answer me, but get thee gone.
Why dost thou stay ?

*Luc.*— To know my errand, madam.

*Port.*— I would have had thee there and back again
Ere I can tell thee what thou shouldst do there.

ভৃত্যকে যাইতে বলিতেছেন কিন্তু কিজন্য তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন,— আসল কথা মনে নাই—এত ব্যস্ত, এত তাড়াতাড়ি। এরূপ ব্যাপার স্বাভাবিক। মন এত চিন্তা মগ্ন যে, যে কথা বলিতে হইবে তাহা মনে নাই! ভৃত্য জিজ্ঞাসা করিল "কি জন্য যাইব?" পোর্সিয়ার যেন রাগ হইল তাই বলিলেন "যাবার পূর্ব্বে যদি তুমি তথায় গিয়া ফিরিয়া আসিতে তবে সুখী হইতাম।" আশ্চর্য্য পাগলামী বটে! মনে তখন এতই গুরু ভার চাপিয়াছে—তখন যেন প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইতেছে, তখন যেন বুঝিতে পারিতেছেন স্ত্রীলোকের পক্ষে এরূপ কথা গোপন রাখা কত কষ্টকর, কত যন্ত্রণাদায়ক,—কত কঠিন—তাই মনে মনে বলিতেছেন, দৃঢ়তাকে ডাকিতেছেন:—

O! constancy, be strong upon my side,
Set a huge mountain 'tween my heart and tongue.
I have a man's mind but a *woman's might!*
*How hard it is for women to keep counsel!*

ভৃত্যের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, তখনও সে দাঁড়াইয়া! বড় রাগ হইল, বলিলেন 'তুই এখন ও এখানে দাঁড়াইয়া?' ভৃত্য অবাক্—সে বলিল 'আমি করিব কি? ছুটিয়া সেখানে যাইব আর ফিরিয়া আসিব, আর কিছু নয়?' তখন তাঁহার জ্ঞান হইল, কিছু বলিয়া দেওয়া হয় নাই, তাই বলিলেন 'তোমার প্রভু অসুস্থ অবস্থায় বাহিরে গেছেন। তিনি কেমন আছেন, তাঁর কাছে কে কে আছে, সিজার কি কচ্ছেন, তাঁর কাছে কে কে গেছে— এই সব জেনে এস।' ইতিমধ্যে পথে গোল শুনিলেন, শেষে পথে যাহাকে দেখেন তাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন 'কোথা থেকে এলে? কি দেখ্‌লে, সিজার ক্যাপিটলে গিয়াছেন কি না।' প্রতি কথায় সন্দেহ, প্রতি কথায় ভয়! শেষে যেন তিনি অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন, তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, শরীর অবশ হইয়া পড়িল; তখন আরও কষ্টে বলিলেন :——

—Ah me! how weak a thing
The heart of woman is!——

কথাটা বড় যন্ত্রণায় বলা হইয়াছে। রমণীহৃদয়ের কোমলতা, দুর্ব্বলতার বেশ পরিচয় পাইতেছেন; তবু ব্রুটাসের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন 'ব্রুটাস! ঈশ্বর তোমার গৃহীত কার্য্যে কৃতকার্য্য করুন,' এই বলিয়াই যেন এদিক ওদিক তাকাইলেন—বুঝি কেহ শুনিল, অমনি ঢাকিয়া ফেলিলেন 'Brutus hasa suit, that Cæsar will not grant' লোকের চক্ষে ধূলা দিলেন, কিন্তু এদিকে শরীর অবশ হইতেছে। বড় যন্ত্রণা— 'Oh I grow faint.' লুসিয়াসকে বলিয়া দিলেন, 'যাও, আমার কথা প্রভুকে বল, বলিও আমি বেশ স্ফূর্ত্তিতে আছি, শীঘ্র ফিরে এসে আমায় খবর দিও।' কারণ তাঁহার শরীর খারাপ শুনিলে যদি ব্রুটাসের কাজ সিদ্ধ না হয়! এদিকে নিজে কিন্তু মরিতে বসিয়াছেন। ধন্যা সতী তুমি!

ইহার পর আর আমরা পোর্সিয়াকে দেখি নাই। শেষে ৪র্থ অঙ্কের ২য় রঙ্গে ব্রুটাসের মুখে শুনিতে পাই যে, পোর্সিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ব্রুটাসের অদর্শন-জনিত কষ্ট এবং এণ্টনি ও অক্টেভিয়াস্ ক্রমেই বলবান্ হইতেছে শুনিয়া আরও উৎকণ্ঠিতা হওয়ায় পোর্সিয়ার মর্ম্মগ্রন্থি ছিঁড়িয়া গেল, তিনি জলন্ত অঙ্গার গলাধঃকরণ করিয়া মরিয়া গেলেন।

প্লুটার্ক একথা সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। সতী স্বামীর জন্য, স্বামীর মৃত্যু বা কষ্ট দেখিবেন না বলিয়া স্বজীবন কি ভীষণ ভাবে বলিদান দিলেন! প্লুটার্কে আর একটি প্রেমনিদর্শন আছে, সেক্সপিয়ার তাহা খাটাইতে সুবিধা পান নাই,—যখন ব্রুটাস ও পোর্সিয়া ইলাইর সমুদ্রতীরে উভয়কে কার্য্যানুরোধে বিচ্ছিন্ন হইতে হয় তখন পোর্সিয়া নিজ দুঃখ গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, এমন সময় একখানি চিত্রে তাঁহার সে বালির বাঁধের ন্যায় চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিল। কি চিত্র? সে চিত্রে বীরবর হেক্টর নিজ শিশুপুত্রকে এণ্ড্রোমেকির কোলে দিয়া ট্রয়যুদ্ধে যাইবার জন্য বিদায় চাহিতেছেন, এবং প্রিয়তমা কেমন করিয়া হেক্টরের দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া আছেন,—সেই চিত্র দেখিয়া পোর্সিয়া ভাবিলেন ঠিক তাঁহারও এ অবস্থা, অমনি হুহু করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অশ্রু জলে বুক ভাসিয়া গেল। পরেও অনেক সময় সেখানে আসিয়া সেই ছবি খানি দেখিতেন ও কাঁদিতেন। এ ঘটনার উপর আর কিছু বলিবার নাই!

পোর্সিয়া অমর লোকে চলিয়া গেলেন! স্বামীর সহিত সর্ব্ব বিষয়ে এক হইতে তিনি চাহিয়াছিলেন, সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদের সঙ্গিনী হইতে চাহিয়াছিলেন, অন্তরের গুহ্য ভাব পর্য্যন্ত অংশ করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন, সে জন্য নিজ শরীরকে কষ্ট দিতে ক্রুটী করেন নাই—তাহা তিনি লইয়াছিলেন এবং সে বিষয় স্বকর্ত্তব্য আজীবন পালন করিয়াছেন—নিজ প্রাণ দিয়াও তিনি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন, এজন্যই আমি তাঁহার প্রশংসা করি। তাঁহার মৃত্যু বীরত্বের পরিচায়ক নহে, দুর্ব্বলতা, রমণীহৃদয়ের ভাব প্রধানতার পরিচায়ক! যে আশাবন্ধন 'সদ্যপাতি প্রণয়িহৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি' তাহা তাঁহার ঘুচিয়াছিল। তিনি যে দর্প করিয়াছিলেন তাহার ফল হইল—মৃত্যু! যদিও দর্প রক্ষা করিলেন কিন্তু প্রাণ দিতে হইল।

Prof. Dowden পোর্সিয়ার চরিত্রসমালোচনায় তাঁহাকে লেডি পার্সির সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, পার্সি সাধ্বী স্ত্রী ছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার পাগলা স্বামী হেন্‌রির (৪র্থ) উপর তাঁহার নিজের জোর খাটিতে পারে বলিয়া তাঁহার নিজেরই বড় বিশ্বাস ছিল না। সুতরাং হেন্‌রির নিকট তিনি জোর করিয়া তাঁহার গুপ্তকথা বাহির করিতে পারেন নাই। কিন্তু পোর্সিয়ার সে জোর ছিল, সে সামর্থ্য ছিল। তার পর পোর্সিয়া ব্রুটাসের গুপ্তকথা জানিয়া শেষে যে ফল ভোগ করিয়াছিলেন, যে আন্তরিক কষ্ট পাইয়াছিলেন—স্বীয় রমণীসুলভ কোমলতা ও দুর্ব্বলতার সামর্থ্য কতদূর তাহা বুঝিয়াছিলেন। এ বিষয়ে Dowden ঠিক কথাই বলিয়াছেন। যদি পোর্সিয়ার এত উচ্চ আশা না হইত, স্বামীর প্রত্যেক কার্য্যে যদি তিনি সমাংশভাগিনী না হইতে চাহিতেন তবে তিনি মরিতেন না। কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। প্রাণতুল্য স্বামীর কষ্টে তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়াছিল, তাই তিনি প্রাণদান করিয়াও তাহা পালন করিলেন। পোর্সিয়া ও ব্রুটাসের দাম্পত্যপ্রেম সম্বন্ধে Dowden মুক্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন 'এরূপ উচ্চ প্রেমের ছবি আর সেক্সপিয়ারের কোন নাটকে নাই।"

বাস্তবিক প্রাণে প্রাণে এক হইয়া গেলে আর প্রেমালাপ, আলিঙ্গন, চুম্বনাদির দ্বারা প্রেম প্রকাশ করিতে হয় না, প্রতি কথাই তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়। পোর্সিয়া হিন্দুনারীর মতই ছিলেন—আদর্শ রমণী সকলেই একরূপ।

ধন্য মহাকবি সেক্সপিয়ার, ধন্য তোমার ক্ষমতা! তুমি সামান্য কথায় যে ছবি আঁকিয়াছ, সকলে তাহা খুলিয়া বুঝাইবার জন্য কত কথাই ব্যয় করিতেছে, তবু যেন বোধ হয় সব বুঝি বলা হইল না, কিছু বুঝি থাকিয়া গেল।

আমরা অনেকক্ষণ পাঠকগণকে বিরক্ত করিয়াছি, যথাসাধ্য সংক্ষেপে পোর্সিয়াচরিত্রের উৎকর্ষ দেখাইয়া বিদায় হইলাম। যদি দোষ থাকে, সে আমার, তাহার কৈফিয়ৎ স্বক্ষমতার অভাব,—তবে এ দুঃসাহস কেন? কালিদাসের কথায় বলিব "মনোরথানাং অগতি র্নবিদ্যতে।"

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

---

# নর বানর।

বানরগণকে এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য অনুসারে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা গেল। দীর্ঘবাহু ও হ্রস্ববাহু। যাহাদিগের বাহুর দৈর্ঘ্য পায়ের নলার দৈর্ঘ্য হইতে অধিক তাহাদিগকে দীর্ঘবাহু, ও যাহাদিগের তদ্বিপরীত তাহাদিগকে হ্রস্ববাহু বলা যায়। এই দুই শ্রেণীর বানর ও নরগণের কতিপয় লক্ষণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। সুধী পাঠকগণ ঐ সকল লক্ষণের পরস্পর ঐক্য ও অনৈক্যস্থল বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিবেন।

(১) হ্রস্ববাহু প্রায়শঃ সলাঙ্গুল, চতুষ্পদ (অর্থাৎ কথনই দণ্ডায়মান হয়না); পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অপর অঙ্গুলির সহিত অসমান্তরালভাবে স্থাপিত, প্রাপ্তবয়স্কদিগের সম্মুখ-দন্তচতুষ্টয় অপেক্ষা তীক্ষ্ণাগ্রদন্ত দীর্ঘতর। ...(১) বানর।

(২) দীর্ঘবাহু; লাঙ্গুল-হীন, কথন চতুষ্পদ, কথন দ্বিপদ; পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রথম শ্রেণীবৎ; সম্মুখ-দন্ত ও তীক্ষ্ণাগ্রদন্ত প্রথম শ্রেণীবৎ। ... (২) বানর।

(৩) হ্রস্ববাহু; লাঙ্গুল-হীন; দ্বিপদ; পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অপর অঙ্গুলির সহিত সমান্তরালভাবে স্থাপিত; সম্মুখ-দন্তচতুষ্টয় অপেক্ষা তীক্ষ্ণাগ্রদন্তদ্বয় দীর্ঘতর নহে। ... ... (৩) নর।

এক্ষণে, দ্রষ্টব্য এই যে, যে শ্রেণীর বানর চতুষ্পদ তাহারা হ্রস্ববাহু ও অসমান্তরাল পদাঙ্গুষ্ঠ-যুক্ত, তাহারাই সলাঙ্গুল, এবং যে বানর দীর্ঘবাহু সে কখন চতুষ্পদ কখন দ্বিপদ, পদাঙ্গুষ্ঠ পূর্ব্ব শ্রেণীবৎ; ইহারা লাঙ্গুল হীন। অবশেষে নরগণ দ্বিপদ ও হ্রস্ববাহু, পদাঙ্গুষ্ঠ সমান্তরাল, ইহারাও লাঙ্গুল-হীন।

বানর অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীস্থ পশুগণও সময় সময় দণ্ডায়মান হইবার চেষ্টা করে, ও দ্বিপদের ন্যায় অত্যল্পস্থান কায়ক্লেশে যাইতে পারে। ব্যাঘ্র ও ভল্লুক এই শ্রেণীস্থ। উল্লিখিত প্রথম শ্রেণীস্থ বানরগণ যখন ক্রমে দণ্ডায়মান হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, তখন ঐ চেষ্টার দীর্ঘকালব্যাপী পরিণামে উল্লিখিত দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ বানরাকৃতি হইল. ইহা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই প্রতীয়মান হইবে। কারণ চতুষ্পদ অবস্থায় হ্রস্ববাহু দেখা যায়, কিন্তু যখন ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইলা ক্রমে দণ্ডায়মান হইতে শিক্ষা করিয়া কখনও দ্বিপদ হইতেছে, তখন শরীরের ভারকেন্দ্র স্থির রাখিবার জন্য দীর্ঘবাহুর প্রয়োজন। উত্তম রূপে পায়ের উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতে না পারিলে দুই হস্ত দ্বারা শরীরের দুই দিকে মৃত্তিকা স্পর্শ করতঃ দুই হস্তে শরীর রক্ষা করা আবশ্যক হয়। সুতরাং এই শ্রেণী দীর্ঘবাহু হয়, এবং ইহাদিগের বাহু এত দীর্ঘ যে ইহারা দণ্ডায়মান হইলে বস্তুতঃই হস্ত ভূমিস্পর্শ করিয়া থাকে। অবশেষে যখন সম্যক্ রূপে দ্বিপদ ভাবে দণ্ডায়মান হওয়া অভ্যস্ত হয়, তখনই উল্লিখিত তৃতীয় শ্রেণীস্থ জীবভাবাপন্ন হয়, অর্থাৎ তখন আর হস্তের আশ্রয় লওয়া নিষ্প্রয়োজন হওয়ায় দীর্ঘ বাহু অনাবশ্যক হয়। সুতরাং নরগণ দ্বিপদ ও হ্রস্ববাহু। প্রথম শ্রেণী চতুষ্পদ সুতরাং হ্রস্ববাহু; দ্বিতীয় শ্রেণী কখন কখন দ্বিপদ সুতরাং দীর্ঘবাহু; তৃতীয় শ্রেণী সর্ব্বথা দ্বিপদ সুতরাং পুনরায় হ্রস্ববাহু। এস্থলে ইহা বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য যে, যে অঙ্গ যে পরিমাণে পরিচালিত হয় তাহা তদনুরূপে পরিপুষ্ট হইয়া থাকে; এবং যে অঙ্গ অনাবশ্যকতাপ্রযুক্ত নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে, তাহা ক্রমে খর্ব্বতা ও অবশেষে লোপ প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই চতুষ্পদ অবস্থায় দীর্ঘ বাহু নিষ্প্রয়োজন থাকায় প্রথম শ্রেণী হ্রস্ববাহু; এবং তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ নরগণ সম্যক্ রূপে দ্বিপদ হওয়াতেও দীর্ঘ বাহু অনাবশ্যক, সুতরাং দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ দীর্ঘ বাহু পুনরায় হ্রস্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কেবল ইহাদিগের মধ্যবর্ত্তী দ্বিতীয় শ্রেণী সুচারুরূপে পায়ের উপর দাঁড়াইতে

অক্ষম এজন্য দেহভার রক্ষার অন্য উপায় আবশ্যক হওয়াতেই এই শ্রেণী দীর্ঘবাহু হইয়াছে। এই অক্ষমতা বশতঃই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অসমান্তরাল। কারণ ঐ অবস্থায় পদ দ্বারা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত পরিমাণ স্থান অধিকার করা যায়, সুতরাং দাঁড়াইবার পক্ষে একটু সহজ হয়। পরে ঐ অক্ষমতা দূরীভূত হইয়া দণ্ডায়মান হওয়া অভ্যস্ত হইলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অসমান্তরাল থাকা অনাবশ্যক হয়। সুতরাং উহা নরগণ-মধ্যে সমান্তরাল ভাবাপন্ন হইয়াছে।

এক্ষণে লাঙ্গুল সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে গেলে প্রথমেই দেখা যাইবে যে, চতুষ্পদ অবস্থায় অগ্রপদদ্বয় (অর্থাৎ হস্তদ্বয়) অন্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় লাঙ্গুলের আবশ্যকতা অধিকতর হয়। কীটপতঙ্গাদি হইতে আত্মরক্ষা, বৃক্ষ-শাখাবলম্বন, ইত্যাদি নানা বিধ কার্য্যে লাঙ্গুল তৎকালে প্রয়োজনীয়। কিন্তু ক্রমে দ্বিপদ অবস্থা যে পরিমাণে অভ্যস্ত হইয়া আইসে, অগ্র পদদ্বয় মুক্ত হওয়ায় ঐ সকল কার্য্য সেই পরিমাণে তদ্দ্বারা সংসাধিত হয়। তখন লাঙ্গুল সেই পরিমাণে ক্রিয়া-হীন হয়। পূর্ব্বকথিত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তখন হইতে লাঙ্গুল খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইতে থাকে। এবং কালে লোপ হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে জীবগণ পরিশেষে লাঙ্গুল-হীন হইয়া যায়। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন দীর্ঘকালসাপেক্ষ। এই কারণে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী-মধ্যে বানরগণের নানাবিধ দীর্ঘতা ও খর্ব্বতাবিশিষ্ট লাঙ্গুল দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, অবশেষে দ্বিতীয় শ্রেণীতে লাঙ্গুল একেবারে লোপ হয়। সর্ব্বশেষে তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ নরগণ সর্ব্বথা দ্বিপদ ভাবাপন্ন হওয়ায় হস্তদ্বয়ের বহুল ব্যবহার দেখা যায়; ও লাঙ্গুল একেবারেই অনাবশ্যক হয়।

এইরূপে প্রথম হইতে তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত জীবগণ কাল ক্রমে সর্ব্বথা দ্বিপদ হইয়াছে ও তৎসহকারে শরীরেরও নানাবিধ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। চতুষ্পদ-অবস্থা হইতে সম্যক্‌রূপে দ্বিপদ অবস্থায় আসিতে হইলে মস্তকের ও মস্তিষ্কের ক্রমপরিবর্ত্তন অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী হয়। তজ্জন্য বুদ্ধিবৃত্তি ও ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা অনায়াসেই প্রতীয়মান হইবে।

অতএব, শুভক্ষণে দ্বিপদ অবস্থায় দণ্ডায়মান হইবার কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা হইতেই নানাবিধ শারীরিক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে, ও অবশেষে মনুষ্য মনুষ্যপদবীতে শুভাগত হইয়াছে।

শ্রীশশধর রায়।

# বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি।

## ( রাজসাহী )

এবারকার কনফারেন্সে, আরও দশটী বিষয়ের মধ্যে, কিরূপে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি হইতে পারে তাহাও একটী আলোচ্য বিষয় ছিল। বঙ্গের অবস্থা ক্রমে যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে দেশের আয়বৃদ্ধির নব নব উপায় উদ্ভাবিত না হইলে, নাতিদূর ভবিষ্যতে, দুর্ভিক্ষে ও অন্নকষ্টে, বঙ্গভূমি শ্মশানস্থলীর আকারে পরিণত হইবে এইরূপ অনেকে আশঙ্কা করিয়া থাকেন। বঙ্গের কৃষিক্ষেত্রের উর্ব্বরা-শক্তির কিরূপে বৃদ্ধি হইতে পারে, বঙ্গের কৃষিক্ষেত্রে কি কি নূতন আবাদ করিলে তাহা লাভজনক হইতে পারে, দেশীয় শিল্প পুনরায় কিরূপে দেশের লোকের চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়া এবং বিদেশীয় শিল্পের সমকক্ষতা লাভ করিয়া দেশে ধনাগমের পন্থা স্বরূপ হয়, এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং এই জন্যই কনফারেন্সে এবিষয়ের বিশেষ আলোচনা এবং ঐ আলোচনায় যাহা স্থির হয় তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া সাধারণকে তদ্‌বিষয়ে শিক্ষিত করা ও ঐ কার্য্যে ক্রমে উৎসাহিত করিবার জন্য প্রত্যেক জেলার ধনী উৎসাহী সভ্যদের মূলধন দ্বারা তাহাদিগকে সাহায্য করা কনফারেন্সের একটী প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে। এই জন্য কনফারেন্সকে ক্রমে একটী কার্য্যকরী সভা ( working body ) করিয়া তোলা আবশ্যক। মহামতি লর্ড রিপণ ১৮৮২ সালে কোন বক্তৃতা উপলক্ষে এ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন যাহা আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। কথা কয়টী এই :—

"No one who considers the economic condition of India can doubt that one of its greatest evils is to be found in the fact that the great mass of the people of the country are dependent almost exclusively upon the *cultivatives of the soil.* This circumstance tends at one and the same *time* to depress the position of the cultivators to aggravate the evils of famine and also *to lower wages generally. I therefore* always *hail,* with great *interest everything which is calculated to* employ new sources of

employment for the people and to develope those which already exist" অর্থাৎ "ভারতের অধিকাংশ অধিবাসী কৃষিজীবী, এবং এই কারণে ভারতের কৃষকদের অবস্থা এত খারাপ, ভারতের শ্রমজীবীদের বেতন এত কম এবং মাঝে মাঝে ভারতে দুর্ভিক্ষ ও অন্নকষ্টের এরূপ প্রভাব। ভারতের আয়ের জন্য যে কোন নূতন পন্থা উদ্ভাবিত হয় তাহা আমি অতি আদরের সহিত অনুমোদন করি" দেশের আয়ের জন্য এবং দেশের উন্নতির জন্য দেশীয় শিল্পের উন্নতিও একান্ত আবশ্যক, এ সম্বন্ধেও লর্ড রিপণ এক স্থানে বলিয়াছেন "The best art has always been truly national, the out-come of the religion, the history and the civilization of each race." সেই জন্য বলিতেছি এ সম্বন্ধে কনফারেন্সের বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। অন্যান্য কি কি রাজনৈতিক বিষয় এবারকার কনফারেন্সে আলোচিত হইয়াছিল ও কোথা হইতে কত ডেলিগেট আসিয়াছিল তৎসম্বন্ধে এ প্রবন্ধে বলিবার কিছু নাই।

আমরা এ পর্য্যন্ত কেবল কনফারেন্সের রাজনৈতিক উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু উহার দ্বারা অনেক সামাজিক উন্নতিও আশা করা যায়। কংগ্রেসে সামাজিক উন্নতির জন্য একটী সামাজিক বিভাগ করা হইয়াছে এবং তাহাতে শিক্ষিত সভ্যদের মধ্যেও অনেক বাগবিতণ্ডা ও কলহের কারণ হইয়াছে। এই জন্য প্রাদেশিক সমিতিতে পৃথক্ ভাবে ঐরূপ সামাজিক বিভাগ করা হয় নাই। কিন্তু মুখ্য ভাবে না হইলেও গৌণ ভাবে যে এই সমিতি দ্বারা অনেক সামাজিক উন্নতির পথ পরিষ্কার হইতেছে ইহা কে অস্বীকার করিবে।

দেশমধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন জাগাইয়া রাখাও যখন কনফারেন্সের একটী প্রধান উদ্দেশ্য তখন আমি কিছু দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এ প্রবন্ধের আলোচনা করিলাম জন্য আশা করি পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

শ্রীভবানীগোবিন্দ চৌধুরী।

# কবিতাকুঞ্জ।

## যৌবনের ইতিহাস।

আর ত পারিনে।
শৈশবের ছেলে খেলা,
তাই নিয়ে সারা বেলা,
চেয়ে থাকা নয়নে নয়নে।

শত অনুগ্রহ দিয়ে
খেলা-ঘর বড় করা,—
আর ত লাগে না ভাল—
ছাই পাশে ঘর ভরা।

বড় সাধ ভুলে যাই
শৈশবের হাসি গান;
বড় সাধ মুছে ফেলি
অনুগ্রহ উপাখ্যান।

আমি—ক্ষুদ্র কীট—আর
অনন্ত মহান্—স্বামী।
কি যে বিড়ম্বনা ইহা।
কি ক'রে জানাব আমি?

দরশে'—মিটেনা তৃষা—
সে সৌন্দর্য্য উগরে অনল!
পরশের সাধ—ক্ষুদ্র কীট।
লাজে ভয়ে একান্ত বিহ্বল।

শৈশবের ইতিহাস
হ'ক মোর যেমন তেমন।
যৌবনের প্রতি ছত্রে—
তাও সখে! লিখিলে "ক্রন্দন"।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

## কেমনে বলিব?

কেমনে বুঝাব সখি! সে প্রেম কেমন?
দেখেছ কি কোন দিন, সাগরে হইতে লীন,
তটিনীর অতি ক্ষীণ বক্ষ-সঞ্চালন;
নীল গগনের বুকে, আশার অতীত সুখে
নিমেষ-বিহীন চোখে তারার শয়ন;
ঘন জলধর কোলে, আপনি আপনা ভুলে,
চকিত কিরণজালে দামিনীস্ফুরণ,
বিপুল রবির করে, ফুটে উঠে হর্ষভরে
নলিনীর ধীরে ধীরে কাতর নয়ন?—
—এরা সখি! বুঝাবার, সে প্রেম তো নাহি আর
এমন কথা'র ভার, ভাষার বাঁধন।
সে যে শুধু অনুভূতি—অলস অবশ গতি
অধরের পাশে অতি বিবশ চুম্বন।
আমার এ প্রেম সখি, একান্ত স্বপন।
কেমনে বলিব হায়, সে প্রেম কেমন?

## যমুনা-বক্ষে।

১

ঘোর অন্ধকার, কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী নিশি,
বিজলী চমকে মেঘে,
বারি-ধারা বহে বেগে,
জল স্থল একাকার সে তিমিরে মিশি।
সন্ সন্ বায়ু বহে,
প্রলয় বারতা কহে,
কোন স্থানে জনপ্রাণী নাহি দেয় সাড়া
কাল পূর্ণ ভাবি কাল,
কড় কড় কি ভয়াল
বাজাইছে বিশ্বব্যাপী মরণের কাড়া!
বিজলীর মালা গলে,
মেঘের হুঙ্কার ছলে,
মহারুদ্র শুনাইছে প্রলয়ের সিঙ্গা;
এ নিশীথে, গিরি উচ্চ
তরঙ্গ করিয়া তুচ্ছ,
যমুনায় কে দিল গো ভাসাইয়া ডিঙ্গা।

২

শ্রাবণের বারি-ধার
দেখা নাহি যায় পার,
ভরা নদী টল টল, বন্যা কানে কান,

তীব্র মরণের তৃষা,—
ভীম ঝঞ্ঝা, অমানিশা
গণ্য করিয়া তরী চলিল উজান।
তরঙ্গের প্রতিঘায়,
ডুবে গেল গেল যায়,
উঠে ডোবে, ডোবে উঠে, ত্রস্ত মাঝি দাঁড়ী,
হরি নাম করি সার,
সাবধানে কর্ণধার,
যামিনীর শেষ যামে জমাইল পাড়ি।

৩

মলিন বসন ছিন্ন,
নিষ্প্রভ নয়ন খিন্ন,
ভগ্নদেহ পরিব্যাপ্ত ঘন কালিমায়,
মরণ তীর্থের যাত্রী,—
জীবনের শেষ রাত্রি
বিদায়ের অভিসারে আসিয়াছে হায়!
রুগ্ন শিশু শু'য়ে বুকে,
চা'হিয়া মায়ের মুখে,
"দেমা দেমা" ব'লে কেঁদে শুধায় অধীর,
শ্বাস-কষ্ট ভুলি মাতা,
বলে "হায়, হা বিধাতা,"
গড়াইল দুই বিন্দু নয়নের নীর।

৪

পিতা যে এল না তার,
ফিরে এল কর্ণধার,
বলে 'মাগো, দেখা বুঝি হ'ল না ক আর',
'একবার চল' ব'লে,
লুটিলাম পদ তলে,
লাথি মেরে দূর ক'রে আঁটিল দুয়ার।
ললাটে সিন্দুর পরি,
শিশুরে চাপিয়ে ধরি,
চুম্বন করিয়া মুখ অঞ্চলে মুছায়,
যুক্ত করি দুই হাত,
করে উর্দ্ধে প্রণিপাত;
ফুরাল অজপা; মাঝি করে হায় হায়!

শ্রীরজনীকান্ত সেন।

(কালিদাস হইতে)

১

## কুসুম-কোমলা পাষাণী।

সুন্দরি! নয়ন তব চারু ইন্দীবরে
নিরমিলা বিধি, মুখ অমল কমলে;
গঠিত অধর তব নধর পল্লবে,
কুন্দে দন্ত, অঙ্গ স্বর্ণ চম্পকের দলে।
কিন্তু নিদারুণ বিধি কেন কহ, ধনি!
কঠিন উপলে হিয়া গঠিল, না জানি।

২

## বিরহিনীর প্রতিহিংসা।

আইলা মধুযামিনী, কিন্তু প্রাণেশ্বর
কেন না আইলা আজি কহ লো সজনি?
যদি না আসেন প্রভু, নিশ্চয় আমার
দহিবে এ প্রাণ, হায়! বিরহ-রজনী।
মরি তবে, ব্যাধ হ'য়ে জন্মিব ভবে,
বধিতে বসন্ত-সখা দুরন্ত কোকিলে,
হর-নেত্রানলরূপে দুষ্ট মনোভবে
ভস্মরাশি পরিণত করিব লো ছলে।
রাহু হ'যে গরাসিব, সখি! সুধাকরে;
কাম হ'যে ফুলশরে জর্জ্জরিব তারে।

শ্রীমনোমোহন কর গুপ্ত।

## দয়া।

[ভূমধ্য সাগরস্থিত মাল্টা দ্বীপে দয়ার এক শ্বেত প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি আছে। জননী সন্তানকে স্তন্য পান করাইতেছেন। উক্ত মূর্ত্তি দর্শনে লিখিত।]

কে তুমি গো স্নেহময়ি, কা'পর প্রভায়
করিয়াছ দীপ্ত দশ দিশি,
পূর্ণ চন্দ্র সমুদয়ে রজত ছটায়
হাসে যেন পূর্ণিমার নিশি।

একি দেখি অনুপম, বিরলে বসিয়া
সাদরে সন্তানে রাখি বুকে
পীযূষ পিয়াও কিবা যতনে ধরিয়া
অমৃতের রেখা দেখি মুখে।

করুণ নয়ন দুটী বিস্ফারিত করি
কুমারের বদন কমলে,
কি দেখিছ অনিমেষে আপনা পাসরি,
আঁখি যে গো ভরে এলো জলে।

শান্তির বিমল ছবি বদনে প্রকাশ
শিশুমুখে প্রতিভা তাহার
দয়া, প্রেম, পবিত্রতা, চরণে নিবাস
শান্তিময় হেরি চারিধার।

চিনিয়াছি, দয়াময়ি সন্তানবৎসলে,
কৈলাস-শিখরে তব ধাম,
করুণার পারাবার, জানে ভূমণ্ডলে
জগত জননী তব নাম।

জীবনের উৎস, মাগো, উঠে তোমা হ'তে
জীবগণে কর তুমি দান,
সুখ, শান্তি, জীবনের উপায় জগতে
আর কত কে জানে সন্ধান।—

হীনবুদ্ধি, ভক্তি নাই তাই ভাবি মনে
কেমনে হেথায় তুমি এ'লে
সাগরের পর পারে বিজাতি ভবনে
মায়ের চরণ কিগো মেলে।

বুঝি দেবি, ধরণীর কল্যাণ-কারণ
অবতীর্ণ অবনী-মাঝারে
সর্ব্বলোকে সম দয়া করিছ জ্ঞাপন
প্রেমসিন্ধু ভুবন বিস্তারে।

প্রকট স্বরূপ মাগো ভকতে আপন
দেশ কাল ভেদ কিছু নাই,
স্বর্গ মর্ত্ত একাকার চরণে তোমার
বর্ত্তমান আছ সব ঠাঁই॥

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

## পাষাণী।

১

এত কোরে পায়ে ধরে সাধি তোরে অবিরল,
পাষাণি! এ সাধনার প্রতিদান কোথা বল্?
প্রবল পিয়াস ক্ষুধা,
কোথা শান্তি, কোথা সুধা,
কোথা সে প্রণয়ভরা আঁখি তোর ছল্ ছল্?
এখন শিখেছ বুঝি প্রণয়ের যত ছল!

২

সজল নয়নে প্রেম উছলি' পড়িল বলে,
আপনি সোহাগ ভরে প্রেম-ফাঁস দিনু গলে!
আমি যেন ভাগ্য হত,
জল বাষ্পে পরিণত।
সংসার মরুভূ মাঝে জল-আশে ছুটে গিয়া,
এক বিন্দু অশ্রুতেও নাহি জুড়াইল হিয়া!

৩

নাগিনী, বাঘিনী হলে তারাও গলিত হায়!
দিত প্রেমে আলিঙ্গন আমার এ সাধনায়;
তা' হতেও অনুমান,
কঠিন তোমার প্রাণ,
বারিবিন্দু দেখা দিয়ে শুকালো নয়ন-কোণে;
ভুলে গেলে ভাল হয়—তাই ভাবিতেছি মনে।

৪

আহা! এত দিন যদি বিভু-পদ নিরবধি
ভাবিতাম, তবিতাম তাহা হ'লে প্রেম নদী!
সে সুখ-শান্তির মাঝে
হেরিতাম বিশ্ব-রাজে,
তা' হলে পাষাণি! আর জ্বলিত না এ অন্তর;
সুরবালা-সুসেবিত হইতাম নিরন্তর।

শ্রীহরিসাধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

## নিরাশ হৃদয়।

আকাশে তারা উঠে,
বাগানে ফুল ফুটে,
পবনে বাস ছুটে
—সুখের ঢেউ;
প্রেমের আঁখি-তরে
সে সব উঠে পড়ে,
এ মরু হিয়া-তরে
নহে ত কেউ।

# ছোট কথা।

একটু গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে, আমাদের থাকিবার মধ্যে আছে অভিমান। এই অভিমান ষোল আনা আছে বলিলেও হয়, আঠার আনা আছে বলিলেও হয়। ইহা আমাদিগকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, আমাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে দিতেছে না; আমাদের সমস্ত অভাবকে সদ্ভাবের আবরণে সজ্জিত করিয়া দেখাইতেছে।

এই অভিমান দ্বিবিধ, সামগ্রীগত ও কল্পনাগত। কেহ অভিমানের সামগ্রী আছে বলিয়া গর্ব্বিত, কেহ কল্পনার পটে অভিমানের সামগ্রী মনোহর বেশে রঞ্জিত করিয়া অভিমানে অন্ধ। উভয়বিধ অভিমানই অনিষ্টকর, ও সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। তবে শেষোক্ত অভিমান দ্বারা জগতের যত অনিষ্ট সংসাধিত হইতেছে, পূর্ব্বোক্ত অভিমান দ্বারা তত অনিষ্ট হইতেছে না।

অভিমান দ্বারা মানুষের অসারতা যতদূর সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় এমন আর কিছু দ্বারা হইতে পারে না। বাস্তবিক অভিমান প্রকৃতই পৈশাচিক। তবে পনর আনা লোকের অভিমান আছে বলিয়া ইহার বিভৎসাকৃতি লোকের সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না। বস্তুতঃ মানুষের স্বভাব এতদূর বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে যে, যাহা অস্বভাব তাহাই স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। যেমন 'স্বার্থ' শব্দ আত্মার প্রকৃত মঙ্গলসাধক না বুঝাইয়া অনিষ্টকর জিনিষই বুঝাইয়া থাকে ও স্বার্থপর বলিয়া গালি দেওয়া হইয়া থাকে, সেইরূপ বিকৃত অভিমান অস্বাভাবিক হইলেও তাহা আজকাল স্বভাবগত ও মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। বড় বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য সকলেরই বিজাতীয় আগ্রহ। যাহার কিছুই নাই সেও নিঃস্ব বলিয়া নূতন লোকের নিকট পরিচিত হইতে রাজি হয় না। আমি ছোট, আমি ক্ষুদ্র প্রাণান্তেও একথা কেহ স্বীকার করিতে চায় না। ফলতঃ যাহার কিছু নাই শুদ্ধ কেবল গলার স্বর-টি মাত্র মিষ্ট তাহার মিষ্ট স্বরের উপরই অভিমানের ভিত্তি স্থাপিত হইয়া থাকে। যাহার সকলই অভাব কেবল আকৃতিটি সুন্দর তাহার সুন্দর আকৃতির দ্বারাই তাহার অভিমান ষোল আনা পরিপুষ্ট

হইয়া থাকে। এই জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ লেখক হামমিস্ বলিয়াছেন যে, যখন দুই ব্যক্তির কথোপকথন হয় তখন লোকে দেখে দুই ব্যক্তি কথোপকথন করিতেছে কিন্তু বাস্তবিক ছয় ব্যক্তির কথোপকথন চলিযা থাকে। মনে করা যাউক রাম আব যদু কথোপকথনে প্রবৃত্ত। রাম এককই তিন জন, ১। প্রকৃত রাম, সৃষ্টিকর্তার চক্ষে যেরূপে উদ্ভাসিত। ২। রাম অভিমানে অন্ধ হইয়া নিজকে যেরূপ চিত্রিত করে। ৩। যদু নিজের অভিমান জন্য রামকে যে ভাবে দেখিয়া থাকে। এইরূপ যদুও যে এককই তিন জন, এ কথা বাহুল্য। শুদ্ধ অভিমানের জন্য এক এক ব্যক্তি তিন জন রূপে দণ্ডায়মান। কিন্তু অভিমানের অভাবে এতটা বৈলক্ষণ্য ঘটিত না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে অভিমানের ন্যায় আমাদের অসারতাপরিচায়ক আর কিছু নাই। মানুষের যে উচ্চ অধিকার তাহা যে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে তাহার অভিমান হওয়া দূরে থাকুক সে তাহার অসারতার উপলব্ধি করিয়া নিতান্তই অনুতপ্ত হইবে। কারণ প্রকৃত মনুষ্যত্ব অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়, অধিকাংশ লোকই অসারতাপূর্ণ।

পরন্তু এ কথাও বলা হইয়াছে যে, অভিমান আমাদের অভাবকে ঢাকিয়া রাখে। ফলতঃ অভাবের প্রতি অন্ধ হওয়া যার পর নাই অনিষ্টকর। অভাব-বোধই সংঘটনের প্রধান উপায়। অভাবের অনুভূতি ব্যতিরেকে কার্য্যক্ষেত্রে উৎসাহের সহিত কোন মনুষ্য অবতরণ করে না। এই বিষয়ে আমার প্রকৃত অভাব আছে এইরূপ হৃদ্‌বোধই সেই অভাব দূর করিবার জন্য ব্যাকুলতা জন্মায়। অভাব-বোধই উন্নতিপথের নেতা। যখন যে জাতি উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়াছে, অভাবের-তীব্র কসাঘাতে উত্তেজিত হইয়াই ঐরূপ উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে। যাহারা ধর্ম্মপথের পান্থ তাহারা যদি "আমরা সকলই জানি,আমাদের মন পবিত্র,হৃদয় উন্নত" এই রূপ সংস্কার লইয়া ধর্ম্মশিক্ষার সোপানে পদার্পণ করে, তাহা হইলে তাহারা ধর্ম্মপথে কিরূপ উন্নতি লাভ করিবে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। শ্রেষ্ঠ প্রাণী বলিয়া আমাদের অভিমান আছে সত্য, কিন্তু যাহাদিগকে আমরা ইতর প্রাণী বলিয়া উপেক্ষা করি তাহারা কি আমাদের নেতা নহে? যাহারা 'গেস্ ফেবল' নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাহারা জানেন যে, একজন

প্রগাঢ় জ্ঞানী মনুষ্য স্বভাবের অনুকরণ দ্বারা পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ফলতঃ মধুমক্ষিকার মধুক্রম, বাবুয়ের কুলায় শিল্প-নৈপুণ্যের চূড়ান্ত দৃষ্টান্তস্থল। পিপীলিকার পরিশ্রমশীলতা, কপোতের দাম্পত্য-প্রেম কাহারও অবিদিত নাই। সুতরাং ইতর প্রাণিপুঞ্জ যে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে আমাদের উপদেষ্টা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা অভিমানে অন্ধ হইয়া আমাদের সহস্র সহস্র অভাব থাকিতেও মনে করি আমাদের কোন অভাব নাই। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু আমাদের করতলস্থ, আমাদের সুবিধার জন্য সৃষ্ট, আমরা ইহজগতের রাজা, সকলই আমাদের নিকট নতশির; আমাদের উপদেষ্টা হইতে পারে এমন আর কে আছে? যাহাদের পূর্ব্ব পুরুষ বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী ছিল, তাহারা কি বর্ত্তমান অভাবের তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করেন না? যাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের সদাব্রত ছিল তাহারা কি বর্ত্তমান অন্নকষ্ট জনিত জঠরঅগ্নি দ্বারা দগ্ধীভূত হন না?

যদি আমাদের অভাব উল্লেখ করিয়া আমাদের প্রতি কেহ দোষারোপ করে, তাহা হইলে আমরা তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি? রোগের নির্ণয় না হইলে তাহার প্রতিকার অসম্ভব। আমার অভাব কি নির্ণীত না হইলে তাহার প্রতিবিধানও অসম্ভব, কিন্তু নিজ নিজ অভাব সম্বন্ধে মানুষ অন্ধ। সত্যই একজন অতি প্রধান কবি বলিয়াছেন, যে, প্রত্যেক মানুষের দুইটা করিয়া থলি আছে, একটী সম্মুখে, দ্বিতীয়টি পশ্চাতে। অপরের দোষ সে যত কিছু দেখিতে পায় তাহা সমস্তই সম্মুখস্থ থলিতে রাখিয়া দেয় কিন্তু নিজের দোষ সমস্তই পশ্চাতের থলিতে নিহিত করে। সত্যই মানুষ অভিমানে স্ফীত হইয়া নিজের দোষ দেখিতে পায় না ও ইচ্ছা করিয়াই তৎপ্রতি নিতান্ত উদাসীন থাকে। যে উপকারজনক কার্য্য আমাদের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না, তাহা যদি অপরের দ্বারা সম্পাদিত হয় তাহা হইলে সেই ব্যক্তির প্রতি আমাদের নিতান্তই কৃতজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু তাহা কখনও হই না বরং আমাদের অভাব বা দোষের বিষয় কেহ উল্লেখ করিলে আমাদের অভিমানের প্রতি আঘাত পড়ে ও আমাদের আপাদমস্তক ক্রোধে কম্পিত হইয়া উঠে। আমরা মনে ভাবি আমাদের ন্যায় ব্যক্তির অভাব বা দোষ কিছুই হইতে পারে না, যাহারা বলে আমাদের অভাব বা দোষ আছে হয়ত তাহাদের

বুঝিবার শক্তি নাই অথবা তাহারা ঈর্ষাপরবশ হইয়া এরূপ বলিয়া থাকে।

যাহারা কর্ম্ম ও উন্নতির জন্য ব্যাকুল তাহাদের পক্ষে বর্ত্তমান কালই যথা-সর্ব্বস্ব। বর্ত্তমান আমাদের কার্য্যক্ষেত্র, ভূতকালের উপর আমাদের কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই; কারণ ভূতকাল আর ফিরিয়া আসিবে না। ভবিষ্যতের প্রতিও আমাদের হাত নাই—যে পর্য্যন্ত সেই ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে পরিণত না হয়। ভূত-কাল চলিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু ভূতকালের দুষ্কৃতির কুফল আমাদের হস্তচ্যুত হয় নাই, তাহা মুষ্টির ভিতরেই আছে। ভূতকালের দুশ্চরিত্রতার জন্য যে সকল বিষময় ফল বর্ত্তমানে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহার যথোপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। কেন না ঐ সমস্ত দুশ্চরিত্রতা ভবিষ্যতে আরও কুফল প্রসব করিতে পারে। ভূতকালের যদি কিছু সৎকার্য্য থাকে তাহার সুফলও বর্ত্তমানে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই গুলিকে সদ্ব্যবহার দ্বারা বর্দ্ধিত করা উচিত। ইহা ভবিষ্যৎ-কল্যাণের বীজস্বরূপ হইয়া থাকে। ভূতকালের ভাল মন্দ দুইই ভোগ করিতে হয় কারণ ভূতকালই এক সময়ে বর্ত্তমানের আকারে আমাদের কার্য্যক্ষেত্রস্বরূপ উপস্থিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে আমরা সুকৃতি করিতে বাধ্য; যদি সুকৃতি না করি তজ্জন্য আমরা দায়ী। অতএব বর্ত্তমানের সুকৃতির ফল সেই বর্ত্তমান ভূত হইলেও পাওয়া যায়। ভূতকালীন দুষ্কৃতির ফলভোগ করিতে হয় বলিয়া তাহা আমাদের চিন্তার বিষয়। এবং এইরূপ চিন্তাই ঐরূপ দুষ্কৃতির হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায়। সুতরাং ঐরূপ চিন্তা আবশ্যক ও প্রশংসনীয়। কিন্তু নিতান্ত অলস ও কাপুরুষ হইলে বর্ত্তমান অধঃপতনাবস্থা পূর্ব্ব পুরুষগণের সুকৃতি দ্বারা মার্জ্জনীয় বলিয়া কেহ মনে করে না। এখন দেখা যাউক আমরা এ সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবহার করি-তেছি। আমরা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চেষ্ট, উন্নতির চিন্তা আমাদের কিছু মাত্র নাই। পূর্ব্ব পুরুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন এই ভাবিয়া আমাদের আহ্লাদ আর ধরে না। পূর্ব্বপুরুষ বড় লোক ছিলেন আমাদের সাথআর পায় কে? এতদূর আমাদের অধঃপতন হইয়াছে যে, জাতিগণনায় আমাদের নাম মাত্র উল্লেখ হই-বার আশা নাই অথচ আমরা এতই নির্লজ্জ যে তজ্জন্য কিছুমাত্র লজ্জিত বা ব্যথিত হইতেছি না। বরং আমাদের আস্ফালনে মেদিনী কম্পিত। সুতরাং আমাদের দুর্দ্দশার অপনয়ন হইবে এরূপ আশা কিছু মাত্র নাই বলিলেই হয়। আমাদের অপেক্ষা যাহারা আজ কাল খুব উন্নত, যাহাদের অনুকরণ দ্বারা আমরা উন্নতির

পথে অগ্রসর হইতে পারি, তাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করিতেছি। আমরা দেখিতেছি তাহারা সহস্র সহস্র ক্রোশ দূর হইতে আসিয়া নির্ব্বিবাদে আমাদের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। অনেক বিষয়ে তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করিয়া পারা যায় না. সুতরাং নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত বলিয়া থাকি "তাহারা শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ হইলে কি হইবে তাহারা 'ম্লেচ্ছ।" এরূপ কথার কোন অর্থ আছে কিনা জানি না। আমার বিশ্বাস শুদ্ধ অভিমান পরবশ হইয়া আমরা নিজকে আর্য্যসন্তান বলিয়া গৌরব করি, অথচ যাহারা আমাদের চেয়ে শতগুণে শ্রেষ্ঠ তাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিবার জন্য পথ করিয়া লই। ইহা কি আমাদের নিকৃষ্টতাজনিত মানসিক ক্ষোভাপনয়নের নিষ্ফল প্রয়াস নহে?

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আমাদের অভিমানই সর্ব্বনাশের হেতু। এই অভিমানবশতঃ আমরা সম্মান পাইবার জন্য ব্যাকুল। এই ব্যাকুলতার দৌড় এতদূর গড়াইয়াছে যে, কোন ২ সম্প্রদায় অন্যান্য সম্প্রদায় হইতে ঈশ্বরোচিত সম্মান আদায় করিতে প্রয়াসী। সম্মানের জন্য সকলেই লোলুপ কিন্তু কেহই মনে ভাবেন না যে সম্মান চাহিলেই পাওয়া যায় না। সম্মানের জন্য উপযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। সম্মানোপযোগী হইতে হইলে পবিত্রতা চাই, বিদ্যা বুদ্ধি চাই, এ সকল কঠোর যত্ন ও পরিশ্রমের ফল। কিন্তু আমরা এতদূর অলস ও অকর্ম্মণ্য যে আমরা চেষ্টা করিয়া কিছুই অর্জ্জন করিতে সমর্থ নই। সুতরাং সম্মানপ্রয়াসী হইয়া পূর্ব্ব পুরুষের দোহাই দিয়া ও তাহাদের সম্মানের দলিল লইয়া উপস্থিত হই। আমরা ভাবি না যে ধনীর সন্তান নির্দ্ধন হইলে ধনীর সন্তান ছিল বলিয়া কেহ তাহাকে ধনী বলে না; সেইরূপ উচ্চ সাধকের সন্তান সাধন-বিহীন হইয়া সাধকজনোচিত সম্মান আশা করিতে পারে না। সম্মানের অনুপযুক্ত হইয়া সম্মান খুজিতে গেলে সম্মান লাভের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা আর সংগৃহীত হইতে পারে না।

ভারতবাসিগণ অযথা সম্মানপ্রয়াসী হওয়ার জন্য আর একটি ভয়ানক পাপ সমাজকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিতেছে। আমরা স্বকীয় উন্নতির দ্বারা সম্মানপ্রার্থী হইতেছি না, অপরের অধঃপতন দ্বারা আমাদের গৌরব বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা পাইতেছি। আমি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর আর যাহারা আছে

তাহারা নীচ, ক্ষুদ্র, অস্পৃশ্য ইত্যাদি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছি। সুতরাং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষানল ক্রমেই পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। যে গৃহ এত বিদ্বেষাগ্নিতে দগ্ধীভূত তাহাতে কোথাও কি কখন শান্তি থাকিতে পারে? ভারত আজ গৃহবিচ্ছেদে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে। ভারত সন্তানগণ, আপনাদের দুরবস্থা চক্ষু মেলিয়া দেখ। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট আমাদের সংস্কারের জন্য এত চেষ্টা ও যত্ন করিতেছেন, আর আমরা নিজে কি নীরব ও নিশ্চেষ্ট থাকিব? আমাদের যে সমস্ত সামাজিক অভাব রহিয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়ত তাহার প্রতিবিধানার্থ বদ্ধপরিকর হইয়া সমবেত চেষ্টায় নিযুক্ত হই।

## মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

**সাহিত্য।** আশ্বিন। এই সংখ্যায় দুইটি কবিতা, একটি চিত্র, দুইটি গল্প, দুইটি বৈজ্ঞানিক ও একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ এবং সহযোগী সাহিত্য, গান ও মাসিক সাহিত্য সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রাবরণে প্রকাশ যে ইহার মধ্যে দুইটি প্রবন্ধ সচিত্র, কিন্তু পত্রিকা-মধ্যে একটি ভিন্ন দুইটি প্রবন্ধে চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় নাই। কবিতা দুইটি সুলিখিত, "আগন্তুক" কবিতাটি পরিহাসরসিক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখনীপ্রসূত। "রাণী ভবানীর" ঐতিহাসিক চিত্র পঞ্চম পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। 'ধূমকেতু' এবং "নাক্ষত্রিক সংঘর্ষণ" শীর্ষক প্রবন্ধ দুইটি লেখকগণের বিদ্যাবত্তার পরিচয়স্থল।

**ভারতী।** আশ্বিন। শ্রীমতী হিরন্ময়ী দেবী "আগমনী" শীর্ষক কবিতা লিখিয়া আশ্বিনের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায় "জামাই জাঙ্গাল" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা গল্প কি ইতিহাস ঠিক বুঝিতে পারা গেল না। অক্ষয় বাবুর মীর কাসিমের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হইয়াছে; তাহাতে মীরজাফরের মুকুটমোচন পর্য্যন্ত আলোচিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "দীপান্বিতা" একটি পল্লীচিত্র, তাহাতে "ডাকের গহনা" হইতে "ঢাকের বাজনা" পর্য্যন্ত "দীপা-

ম্বিতাব" সকল চিত্রই ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং "নদীতট প্রত্যাবৃত্ত ঢাকীরা বিভিন্ন দলে বিচ্ছিন্ন হইয়া আলোকহীন, উৎসবশূন্য গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন পথে বিসর্জ্জনের বাজনা বাজাইয়া একটি আনন্দময় অতীত উৎসবের কাহিনী ঘোষণা" করিবার সময়ে প্রবন্ধটি সমাপ্ত হইয়াছে। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর 'কাহাকে" এত দিনে বিংশ পরিচ্ছেদে পরিসমাপ্ত হইল। গ্রন্থশেষে গ্রন্থকর্ত্রী পাঠকের উপর মীমাংসার ভার রাখিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "কাহাকে ভালবাসিতে ভাল বাসিয়াছি কাহাকে ?" প্রশ্নটি যেরূপ সহজ মীমাংসা সেরূপ সহজ নহে বলিয়াই বোধ হয় উপন্যাস খানির নাম হইয়াছে—"কাহাকে ?" শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "সূর্য্য" শীর্ষক প্রবন্ধ বহু তত্ত্বকথায় পূর্ণ।

নব্যভারত। ভাদ্র ও আশ্বিন। পঞ্চদশটি প্রবন্ধের মধ্যে অধিকাংশই অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্বকথায় পূর্ণ। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ, বি-এল "রাজ-তরঙ্গিনী" প্রবন্ধে অনেক তত্ত্বানুসন্ধানের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম-এর "এক শৃঙ্গ ও" বিলক্ষণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। শ্রীগোপালচন্দ্র শাস্ত্রী এম-এ বঙ্গসাহিত্যে "খৃষ্ট ও তাঁহার ধর্ম্ম" সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিয়া প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের সমালোচনা করিতেছেন। সম্পাদক "দীনজননী মহারাণী স্বর্ণময়ী" শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহদাত্রীর স্মৃতিসমাদর রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীমনোমোহন সেন গুপ্ত "বল ও ব্যায়াম" লইয়া আলোচনা করিতেছেন, এরূপ বিষয়ের আলোচনা সময়োচিত হইয়াছে।

দাসী। সেপ্টেম্বর। দেখিয়া সুখী হইলাম শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর দাসীতে "অজ্ঞেয়বাদ" সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতেছেন। দাসীর বর্ত্তমান সংখ্যা অনেক গুলি সুখপাঠ্য প্রবন্ধে পরিপূর্ণ, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের "মেঘনাধ বধ কাব্যের চতুর্থ সর্গের সমালোচনা" পাঠ করিলে সকলেই আনন্দ অনুভব করিবেন।

পূর্ণিমা। কার্ত্তিক। শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার, শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম-এ, শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল ও শ্রীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায় এই সংখ্যায় চারিটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সকল গুলিই অল্পাধিক পরিমাণে হিন্দু-তত্ত্বের আলোচনাপূর্ণ।

বামাবোধিনী পত্রিকা। আশ্বিন। বামাবোধিনী এবার একুশটি বিবিধ প্রবন্ধে পরিপূর্ণ হইয়াছে, তন্মধ্যে বামারচনা, সাময়িক প্রসঙ্গ, পাকা পেয়ারার মোরব্বা হইতে পুস্তকাদি সমালোচনা পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর প্রবন্ধই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।

# সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

**বিপত্নীক।** শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত।

এই উপন্যাস খানি বর্ত্তমান শতাব্দীর সুশিক্ষিত বঙ্গবাসীর সুখ-দুঃখময় সরল কাহিনী বলিয়া সহজেই চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিয়াছে। ভাষা খুব সরল, লিপিকৌশলও সুন্দর; সুতরাং বক্তব্য বিষয় সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ছাপা ও বহিরাবরণ এত সুন্দর যে পুস্তক খানি হাতে পড়িলেই পড়িতে ইচ্ছা যায়। ইহা বঙ্গীয় মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতিসূচক ও গৌরবের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। হেমেন্দ্রপ্রসাদ সুকবি, সুলেখক এবং সুনিপুণ চরিত্র-চিত্রাঙ্কণে পারদর্শী। তাঁহার প্রথম উদ্যমেই যখন এমন সুন্দর উপন্যাস রচিত হইয়াছে তখন আশা আছে কালে তাঁহার অমৃতময়ী লেখনী বঙ্গভাষায় অনেক অমৃত বর্ষণ করিবে।

**রোগিপরিচর্য্যা।** ডাক্তার আর, জি, কর প্রণীত 'রোগিপরিচর্য্যা" পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বড় সুখী হইয়াছি। বাস্তবিক এই প্রকারের একখানি পুস্তকের আমাদের দেশে বড়ই প্রয়োজন ছিল। রোগিপরিচর্য্যা সে অভাব অনেক পরিমাণে পূরণ করিয়াছে। মল মূত্র পরীক্ষার ভার দাইয়ের হস্তে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কঠিন, কারণ এ অতি গুরুতর কার্য্য। ইহার সপক্ষে চিকিৎসকের স্বয়ং পরীক্ষার ভার লওয়াই কর্ত্তব্য, ধাত্রীর প্রতি ভার দেওয়া বা তাহার কথার প্রতি নির্ভর করিয়া কার্য্য করা আমাদের মতে ভাল বোধ হয় না। তবে পরিমাণ ও রং এই সামান্য সামান্য বিষয়ের ভারার্পণ করা যাইতে পারে মাত্র। মাসাজ্ বা অঙ্গমার্জ্জনের অধ্যায়টা কিছু দুর্ব্বোধ হইয়াছে। যে প্রকারের রোগী পরিচারিকাদিগের জন্য এই গ্রন্থখানি বিশেষ ব্যবহার্য্য তাঁহারা বোধ হয় ইহার অনেক স্থানেই বুঝিতে পারিবেন না। বিষয়টা আর একটু সরল ভাষায় সোজা করিয়া লিখিতে পারিলে ভাল। চতুর্থ, ষষ্ঠ, নবম ও দশম অধ্যায় কয়টি বড়ই সুন্দর হইয়াছে এবং ঠিক আমাদের দেশে যে প্রকারের অভাব তাহা মোচনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইয়াছে। আমরা আশা করি "রোগিপরিচর্য্যা" প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে একখানি করিয়া থাকিবে। ব্যবসায়ী রোগিপরিচারিকাদিগের ইহা অতি মূল্যবান্ রত্ন হইয়াছে।

# অজ্ঞেয়-বাদ।

( সমালোচনা )

## চতুর্থ অধ্যায়—আদি-কারণ কিং স্বরূপ ?

(২)

——oo——

বাহ্যজগতেব দিকে চাহিযা দেখ, সহজেই বুঝিতে পারিবে যে এই জগতে যাহা কিছু আছে সকলই যখন আদিকাবণজাত তখন ইহাব বিচিত্র কৌশলেব মূলে-ও সেই 'আদিকাবণ'। প্রাচীন মানবসমাজ প্রাকৃতিক বিবিধ কার্য্যের মূল অনুসন্ধান কবিতে গিযা সন্তানেব জন্মোৎসবেব এক দেবতা ও মৃত্যুশোকের অন্য দেবতা মানিযা লইতেন। জগৎ যেমন অনন্ত বৈচিত্র্যময়, প্রাচীন মানবসমাজও সেইরূপ অনন্ত দেবতাবাদী হইযাছিলেন। অবশ্য ইহা অজ্ঞান, অবশ্য ইহা কুসংস্কাব। কিন্তু কেবল ধর্ম্ম কেন, প্রাচীন বিজ্ঞানশাস্ত্র উদ্ঘাটন কব, তুল্যরূপ কুসংস্কাব ও অজ্ঞান বর্ত্তমান দেখিতে পাইবে। প্রাচীন ধর্ম্ম-সমাজেব ন্যায প্রাচীন বৈজ্ঞানিক সমাজেবও এইরূপ ধাবণা ছিল যে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যেব মূল—ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তাব ইচ্ছা। এক অদ্বিতীয় দেবতাব ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ও নিয়ম হইতে পারে বলিয়া ধর্ম্মসমাজ যেমন অনুভব কবিতে পাবিতেন না, বিজ্ঞানও সেইরূপ এক অদ্বিতীয় মহাশক্তির বিবিধ ক্রম ও নিযম হইতে বিচিত্র জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি হইতে পাবে বলিয়া বুঝিতেন না। ইহা কেবল কথাব কথামাত্র নহে—প্রাচীন বিজ্ঞানশাস্ত্রে দেখ, পঞ্চাশৎ বৎসব পূর্ব্বে বিজ্ঞানবিদ্দিগের গ্রন্থ পাঠ কর, তাঁহাবা জগতেব ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ভিন্ন ভিন্ন নিযম মাত্রই বিশ্বাস করিতেন তাহা নহে, সেই বিশ্বাস অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তত্ত্বালোচনা করিতেন। [illegible]য় জগৎকে এক শক্তির কার্য্য বলিয়া একত্র বুঝিবাব চেষ্টা পর্য্যন্ত ছিল [illegible] ধর্ম্মমতের ক্রমোন্নতিতে বহুদেববাদ খণ্ডিত হইয়া কালে যেমন একে-[illegible]রবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, সেইরূপ বহুশক্তিবাদ অন্তর্হিত হইয়া তাহার স্থানে [illegible]কশক্তিবাদ প্রচার করিবার জন্য বর্ত্তমান উন্নত বিজ্ঞান আয়োজন করি-

তেছেন। কেবল এক শক্তিবাদ কেন, এক নিয়মবাদ পর্য্যন্তও বিজ্ঞানের লক্ষ্য হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং বাহ্যজগতের শক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিয়া বিজ্ঞান এখন নিঃসন্দেহে বলিতেছেন "সেই আদিকারণ সকল বস্তুরই আদিকারণ, সর্ব্বত্রই এক শক্তি এবং সম্ভবতঃ এক অদ্বিতীয় নিয়ম প্রতিষ্ঠিত।" এখন আমরা বুঝিতেছি যে, যে শক্তির উপর নির্ভর করিয়া অত্যুন্নত মন্দির-চূড়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে তাহারই বলে তাহা কালে ভূমিসাৎ হইবে—প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু যাহা হইতে জন্মিয়া যাহাতে জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছে, কালে আবার তাহাতেই বিলয়প্রাপ্ত হইতেছে। মানবের সাপেক্ষিক জ্ঞান লইয়া বর্ত্তমান বিজ্ঞান এই সত্যতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন এবং ইহাই বর্ত্তমান পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রধানতম জয়োল্লাস। এই মহাসত্য অস্বীকার করিতে পার না, কেন না বিজ্ঞান ইহার শিক্ষক। ইহার সঙ্গে অতি পুরাতন উপনিষদের একটি উপদেশ মিলাইয়া দেখ, সে কালের সঙ্গে এ কালের এক সূত্রে বন্ধন দেখিতে পাইবে। শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন 'ব্রহ্ম' কি? তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মবিদ্ গুরু বলিতেছেন,—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,
যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি,
তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম॥"

যাঁহা হইতে ভূত সকল জন্ম গ্রহণ করিবা যাঁহাতে স্থিতি লাভ করিতেছে আবার প্রয়াণ কালে যাঁহাতে প্রবেশ করিবে তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়া সেই বস্তুর অন্বেষণ কর—ইহা মহাবাক্য। ধর্ম্মই বক্তা হউন আর বিজ্ঞানই বক্তা হউন, ইহা সত্য। যাহা সত্য কথা তাহার লক্ষণ এই যে ব্যক্তি বিশেষ, জাতি বিশেষ, বর্ণ বিশেষ পুস্তক বিশেষের উপর তাহার সত্যতা নির্ভর করে না। ২ আর ২ চারি হয় ইহা একজন ধার্ম্মিক জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদীর কাছে না শিখিয়া পাপাসক্ত মিথ্যাবাদী কোন শিক্ষকের কাছেও যদি শিখিয়া থাক তথাপি উহা সত্য।

বাহ্যজগতের মূলে যে আদিশক্তি বিজ্ঞান প্রদর্শন করিতেছেন তাহা চেতন না অচেতন? অজ্ঞেয়বাদী বলিবেন—তাহা জানিতে পারা অসম্ভব।

সুতরাং প্রশ্নটী একটু ফিরাইয়া ঘুরাইয়া জিজ্ঞাসা কর—বাহ্যজগতে কোন চৈতন্যের চিহ্ন দেখিতেছ কি না? যদি থাকে তবে সেই চৈতন্য কোথা হইতে আসিল? বিজ্ঞান দর্শনশীল। সুতরাং এই বাহ্যজগতে যে চৈতন্য বর্ত্তমান তাহা অস্বীকার করেন না। এই চৈতন্যের আদিকারণ কি পৃথক্? অজ্ঞেয়বাদী বলেন—না, জগতের সকল বস্তুরই সকল বিষয়েরই এক অনন্ত অদ্বিতীয় আদিকারণ। সুতরাং বহির্জগতে যে চৈতন্যের বহিঃপ্রকাশ মাত্র, আদিকারণই তাহার মূল। জড় হইতে শক্তি, অচেতন হইতে চৈতন্য আসিতে পারে না ইহা বিজ্ঞানের সার সিদ্ধান্ত। অতএব জগতের আদিকারণ যে 'চৈতন্যময়' তাহা বুঝিতে অসুবিধা কি? যে জ্ঞানে তাঁহাকে আদিকারণ বলিয়া বুঝিতেছ সেই জ্ঞানই চৈতন্যময় বলিয়া প্রমাণ দিতেছে না কি? বিজ্ঞান জগতের মূলে যে চৈতন্য দেখিয়া, অজ্ঞেয়বাদিগণ যাহাকে আদিকারণের স্বরূপ বলিয়া অস্বীকার করিতে অক্ষম হইয়া অবনত মস্তকে স্বীকার করেন যে জগতের চৈতন্যের মূলেও তিনিই চৈতন্যময়; ধর্ম্ম সেই কথাই বহুদিন হইতে পৃথিবীর নরনারীকে বুঝাইয়া আসিতেছে।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।"

শত পরিবর্ত্তনময় জড়জগতের মূলে যে আদিশক্তি বিরাজ করিতেছে তাহা কি অন্ধশক্তি? নাস্তিক তাহাকে অন্ধশক্তি বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন, সন্দেহবাদী "হাঁ না" দুই কথাই সম্ভব বলিয়া স্বীকার করেন, অজ্ঞেয়বাদী বলেন যে আমাদের সে শক্তি যে কিংস্বরূপ তাহা—অজ্ঞেয়। ইহার একটু বিস্তৃত আলোচনা করা আবশ্যক। বাহিরে যে পরিদৃশ্যমান জগৎ, বিজ্ঞান বলিতেছেন তাহা জ্ঞান-চৈতন্যহীন জড়পদার্থের সমষ্টি মাত্র, দর্শন প্রমাণ করিতেছেন যে তাহার মধ্যে জ্ঞান ও চৈতন্য নাই। সুতরাং জড়জগতে যদি জ্ঞান ও চৈতন্যের আভাস দেখিতে পাও তাহা যে আদিকারণেরই স্বরূপ তাহাতে সন্দেহ থাকিবে না। এখন একটি একটি করিয়া এই শক্তিতত্ত্ব সমালোচনা কর।

সৃষ্টির আদিতে যে শিলাখণ্ড যেখানে যেমন ভাবে পড়িয়াছিল, বাহির হইতে কোন শক্তি আসিয়া যদি সেই শিলাখণ্ডকে স্থানান্তরিত না করে,

তবে তাহা যে আবহমান কাল সেই খানে সেইরূপ ভাবেই পড়িয়া থাকিবে ইহাই গণিতবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত। সুতরাং আপন ইচ্ছামত একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার, এক অবস্থা হইতে অন্য রূপান্তর লাভ করিবার অথবা এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা ও শক্তি পর্য্যন্তও যে জড়পদার্থের মধ্যে নাই তাহা সত্য। কিন্তু তথাপি এই জড় জগতে ক্ষুদ্র বৃহৎ পদার্থনিচয় একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতেছে, একরূপ হইতে অন্য রূপান্তর প্রাপ্ত হইতেছে, এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্ব বিবর্ত্তন করিতেছে, ইহাও প্রত্যক্ষ সত্য। পৃথিবী জড় পরমাণুর সমষ্টি মাত্র, কিন্তু স্বয়ং ইচ্ছা ও শক্তিহীন হইলেও নিত্য পার্শ্ববিবর্ত্তন করিতে করিতে সংবৎসরে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতেছে। পৃথিবীর জড়ীয় বস্তু সকল অল্পাধিক পরিমাণে রূপান্তরিত হইতেছে;—কখন বাষ্প., কখন মেঘ, কখন জল, কখন তুষার; কখন পদদলিত বালুকাকণা, কখন মরুভূমির বালুকাস্তূপ, কখন বা কঠিন পাষাণ; কখন সতেজ ফলবান বৃক্ষ, কখন শুষ্ককাষ্ঠ কখন বা ভূগর্ভশায়িত অঙ্গারস্তূপ মাত্র—এইরূপ সহস্র রূপান্তর জড়জগতের সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। জড়ের স্বতন্ত্র শক্তি নাই, কিন্তু এ সকল শক্তির কার্য্য কেমন করিয়া সম্পন্ন হইতেছে? আস্তিকগণ পুস্তক উদ্ঘাটন করিয়া শাস্ত্রবাক্য বাছিয়া বাহির করিবার পূর্ব্বেই অজ্ঞেয়বাদী বলিবেন এ সকল আদি-কারণের বিচিত্র শক্তি মাত্র। যাঁহারা জগৎরহস্য সুজ্ঞেয় বলেন বলিয়া হার্বার্ট উপহাস করিয়াছেন তাঁহারা সকলে এক বাক্যে এই শক্তিতত্ত্বের একটি মাত্র উত্তর কিম্বা আদৌ কোন উত্তর দিতেই পারিবেন কি না সন্দেহ; কিন্তু যিনি বলেন সকলি অজ্ঞেয় তিনিই সর্ব্বাগ্রে এই রহস্যের প্রত্যুত্তর দিবেন—এ এক নূতন রহস্য নয় কি? এই শক্তি জগতের আদিতেও যেমন বর্ত্তমান ছিল অদ্যাও সেইরূপ রহিয়াছে। এই শক্তি মানুষের প্রতি লোমকূপেও যেমন কার্য্য করিতেছে, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কলেবরেও সেইরূপ কার্য্য করিতেছে। আদিকারণের এই মহাশক্তি অনাদি অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী।

জড়জগতের মধ্যে যে মহা শক্তির কার্য্য চলিতেছে, জড়বস্তু কি ইচ্ছা করিয়া তাহা সম্পন্ন করিতেছে? সূর্য্য যে প্রতিদিন প্রাতে সমুদিত হইয়া সায়ংকালে অস্ত গমন করিতেছে, চন্দ্রকলা যে কখন পূর্ণ কখন শূন্যতা লাভ করিতেছে,

জল যে ক্রমাগত নিম্নাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, এই সকল কার্য্যের মধ্যে জড়বস্তুর কোন ইচ্ছা থাকিতে পারে না। এই সকল যদি ইচ্ছাসম্ভূত কার্য্য বলিয়া স্বীকার কর, সে ইচ্ছা যে সেই মহাশক্তিরই মহতী ইচ্ছা তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। এখন আলোচনা করিয়া দেখ জড়বস্তু সকল যে যে কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, তাহা কোন নিয়মাধীন কি না? আমি যদি চিরদিনই তোমাকে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিতে দেখি, মধ্যাহ্নে গৃহসেবা করিতে দেখি, সায়ংকালে অধ্যয়ন করিতে দেখি এবং রজনীতে বিশ্রাম করিতে দেখি, তাহা হইলে কি বলিব না যে ঐরূপ কার্য্য সম্পাদন করা তোমার নিয়ম? অবশ্য তুমিও স্বীকার করিবে যে এইরূপ করিয়াই গণিত-বিজ্ঞান জড়জগতের সমুদায় নিয়মতত্ত্ব নিরূপণ করিয়া সেই নিয়মের উপর নির্ভর করতঃ শত শত জ্ঞান-কৌশলপূর্ণ যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতেছেন! এ নিয়মের কি কোন নিয়ামক নাই? তোমার ক্ষুদ্র নিয়মের নিয়ামক তুমি, কিন্তু এই অসীম নিয়মের কি অনন্ত নিয়ামক সেই আদিকারণ নহেন? যদি বল না— ভাবিয়া দেখ ইহা অপেক্ষা গুরুতর অসঙ্গতি দোষ হইতে পারে না। যাহাকে একমুখে অনন্ত বলিতেছ তাহাকেই আবার সঙ্কুচিত করিতেছ কি না? জড়ের নিয়ম পালনের দায়িত্ব আছে, কিন্তু নিয়ম সৃষ্টি করার ক্ষমতা নাই। জড়ের সমুদায় গুণই আদিকারণের গুণ! এই সুগভীর তত্ত্বকথা সরল ভাবে বুঝাইবার জন্য আস্তিকগণ সচরাচর যে কোন একটী শিল্পজাত যন্ত্রের সহিত জগতকে তুলনায় আলোচনা করিয়া থাকেন। মনে কর একটী ক্ষুদ্র ঘটিকাযন্ত্র সময় নিরূপণ করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মাস তিথি বার দেখাইয়া দিতেছে, অবশ্য ঘটিকা এই কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, ইহা তাহার জীবনের নিয়ম বটে, কিন্তু ইহার যেমন নিয়ামক নির্ম্মাতা, সেইরূপ আদিকারণই জগতের বিচিত্র নিয়মের নিয়ামক নহেন কি?

আদিকারণের স্বরূপ তত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্যবস্তুতত্ত্ব আলোচনা করা আবশ্যক হয়। একজন মানুষের স্বরূপতত্ত্ব বুঝিতে হইলে যেমন তাহার আকৃতি মাত্রই যথেষ্ট নহে; কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করাও আবশ্যক, সেইরূপ আদিকারণের স্বরূপালোচনা করিতে হইলেও অস্তিত্বমাত্রই যথেষ্ট নহে, জগতের বস্তুতত্ত্ব আলোচনা করিতে হয়। মানব-

জ্ঞান সাপেক্ষিক বলিয়া এইরূপ বিচারপ্রণালী অবলম্বন করা ভিন্ন আর অন্য পথ নাই। আমরা এই পথ অবলম্বন করিয়াই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

বাহ্যজগতের আদিকারণ সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া অজ্ঞেয়বাদী মানিয়া থাকেন, সুতরাং ঐরূপ মানিবার যে যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে, তাহা অধিক বিস্তৃতরূপে দেখাইবার প্রয়োজন নাই, ধর্ম্ম সেই আদিকারণকে ইচ্ছাময় বলেন, অজ্ঞেয়বাদীর তাহাতে ঘোর আপত্তি—সুতরাং জগৎকারণকে ইচ্ছাময় বলিবার ধর্ম্মের পক্ষে যুক্তি কি তাহারই বিচার সর্ব্বপ্রথমে করা যাউক। কিন্তু এই বিচার করিবার পূর্ব্বে "ইচ্ছা" শব্দের অর্থ কি, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। আমরা যথাসাধ্য ধর্ম্মবিরোধী দার্শনিকগণের প্রদত্ত অর্থ একত্র সংগৃহীত করিয়া তাহার ভিন্ন ভিন্ন অর্থের সারসিদ্ধান্ত যাহা সেইটী অবলম্বন করিয়া বিচার করিব। ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেমন নানা মুনির নানা মত চিরপ্রসিদ্ধ, এই "ইচ্ছা" শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়াও নানা দার্শনিক নানা অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু সমুদায় বিরোধী মতের অন্তরালে যে সারসিদ্ধান্ত লুক্কায়িত আছে, তাহাই আমরা গ্রহণ করিতে বাধ্য।

একদল দার্শনিক বলেন যে 'ইচ্ছা' আর কিছুই নহে মানসিক বিচারণা বিশেষ। কার্য্য করিবার পূর্ব্বে "এই রূপই করি কি ঐরূপ করি?"—এ প্রকার বিতর্ক জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে, আমরা সেই উভয় পথের একটি বর্জ্জন ও একটি গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকি। এই বর্জ্জন ও গ্রহণ করিবার সময়ে যে বিচারণা করিতে হয় তাহারই নাম 'ইচ্ছা'। আর একদল আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া বলেন যে মনে একটি উদ্দেশ্য রাখিয়া তদনুসারে জ্ঞাতসারে সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থ কার্য্য করিবার প্রবৃত্তির নাম ইচ্ছা। এই উভয় দলের দার্শনিকদিগের মতের সারসিদ্ধান্ত এই যে, ইচ্ছা জ্ঞান ও কর্ম্মাত্মক অর্থাৎ জ্ঞানে উৎপত্তি কর্ম্মে প্রকাশ সুতরাং ইহাদের মতে জ্ঞান কর্ম্ম ও ইচ্ছা অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংবদ্ধ। যেখানে জ্ঞান নাই সেখানে ইচ্ছা নাই, যেখানে কর্ম্ম নাই সেখানেও ইচ্ছা নাই। তৃতীয় এক শ্রেণীর দার্শনিক বলেন ইচ্ছার সঙ্গে কার্য্যের সংস্রব নাই। কর্ম্ম হউক আর না হউক এইটি গ্রহণীয়, এইটি বর্জ্জনীয়, এইরূপ বিচারণাই ইচ্ছা। ইহা তর্কপ্রণালী হইতে জন্মগ্রহণ করে ও সেই তর্কপ্রণালী বা

বিচারণা ও ইচ্ছা একই কথা। আর একদল দার্শনিক বলেন ইচ্ছা ব্যতীত কোন কার্য্যই যখন হইতে পারে না, যখন সকল কার্য্যই অন্যরূপ হইতে পারা সত্বেও তাহা না হইয়া যাহা যেরূপ আছে সেইরূপ হইয়াছে তখন সকল বস্তুর মূল প্রস্রবণের নামই ইচ্ছা। আর একদল বলেন সকল বস্তুর মূলেই যখন শক্তি বর্ত্তমান তখন ইচ্ছা ও শক্তি একই কথা। এই সকল বিভিন্ন দার্শনিক ব্যাখ্যা হইতে এই সার সিদ্ধান্ত লাভ করা যাইতেছে যে, যে ভাবে যাহা আছে তাহা অন্যরূপ না হইয়া যাহার জন্য "এইরূপ" হইয়াছে তাহারই নাম ইচ্ছা। কেহ ইহাকে কর্ম্ম, কেহ জ্ঞান, কেহ বিচারণা, কেহ আদি কারণ, কেহ বা শক্তি বলিতেছেন এইমাত্র প্রভেদ। সুতরাং এই পরিদৃশ্যমান জগতের মূলে যে ইচ্ছা বর্ত্তমান আছে তাহা নিঃসংশয়; অতএব আদিকারণকে ইচ্ছাময় বলাই যুক্তিসঙ্গত।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

---

# ইংরেজের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা।

---

শীতপ্রধান দেশে প্রবল শীতের সময় তরু, লতাপাতা সমস্তই মৃতপ্রায় হইয়া থাকে, গাছে একটী ফুলও ফোটে না, একটী পাতাও থাকে না। গাছগুলি জ্বালানি কাষ্ঠের ন্যায় পড়িয়া থাকে। একে প্রবল শীত তাহাতে চতুর্দ্দিকে কেবল শুষ্ক দৃশ্য, চক্ষু যতদূর যায় একটী তরু বা একটী লতা দেখিবার উপায় নাই, এরূপ অবস্থায় মানবের মন স্বতঃই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিকে আকৃষ্ট হয়; প্রাকৃতিক দৃশ্যের অভাবজনিত কষ্ট পূর্ণ মাত্রায় অনুভব করে। এই জন্যই ইংরেজেরা গৃহের মধ্যে, বহিরঙ্গণে চতুর্দ্দিকেই সবুজ, হরিৎ প্রভৃতি নানা বর্ণের লতাপাতা রাখিয়া বাহিরের শুষ্কদৃশ্য প্রাণে যাহাতে অনুভূত না হয় তজ্জন্য চেষ্টা করে। যে কারণেই হউক ইংরেজ জাতির হৃদয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগ এক্ষণে অনুরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে যে আহার ও পানীয়ের ন্যায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে না পাইলেতাহারা বিশেষ অশান্তি ভোগ করে, একেবারে আকুল হইয়া

উঠে। ছোট ও বড় ধনী ও নির্ধন সকলের হৃদয়েই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে বাস করিবার এই প্রবল অনুরাগ সমান ভাবে বিদ্যমান; এই জন্যই ইংরেজের কি রাজহর্ম্ম কি পর্ণকুটীর উভয়ই নানা বিধ ফুল, ফল ও তরুলতায় সমান ভাবে সুশোভিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ব্যতীত ইংরেজ জাতি তিলার্দ্ধ তিষ্টিতে পারে না। অতি হতদরিদ্র ইংরেজ—এমন কি যে সামান্য তাম্বু পাতিয়া মাঠের মধ্যে বাস করে—সেও চারি দিকে নানা রঙ্গের লতাপাতা দ্বারা সে স্থানটী সজ্জিত ও মনোরম করিয়া রাখে। সুন্দর রূপে উদ্যান সাজাইতে ইংরেজের মত সুপটু জাতি বুঝি আর নাই। ইংরেজ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যতত্ত্ব এরূপ সূক্ষ্ম ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে যে যেখানে যে লতা বা যে পাতাটী আবশ্যক, যে গাছটী যেরূপে ছাঁটিলে সুন্দর দেখায়, যেখানে যে যে রঙ্গের সমাবেশে অতীব নয়নমনোরঞ্জন দৃশ্য হয়, যে ফুলের নিকট যে ফুলটী ফুটিলে প্রাণে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যথাযথরূপে প্রতিফলিত হয় সে ঠিক সেইরূপ করিয়াই গৃহ ও বহিরঙ্গণ সজ্জিত করে। তাহাদের এক একটী সামান্য গৃহও যেন এক একটী কুঞ্জবন! একজন সাধারণ শ্রমজীবীও তাহার সমান্য পর্ণকুটীর যাহাতে পত্রপুষ্পে সুশোভিত হয় তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখে, তাহার বাহিরের বেড়াটী যাহাতে সুন্দর দেখায়, দরজার ঠিক সম্মুখে যাহাতে কচি কচি সবুজ ঘাসের একটী ছোট সমতল ক্ষেত্র হয়, পুষ্পোদ্যানটীর চারিদিক্ সুন্দর রঙ্গীন ফুলের টব দ্বারা যাহাতে শোভিত হয়, সবুজ বর্ণের কিসলয়রাজি যাহাতে দেয়ালের গায়ে সুমিল জড়াইয়া সুন্দর দেখায় এ সব বিষয়ে তাহার অত্যাবশ্যকীয় জিনিসের মত দৃষ্টি ও যত্ন থাকে। বাঙ্গালীরা যে অনুর্ব্বরা ভূমিখণ্ড কেবল আবর্জ্জনা রাশিতে পূর্ণ করিয়া কদর্য্য অবস্থায় ফেলিয়া রাখে ইংরেজের হস্তে পড়িলে সেই সামান্য অনুর্ব্বরা ভূমিখণ্ড নন্দন-কাননতুল্য হয়। কিরূপ ভাবে সাজাইলে স্থানটী সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম হইবে তাহা স্থির করিয়া সে কোথায়ও বা মকমল সদৃশ শ্যামল নব দূর্ব্বাদল ক্ষেত্র, কোথায়ও বা নবোদ্গত কিসলয়রাজির শ্রেণী, কোথায়ও বা কচি কচি ঘাঁসের ত্রিকোণ ও চতুষ্কোণ কোথায়ও বা নানারঙ্গের প্রস্ফুটিত পুষ্পবীথিকা এবং কোথায়ও বা লতাপাতার মধ্যে স্ফটিকাভ স্বচ্ছ নির্ঝর প্রস্তুত করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া রাখে। যে সৌন্দর্য্য আমাদের

বনজঙ্গলে ও কবির হৃদয়ে ছড়ান আছে ইংরেজ সেই সৌন্দর্য্য স্বীয় বাসস্থানের সন্নিকটে সমাবেশ করিয়া উপভোগ করে। 'দরিদ্রের কুটীর প্রেম ও ভালবাসার প্রিয়তম আবাস' কবির এই উক্তি যদি সত্য হয় তাহা হইলে ইহা নিশ্চয়ই ইংরেজের কুটীর সম্বন্ধে। উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর ইংরেজই ঘরের মধ্যভাগটী ফুলের তোড়া, ফুলের মালা, লতার ঝাড় ইত্যাদি নানাবিধ নয়নমনোমুগ্ধকর কারুকার্য্যে এমন সুন্দর ভাবে সাজাইয়া রাখে যে দেখিলে মোহিত হইতে হয়। সহরের অতি অপরিচ্ছন্ন গলিতেও যদি কোন ইংরেজের গৃহ থাকে তাহা এমনি সুন্দর করিয়া সাজাইয়া রাখে যে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে গৃহস্বামীর কৌশলসজ্জিত প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া বাহিরের অপরিচ্ছন্নতার কথা একেবারে ভুলিয়া যাইতে হয়। জানালার নিকট গোলদাম, ও গোলাপফুল ফুটাইয়া, চারিদিকে লতাজড়িত সবুজ ফ্রেম আঁটিয়া, সিঁড়িতে টবে করিয়া নানা রঙ্গের ক্রোটন রাখিয়া অস্বাস্থ্যকর স্থানও তাহারা স্বাস্থ্যকর করিয়া তুলে। এই জন্যই বলিতেছিলাম ইংরেজদের সামান্য সামান্য গৃহও এমনি পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন ও ফিট্‌ফাট্ যে দেখিলেই প্রাণে কেমন এক শান্তির ছায়া পড়ে, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার মধ্যে যে এক দেবভাব নিহিত আছে প্রাণের মধ্যে সেই দেবভাবের উপলব্ধি হয়, বোধ হয় অমরাপুরী এইরূপ। ইংরেজের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার জন্যই বড় বড় নগরে এত পার্ক বা বৃক্ষোদ্যানের সৃষ্টি। ইংরেজের বৃক্ষোদ্যান দৃশ্য যেরূপ মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী এমন আর কিছুই নহে—বহুদূর বিস্তৃত সবুজ রঙ্গের ময়দান; তাহার মাঝে মাঝে বড় বড় বৃক্ষশ্রেণী, এখানে সেখানে দুই চারিটী লতাকুঞ্জ; মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বচ্ছসলিলা, বঙ্কিম গতিতে হ্রদের সহিত মিলিতা নির্ঝরিণী; কোথাও বা বনমধ্যে হরিণহরিণী পালে পালে ভ্রমণ করিতেছে, পশ্চাৎ পশ্চাৎ হরিণ শাবক ধাবিত হইতেছে। কোথাও বা শশকদল ঝোপ হইতে ঝোপান্তরে লাফাইয়া পড়িতেছে, কোথাও বা ময়ূরময়ূরীগণ অতর্কিতে উড়িয়া স্থানান্তরে গমন করিতেছে, কোথাও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ের স্বচ্ছ অচঞ্চল মুকুরপ্রতিম বক্ষে পার্শ্বস্থ গাছ পাতাগুলির প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, কোথাও বা পুরাতন কাহিনীর স্মৃতিস্বরূপ বনের নিভৃত এক কোণে দুই একটী পুরাতন মন্দির বা খোদিত প্রস্তরমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। সব ঠিক্ প্রকৃতির অনুকরণে

সজ্জিত; দেখিলে মনে হয় না যে ইহাতে মনুষ্যহস্তের আবশ্যক হইয়াছে। ধন্য ইংরেজের উদ্ভাবনী শক্তি!" নগরের মধ্যে ও নিকটে পুষ্পোদ্যান ও বৃক্ষোদ্যান প্রস্তুত করিয়া নগরের স্বাস্থ্য ও শোভা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে এবং ভূতলে স্বর্গীয় শান্তিনিকেতন সৃষ্টি করা যাইতে পারে ইহা বাঙ্গালী বা মুসলমান কোন কালে জানিত না। তাজমহল ও খাসমহল প্রস্তুত করিয়া মুসলমানেরা কারুকার্য্য ও শিল্পবিদ্যার অসাধারণ প্রতিভা ও অশেষ অনুরাগ দেখাইয়াছে কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্য তাহারা ইংরেজের মত কোন কালেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই।

ইংরেজদের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা হইতে তাহাদের চিত্রবিদ্যার অনেক উন্নতি হইয়াছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মানবের হৃদয়-নিহিত কতকগুলি বৃত্তিবিকাশের সহায়তা করে। চিত্রপটে প্রাকৃতিক দৃশ্য সুন্দর রূপে প্রতিফলিত করিতে পারিলে মানবের সুকোমল হৃদয় বৃত্তিবিকাশের অনেক সহায়তা করা হয়; চিত্রবিদ্যার ক্ষেত্রও অনেকটা প্রসর হয়। অনন্ত নীলিমাময় সাগর, দুই দিকে জল ঠেলিয়া গর্ব্বিত রাজহংসের ন্যায় পালভরে জাহাজ চলিয়া যাইতেছে, অনন্ত বিস্তীর্ণ আকাশ, নানা রঙ্গের মেঘ ছড়াইয়া পড়িয়াছে, পাখী উড়িতে উড়িতে আকাশের মধ্যে মিলাইয়া যাইতেছে। বিস্তীর্ণ শ্যামল মাঠ, মাঝে মাঝে দুই চারি খানি পল্লীগ্রাম, মাঠের চারিদিকে নানা রঙ্গের গাভী ও পালে পালে মেষের দল চরিয়া বেড়াইতেছে, ছোট ছোট ঝোপের মাঝে নানা রঙ্গের বনফুল ফুটিয়া বাতাসে এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে—এই সমস্ত চিত্র বিচিত্র পটে অঙ্কিত করিতে ইংরেজেরা কিরূপ সুদক্ষ তাহা যাঁহারা ইংরেজাঙ্কিত এই সমস্ত চিত্রপট দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন।

ইংরেজের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা তাহাদের কাব্য ও সাহিত্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাতে এক নূতন মোহিনী শক্তির সঞ্চার করিয়াছে। পক্ষান্তরে এই মোহিনী শক্তি ইংরেজের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যপ্রিয়তাকে তাহাদের হৃদয়ের স্তরে স্তরে অনুপ্রবেশ করাইয়া দিয়াছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণন করিতে ইংরেজ কবি যেরূপ সুপটু অন্য কোন দেশের কবিই সেরূপ নহে। ইংরেজী সাহিত্য প্রাকৃতিক দৃশ্য হইতে সংগৃহীত উপমায় পরিপূর্ণ।

অন্যান্য দেশের কাব্য পড়িয়া বোধ হয় কবিরা প্রাকৃতিক শোভায় সময়ে সময়ে মোহিত ও আকৃষ্ট হইয়াছে মাত্র; প্রকৃতি দেবীর যে সমস্ত শোভা সাধারণ, কেবল তাহাতেই উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, কিন্তু ইংরাজী কাব্য পড়িয়া বোধ হয় ইংরেজ কবিরা নিসর্গকে প্রাণের সখা করিয়া নিভৃতে তাহার সহিত খেলা করিয়াছে। তাহার অন্তস্তলে যেখানে যেটুকু মাধুর্য্য, যেটুকু কোমলতা আছে সমস্ত বিশেষ রূপে আয়ত্ব করিয়াছে। পাতার মর্ম্মর শব্দ, তটিনীর কুলু কুলু ধ্বনি, বায়লেটের ঈষৎ সৌরভ, ডেজির অরুণাভ শোভা—কিছুই এই সূক্ষ্ম-দর্শী কবিদের লক্ষ্য এড়াইতে পারে নাই। কাব্যজগতে বার্ণস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতি ইংরেজ কবিগণই কেবল পূর্ণ গর্ব্ব সহকারে বলিতে পারে "একটী মাত্র সামান্য পাতা দেখিলে আমার প্রাণে এত গভীর ভাবের উচ্ছ্বাস আইসে, প্রাণ এতদূর আকুল করিয়া তুলে যে ক্রন্দনেও সে আকুলতা দূর হয় না;—

Even from the meanest flowers that blows
Thoughts that do often lie too deep for tears."

Wordswoth

কালিদাসের কাব্যে প্রকৃতির অতি সুন্দর, সূক্ষ্ম ও যথাযথ বর্ণনা আছে সত্য, তাহার শকুন্তলা-গ্রন্থ ও গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমবর্ণনা যিনিই পড়িয়াছেন তিনিই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু সে বর্ণনার কারণ কবির আলোকিক প্রতিভা, অথবা প্রকৃতিতত্ত্বে ব্যক্তিগত অনুরাগ; জাতিগত সৌন্দর্য্যানুরাগ নহে; কারণ অন্য সংস্কৃত-কাব্যে এরূপ বর্ণনা অতি বিরল।

বাস্তবিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যতত্ত্বে ইংরেজের স্থান সর্ব্বোচ্চে। ইংরেজদের মত এত লতা ও ফুল আর কোন জাতি ভাল বাসে না, ফুলের মাহাত্ম্য বুঝিতে, ফুলের সুন্দর ব্যবহার করিতে আর কোন জাতি এরূপ জানে না। জামার বোতামে ফুলের গুচ্ছ, মাথার টুপিতে ফুলের ঝাড়, আনন্দোৎসবে ফুলের নানা বিধ কারুকার্য্যের প্রীতিউপহার, ফুল ফুল বলিয়া ইংরেজ উন্মত্ত। কচি কচি ইংরেজ মেয়েগুলি যখন সাদা ধব্‌ধবে পোষাকে সজ্জিত হইয়া, কুন্তলে কচি কচি পাতাঢাকা আধ ফোটা ফুলের কলি গুঁজিয়া, টুপিতে হরিৎ বর্ণের সুকোমল লতাগ্র জড়াইয়া এবং জামার বোতামে সুরঞ্জিত ফুল ও পাতার ছোট ছোট গুচ্ছ আঁটিয়া সুমিষ্ট হাসিতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যহৃষ্ট রক্তাভ

গণ্ডস্থল আরও উজ্জ্বল করিয়া বেড়াইতে থাকে, তখন বাস্তবিকই তাহাদিগকে দেববালা বলিয়া ভ্রম হয়। ইংরেজদের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যানুরাগ তাহাদের বালক বালিকাদের স্বাস্থ্য-উন্নতির এক মূল কারণ নহে কি?

ইংরেজের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যানুরাগ যে বাঙ্গালীর সর্ব্বাংশে অনুকরণীয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদিও সাহেবদের দেখাদেখি শিক্ষিত ধনী সন্তানের মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যানুরাগের ঈষৎ সঞ্চার হইয়াছে, যদিও বাঙ্গালীর চিত্রপটে, এবং 'ফুলহার', 'আলো ও ছায়া', 'আভাস', 'কড়ি ও কোমল' ও 'সোনার তরী' প্রভৃতি বাঙ্গালীর কাব্যে এই অনুরাগের স্বাভাবিক ফল কিছু কিছু ফলিতেছে তবুও এখন বাঙ্গালীজাতির এ অনুরাগ পূর্ণরূপে হৃদ্গত হয় নাই। কোন বৈদেশিক জাতির গুণ অন্য জাতিকে অনুকরণ করিতে বলিবার পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ পণ্ডিত গেটের নিম্নলিখিত উক্তি মনে হয় "যে সমস্ত পদ্ধতি কোন জাতির আদিম অবস্থা ও অভাব হইতে উৎপন্ন না হইয়া ভিন্ন এক জাতির অবিকল অনুকরণে উৎপন্ন হয় তাহা পূর্ব্বোক্ত জাতির পক্ষে হিতকর নহে কারণ যাহা এক সময়ে এক জাতির পক্ষে বিশেষ হিতকর, অবস্থা ভেদে অন্য জাতির পক্ষে তাহাই বিষবৎ। এই জন্যই জাতীয় আভ্যন্তরিক অভাব মোচনের জন্য বিজাতীয় পদ্ধতির কিছু মাত্র আবশ্যক নাই, কেবল অনুচিকীর্ষা পরবশ হইয়া সেগুলি আপন সমাজে নূতন ভাবে প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টা মূর্খতা মাত্র"। দেশ কাল ও সামাজিক অবস্থা বিবেচনা না করিয়া কোন নূতন পদ্ধতি সমাজে প্রচলিত করা যে ঘোর দোষাবহ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অনুকরণ ব্যতীত উত্থানপ্রয়াসী জাতির উন্নতি অসম্ভব। বিশেষ আমি যে গুণ অনুকরণ করিতে বলিতেছি তাহাতে জাতির উন্নতি ভিন্ন অবনতি হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। কবিবর ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও বার্ণসের নাম অক্ষয় হউক। আদি বাঙ্গালী কবিগণের অনুবর্ত্তন না করিয়া ইংরেজ কবিগণের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়াই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যবর্ণনার মনোমুগ্ধকারিত্বে কবি রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে মোহিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

শ্রীভবানীগোবিন্দ চৌধুরী।

# যামিনী।

## চতুর্থ অধ্যায়।

---

আজ সাত দিন জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাটী হইতে গিয়াছেন, এই সাত দিন যামিনী অতি গোপনে, অতি নিঃশব্দে যূথহারা বনহরিণীর মত কেবল ছট্‌ফট্ করিয়াছে, প্রতি দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহার এক একটী হৃদয়স্তর চূর্ণ হইয়াছে, মনুষ্যচক্ষুর বহুদূরে দাঁড়াইয়া সে কত যে চক্ষু-জলে ভাসিয়াছে তাহা কি কেহ দেখিয়াছে?

এতদিন জ্ঞানেন্দ্রের দ্বিতীয় বিবাহের কথা লইয়া লোকে কানাকানি করিত, এখন আর সে কানাকানি নাই, গ্রামের সকলেই এখন শুনিয়াছে, যেখানে দুই চারিজন পুরুষ কি স্ত্রীলোক একত্র হইতেছে সেই খানেই এই বিবাহ-প্রসঙ্গ উঠিতেছে। যাহারা যামিনীকে ভাল বাসে তাহারা বিষণ্ণ মুখে যামিনীর কাছে আসিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছে "যামিনি! বুঝি কপাল ভাঙ্গিল"। যাহারা যামিনীর সুখের ঈর্ষা করে, তাহারাও যামিনীকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিয়াছে, এত বয়স পর্য্যন্ত ছেলে হ'ল না তা বিয়ে কর্‌বে বৈ কি"। যামিনীর জীবনব্যাপী সন্দেহ এখন সত্যে পরিণত হইয়াছে। স্বপ্নময়ী আশার তরঙ্গ গুলি বুকে ধরিয়া তাহার ক্ষুদ্র জীবনস্রোত্ সুখের সাগর পানে ভাসিয়া যাইতেছিল, কে বলিবে কেন তাহা মাঝ পথে আসিয়া পাষাণময় পর্ব্বতে প্রতিহত হইল, কেন তাহার উপর অকস্মাৎ এমন প্রবল ঝটিকা বহিল!

সুখের দুঃখের কত দিন গিয়াছে, যামিনী কখন একটী দিনের তরেও অন্তরালে দাঁড়াইয়া কাঁদে নাই—পিতৃমাতৃবিয়োগ ভিন্ন সে জীবনের ভিতর একটী দিনের জন্যও এমন একটী ঘটনা খুজিয়া পায় নাই—যাহাতে দুঃখের চিহ্ন আছে। শ্বশুর যে তাহাকে ভাল বাসেন না, তাহা সে জানিত, কতদিন কত ঘটনায় তাহা অনুভব করিয়াছিল, তথাপি কৈ একটী দিনের জন্যও শ্বশুরের প্রতি যে অবিচলিত ভক্তি—তাহার ত্রুটী করে নাই, হাস্যময়ী যামিনী আপনার হাস্যময় জীবন লইয়া রাজলক্ষীর মত জ্ঞানেন্দ্রের ঘর আলো করিয়াছিল, সে কোন্ জন্মে কি পাপ করিয়াছে তাই আজ তাহার সে হাসি শুষ্ক হইয়া গেল, কিসের জন্য বিধাতা তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ভরা সুখটুকু কাড়িয়া লইলেন?

যামিনীর সন্তান হয় নাই, বংশরক্ষার জন্য জ্ঞানেন্দ্র পুনর্ব্বার বিবাহ করিবেন যামিনীর তাহাতে দুঃখ কি? কিন্তু জ্ঞানেন্দ্র যামিনীর কাছে তাহা গোপন করিলেন কেন? একটী বারের জন্য কেন বলিলেন না—'যামিনি, আমি বিবাহ করিব;' যামিনী হাসিতে হাসিতে অনুমতি দিত; যামিনী অকপটে যাঁহার নিকট হৃদয় খানি খুলিয়া দিয়াছে, যাঁহার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ভালবাসা পাইয়াছি বলিয়া যামিনীর আহ্লাদ রাখিবার স্থান ছিল না, সে মনে মনে অনুক্ষণ যে স্বামীর অনির্ব্বচনীয় সোহাগের অহঙ্কার করিত, সে সেই স্বামীর কাছে এই সামান্য একটী কথা শুনিবার অধিকারিণী হইল না কেন? যামিনী ত পর নয়, যামিনী জীবনেমরণে দাসী, তবে কেন জ্ঞানেন্দ্র তাহাকে পর ভাবিলেন? স্বামীর কাছে সেতো কৈ কখন কিছু লুকায় নাই, তবে জ্ঞানেন্দ্র তাঁহার হৃদয়ের ভাষা লুকাইলেন কেন? তাহার নারীজীবনের অহঙ্কার একবারে চূর্ণ করিয়া দিলেন কেন? স্বামী যাহার পর ভাবে, সে কেন বাঁচিয়া থাকে?

যামিনী জ্ঞানেন্দ্রকে বিদায় দিয়া শত বার চিন্তা করিয়াছিল—বিষ খাই, না হয় ডুবিয়া মরি, এ ঘৃণিত নারীজন্ম রাখিয়া আর সুখ কি? কিন্তু মরিলে জন্মের মত আর জ্ঞানেন্দ্রকে দেখিতে পাইবে না এই ভয়ে সে মরে নাই। সে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়াছে মরিব না। স্বামী আমার দেবতা, স্বামী আমার গুরু, স্বামিসেবা ভিন্ন এ নারীজন্মে আর কি আছে? আমি সাধ করিয়া সে সুখে বঞ্চিতা হইব কেন? বিবাহ করিয়া তিনি যদি সুখী হন, তাহাতে আমার দুঃখ কি? তাঁহার সুখের পথে কণ্টক হওয়া আমার কি উচিত? তাঁহার সুখের জন্যই তো নারীজন্ম লইয়া এ পৃথিবীতে আসিয়াছি; তাঁহার সুখেই সুখ, তাঁহার দুঃখেই দুঃখ; তিনি বিবাহ করিয়া আসিবেন, আমি পদসেবার আর একজন সঙ্গিনী পাইব। সে যদি আসিয়া আমাকে তাড়াইয়া দেয়, আমি স্বামীর পায়ে ধরিয়া কাঁদিব, শতবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি তাঁহার তো প্রাণ নিষ্ঠুর নয়, তিনি কি আমার রোদন শুনিবেন না? যদি না শুনেন তখন মরিব, কিন্তু তাঁহাকে নয়নের অন্তরে রাখিয়া মরিতে পারিব না; তিনি আমার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে মাথার উপর দাঁড়াইবেন, আমি পদতলে মাথা লুটাইয়া, সর্ব্বাঙ্গে পদধূলি মাখিয়া দেবতার

দেবতা চক্ষুর উপর দেখিতে দেখিতে মরিব !! আকাশের দেবতা যদি কেহ থাক বলিয়া দাও, সে সুখ কি যামিনীর ভাগ্যে ঘটিবে ?

সকল ভাবনার মধ্যে তাহার একটী ভাবনা বড় প্রবল হইয়াছে; সে এখন ভাবিতেছে—সতীন হইলেই কি স্বামী পর হয ? আমিও তো আমার সতীনের সতীন ? আমার যদি পর হয তবে তাহারও তো হইতে পারে ? যাহার সতীন আছে এমন কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে যামিনী এ সন্দেহ ভাঙ্গিয়া লইতে পারিত; সে এ সন্দেহ মিটাইবার জন্য তাহার পরিচিত যেথানে যত মানুষ আছে এক একটী করিয়া সকলের নাম স্মরণ করিয়াছে, তাহার ভিতর যাহার সতীন আছে এমন কাহাকেও খুঁজিয়া পায নাই। ছোট বেলায় পিসিমার কাছে যে উপন্যাস গুলি শুনিত, একটি একটি করিয়া সবগুলি মনে করিযাছে; কড়ি গাছের কথা, বেঙ্গমা বেঙ্গমীর কথা, মরণ কাটি জিওন কাটির কথা, রাজপুত্র পাত্রপুত্রের কথা—আরও যত কথা সব স্মরণ হয় না—সবগুলিতেই প্রায় রাজপুত্র রাজকন্যা আছে, সব রাজপুত্রই প্রায় দুই তিনটী করিযা রাজকন্যা বিবাহ করিয়াছে, সকল রাজকন্যারই দুই তিনটী করিয়া সতীন হইয়াছে; তাহারা তো শেষে সবাই সুখে ছিল; পিসিমা যখন গল্প শেষ করিতেন তখন বলিতেন,—সকলে মিলিয়া সুখে সচ্ছন্দে ঘর কন্না করিতে লাগিল, তবে সতীন হইলেই জীবনের সকল সুখ ভাসিয়া যায় না। যখন এই চিন্তা করিতেছে, তখন হৃদযে একটু বল পাইতেছে; আবার যখন দুরণত স্মৃতি ধীরে ধীরে "সুও রাণী দুও রাণীর" কথা মানসক্ষেত্রে জাগরিত করিয়া দিয়াছে, যখন "দুও বড়, সুও ছোট" "দুও ঘোড়া শালায় থাকে, সুও রাজরাণী হইয়া রাজঅন্তঃপুরে থাকে" এই কথা গুলি মনে পড়িয়াছে, তখন আবার তাহার বুকের বল যেন অর্দ্ধেক বসিয়া গিয়াছে, তথাপি একবারে হতাশ হয় নাই; সাগরে ডুবিয়াও মানুষ তৃণগুচ্ছ আশ্রয় করে; আবার ভাবিতেছে নারায়ণ দেবতা, তিনিও তো দুই বিবাহ করিয়াছেন, লক্ষ্মী বড় সরস্বতী ছোট, তিনি তো দুই জনকে লইয়াই ঘরসংসার করেন ! তিনি তো দুই জনেরই স্বামী, লোকে কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণ বলিয়াই ডাকে, সরস্বতী-নারায়ণ তো কেহ বলে না, তবে আমার স্বামী আমার থাকিবে না কেন ? আমার স্বামী কেবল একজনের হইবে কেন ? ও গো তোমাদের পায়ে পড়ি

যামিনী কি তপস্যা করিবে বলিয়া দাও, কি তপস্যা করিলে যামিনী যত দিন বাঁচিবে, ততদিন লোকে জ্ঞানেন্দ্রকে 'যামিনীর জ্ঞানেন্দ্র' বলিয়া ডাকিবে!

এই অগাধ দুঃখ রাশির ভিতর যামিনী তাহার শাশুড়ীর যে স্নেহ টুকু পাইয়াছিল, সেই টুকুই তাহার জীবনের মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র। যামিনীর কি যে যাতনা তিনি তাহা বুঝিযাছিলেন, যামিনীর অন্তরের অব্যক্ত রোদনধ্বনি তিনি শুনিযাছিলেন, যখনই তিনি যামিনীকে ম্লানমুখী কি চিন্তানিমগ্না দেখেন তখনই আসিযা সস্নেহে মুখচুম্বন করিয়া বালিকা-কন্যার ন্যায় যামিনীকে কোলে করিয়া বসেন, যামিনী সে অকৃত্রিম মাতৃস্নেহে আত্মহারা হইয়া বালিকার মত শাশুড়ীর বুকের মাঝে মুখখানি লুকাইযা নিঃশব্দে প্রাণ ভরিযা খানিক কাঁদে, লুক্কাযিত হৃদযব্যথা কিষৎ পরিমাণে উপশমিত হয, শাশুড়ী প্রবোধ দিযা বলেন "মা! তুমি কেঁদনা, তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী, আমি তোমাকে বুকে করিযা থাকিব, যে আসে আসুক সে তোমার দাসী হইয়া থাকিবে, যদি তাহাতে অন্যমত দেখি তখন তোমাকে বুকে করিয়া বনবাস যাইব," সে প্রবোধ বাক্যে যামিনীর জ্বলন্ত প্রাণে অমৃতসিঞ্চন হয, ভগ্ন হৃদয়ে কত যেন সাহস হয, সেই সাহসে ভর করিযা মনে মনে বলে "কিসের ভয়"?

সন্তান হইল না বলিযা যামিনী ইহার পূর্ব্বে একটী দিনের জন্যও দুঃখ করে নাই। এত দিনের পর তাহার সেই দুঃখ দেখা দিয়াছে, সে ভাবে আমি হয়ত পূর্ব্ব জন্মে অনেক পাপ করিযাছি, তাই আমার সন্তান হইল না, আমি হয় তো আর জন্মে ডাইন না হয রাক্ষসী ছিলাম কত লোকের কোলের ছেলে কাড়িয়া লইয়া মারিয়া ফেলিযাছিলাম না হয় খাইযা ফেলিয়াছিলাম; সেই জন্যই ভগবান, আমাকে এ জন্মে বন্ধ্যা করিয়াছেন। এমন ঠাকুর দেবতা নাই যামিনী যাহাকে ডাকে নাই, এমন দেবস্থান নাই যামিনী যেখানে মাথা কুটে নাই, পাছে কেহ দেখিবে বলিয়া ঘরের ভিতরে দুয়ার বন্ধ করিয়া সজলনযনা, গললগ্নকৃতবাসা যামিনী উর্দ্ধমুখে করযোড়ে ডাকিযাছে—"হে ঠাকুর, হে দেবতা, হে মা মঙ্গল চণ্ডি, হে মা ষষ্ঠি"—দুঃখিনী আমি তোমাদের পাযে পড়ি, অভাগিনীকে আর দুঃখ সাগরে ভাসাইও না; আমি বুক চিরিয়া রক্ত দিব, হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া দিব, তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে একটী মাত্র সন্তান দাও, আমি জানিতাম না যে সন্তান না হইলে নারীজন্ম বৃথা হয়, জানিতাম না যে সন্তান না হইলে আপনার স্বামীকে আমার বলিবার অধিকার

যায়; সাত নয়, পাঁচ নয়, একটী মাত্র সন্তান ভিক্ষা দাও, আমার নারীজন্ম সার্থক হ'ক।"—উন্মুক্ত বাতায়নের কাছ দিয়া পাখী ডাকিয়া উড়িয়া গিয়াছে, শশব্যস্তে যামিনী নয়নজল মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

"বাতাসে একটু বসি বলিয়া" আ'জ সন্ধ্যাকালে যামিনী তাহাদের ছাদের উপর আসিয়া বসিয়াছে, মাথার উপর সুনীল আকাশটী সুনির্ম্মল; চন্দ্র উঠিতেছে, নক্ষত্র হাসিতেছে, ধরাতল সান্ধ্য জ্যোৎস্নালোকে পুলকিত হইয়াছে, উদ্যানের বৃক্ষগুলি স্নিগ্ধ মলয়ের সহিত কোলাকুলি করিতেছে; সে সেই ছাদের উপর বসিয়া ভাবিতেছে, "এক দিন এমনি শুভ্র রজনীতে এই খানে আসিয়া দুজনে বসিয়াছিলাম, আর বসিতে পাইব না, এতদিন হয়ত বিবাহ হইয়া গিয়াছে সেখানে তো আমার কেহ নাই, সেখানকার লোক আমার হইয়া দু'কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিবে কেন? সেখানে তারাপুরের যদি কেহ থাকে, তাহা হইলে সে মানা করিবে। তাহার কথা তিনি শুনিবেন কেন? তবে আ'জ না হয় কা'ল চতুর্দ্দোল আসিবে, আমি তখন ঘরের ভিতর গিয়া কপাট বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিব, না—না তাহা হইলে লোকে মনে করিবে কি? বলিবে হিংসা করিতেছে, আমি ছুটিয়া যাইব, আমার সতীন সে তো আমার ছোট, আমি আদর করিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইব। আর যদি কোলে না আসে, যদি 'দূর' 'ছি' করিয়া তাড়াইয়া দেয়, তিনি যদি মুখ ফিরাইয়া থাকেন?"—তাহার পর যামিনী আর কি যে ভাবিবে স্থির করিতে পারিল না, নয়ন দুটী জলে প্লাবিত হইল, এমন সময় যামিনীর দৃষ্টি ছাদের নিম্নস্থ পথের দিকে আকৃষ্ট হইল, দেখিল কে একজন সন্ধ্যার অন্ধকারের ভিতর দিয়া হন্ হন্ করিয়া তাহাদের বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল, পরক্ষণেই যে কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণমূলে প্রবেশ করিল তাহাতে সে চিনিল, বাটীপ্রবেশকারী ব্যক্তি আর কেহ নয়, তাহারই শ্বশুর!!!

প্রাণদণ্ডের আদেশপ্রাপ্ত বন্দী কারাগৃহ-দ্বারে ঘাতকের পদশব্দ শুনিয়া যেমন আতঙ্কিত হয়, শ্বশুরের কণ্ঠস্বর শুনিয়া যামিনী তেমনি চকিতা হইল, তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল, বুকের ভিতর থর থর কাঁপিয়া উঠিল, শ্বশুর আসিয়া কি নিদারুণ সংবাদ দেন শুনিবার জন্য তাহার মন বড় ব্যগ্র হইল; ব্যগ্রভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল, শরীরে বল নাই, মনের স্থিরতা নাই, মাথার উপর

প্রতি মুহূর্ত্তে সূক্ষ্ম সূত্রগ্রথিত যে পাষাণখণ্ড ঝুলিতেছিল এইবার বুঝি ছিঁড়িয়া পড়িল ভাবিয়া যেমন উঠিয়া দাঁড়াইল অমনি তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, নয়নে আঁধার লাগিল, আকাশের নক্ষত্র, শাখার কুসুম যেমন খসিয়া পড়ে সেও সেই জ্যোৎস্না-রাশির ভিতরে তেমনি ভাবে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল।

হায়রে! নিষ্ঠুর ব্যাধ আত্মসুখের জন্য কেন হেন বনহরিণী বধ করে?

কিছুক্ষণ পরে যখন মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল, তখন যামিনী দেখিল, সে শাশুড়ীর অঙ্কের উপর মাথা দিয়া রহিয়াছে, সেই পুত্রবধুগত প্রাণা স্নেহময়ীর নয়নজলে উজ্জ্বল চন্দ্রালোক প্রতিফলিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

---

# বিজ্ঞান ও কল্পনা।

---

কল্পনা হইতে কেবল সাহিত্য জগৎই যে উপকৃত হইয়াছে এমন নহে। বিজ্ঞানও সমপরিমাণে উপকৃত হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। বিজ্ঞানবিষয়ক পরীক্ষা সকল কল্পনার জাজল্যমান প্রমাণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। অভ্রান্ত মত জ্ঞানের সোপানস্বরূপ, কল্পনার সাহায্য ভিন্ন বিশুদ্ধ মত-সন্নিধানে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নহে। বিজ্ঞানালোচনার ফলস্বরূপ আমরা ইন্দ্রিয়ানুভূতি বহির্ভূত অদৃষ্টপূর্ব্ব বিষয়সমূহ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই, পরমাণুনিচয়ের শান্ত ভাব ও ক্রীড়াকলাপ অবলোকন করিতে পারি, এবং তাহাদের দ্বারা এই জগতের কত অনির্ব্বচনীয় কাণ্ড অভিনীত হইতেছে তাহাও দেখিতে পাই। "আমি অনুমান করি এই এই বস্তু এই এই প্রক্রিয়ায় অমুক রূপ ধারণ করিবে। এখন কথা ঠিক কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।" ইহাত কল্পনার কথা। নিউটন, গাছ হইতে ফল ভূমে পড়িল দেখিয়া মহাকর্ষণ স্থির করিলেন, তাহাও ঐরূপে। কল্পনাপ্রসূত সকল প্রসঙ্গই যে ব্যাখ্যাত ও প্রমাণিত হইতে পারে তাহা নহে। আধুনিক প্রসিদ্ধ পদার্থবিৎ ডাক্তার টিণ্ডেল এই বিষয়ের সুন্দর মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। দুই একটী সহজ-

বোধ্য পরীক্ষার উল্লেখ আমরা এখানে করিব। সকলেই জানেন যে বিশুদ্ধ পরিস্কৃত জল সম্পূর্ণ রূপে স্বচ্ছ ও বর্ণহীন। তিনি বলেন যে, তাঁহার বিবেচনায় জল বায়ুর পাত্‌লা স্তরের ন্যায় বর্ণহীন, বায়ুর স্তর পুরু হইলে যেমন নীলাভ দেখায়, কোন সংমিশ্রণ না থাকিয়া জলের স্তর পুরু হইলেও সেই প্রকার কোন না কোন বর্ণ প্রকাশ করিবে। এই গেল অনুমান। পরীক্ষা করা হইল এইরূপে,—ডাক্তার টীণ্ডেল প্রথমতঃ একটী কাচের গ্লাসে কিছু পরিস্কৃত জল (Distilled water) ঢালিলেন। কোন বর্ণের ছায়া মাত্রও তাহাতে পরিলক্ষিত হইল না। এখন একটী ১০ হাত লম্বা ও ২ ইঞ্চি ব্যাস কাচের নলে কতকটা পরিস্কৃত জল পুরিয়া নলের দুই মুখ দুই খানি কাচের চাক্তির দ্বারা বন্ধ করিয়া নলটী সমতল ক্ষেত্রে রাখিলেন। নলটী শুয়াইয়া সমক্ষেত্রে রাখায় নলের নিম্নার্দ্ধে জল রহিল এবং অপরার্দ্ধ খালি রহিল। নলের এক মুখে একটী বিদ্যুৎ-আলোক জ্বালিয়া দিলেন ও অপর মুখে প্রায় দুই হাত অন্তরে একখানি সাদা চাদর টাঙ্গাইয়া দিলেন তখন বিদ্যুৎ-রশ্মি নলের ভিতর দিয়া বৃত্তাকারে কাপড়ে পড়িল। তখন দেখা গেল যে সাদা কাপড়ের উপরে পতিত আলোকচক্রের উপরার্দ্ধ উজ্জ্বল শ্বেত এবং নিম্নার্দ্ধ ঈষৎ পীতের আভাযুক্ত শ্যামলবর্ণ। এইরূপে প্রমাণিত হইল যে পূর্ব্ব অনুমান বা কল্পনা সত্য।

এইরূপ বহু দিন পূর্ব্বে একব্যক্তি কল্পনা করিয়াছিলেন যে বায়ুস্তর আলোড়িত হইয়া শব্দের উৎপত্তি হয়, এবং বায়ু ব্যতীত শব্দ পরিচালিত হয় না। এ অনুমান পরীক্ষা করিতে হইলে বায়ুহীন স্থানের প্রয়োজন। তখন বায়ুনিস্কাষণ-যন্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই সুতরাং পরীক্ষা হইল না। সময়ে বায়ুনিস্কাষণ-যন্ত্র আবিস্কারের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ হইল যে বায়ু ব্যতীত শব্দ সম্ভবে না, যেখানে বায়ু নাই সেখানে শব্দও নাই। ভূপৃষ্ঠ-সন্নিকটের বায়ু ঘন, উচ্চে পাতলা সুতরাং উচ্চে শব্দও পরিমাণমত মৃদু। উচ্চে উঠিয়া শব্দ শুনা ত সহজ নহে, তাহারও উপায়উদ্ভাবন হইল। জানা আছে যে বায়ু অপেক্ষা জলজান বাষ্প চতুর্দ্দশ গুণ লঘু। এখন, একটী পাত্র হইতে বায়ু নিস্কাষণ করিয়া তাহাতে একটী ঘণ্টা বাঁধিয়া দেওয়া গেল এবং নল যোগে বায়ুর পরিবর্ত্তে জলজানপূর্ণ করিয়া দেওয়ায় ঘণ্টার বাদ্য পূর্ব্বাপেক্ষা মৃদুতর ভাবে শুনা যাইতে লাগিল।

কত সময়ে কল্পনাশক্তি বিকাশের সামান্য অভাবের জন্য কত কত মহা

সত্য আবিস্কৃত হইতে হইতে রহিয়া গিয়াছে। পূর্বাকালের কল্পিত বহু বিষয় আমরা এখনও প্রমাণাভাবে কল্পিত বলিয়া বসিয়া আছি, আবার কতকগুলি আমরা পরীক্ষা মাত্র করিয়া আমাদের আবিস্কৃত বলিয়া বেড়াইতেছি। যুগে যুগে কথা চলিয়া আসিতেছে, গতিই যথা ঘর্ষণ ও চাপন, তাপোৎপত্তির কারণ। কেহ কি বলিতে পারেন, যে কত দিন পূর্ব্বে কাঠে কাঠে ঘসিয়া বা পাথরে পাথরে ঠুকিয়া অশিক্ষিত আদিমজাতি প্রথমে অগ্নি বাহির করিয়াছিল। বন্দুক হইতে নিক্ষিপ্ত গুলি বায়ুর ঘর্ষণে উত্তপ্ত হয়; শীতল লৌহখণ্ড শীতল লৌহের উপর রাখিয়া শীতল হাতুড়ির দ্বারা জোরে ঘা মারিলে অগ্নিবৎ গরম হইয়া উঠে। একথা আজকালের নহে। দিন দিন নূতন আবিষ্কার অপরিহার্য্য। এখন জানা গিয়াছে যে উক্ত নিয়মে অতি অল্প সময় মধ্যে জল ফুটিয়া উঠে এমন গরম করা যায়। উপায় কি তাহা সকলেই অবগত আছেন। দড়ির ফিঙ্গায় (এক প্রকার ছোট সিকার মতন) করিয়া হাঁসের ডিম জোরে ঘুরাইলে আহারোপযোগী সিদ্ধ হয়। জগৎপরিব্যাপ্ত ঈথারস্পন্দনই নৈসর্গিক অনেকানেক ব্যাপারের মূলীভূত কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঈথারের স্পন্দন হেতু আমরা দর্শনক্রিয়া সম্পন্ন করি, বায়ুর মৃদু তরঙ্গহিল্লোলে আমরা শ্রবণ করি, স্নায়বীয় স্পন্দনে আমরা আস্বাদন, আঘ্রাণ ও অনুভব করি, এবং হৃদয়ের স্পন্দনপ্রভাবে আমরা জীবনধারণ করি। এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার মনশ্চক্ষুর সাহায্য ব্যতীত উপলব্ধি হয় না। এবং কল্পনা ব্যতীত সে অনুভূতির অন্য সংজ্ঞা নাই। এই যে আমরা দেখি, তাহা হইল কার্য্য, কারণ হইল আলোক, আবার আলোকের উৎপত্তি হইল ঈথারের স্পন্দনপ্রভাবে। ঈথার আমাদিগের পক্ষে অননুমেয়, ইন্দ্রিয়ানুভূতির বহির্ভূত, জ্ঞান ও কল্পনার দ্বারা ইহার উপলব্ধি করি মাত্র। কেহ আজ পর্য্যন্তও ইহাকে রাসায়নিক কি অপর কোন প্রক্রিয়া দ্বারা অনুমানসাপেক্ষ করিয়া মানবসমক্ষে উপস্থিত করিতে পারেন নাই। তত্রাচ ইহার অস্তিত্ব আমরা ধারণা করিতে পারি এবং বুঝিতে পারি, যে অনেক সময়ে আলোকসূত্র শব্দসূত্রের সূক্ষ্মতম রূপান্তর মাত্র। তাহা কিরূপ আমরা এখন বুঝিতে চেষ্টা করিব।

উপায়-ভেদে শব্দ বিভিন্ন গতিতে গমন করে। জলে শব্দের গতির বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৪৭০০ ফিট, কিন্তু সেই জলবক্ষে তরঙ্গের গতি প্রতি সেকেণ্ডে

এক ফুটের অধিক নহে। মাধ্যাকর্ষণ ও জড়ত্ব (inertia) তরঙ্গ উৎপাদনের কারণ আর স্থিতিস্থাপকতা শব্দ প্রেরণের কারণ, শব্দপরিচালনের সাধনদ্বার কিন্তু জল নহে, বায়ু। জল জমিয়া বরফ হইবার পূর্ব্ব সময়ে যে পরিমাণ ঘনত্ব ও স্থিতিস্থাপকতা প্রাপ্ত হয়, বায়ু তদ্রূপ হইলে তাহার শব্দ-পরিচালনক্ষমতা জল অপেক্ষা প্রায় বার গুণ হ্রাস হইয়া যায়, অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ১০৯০ ফিটে আসিয়া পড়ে। ইহার এক মাত্র কারণ এই যে, যদিও জলের গুরুতর ভার শব্দের বেগ হ্রাস করিয়া আনে, উহার তারল্য গুণজনিত আনবিক স্থিতিস্থাপকতা গুরুত্বহেতু শব্দপরিচালনের যে বাধা হয় তাহা দূর করিয়া দেয়। শব্দপরিচালনসূত্র আমাদের আজকাল পরিষ্কার রূপে বোধগম্য হইয়াছে। আমরা যন্ত্র সাহায্যে বায়ুস্তরকে পরিস্ফুট করিতে পারি এবং শব্দায়মান বায়ুলহরীর দৈর্ঘ্য ও নৈরন্তর্য্যের পরিমাণ করিতে পারি। এই সকল ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে আমাদিগকে প্রকৃত ইন্দ্রিয়ানুভূতি হইতে বহুদূরে যাইতে হয় না, কিন্তু তত্রাচ কল্পনাশক্তির সাহায্য লইতে হয়। চর্ম্মচক্ষে অদৃষ্ট হইলেও মনশ্চক্ষু সমীপে শব্দতরঙ্গমালা পরিদৃশ্যমান। শব্দ উৎপাদনের কারণ ও সাধনপ্রণালী অনুধাবন করিতে পারিয়াছি বলিয়াই, আলোকসূত্রের গুঢ়তর তত্ত্ব জানিতে আমরা উৎসুক হইয়াছি।

এখন যদি শব্দ পরিচালনদ্বারের (medium) স্থিতিস্থাপকতা ঠিক রাখিয়া তাহার ঘনত্ব হ্রাস করিতে পারা যায়, তাহা হইলে গতির বেগ বৃদ্ধি হইবে, আবার, ঘনত্ব ঠিক রাখিয়া স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করিতে পারিলেও সেইরূপ ফল পাওয়া যাইবে। আলোকের বেগ কিরূপ বিস্ময়কর তাহা আমরা জানি। আলোক প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ পঁচাশি হাজার মাইল ভ্রমণ করে। এই বেগ সাধিত হইতে পারে এমন ক্ষমতা বায়ুর নাই, সুতরাং ঈথারের কল্পনা করা হইয়াছে। এত দিন কেবল কল্পনা মাত্রই ছিল অধুনা পণ্ডিতগণ তাহা সপ্রমাণ করিতেও সমর্থ হইয়াছেন। উপরে শব্দায়মান বায়ুলহরীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, শব্দায়মান আলোকতরঙ্গও স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইয়াছে। ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু এক অত্যদ্ভুত যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে টেলিফোনের ন্যায় এক স্থান হইতে অন্য স্থানে শব্দ পরিচালন করিবে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই যন্ত্র টেলিফোনের মত তারের একেবারেই

আবশ্যক হইবে না, তাবেব পবিবর্ত্তে আলোকউর্ম্মি শব্দ বহন করিবে।

আব একটী উদাহবণ দিয়া আমবা এই নিবস প্রবন্ধ শেষ কবিব। বর্ণভেদ আলোকবাহী ঈথাবউর্ম্মিব আয়তন ভেদ মাত্র। নযনেব ছায়াপটে বিভিন্ন আয়তনেব উর্ম্মি প্রতিফলিত হইলে আমবা বিভিন্ন বর্ণ দর্শন করি। বৃহদাযতন উর্ম্মি লোহিত, ক্ষুদ্র নীল-লোহিত এবং মধ্যাকার নীল ও শ্যামল ইত্যাদি বর্ণ উৎপাদন করে। এই সূত্রই উক্ত শ্বেত আলোক বিশ্লেষণে অনেক পবিমাণে প্রমাণিত হইয়াছে। আকাশেব বর্ণ নীলাভ সুতবাং বৃহদাযতন আলোক উর্ম্মিব অভাব বলিয়া বোধ হয়। আকাশ নীল বলিলেই মনে সন্দেহ উদয় হয় যে, "ঘন বাযুস্তব নীল বলিযা কি আকাশ নীল দেখা যায না ?" কিন্তু বাযুব বর্ণ নীল হইলে, সূর্য্যকিবণ উদয ও অস্ত কালে পীত, স্বর্ণ ও লোহিত বর্ণ দেখাইত না। পণ্ডিতগণ স্থিব কবিয়াছেন যে বাযুব বর্ণ নীল নহে, পশ্চাৎ-নিক্ষিপ্ত (reflected) আলোক নীল, তাহাব উদাহবণ জলেব উপবে সাবান বা তৈলেব ফেণা। বুদ্‌বুদেব উপব পতিত আলোক নীল, কিন্তু বুদবুদ ভেদ কবিয়া যে আলোক আসে তাহাব কোন ব্যতিক্রম দেখা যায না। এই সমস্ত ব্যাপার দর্শনে পণ্ডিতগণ স্থিব করিয়াছেন যে অতি সূক্ষ্ম পবমাণুনিচয় সর্ব্বক্ষণ শূন্যে ভাসমান বহিযাছে। এই মতেব অনুসবণ কবিযা পণ্ডিত সাব জন হার্সেল এক মহাবিস্ময়কব সিদ্ধান্তে উপনীত হইযাছেন। তিনি বলেন যে, যে ধূমকেতু আপনার পুচ্ছ দ্বাবা আমাদেব পৃথিবীব মত শত শত পৃথিবী আচ্ছাদন করিতে পাবে, তাহাব পুচ্ছেব বিক্ষিপ্ত জ্যোতির্ম্ময পবমাণুচয যদি ঝাঁট দিয়া জড় কবা যায তাহা হইলে তাহার সমষ্টি এক গাড়ীব অধিক হইবে না। তাহার একটী পরমাণুব আকার কত ছোট তাহা হৃদযে ধাবণা কবা যায় না।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

# এডিটার।

——00——

নদেরচাঁদ পাঁচ বৎসরে পদবিক্ষেপ করিলে, শুভদিনে শুভক্ষণে হাতে খড়ি পড়িল। ভক্ত প্রহ্লাদের মত নদেরচাঁদ "ক" দেখিয়াই কাঁদিয়া আকুল। কিন্তু কৃষ্ণনাম মনে হইয়াছিল কিনা, ইতিহাসে তা লেখে না। তবে লোকে বলে পরিণত বয়সে সে যে কাগজ বাহির করিয়াছিল, তাহারই আদি অক্ষর "ক" যে ঐরূপ বিভ্রাট ঘটিয়াছিল। "বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ" নাকি বলেন, তাড়িৎ-শক্তিপ্রভাবে পরিণামদর্শনজনিত স্নায়বীয় স্ফুরণে এইরূপ রোদন সম্ভব।

বছর কয়েক বাঙ্গলা পড়িতে পড়িতে দেখা গেল, নদেরচাঁদ রচনায় অদ্ভুত ক্ষমতাশালী। পণ্ডিত মহাশয় একদিন "বিদ্যালয়-বর্ণন" লিখিতে দিলে নদেরচাঁদ সেই রচনার এক স্থানে লিখিয়াছিল, "নারায়ণের হস্তে যেমন সুদর্শন, ব্রহ্মার হস্তে যেমন কমণ্ডলু, মহাদেবের হস্তে যেমন ত্রিশূল, ইন্দ্রের হস্তে যেমন বজ্র, ভীমের হস্তে যেমন গদা, বানরের হস্তে যেমন খোন্তা, পণ্ডিত মহাশয়ের হস্তে তেমনই বেত", এই প্রবন্ধ-পাঠের পর পণ্ডিত মহাশয় নদেরচাঁদের Theoretical বেত-বর্ণন তাহার পৃষ্ঠে কিছু অধিক মাত্রায় Practical এ পরিণত করিলে নদেরচাঁদ বাঙ্গলা স্কুল ত্যাগ করিয়াছিল।

বয়সের পরিমাণ কিছু অধিক হইলেও নদেরচাঁদ ইংরাজি স্কুলে ভর্ত্তি হইল। "খুদে পিপ্‌ড়ের" দলে "ডেঙ্গে পিপ্‌ড়ের" মত নদেরচাঁদ ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে A. B. C. আরম্ভ করিল। A. B. C. পড়িতে পড়িতে মাষ্টার মহাশয়ের দিকে বই আড়াল দিয়া সে নানারূপ মুখভঙ্গি করিত এবং A. B. C র সহিত মিল করিয়া অনেক প্রকার ছড়া আওড়াইত। শুনিয়া নিরীহ ছেলের দল হাসিয়া বাঁচিত না। নদেরচাঁদ যে রসিকতায় পরিণত বয়সে সুপরিচিত হইয়াছিল, এই হইতেই তাহার সূত্রপাত। ফাষ্ট বুক আরম্ভ করিয়াই P. u. t. put পুট হয়, আর B. u. t. but বাট, এরূপ অযথা বিভিন্নতা কেন হয়, বলিয়া, মাষ্টারের সহিত সে মহাতর্ক বাধাইয়াছিল। সেই অদ্ভুত তর্কে তাহার ন্যায়-শাস্ত্রোপযোগী বুদ্ধির অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল, সেই অঙ্কুরের ফলে, না পড়িয়াও

নদেরচাঁদ সম্পাদক-অবস্থায় সর্ব্বদেশীয় ন্যায়শাস্ত্রের উপর Comment করিতে পারিত।

পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যেই নদেরচাঁদের প্রতিভাকিরণে স্কুল বিভাসিত করিয়া ফেলিল। সে যখন থার্ড ক্লাসে পড়িত, তখন গৃহপালিত গাভি-সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লেখে, তাহা মাষ্টার মহাশয় ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার মুখে আমরা নদেরচাঁদের সেই রচনার যে দুই তিন ছত্র শুনিয়াছিলাম তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—"We have a cow, she is a four-sided animal, she gave us milk." Gives না লিখিয়া Gave কেন লিখিল জিজ্ঞাসা করায় নদেরচাঁদ তাড়াতাড়ি গম্ভীর ভাবে উত্তর দিয়াছিল "আজ্ঞা আগে দুধ দিত, সম্প্রতি গাভীন।" নদেরচাঁদ এইরূপ বিদ্যা ও প্রত্যুৎপন্নমতির সাহায্যে ফাষ্ট ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল, শেষ টেষ্ট পরীক্ষার পর তাহার পিতাকে বুঝাইল, লেখা-পড়া যাহা শিখিবার তা সে শিখিয়াছে, এখন পরীক্ষা দেওয়া অনর্থক, পরীক্ষায় প্রতিভার অপব্যয় হয় মাত্র। সে আরও দেখাইল, রামগোপাল, কেশবচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি বড় বড় লোক কেহই পরীক্ষা দেন নাই। পিতা বুঝিলেন, পুত্রের কথা প্রকৃত বটে, বিশেষ দুই তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতেই নদেরচাঁদ সংবাদ-পত্রে প্রবন্ধ লিখিতেছে। সেই তরুণ অবস্থাতেই অনুপ্রাস-সঙ্কুল, মধুর ভাষায় আর চটকপূর্ণ সুন্দর বর্ণনায় লেখক বলিয়া পুত্রের যে বেশ নামডাক হইয়াছিল তাহাও নদেরচাঁদের পিতা শুনিয়াছিলেন। এ সকল কারণে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল পুত্র মিথ্যা বলিতেছে না। অল্প দিন মধ্যেই নদের-চাঁদ হাফ্ সেয়ারে, এক "সব এডিটারি" জুটাইল। পুত্রের এই সম্মানে মুগ্ধ হইয়া পিতা বাসা-খরচ যোগাইতে লাগিলেন। সহকারী রূপে লিখিতে লিখিতে যখন নদেরচাঁদ দেখিল, তাহার ডাঁসা হাতে পাক ধরিয়াছে, তখন সম্পাদক-পদের পূর্ব্বে সহকারীটা তাহার কেমন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। ভাবিল, সাম্নে এত বড় ভারটা বহন না করিয়া, যাহাতে একাবেক সম্পাদকে পরিণত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে সম্মানসূচক একটা চিহ্ন পশ্চাতে সংযুক্ত হয়, সেই চেষ্টাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

শেষ নদের চাঁদ এক কাপ্তেন পাকড়াও করিয়া ফেলিল। তাহার অর্থে ও নিজের সম্পাদকত্বে কলিকাতা হইতে এক কাগজ বাহির করিল। বিজ্ঞাপনে

লিখিল, "উপন্যাসে যাঁহারা স্কট্,' কাব্যে যাঁহারা কালিদাস, নাটকে যাঁহারা সেক্সপিয়ার, প্রবন্ধে যাঁহারা এডিসন্, চিন্তায় যাঁহারা ইমার্সন, দর্শনে যাঁহারা কোমত, তাঁহারাই এই কাগজের লেখক। আর ইহাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই ইহার সম্পাদক।"

নদেরচাঁদ কিছু ইংরাজী পড়িয়াছিল, কাজেই কলিকাতায় আসিয়া আহারাদি সম্বন্ধে তাহার প্রথম প্রথম বড় একটা বাছবিছ ছিল না। লুকাইয়া লুকাইয়া তাহার সকল রকমই চলিত। ঠাকুর দেবতার প্রতি ভক্তি তাহার যে কখনও ছিল, ইতিহাসপুরাণে এ সাক্ষী দেয় না। তবে সে পিতার বা অন্য কোন গুরুজনের সমক্ষে দেবদ্বিজে গড় হইয়া প্রণাম করিত, জুতা খুলিয়া জল, পানও খাইত। আর সময়ে অসময়ে বৃদ্ধগণের নিকট হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে দুই চারিটা মন্তব্যও প্রকাশ করিত।

কাগজ বাহির করার পর নদেরচাঁদ দেখিল সে যে আশা করিয়াছিল, তাহা পূরিল না। তাহাকে অন্যান্য সম্পাদকগণ আমলই দেন না। বরং কেহ কেহ তাহার লেখাকে আমোদের একটা উপকরণ মনে করেন, আবার এক লজ্জার কথা, শুনিয়া কালাচাঁদের কাল মুখ লাল হইয়া যায়, সবে বলে কি না, নদেরচাঁদ মূর্খ! হায়! হায়। তবে বুঝি নদেরচাঁদের এত সাধের সুতা এ হাটে আর বিকায় না! শেষে কি তাহাকে দোকানপাট তুলিতে হইবে? নদেরচাঁদ রাত্রিদিন তাহাই ভাবে! কি করিলে তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে! ভাবিয়া ভাবিয়া নদেরচাঁদ কি একটা মতলব আঁটিয়া ফেলিল, স্থির করিল, সকল সম্পাদককেই সে একলা "এক ঘরে" করিবে। বিদ্যা, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা—কিসে তাহারা নদেরচাঁদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? তাহারা ভাল ইংরাজী জানে, নদেরচাঁদ তা জানে না, এই ত? আচ্ছা ইংরাজীতে পারদর্শী না হইলে কি উপযুক্ত সম্পাদক হওয়া যায় না? ইংরাজী ম্লেচ্ছ ভাষা, তাহাত বরং না জানাই ভাল। ক্রমে দেখিতে দেখিতে নদেরচাঁদের সুর ফিরিতে লাগিল। তাহার কাগজ এখন বিশুদ্ধ হিন্দু-পত্রিকায় পরিণত হইতে চলিল। নদেরচাঁদ তখন টেরি মুছিয়া টিকি রাখিল, খানা ছাড়িয়া হবিষ্যান্ন ধরিল! তাড়াতাড়ি মনুসংহিতা ও ভগবদ্গীতার বাঙ্গলা অনুবাদ পড়িয়া লইল—নদেরচাঁদ এখন খাঁটি হিন্দু! এত দিনে নদেরচাঁদের আশাবৃক্ষে মুকুল দেখা দিল। তাহার কাগজে হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধীয় যে সমস্ত প্রবন্ধ

প্রকাশ হইতে লাগিল, তাহা পড়িয়া একশ্রেণীর পাঠকমহলে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। রব উঠিল, হিন্দুধর্ম্মের দুর্দ্দশা নাশিতে, এত কালের পর শঙ্করাচার্য্যের পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ পাইয়াছে।

নব্য হিন্দু নদেরচাঁদ নূতন উৎসাহে নূতন আশায়, সজোরে, কলম চালাইতে আরম্ভ করিল। রাজনীতি, সমাজনীতি, উদ্ভটনীতি, সকল বিষয়েরই আলোচনা হর্‌দম্‌ চলিতে লাগিল। সর্ব্বোপরি সেই স্বভাবসুরসিক সম্পাদকের রসিকতায় পাঠকবর্গ বিস্মিত হইতে লাগিলেন। নদেরচাঁদের কলমের মুখে কিছু বাধে না। কা'ল যাহাদিগকে দেবতা বলিয়া পূজা করিয়াছে, স্বার্থের খাতিরে আজ ঘোষণা করিল তাহারা নরকের কীট। নদেরচাঁদ যেরূপ গালি দিতে পারে, তেমন গালাগালি নাকি কেহই দিতে পারে না। মেছুনি হইতে মুদি পর্য্যন্ত সকলেই নদেরচাঁদের এই অসাধারণ ক্ষমতার বিশেষ প্রশংসা করিত।

নদেরচাঁদের কলম ছুটিল। কোথায় যদি ক্ষুদ্র গোবাঘায় বাছুর ধরিত, নদেরচাঁদ অমনি লিখিত "ভাই সকল! আর ঘুমাইও না, উঠ, জাগ, ঐ দেখ শার্দ্দূলপ্রবর স্বীয় ভীষণ বদন ব্যাদন করতঃ শনৈঃ শনৈঃ পদসঞ্চারে আসিতেছে। আর রক্ষা নাই! পূর্ব্ব হইতে সাবধান হও। এখনও সময় আছে! ইংরাজরাজ্যে আমাদের সব গিয়াছে, ধরিবার অস্ত্র, ছুড়িবার শস্ত্র, পরিবার বস্ত্র, কিছুই নাই! আমাদের বাহুতে বল নাই, মনে স্ফূর্ত্তি নাই, হৃদয়ে উৎসাহ নাই, তাই বলি, এখন হইতে সাহস সংগ্রহ কর! এখনও আকাশ নির্ম্মল, নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ, নিঃশব্দ, ইহার পর, যখন জলদজালে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন হইবে, বায়ু বহিবে, মেঘ গর্জ্জিবে, বৃষ্টি বর্ষিবে, তখন আর উপায় থাকিবে না।"

কোন পুত্র পিতাকে অন্যায় রূপে বিষয় বেনামী করিতে নিষেধ করিতেছে শুনিয়া নদেরচাঁদ লিখিল, "সর্ব্বনাশ হইল, আর রক্ষা নাই, হায় হিন্দুধর্ম্ম, তোমার দুর্গতি দেখিয়া আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারি না, বুক যে ফাটিয়া যায় হাত যে অবশ হয়, কলম যে ভাঙ্গিয়া যায়! মনু, অত্রি, হরিৎ তোমরা আজ কোথায়! কোথায় আজ সেই বেদবাক্য—

পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্ম্মঃ, পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

হায় ইংবাজী শিক্ষা, তোমার আবর্ত্তে পড়িয়া পিতৃভক্তি, মাতৃঅর্চ্চনা, গুরুজনে সম্মান, সকলই ভাসিয়া গেল, এইত কলির প্রথম, হায়, হায়, না জানি পরে আরও কত কি হইবে !

মাতাল স্বামীকে আমোদেব খবচ যোগাইবার জন্য কোন হিন্দু স্ত্রী গায়ের গহনা দিতে আপত্তি কবিয়াছিল জানিয়া নদেরচাঁদ লিখিল, "হিন্দুরমণি ! তোমরা কি জান না, স্বামীই তোমাদেব সর্ব্বস্ব, স্বামীই তোমাদের অলঙ্কাব। হিন্দুমহিলা স্বামীব জন্য কিনা করিয়াছেন ? প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন ! আর আজ তোমরা, সেই কুলে জন্মিযা, ছি, ছি, বলিতে প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া যায়, তোমরা কিনা সেই স্বামীর অপমান কবিলে ? সীতা, সাবিত্রী, সতী, দময়ন্তী, আজ তোমবা কোথায ? একবার দেখ, তোমবা যে কুল পবিত্র করিয়াছিলে, আজ সেই কুলে জন্মিয়া, হিন্দুনারী কি কবিতেছে ? হায় স্ত্রীশিক্ষা, কি কুক্ষণেই তুমি এ দেশে আসিয়াছিলে ! ভাই হিন্দু ! পদে পদে স্ত্রীশিক্ষার কুফল দেখিয়াও তোমবা চেতিলে না ! কত লিখিলাম, কত কাঁদিলাম, কত সাধিলাম, কিছুতেই বুঝিলে না ! এখনও বলি ঐ সর্ব্বনেশে স্ত্রীশিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত কব। আব, আব সকল অনিষ্টের আদিকারণ ঐ যে ইংরাজী শিক্ষা, সেই ইংরাজী শিক্ষাকে বিদূরিত কবিয়া দাও। আব, হে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিতাভিমানী বিকৃতমস্তিষ্ক হিন্দুকুলাঙ্গার, তোমাকেও বলি,—"আপনি মজেছ, মজ, লঙ্কা মজায়ো না !"

পরম হিন্দু শ্যামকিঙ্কব শ্বশুরের সহিত সামান্য কাবণে বিবাদ বাধাইয়া, সেই 'দাদ্' তুলিবাব নিমিত্ত পুনবায দাবপবিগ্রহ করিয়া প্রথম স্ত্রীকে ত্যাগ কবিয়াছিলেন। অনাথা পবিত্যক্তা স্ত্রী পিতার মৃত্যুর পব অযাচিত হইয়া স্বামীগৃহে বাস করিতে আসিযাছিলেন ! কিন্তু বিলাসসাগবে, সুখের তরঙ্গে ভাসমান স্বামী সেই কাতবা, বোরুদ্যমানা, উদবান্নলালায়িতা, অসহায়া স্ত্রীর চক্ষের জলে নিজের রসিকতার তরণী ভাসাইয়া তাঁহাকে বিদায় দিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। শেষে পবিত্র ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের আর কোন সদুপায় না দেখিয়া আত্মীয় বন্ধুব প্রবোচনায় ও উদ্যোগে শ্যামকিঙ্করের সেই প্রথমা স্ত্রী আদালতের আশ্রয় লন, ও "খোরপোষের" টাকার ডিক্রী পান। এই মোকর্দ্দমার বিচার লইয়া নদেবচাঁদ একটা হৈ চৈ বাধাইয়াছিল, পাঠকবর্গকে

আমরা নদেরচাঁদেব সেই লেখার কিয়দংশ অবগত করাইতেছি।

"হিন্দুশাস্ত্রানুসারে স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি, সেই সম্পত্তি লইয়া স্বামী যাহা ইচ্ছা করিতে পাবেন, তাহাতে কাহাবও হাত দিবাব অধিকাব নাই। যদি কেহ তাহাতে হস্তক্ষেপ কবে তবে ধর্ম্মেব মর্ম্মে আঘাত কবা হয। ইংরাজ-রাজ্যে আমাদেব তঁ সবই গিযাছে ধন, মান, গৌবব, যশ, ইংরাজ আমাদের সবই হরিযাছে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু আমবা, আমবা শুধু ধর্ম্মেব মুখ চাহিয়াই বাঁচিয়া আছি, হায়! বুঝি ইংবাজ আব আমাদেব সে ধর্ম্মটুকুও রাখে না। ইংবাজ আমাদেব কহিনুব লইযাছে, তাহাতে আমবা দুঃখিত নহি, কিন্তু কোটী কোহিনুব অপেক্ষাও মূল্যবান এই যে ধর্ম্ম, এ ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ কবিলে তাহা আব সহিবে না। এই মোকর্দ্দমাব এরূপ বিচার করিয়া ইংবাজ আমাদেব ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ কবিযাছে, মহারাণীব সেই প্রতিজ্ঞা উলঙ্ঘন কবিয়াছে, হায়, হায়, আব আমাদের বক্ষা নাই, ভাই হিন্দু, এখনও কি তোমবা সুখে নিদ্রা যাইতেছ, এই কি তোমাদের ঘুমাইবার সময? আবত ঘুমাইলে চলিবে না, উঠ, জাগ, দেখ, তোমাদেব সর্ব্বনাশ হইল, ইংবাজবাজ্য "মগের মুলুকে" পবিণত হইল! হিন্দু, তোমার ধর্ম্ম যায, তোমাব কর্ম্ম যায, তোমার সর্ব্বস্ব যায়, তোমাব ইহ-কাল, তোমাব পবকাল সকলই নষ্ট হয। তাই বলি আব নিশ্চেষ্ট থাকিও না। সত্য বটে আমবা দুর্ব্বল, কিন্তু দুর্ব্বলেব বল কি কেহ নাই? ধর্ম্ম আমাদের সহায়, তোমরা কি জান না—

"যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ"

ধর্ম্মের জন্য হিন্দুগণ কিনা কবিতে পারেন, প্রাণও ধর্ম্মেব নিকট অতি অকিঞ্চিৎ-কর পদার্থ!

"অতএব জাগো, জাগো গো সকলে,
রাখ হিন্দুকীর্ত্তি রাখ মহীতলে।
দেখুক ইংবাজ, ধর্ম্মরক্ষা তবে,
ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু শমনে না ডবে॥" ইত্যাদি.

এই প্রবন্ধটী বাহিব হইবার পর এক দিন এক "লাল পাগড়ি" নদেবচাঁদকে নাকি কি বলিয়াছিল, সেই দিন রাত্রে বাসায় ফিরিয়া নদেরচাঁদের ভয়ানক জ্বর

দেখা দিয়াছিল। জরের ঘোরে, বিকারে নদেরচাঁদ চীৎকার করিয়াছিল "কে আছ, রক্ষা কর! রক্ষা কর! ঐ ধল্লে! ধল্লে!"

তার পর, বহুকাল, নদেরচাঁদের কাগজে ঐরূপ প্রবন্ধ বা সমালোচনা দেখি নাই। শুনিয়াছি, নদেরচাঁদ নাকি তাহার সম্পাদকজন্ম হইতে খালাস পাইয়াছেন!

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

---

# জুনিয়ার উকিল।

---

কি সুধাও, আমি ভাই জুনিয়ার উকিল।
"ল" পাশ করিয়া এসে,
ছিল এ কপালে শেষে,
"ব" এর ত্রিগণ্ডি মাঝে হয়েছি কাহিল,
"শ, ষ, স," যে পার হওয়া বেজায় মুস্কিল।

না হইতে বি-এ পাশ,
পরেছিনু বিয়ে-ফাঁস,
কাচ্চা বাচ্চা বেড়ে গিয়ে সব বেসিজিল;
কে জানিত বিবাহটা উর্ব্বরতাশীল?

ধরেছে ইন্‌কাম্ টেক্‌স,
দেখে আলমারি ডেক্‌স,
ফরাস, তাকিয়া, হুঁকো,—সুন্দর, সুডৌল;
কে বুঝিবে, ঘরে নাই তণ্ডুল বা তিল!

কাছারিতে যাই আসি,
প্রাণ জ্বলে, মুখে হাসি,
বটতলে শঠদলে মেশামেশি মিল;
হায়—সব নামঞ্জুর, সকলি বাতিল!

সদা থাকি মনঃক্ষুণ্ণ,
অনাহারে বাক্যশূন্য,
হতাশের কণ্ঠস্বরে আছে কভু জিল?
তবু বলি— লোকে বলে বওয়া'টে ফাজিল।

কথার কি পাবে অর্থ
অর্থ থাকে পেলে অর্থ,
মক্কেল আক্কেলশূন্য,—সে আইটেমে নিল্;
ওঝেবাদ নাহি যায় খরচের ফিল্।

কাছারি হইতে ফিরি,
গিন্নি দিয়ে গিট্‌খিরি,
পকেটে পুরেন হাত, হায় কি মুস্কিল!
কাপড়ের দোকানের থান কত বিল্!

বাসনিয়া, কর্ম্মকার,
ঝি, বামন, সূত্রধার,—
পরিষ্কার চিৎ-হস্ত—সংসার নিখিল!
ঋণের দফার কত দিব তপশীল্!

ওকালতি সক্ ভারি,
করেছি কি ঝক্‌মারি,
দেক্‌দারি দম্‌বাজি—দারুণ অশ্লীল।
ইচ্ছা হয় দোকানের এঁটে দেই খিল!

বিদ্যা যে অমূল্য ধন,
বুঝিয়াছি বিলক্ষণ,
দুখী দেখে বাণীও যে কেটেছেন ঢিল্।
ভুলেছি স্পেন্‌সার, গেটে, মিল্‌টন্ মিল্।

একটা মক্কেল পেলে,

টানাটানি সবে মিলে,
ছুটী টাকা পেলে করি কন্‌সেন্স্‌ কিল্‌;
আল্লা ব'লে লেগে যাই সাক্ষী করি ড্রিল্‌।

চোক কান নাক বুঁজে,
আলুভাতে পেটে গুঁজে
কেটে গেল পাঁচ বর্ষ—মন্দগতিশীল;
উপার্জ্জন অষ্টরম্ভা,— লাথি আর কিল।

কেন মিছে এ সাধনা,
কা কস্য পরিবেদনা,
হুঁকো নিয়ে ব'সে ব'সে ভাবি নিরিবিল্‌;
হায় বিধি করেছিনু এত কি তাস্কিল।

গিন্নি, সে কাঁদিয়া মরে,
ছেলে গুলা ফ্যা্‌ফ্যা করে,
ছ' আনার জামা গুলো গায়ে হয় ঢিল্‌;
মুড়ি খেয়ে ভুঁড়ি হয়?—নেহাত্‌ কাহিল।

কারু পেটে নাহি অন্ন,
ভেবে ভেবে অবসন্ন,
মনকথা মনে রাখি কবিনে রিভীল্‌;
বলিলে পাগল ব'লে গায়ে মারে ঢিল্‌।

গিন্নির গহনা নাই,
ছেলেদের জুতো চাই,
"ওদের যে সব আছে?"—কঠিন দলিল!
হায়, ধরা হীন স্বার্থে এতই পঙ্কিল?

স্বধু ব'সে ব'সে ভাবি,
নিরুপায়, খাই খাবি,
ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, ডিবিলিটি, হলো হাইড্রোসিল্‌।
বুঝেছো তো? আমি ভাই জুনিয়ার উকিল।

জনৈক জুনিয়ার উকিল।

---

# কোথায়?

এই সে যমুনাতীর এই শ্যামসোহাগীর
মধুকরমুখরিত শ্যামকুঞ্জবন।
তেমনি লতিকা তায় ব্রজরজ মাখি গায়
আদরে প্রসারি বাহু করে সম্ভাষণ।
কালিন্দী কল্লোলময়ী তেমনি বহিছে ওই
তেমনি এখনো তার আনন্দ-প্লাবন।
তেমনি তমালশাখে শুকশারী মনসুখে
প্রদোষ উষায় করে মধুর কুজন।
তেমনি কদম্বতলে হেরি নব ঘনজালে
উল্লাসে পেখম ধরে শিখী অগণন।
তেমনি সে কেলিঘাট "ধীর সমীর" মাঠ
অদূরে দাঁড়ায়ে ওই গিরি গোবর্দ্ধন।
ব্রজের সকলি সেই কেবল ব্রজত্ব নেই
হায়রে কোথায় সেই প্রেমিক দু'জন?

শ্রীমনোমোহন সেন।

# মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

**সাহিত্য, ভারতী, নব্যভারত।** এবার এই তিন খানি লব্ধপ্রতিষ্ঠ মাসিক পত্রের দর্শনসুখলাভ করিতে পারি নাই। যে দেশে এরূপ উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা যথারীতি বাহির হইতে পারে না, সে দেশের সাহিত্যানুরাগ কত প্রবল তাহা সবিশেষ চিন্তার বিষয়।

**প্রদীপ।** ১ম ভাগ ১ম সংখ্যা। ইহা একখানি সচিত্র সুন্দর নূতন মাসিক পত্র। দাসীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক এলাহাবাদ কায়স্থপাঠশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম-এ সম্পাদিত। নূতন সহযোগীকে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা প্রদান করিতেছি। ইহার সম্পাদনভার যেরূপ যোগ্য হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে ও ইহাতে বঙ্গের যে সকল সুলেখক লেখনীচালনা করিতেছেন তাহাতে আশা হয়, ইহা কালে একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রের অভাব পূরণ করিতে পারিবে। বর্ত্তমান সংখ্যায় বিখ্যাত ইতিহাসলেখক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের 'আগ্রা', শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'জ্যোতিষ', শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'সীমান্ত সংগ্রাম' ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের 'পরজীবি' প্রবন্ধ সবিশেষ অনুসন্ধাননিপুণতা ও লিপিকৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়াছে। এই সংখ্যায় ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় দুই খানি প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতিকৃতিতে রজনী বাবুর মুখচ্ছবি সুস্পষ্ট হইয়াছে কিনা সন্দেহ, অক্ষয় বাবুর ছবি মন্দ হয় নাই। জীবিত সাহিত্যসেবকদিগের প্রতি এইরূপ সমাদর প্রদর্শন করিয়া সহযোগী বঙ্গ-সাহিত্যের গৌরববর্দ্ধন করিয়াছেন। আমরা সহযোগীর দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি।

**দাসী।** *অক্টোবর ও নবেম্বরের যুক্ত সংখ্যা। ইহাতে অনেকগুলি সুখপাঠ্য প্রবন্ধ আছে।* তন্মধ্যে "চন্দন নগর অধিকার" একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, কিন্তু ইহাতে ভুল এত অধিক যে সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় তাহার উল্লেখ করা অসম্ভব। ঐতিহাসিক প্রবন্ধে স্থান ও নামের ভুল থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। স্যর জন্ ম্যাল্‌কম হইয়াছেন 'আর জন্ মালকম্', তারিখ-ই-মুনসুরি হইয়াছে 'তারিখইমনপুরি', তেরাণু হইয়াছে 'তের্‌াঁসো', মসিয় বেণস হইয়াছে 'সফিয়ে রোলার'; এবং প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হয় বুঝি চন্দননগর অধিকারের অব্যবহিত পরেই তেরাণু আত্মহত্যা করিয়াছিল— তাহাও সত্য নহে। এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া প্রবন্ধ মুদ্রিত করা আবশ্যক।

**পূর্ণিমা।** অগ্রহায়ণ। ইহাতে শূদ্রমণি রাজা নৃসিংহদেব রায় মহাশয়ের প্রতিমূর্ত্তিসহ জীবন-চরিত লিখিত হইতেছে। নৃসিংহদেব ক্লাইবের সমসাময়িক ব্যক্তি, ইহার জীবনেতিহাসে তৎসাময়িক অনেক গুপ্ত রহস্য প্রকাশিত হইলে প্রবন্ধটি সবিশেষ উপাদেয় হইবে। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর মহাশয় 'পাপের পরিণাম' নামে একটি গল্পের সূচনা করিয়াছেন।

**বামাবোধিনী পত্রিকা।** অগ্রহায়ণ। এই সংখ্যায় অনেকগুলি প্রবন্ধ ও বামারচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে 'সাময়িক প্রসঙ্গে তিলকের কারাবাস 'তিলকের অদৃষ্ট দোষ' বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমরা এমনই অদৃষ্টবাদী।।

**পুণ্য।** পুণ্যের প্রত্যেক সংখ্যাতেই 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং' এই মহাবাক্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কতকগুলি পোলাও, কালিয়া, মোরব্বা, মিষ্টান্ন প্রস্তুতপ্রণালী লিখিত হইয়া থাকে। এবার পোলাও এবং আমলেট রন্ধনের প্রণালী লিখিত হইয়াছে ও পোলাওটিকে ঐতিহাসিক করিবার জন্য তাহার নাম রাখা হইয়াছে 'রামমোহন পোলাও'। স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায় যে আমাদের খাদ্যরসের সহিত রসনাগ্রে স্থান লাভ করিয়াছেন ইহাও কতক আনন্দের সংবাদ। অক্ষয়কুমার দত্ত রামমোহনের স্মৃতিচিহ্ন না দেখিয়া যে মর্ম্মবেদনায় কাঁদিয়া উঠিয়াছিলেন এতদিনে সে ক্রন্দনের কথঞ্চিৎ অবসান হইতেছে।। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মনুসংহিতা ও মাতৃভাব' বেশ সুখপাঠ্য প্রবন্ধ।

# সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

**গীতা কৌমুদী বা পদ্য গীতা।** শ্রীরাখালচন্দ্র শেঠ, বি-এল প্রণীত। এই ক্ষুদ্রকলেবর পদ্য গীতা খানি বহু যত্নে অনুবাদিত ও ইহার উপস্বত্ব মালদহের শ্রীশ্রীগৌরভক্তি প্রদায়িনী সভার হস্তে বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচার জন্য প্রদত্ত হইয়াছে। অনুবাদক যত্ন চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু স্থানে স্থানে মূলের ভাব রক্ষা করিতে গিয়া যেরূপ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা সহজে বোধগম্য হইবে বলিয়া বোধ হয় না। এই দোষ পরিহার করিবার জন্য কোথাও কোথাও টীকাও সংযুক্ত হইয়াছে; তথাপি সকল স্থান সরল ও সুন্দর হয় নাই। অনুবাদকের কবিতারচনায় ক্ষমতা আছে, সংস্কৃতালোচনায় অনুরাগ আছে, গীতোক্ত ধর্ম্মপ্রচারে শ্রদ্ধা আছে,—সুতরাং পদ্যগীতা পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

**পরিচয় ও পুষ্পাঞ্জলি।** শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি-এ, এল-এম-এস, প্রণীত। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পদ্যগদ্যময়। ইহার পূর্ব্বার্দ্ধে লেখকের সাধক-জীবনের পরিচয়, পরার্দ্ধে সাধনোচিত হৃদয়োচ্ছ্বাসপূর্ণ সরস কবিতা। বোধ হয় সেই জন্যই ইহার নাম "পরিচয় ও পুষ্পাঞ্জলি।" লেখক বঙ্গসাহিত্যসমাজে সুপরিচিত, তাঁহার সরল সুন্দর লিপিকৌশলের সঙ্গে ভগবদ্ভক্তির মধুর রস বিমিশ্রিত হইয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছে। ইহা ভক্ত-জনারাধ্য;—সম্পাদকীয় সমালোচনার অতীত তত্ত্বকথায় পরিপূর্ণ। সেইজন্য গ্রন্থকার 'ভূমিকার' প্রথম ছত্রেই লিখিয়া রাখিয়াছেন:—"বৈষ্ণব শাস্ত্রোক্ত মাধুর্য্যরস, ভগবৎ কৃপা ব্যতিরেকে, বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করা বড় সুকঠিন।"

# অজ্ঞেয়-বাদ।

( সমালোচনা )

## চতুর্থ অধ্যায়—আদি-কারণ কিং স্বরূপ ?

(৩)*

——00——

আদি-কারণ যখন সমুদায় জগৎরহস্যের অবিসম্বাদিত কারণ তখন জগতের সমুদায় শক্তিতত্ত্বের, সমুদায় বৈষম্যের, সমুদায় নিয়মজালের, সমুদায় পরিবর্ত্তনেরও কারণ যে তিনি তাহাও প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে হইবে। এই বিচিত্র জগৎ সেই মহাশক্তির পরিচালনায় উদ্ভূত হইয়াছে; ধর্ম্ম এই জগদুৎপত্তির যে সকল ভিন্ন ভিন্ন ক্রম বা ইতিহাসের বর্ণনা করিয়াছেন তাহা দেশভেদে, অবস্থাভেদে এত ভিন্ন ভিন্ন, এত অসঙ্গতিপূর্ণ, এত মানবোচিত অপূর্ণতাজ্ঞাপক যে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিলে গ্রহণ না করাই বরং উচিত। কিন্তু জগৎ যখন সৃষ্ট, ইহার অবশ্যই আদি ছিল। সপ্তদিবানিশী বিশ্বশিল্পী অবিরাম পরিশ্রম করিয়া গড়িয়া পিটিয়াই ইহাকে প্রস্তুত করিয়াছে, অথবা কোন অন্যতর উপায়ে অযুত কোটী বৎসরের অগণ্য পরিবর্ত্তনে জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে তাহার বিচার নিষ্প্রয়োজন। যেমন করিয়াই হউক, যতদিনেই হউক, এই জগৎ যে বিচিত্রতার আধাররূপে বিরাজ করিতেছে তাহা সমুদায় মানবসমাজ, সমুদায় ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞান নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিতে বাধ্য—ইহা প্রত্যক্ষ মহাসত্য। স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে পাই ইহার অগণ্য গ্রহনক্ষত্রের কোন দুইটী একরূপ নহে, অযুত পশুপক্ষী, গুল্মলতা, বৃক্ষবনস্পতির ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি প্রকৃতি, জন্ম, জীবন ও মৃত্যু; সৃষ্টির যাঁহারা প্রভু সাজিয়া অহঙ্কারে ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছেন সেই জ্ঞানগর্ব্বিত নবনারী আকৃতি, প্রকৃতি, বর্ণ, ভাষা, আচার, ব্যবহার—সংক্ষেপতঃ সমুদায় বিষয়ই ভিন্ন ভিন্ন, জগৎ অনন্ত বৈচিত্র্যপরিপূর্ণ, অসীম রহস্যের সাগর! আবার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে পাই যে, পরমাণুর সংযোগ-বিয়োগে জগতের জড়াবরণ জন্মলাভ করিয়াছে, তাহাদের প্রকৃতির মধ্যে কত প্রভেদ! সমুদায় পরমাণুর ভারত্ব একরূপ নহে, আসঙ্গলিপ্সা একরূপ নহে—

কোন পরমাণু অল্প ভাবি কেহ বা অধিক, কোন পরমাণু সহজেই অন্য পরমাণুর রূপসাগরে আত্ম-অস্তিত্ব ডুবাইয়া মধুলুপ্ত ভ্রমরের মত পদ্মকোটরে আবদ্ধ হইয়া অদৃশ্য হইতেছে, কোন পরমাণুকে আবার আর একটি পরমাণুর সহিত মিশ্রিত করিয়া স্বতন্ত্র একটি জড়াণু সৃষ্টি করিতে বজ্র বিদ্যুতের শক্তি পর্য্যন্ত প্রয়োগ করা আবশ্যক হইতেছে। অক্সিজনের মধ্যে প্রস্ফুরকের পরমাণু ফেলিয়া দেও, উভয়ে এত উৎসাহে পরস্পর জড়াইয়া ধরিবে যে ক্ষুদ্র পরমাণুর মহা সম্মিলনে অগ্ন্যুৎপাত হইবে, আর সেই অক্সিজনকে হাইড্রোজনের সঙ্গে চিরকাল একত্র করিয়া রাখ কেহ কাহারও নাম পর্য্যন্তও জিজ্ঞাসা করিবে না—যদি বজ্রবিদ্যুৎ—শক্তির চালনা দ্বারা বিষম তাড়না করিতে পার তবেই তাহারা সম্মিলিত হইবে। এসকলই এক শক্তির, এক আদিকারণের কার্য্য—কিন্তু কারণ ও শক্তি এক হইয়াও কার্য্য এক অদ্বিতীয় প্রকারের না হইয়া শত সহস্র অগণ্য প্রকারের বিচিত্রতাময় হইল কেন? জলে তরলতা, বাষ্পে বায়বতা, মৃত্তিকায় কঠিনতা—"এ জগতের মাঝে যেখানে যা সাজে" সেখানে সেইরূপ হইল কেন? ইচ্ছা-শব্দের যে দার্শনিক ব্যখ্যার সার সিদ্ধান্ত দেখিযাছি, কেবলই সেই 'ইচ্ছাই' উত্তর দিতে পারে। ইহার একমাত্র উত্তর এই যে বিচিত্রতা উদ্ভূত হইবার পূর্ব্বে বিচারণা হইযাছিল, আদি-কারণের সেই বিচারণা অথবা মহতী ইচ্ছা হইতেই অনন্ত বিচিত্রতায় জগৎ পূর্ণ হইয়াছে! সুতরাং শক্তিতত্ত্ব যতই আলোচনা করিবে ততই আদিকারণকে 'ইচ্ছাময়' না বলিয়া থাকিতে পারিবে না।

জড়জগতের শক্তিতত্ত্বের মূলে যে 'ইচ্ছা' বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহার কার্য্য-প্রণালীর মধ্যে কোন নিয়ম আছে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক হইয়া উঠে। কেন না যদি ইচ্ছা নিযমহীন হয় তাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে 'ইচ্ছা' নামে অভিহিত করা যাইতে পারে না। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে জড়জগৎ নিযমশৃঙ্খলে আবদ্ধ, ইহার একটি পরমাণুও সেই অসংখ্য নিয়ম অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু সেই নিয়ম আজ একরূপ কাল অন্যরূপ কিনা? সেই নিয়ম অনিশ্চিত পরিবর্ত্তনময় আকস্মিক নিয়ম কি না? জড়তত্ত্ব আলোচনা ভিন্ন ইহার প্রকৃত মীমাংসা হইতে পারে না। বিজ্ঞান প্রমাণ করিতেছে যে এই মহানিয়ম চিরস্থির মহাসত্য। চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, রেণু, পরমাণু চিরদিনই সমনিয়মে আপনাপন অস্তিত্বভার বহন করিতেছে। চির-

দিনই এক একটি বিশেষ অবস্থা বা নিয়মানুসারে দিনরাত্রি, উদয়াস্ত, জোয়ারভাটা, ঋতুপরিবর্ত্তন প্রভৃতি ঘটিয়া আসিতেছে, এমন কি যে ধূমকেতুকে আকস্মিক নিয়মহীন জ্যোতিষ্ক বলিয়া মনে হয় তাহাও নিয়মাধীন নিশ্চিত পথাবলম্বী—ইহার প্রত্যেকটি গণিত বিজ্ঞান অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছে সুতরাং অসীম নিয়মশৃঙ্খলে চিরদিন অলঙ্ঘনীয় রূপে যে জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড আবদ্ধ তাহা আর বিশেষরূপে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। এই নিয়ম যে আকস্মিক ঘটনা সম্ভূত নহে দর্শনবিজ্ঞানই তাহার প্রধান সাক্ষী; আকস্মিক নিয়ম পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিজ্ঞান জন্মলাভ করিতেই পারিত না, জগতে অলঙ্ঘ্য নিয়ম বর্ত্তমান বলিয়াই বিজ্ঞানের এত গৌরব।

এই জগতের ক্ষুদ্র বৃহৎ পদার্থনিচয়ের মধ্যে যে মহানিয়ম বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহার স্বরূপতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে যে নিয়ম দুই শ্রেণীর।—সাধারণ এবং বিশেষ। তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা সমুদায় পদার্থের মূলে যে সাধারণ নিয়ম দর্শন করেন তাহাতে ( Regularity ) ধারাবাহিক কার্য্যপদ্ধতির প্রমাণ প্রাপ্ত হন এবং বিশেষ বিশেষ পদার্থের মূলে যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিশেষ নিয়ম দেখিতে পান তাহাতে উদ্দেশ্যানুরূপ কার্য্যকারিতার পরিচয় প্রাপ্ত হন। এই দুই শ্রেণীর নিয়ম বুঝিবার সুবিধার জন্য পৃথক ভাবে আলোচিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে সকল বস্তুর মধ্যেই দুই প্রকার নিয়মই বর্ত্তমান। প্রথম শ্রেণীর নিয়ম হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে জগতের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল পদার্থই কোন এক মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়ম হইতেই ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে সৃষ্টির প্রত্যেক বস্তু আপনাপন শক্তি অনুসারে সেই মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। তুমি কতকগুলি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার জন্য নিমন্ত্রণের অনুষ্ঠান করিয়াছ, কোন স্থানে রন্ধনের বিশেষ উদ্দেশ্যে চুল্লী খনন করিতেছ, কোথাও ইন্ধনের বিশেষ উদ্দেশ্যে কাষ্ঠ সঞ্চয় করিতেছ, কোথাও উপবেশনের বিশেষ উদ্দেশ্যে আসন বিস্তৃত করিতেছ—এই সকল বিশেষ বিশেষ কার্য্য যদিও এক একটি বিশেষ উদ্দেশ্য-জ্ঞাপক কিন্তু সমুদায় গুলিই আবার সাধারণ উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপযোগী। জগতের নিয়মজালের মধ্যেও এইরূপ সাধারণ ও বিশেষ উদ্দেশ্য বর্ত্তমান। নিয়ম যে উদ্দেশ্যজ্ঞাপক তাহাতে যাঁহার সন্দেহ হয় তিনি আত্মকার্য্যের নিয়ম সর্ব্বাগ্রে আলোচনা করিলেই সন্দেহ দূর হইবে।

প্রথমতঃ সাধারণ নিয়মগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে জগতের মূলে গণিতবিজ্ঞানসম্মত স্থির নিয়ম বর্ত্তমান। যে মাধ্যাকর্ষণের মহানিয়মে স্থূল সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র বৃহৎ সমুদায় জড়জগৎ নিয়মিত হইতেছে, যাহার গভীর তত্ত্ব আলোচনা করিয়া কেপ্‌লার, নিউটন, লাপ্লাস প্রভৃতি গণিতবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণ জগতে অমর পদবী লাভ করিয়াছেন, সেই মাধ্যাকর্ষণের নিয়মও গণিতসম্মত মহানিয়ম। দুই আর দুই মিলিয়া চারি হয় ইহা যেমন, মাধ্যাকর্ষণের নিয়মও সেইরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে নির্ণীত ও তদনুসারে পরীক্ষিত হইতে পারে। এই নিয়ম আদি অন্ত মধ্যে সকল বস্তুতে, সকল কালে সমান রূপে বর্ত্তমান; ইহাকে অতিক্রম করিয়া একটি গ্রহ উপগ্রহ, একটি ক্ষুদ্রতম পরমাণু পর্য্যন্ত বিরাজ করিতে পারে না। এই মহানিয়ম না থাকিলে ক্ষুদ্র বৃহৎ কোন পদার্থই যে থাকিতে পারিত না বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা বালকদিগকে সরল ভাষায় তাহা বুঝাইবার জন্য নানা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাহার একটি উদাহরণ এই যে আমরা হঠাৎ একবার লম্ফ দিলে আর মাটিতে নামিতে পারিতাম না, চিরদিনই মাটি ছাড়া হইয়া থাকিতে হইত। ইহার অভাবে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমণ্ডলী চূর্ণ বিচূর্ণ হইত; ব্রহ্মাণ্ড মহান্ধকারে পূর্ণ হইত; রেণু পরমাণু মহাশূন্যে বিলীন হইয়া যাইত! সুতরাং ইহা অপেক্ষা সাধারণ নিয়ম আর কি হইতে পারে? মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় রাসায়নিক আকর্ষণও জগতের একটি সাধারণ নিয়ম। বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা ভূয়োদর্শন পরীক্ষা ও বিশ্লেষণাদির দ্বারা জানিয়াছেন যে ন্যূনাধিক ৬৪ মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন প্রকার সংযোগ বিয়োগে এই জড়জগতের সমুদায় পদার্থ গঠিত এবং সেই সকল সংযোগ বিয়োগ গণিতসম্মত নিয়মের অধীন। এই সংযোগ বিয়োগের গণিতসম্মত নিয়ম এতদূর সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে পরীক্ষিত ও অধীত হইয়াছে যে বিজ্ঞানশাস্ত্র ইহার উপর নির্ভর করিয়া অনন্ত গগনবিহারী নক্ষত্রলোকের জড়াবরণের পরমাণুতত্ত্ব এই পৃথিবীতে বসিয়াই নির্ণয় করিতেছেন। এই রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগের নিয়ম সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে অপরিবর্ত্তনীয়রূপে বর্ত্তমান থাকায় ইহাকে আর আকস্মিক নিয়ম বলিবার উপায় নাই। সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে বিশেষ পরিমাণ অক্সিজান ও জলজান সম্মিলিত হইয়া জল উৎপন্ন করে, সে নিয়মের চুলমাত্রও ব্যতিক্রম হয় না। দীর্ঘকালের পরিদর্শন ও বৈজ্ঞানিক

পরীক্ষার দ্বারা এক্ষণে আমরা বুঝিতেছি যে, কি সুনীল গগনশোভী ইন্দ্রধনুর বর্ণসম্মিলন, কি কলকণ্ঠ বিহঙ্গমের মধুরস্বর লহরীর উত্থান পতন, কি বৌদ্ধবাদী আকরজাত বা শিল্পজাত লবণাদির স্তরবিভাগ, কি বিচিত্র পত্র তরুলতা ও বিচিত্রপক্ষ বিহঙ্গমের পত্র ও পক্ষসমাবেশ— সর্ব্বত্র এক গণিতসম্মত মহানিয়ম প্রতিষ্ঠিত! এই অলঙ্ঘ্য অপরিবর্ত্তনীয় মহানিয়ম কি অন্ধশক্তিপ্রসূত? এই নিয়মতত্ত্ব আমরা সৃষ্টি করি নাই, তাহা আমাদিগের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে, আমরা কেবল দুই দশদিনের জন্য আংশিকরূপে এই তত্ত্ব সমালোচনা ও অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত হইতেছি, আর যে শক্তি এই সকল আশ্চর্য্য নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছে তাহা কি অন্ধ শক্তি? জগতের মূলে যে মহাশক্তি তাহা যে ইচ্ছাময় সর্ব্ব নিয়ামক অনন্ত জ্ঞানসম্পন্ন আদি-কারণ তাহা বুঝিতে কি অধিক ইতস্ততঃ করিবার কোন কারণ আছে?

সাধারণ নিয়ম অপেক্ষা বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনার্থ যে সকল বিশেষ নিয়ম জগতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে তাহার আলোচনা করিলে বিশ্বশিল্পীর অনন্ত জ্ঞান আপনই হৃদয়ঙ্গম হয়! কিন্তু সে সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ অনন্তকোটী জড়বস্তুর উদ্দেশ্যতত্ত্ব সমালোচনা করা এই ক্ষুদ্র সমালোচনার উদ্দেশ্য নহে—তদুপযোগী স্থানেরও অভাব। আমরা একটী মাত্র উদাহরণ দিয়া পাঠকগণকে শক্তিতত্ত্ব অধিকতর রূপে অধ্যয়ন করিতে পরামর্শ দিব।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

---

# কালিদাসের শিব।

হিন্দুশাস্ত্রে শিব পরম দেবতা। যেখানেই শিব, সেইখানেই তাঁহার অলৌকিক মাহাত্ম্য। হিন্দুকে আর শিবের বিষয় অধিক করিয়া কিছু বুঝাইতে হইবে না। সংস্কৃত কবিগণের মধ্যেও যাঁহারা শিবের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহারা শিবের পরম দেবত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতেই চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যে শিবের এই পরম দেবত্বের মধ্যে কতকগুলি নীচত্ব প্রবেশ করাইয়া তাঁহাকে

এক অদ্ভুত পদার্থ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রথম যুগে যে সমস্ত কবিগণ শিবকে অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা শিবের স্কন্ধে বহু প্রকার নীচজনোচিত ব্যবহার আরোপ করিযাছেন। ভারতচন্দ্র শিবকে লইয়া অনেক নাড়াচাড়া করিয়াছেন এবং অনেক নীচ দোষও বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্বারা তিনি যে শিবের ঈশত্ব অস্বীকার করিয়াছেন তাহা নয়। কিন্তু যেমন একদিকে শিবকে পরমেশ্বর বলিযা তদীযোচিত কার্য্যকলাপ বর্ণনা করিয়াছেন তেমনি অন্যদিকে তাঁহাকে ভাঙ্গধুতুরাসেবী, লম্পট, পরদারপ্রিয় বলিয়া বর্ণনা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। বরং সেই গুলি বিশেষ উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিতে যত্ন করিয়াছেন। রামেশ্বরের শিবায়নও ঐ দলভুক্ত। তিনিও শিবের প্রতি পরদারপ্রিয়ত্ব, লম্পটত্ব প্রভৃতি সদ্‌গুণ আরোপ করিযাছেন। শিবের এ সমস্ত সৎগুণোৎপত্তির ইতিহাস তাঁহারা কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলেন তাহা আমরা অবগত নহি। কোন শাস্ত্রগ্রন্থে এসমস্ত আছে কি না জানি না তবে যে সামান্য শাস্ত্রগ্রন্থ আমরা দেখিয়াছি তাহাতে এ সমস্তের নাম গন্ধ কিছু নাই বলিয়াই মনে হয়।

অনেকের মত এই যে কালিদাস শিবোপাসক ছিলেন। আমাদের মতে এরূপ বিশ্বাস করা নিতান্ত অমূলক বোধ হয় না। কারণ গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ-স্থলে রঘুবংশ, শকুন্তলা প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি শিবমূর্ত্তিকেই আরাধনা করিয়াছেন। মেঘদূতের যে স্থলে তিনি মহাকালের কথা বর্ণনা করিয়াছেন সেখানেও শিবের ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদন বিশেষরূপেই করিয়াছেন। কালিদাসের কুমার-সম্ভব শিববিষয়ক। শিবের বৃত্তান্ত লইযাই কুমার-সম্ভব রচিত। সেই কুমার-সম্ভবে কালিদাস শিবকে কি ভাবে দেখিয়াছেন একবার তাহাই দেখা যাউক। কালিদাস প্রথম সর্গে শিবের তপঃ-সমাধির কথা বলিতে গিয়া বলিতেছেন—

তত্রাগ্নি মাধায় সমিৎ সমিদ্ধং
স্বমেব মূর্ত্ত্যন্তর মষ্টমূর্ত্তিঃ
স্বয়ং বিধাতা তপসঃ ফলানাং
কেনাপি কামেন তপশ্চচার।

তিনি নিজেই তপঃ-ফলবিধাতা। তবে তিনি আর তপস্যা করেন কি প্রয়োজন সাধনোদ্দেশ্যে? যাঁহার ইচ্ছা মাত্রে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হইতে পারে তিনি আবার

তপশ্চরণ করেন কেন। কবি উত্তর দিতে অক্ষম হইয়া বলিলেন "কেনাপি কামেন" যদিও মূর্খ আমরা জানি না, বুঝি না, তথাপি সেই অনন্ত শক্তির অবশ্য কোন প্রকার ইচ্ছা আছে তদুদ্দেশ্যে তিনি তপস্যা করেন। তাঁহার ইচ্ছার মর্ম্ম গ্রহণ করা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমাদের সাধ্য কি?

সেই সময়ই গিরিরাজ-তনয়া সর্ব্বাবয়বা নবদ্যাঙ্গী গৌরী তাহার পরি-চর্য্যার্থে পিত্রাদিষ্টা হইয়া উপস্থিত হইলেন। মহাদেব অম্লান চিত্তে সে বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিলেন। তাদৃশী রূপবতী নবোদ্ভিন্নযৌবনা রমণী সম্মুখে থাকিয়া শুশ্রূষা করিবে, তিনি তপস্যা করিবেন—জিতেন্দ্রিয়ত্বের পরাকাষ্ঠা! কবি বলিলেন "বিকার হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে, যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।" তার পর দ্বিতীয় সর্গে সমস্ত দেবগণ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া সর্ব্বদেবাগ্রগণ্য বলিয়াই ব্রহ্মাকে স্তব করিলেন। তৎপর ব্রহ্মা উপস্থিত হইয়া দেববৃত্তান্ত অব-গত হইয়া কহিলেন সেকার্য্য তাঁহার অসাধ্য। তিনি মহাদেবকে দেখাইয়া দিলেন। তখন কবি ব্রহ্মার মুখ দিয়া শিবের বর্ণনা করিলেন—

সহি দেবঃ পরং জ্যোতিস্তমঃ পারে ব্যবস্থিতম্।
পরিচ্ছিন্ন প্রভাবর্দ্ধি ন ময়া নচ বিষ্ণুনা!

স্বয়ং ব্রহ্মা বলিতেছেন তিনি তমোগুণাতীত, তাঁহার মহিমা আমার কিম্বা বিষ্ণুর দ্বারাও পরিমিত হয় না। অতএব তাঁহার অসাধ্য নাই। সুতরাং তিনিই তারকনিধনের কারণোৎপাদনে সক্ষম। ব্রহ্মাও এস্থলে শিবকে তাঁহাপেক্ষা এবং বিষ্ণুর অপেক্ষাও অধিক ক্ষমতাশালী বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন।

তৎপর তৃতীয় সর্গে শিবের ধ্যান ভঙ্গের ষড়যন্ত্র! ষড়যন্ত্রটী বড় সামান্য নহে। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র কামের অধীশ্বর দেবতা, কন্দর্পকে অনেক খোসামোদ করিয়া তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করিতে প্রেরণ করিলেন। পাঠক একবার অনুধাবন করুন! ষোড়শী সর্ব্বরূপসমান্বিতা রমণীর অবিরলসন্নিহিত ধ্যানপরায়ণ যোগী নির্জ্জন স্থানে উপবিষ্ট আছেন, এদিকে কন্দর্প নিজ সহচরবর্গ সমভিব্যাহারে তাঁহার উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য উপস্থিত। মহা পরীক্ষার সময়!

মহাকবির এই সর্গটী অতি মনোহর! কবির অসীম ক্ষমতার পরিচায়ক তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কন্দর্প বসন্তসহচর হইয়া শিবের সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। বসন্তের আগমনে বনভূমির আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইল।

সে বর্ণনা অতি মনোহর! অতি সুন্দর! পাঠক তাহা মূল গ্রন্থে পাঠ করিবেন। আমাদের তাহা বর্ণনীয় নহে, সুতরাং সংক্ষেপতঃ এই বলিলেই যথেষ্ট যে চিত্তচাঞ্চল্যের উপযোগী সমস্ত উপকরণই সংগৃহীত হইয়াছিল। এমনি তাহার প্রভাব যে রতিসহচর মদন সে বনে প্রবেশ করা মাত্র—কাষ্ঠাগত স্নেহরসানু বিদ্ধং, দ্বন্দানি ভাবং ক্রিয়য়া বিবব্রু। 'দ্বন্দানি' স্থলে মল্লিনাথ বলিতেছেন "স্থাবরাণি, জঙ্গমানিচ মিথুনানি।" স্থাবর এবং জঙ্গম পর্য্যন্ত সর্ব্বজীবেরই রতিভাব সমুৎপন্ন হইল। এভাব দৃষ্টে সেই বনবাসী সমস্ত মুনিই "কথঞ্চিৎ, দীশা মনসাং বভূবুঃ।" মহাদেব কি করিলেন? তদবস্থা দেখিয়াও তিনি ধ্যানপরই রহিলেন। তাঁহার একটু মাত্রও চিত্তের বিকৃতি জন্মিল না, তিনি পূর্ব্ববৎ অচল অটল। কামের প্রভাবে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল না। কবি বলিলেন "আত্মে শ্বরাণাং নহি জাতু বিঘ্নাঃ, সমাধি ভেদ প্রভবো ভবন্তি।" নন্দী এই প্রভুর সেবক। তিনিও ধীরভাবে মুখে অঙ্গুলী প্রদান পূর্ব্বক নিজ অনুচরগণকে শিক্ষা দিলেন "সাবধান, চপলতা প্রকাশ করা না হয়।" উপযুক্ত সেবকের আদেশ মাত্রই সমস্ত বন একেবারে চিত্র-লিখিত বস্তুর ন্যায় সর্ব্বচেষ্টাবিরহিত হইয়া রহিল। কামদেব নন্দীর দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া শিবের আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। কি দেখিলেনঃ—মহাদেব সংযমী হইয়া বীরাসনে অধোমুখে নাসাগ্রগ্রস্তলোচন হইয়া উপবিষ্ট আছেন। তাঁহাকে

অবৃষ্টি সংরম্ভ মিবাম্বু বাহম্
অপামিবা ধারমনু তরঙ্গম্
অন্ত শ্চরণাং মরুতাং নিরোধাৎ
নিবাত নিষ্কম্প মিব প্রদীপম্

দেখা যাইতেছে। কি সুন্দর উপমা! তিনি নবদ্বারনিষিদ্ধ বৃত্তি মনকে সমাধি বশ করিয়া নিজেই নিজকে ধ্যান করিতেছেন। এ স্থানে মল্লিনাথ টীকায় বলিতেছেন "স্বাতি রেকেন পরমাত্মনো অভাবাৎ" নিজ ব্যতীত আর পরমাত্মা নাই এজন্য নিজকেই নিজে ধ্যান করিতেছেন। তিনি পরমাত্মা! কামদেব যথেষ্ট দর্প করিয়াছিলেন, কিন্তু এতদবস্থ মহাদেবকে দেখিয়াই তাঁহার বলবীর্য্য তিরোহিত হইল। ভয়ে হাত হইতে ধনু খানি খসিয়া পড়িল, তিনি বুঝিতেও পারিলেন না। ইতিমধ্যে পার্ব্বতী উপস্থিত হইলেন! তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার

অলোকসামান্য অনুপম রূপ দেখিয়া কাম আশান্বিত হইলেন। নন্দী ধ্যান-ভঙ্গের পর পার্ব্বতী পূজা করিতে আসিয়াছেন এই কথা নিবেদন করিলে মহাদেব আসিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। তিনি যখন পদ্মবীজের মালা শিবকে উপহার দিতেছেন, মহাদেব হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে যাইতেছেন এমন সময় ঠিক অবসর বুঝিয়া পুষ্পধন্বা সম্মোহন বাণ ধনুকে যোজিত করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। এক্ষণে কবির মহা সমস্যা উপস্থিত! এক দিকে কামের অখণ্ডনীয় প্রভাব, অন্যদিকে মহাদেবের ঈশ্বরত্ব! কোন দিক রাখিবেন। কিন্তু ধন্য কবি! তিনি দুই দিকই সুন্দর রূপে রক্ষা করিয়াছেন। সম্মোহন অস্ত্রের প্রভাবে

হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য্য
শ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বু রাশিঃ
উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে
ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি।

ঈষৎ বিচলিত হইলেন মাত্র। চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র যেমন বিচলিত হয় সেইরূপ! কিন্তু সেও কতক্ষণ! তৎক্ষণাৎ

অথেন্দ্রিয় ক্ষোভমযুগ্মনেত্রঃ
পুনর্বশিত্বাৎ বলবন্নিগৃহ্য
হেতুং স্বচেতো বিকৃতের্দিদৃক্ষু
র্দিশামপান্তেষু সসর্জ্জ দৃষ্টিম্।

কি দেখিলেন? স্বয়ং কামের অধীশ্বর কন্দর্প স্বীয় ধনু আকুঞ্চিত করিয়া বসিয়া আছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তপস্যার মহা প্রতিকূল, অশেষ দোষের কারণ কামকে স্বীয় প্রভাবোৎপন্ন নয়নাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন! কামের প্রভাব তিরোহিত হইল! কাম-রিপু তিনি স্বীয় মনোবল দ্বারা ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন, তৎপর স্ত্রীসন্নিকট পরিত্যাগ জন্য সে স্থান ত্যাগ করিলেন! ইহা স্বীয় মনোবলের অভাবের জন্য নহে; এইরূপ বিঘ্নাবলীর হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, বিরক্তির হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য। এদিকে পার্ব্বতী শিবকে পাইবার জন্য কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি বুঝিলেন এ হেন রত্ন স্বীয় রূপদ্বারা প্রাপ্ত হইবার নহে, তপস্যা করা চাই, একাগ্রতা জন্মান চাই। এজন্য মাতার অশ্রুজল উপেক্ষা করিয়া পিতার অনুমতি লইয়া

তপস্যার জন্য এক গুহায় গমন করিলেন। তথায় তিনি কঠোর সাধনা আরম্ভ করিলেন। মহাদেব পার্ব্বতীর অনুরাগ পরীক্ষার জন্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে উপস্থিত হইয়া শিবের নিন্দাবাদ করিলেন, তদুত্তরে কবি পার্ব্বতীর মুখদ্বারা শিবের প্রকৃত ঈশ্বরত্ব স্থাপন করিয়াছেন।

বলা হইয়াছে, তিনি অলোকসামান্য, অচিন্ত্যহেতু, জগতশরণ্য, নিরভিলাষ, সৎ; তিনি দরিদ্রও বটেন, সর্ব্ববিভবশালীও বটেন, শ্মশানবাসীও বটেন, ত্রৈলোক্য-নাথও বটেন, ভীমরূপও বটেন, শিবও বটেন, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বত্যাগী, তাঁহার প্রকৃত রূপাবধারণক্ষম লোক নাই। তিনি বিশ্বমূর্ত্তি, সর্ব্বদেবপূজনীয়, এমন কি ব্রহ্মারও উৎপত্তিস্থান! এখানেই তাঁহার পরমেশ্বরত্বের পরাকাষ্ঠার প্রমাণ! তৎপর ৬ষ্ঠ সর্গে তাঁহার লীলার এক বিকাশ। বিবাহের আয়োজন। তাহাতেও সপ্তর্ষি তাঁহাকে স্তব করিতে গিয়া তাঁহার মহেশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহারা যাহা বলিতেছেন সংক্ষেপে তাহা এইঃ—

হে প্রভো আমরা যে সমস্ত তপ করিয়াছিলাম অদ্য তাহা সার্থক হইল কারণ আমরা আপনার দ্বারা স্মৃত হইয়াছি। আমরা অদ্য মহদুচ্চৈস্থিত হই-লাম, কারণ আপনি আমাদিগকে স্মরণ করিয়াছেন। আমাদের আনন্দ আপনার অবিদিত নাই, কারণ আপনি সর্ব্বজ্ঞ। আপনি দৃশ্যমান হইতেছেন বটে কিন্তু তত্ত্বতঃ আপনাকে নিরূপণ করিতে পারিতেছি না। অনুগ্রহ করিয়া নিজ স্বরূপ বলুন। কারণ আপনি বুদ্ধির অতীত। আপনার এই দৃশ্যমান রূপ কোনরূপ? একি সৃজক্ পালক না সংহারকরূপ? তৎপর প্রয়োজন জিজ্ঞা-সিত হইয়া মহেশ্বর বলিতেছেন—তোমরা জান, যে আমার কোন ব্যাপারই নিজের জন্য নয়—তাহা অষ্টমূর্ত্তিতেই প্রকাশ আছে। সাধারণের মঙ্গলের জন্য আমি পুত্রোৎপাদনার্থে প্রার্থিত হইয়াছি। এজন্য আমি পার্ব্বতীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। এতদ্বারা তিনি নিস্বার্থ তাহা বুঝাইতেছেন।

তৎপর সপ্তর্ষি হিমালয়ের নিকট মহাদেবের গুণবর্ণনাস্থলে বলিতেছেন তিনি অনিমাদি গুণোপেত, অস্পৃষ্ট পুরুষান্তর ঈশ, তিনি বিশ্বধারক, তিনি সর্ব্ব-ভূতান্তর্য্যামী; যাঁহার ধ্যান করিলে আর সংসারে আসিতে হয় না, সর্ব্বভূতে পিতা, দেবতাদিগেরও পূজনীয়, তিনি সকলের স্তূত্য, সর্ব্ববন্দ্য। ইহাতেও পরমেশ্বরত্ব অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে। তৎপর বিবাহপর্ব্ব। এই বিবাহপর্ব্বে ভারতচন্দ্র শিবকে

বড় লজ্জাঙ্কর ভাবে উপস্থিত করিয়াছেন। সম্পূর্ণ উলঙ্গ, পুরস্ত্রীগণ পলায়ন করিতেছেন, তৎপর পার্ব্বতীর প্রভাবে মেনকা প্রভৃতির দিব্য চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল। বিবাহের পর শিব অনেকক্ষণ ভাঙ্গ খান নাই বলিয়া নন্দীকে খুব ধুতরা পাতা দিয়া সিদ্ধি প্রস্তুত করিতে বলিলেন। পরে নেশায় মত্ত হইয়া মত্ত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। পরমেশ্বরের এরূপ ভাব কিরূপ ঈশ্বরত্ব-পরিচায়ক তাহা আমরা অবধারণে অক্ষম। কিন্তু কালিদাসের শিবের বিবাহ-সজ্জা একবার সকলে দেখুন। ব্রাহ্মী প্রভৃতি সপ্ত মাতৃকা শিবের প্রসাধন উপস্থিত করিলেন। কিন্তু মহাদেব কি করিলেন?

তদ্‌গৌরবাৎ মঙ্গল মণ্ডনশ্রীঃ<br>সা পস্পৃশে কেবলমিশ্বরেণ।

তবে তাঁহার প্রসাধন সম্পাদিত হইল, কেমন করিয়া?

স এব বেশঃ পরিণেতুবিষ্টং<br>ভাবান্তরং তস্য বিভোঃ প্রপেদে।

কেমন করিয়া হইল? ভস্ম শুভ্র গন্ধানুলেপনের কার্য্য করিল, কপালই শিরোভূষণ হইল, গজচর্ম্মই দুকূল হইল, কপালস্থ তৃতীয় নেত্রই হরিতালময়ী তিলকরচনার কার্য্য করিল, সর্পের মস্তকস্থ মণিসমূহই কঙ্কণাভরণের কার্য্য করিল; কিন্তু সর্পাদির শরীর রূপান্তরিত হইয়া গেল। ললাটস্থ চন্দ্রই চূড়ামণি হইয়া পড়িল। বিধাতা এই রূপ নিজ বিবাহ ব্যাপার সম্পাদনোপযোগী বেশ পরিধান করিয়া খড়্গে নিজ প্রতিবিম্ব দর্শন করিলেন। এটী বীর পুরুষের আচার। বাবুয়ানা নহে।

মহাদেব যাত্রা করিলেন। মাতৃকাগণ সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কালী সকলের পশ্চাতে চলিলেন। এদিকে দেবগণ সেবাবসঃ প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। সময় বুঝিয়া অনুমতিক্রমে তাঁহারা সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। স্বয়ং তেজোপুঞ্জ সহস্ররশ্মি সূর্য্য ছত্রধারী হইলেন, গঙ্গা যমুনা চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু 'জয়' শব্দে মহাদেবের মহিমা গাহিতে গাহিতে উপস্থিত হইলেন। এস্থলে কবি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ত্রিমূর্ত্তির অভেদ গাহিয়া বলিলেন ইঁহাদের ভেদ বাস্তবিক নহে। পৌর্ব্বাপর্য্য নিয়মমাত্র। তৎপর অন্যান্য ইন্দ্রাদি লোকপাল নন্দীদ্বারা আবেদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন

করিলেন। মহাদেব শিরঃকম্পন দ্বারা ব্রহ্মাকে, বাক্যে হরিকে, ঈষদ্ধাস্য দ্বারা ইন্দ্রকে এবং দৃষ্টি মাত্রেই অশেষ দেবগণকে পরিতৃপ্ত করিলেন। পরে হিমবৎ-পুরে উপনীত হইয়া তিনি আচার ব্যবহারে পূজনীয় হিমালয়কে প্রণাম করায় তিনি ত্রৈলোক্যবন্দ্যদ্বারা কৃতপ্রণাম হইয়া লজ্জিত হইলেন। কিন্তু তিনি পূর্ব্বেই শিবের মহিমাতে নিজ শির নত করিয়াছেন। তাহা ঔৎসুক্য বশতঃ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের মহাদেবকে দেখিবার জন্য পুরন্ধ্রীগণের এত ঔৎসুক্য যে তাঁহারা নিজ নিজ কার্য্য ফেলিয়া গমন করিলেন। সে দৃশ্যে তাঁহারা এত মোহিত হইলেন যে বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া গেলেন। তাঁহাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল। কবি বড় সুন্দর করিতায় এই কথা প্রকাশ করিয়াছেনঃ—

তমেক দৃশ্যং নয়নৈঃ পিবন্ত্যো
নার্য্যো ন জগ্মু বিষয়ান্তরাণি
তথাহি শেষেন্দ্রিয়বৃত্তি রাসাং
সর্ব্বাত্মনা চক্ষু রিব প্রবিষ্টা।

তাঁহারা বলিতে লাগিলেন— ইঁহার জন্য পার্ব্বতীর তপশ্চরণ খুব উপযুক্তই হইয়াছিল। ইঁহার স্ত্রী হওয়া ত দূরের কথা ইঁহার দাসীত্ব লাভ করিলেও কৃতার্থা হওয়া যায়। যদি পার্ব্বতীর সহিত ইঁহার মিলন না হইত তবে প্রজাপতির এ দুই রূপসমষ্টির সৃজন বৃথাই হইত। মদনের শরীর ইনি দগ্ধ করিয়াছেন এটা বোধ হয় মিথ্যা। মদন ইঁহাকে দেখিয়া লজ্জাতেই প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। ইঁহার সহিত সম্বন্ধ করিয়া পর্ব্বতরাজের মস্তক আরও উচ্চ-তর হইয়াছে সন্দেহ নাই। এই হইল কালিদাসের শিবের রূপ। তিনি নিজে বিভু, অতএব সর্ব্বরূপধারণক্ষম। তিনি সামান্য বিবাহবেশ করিতে পারিবেন না, উলঙ্গ হইয়া শ্বাশুড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া লোককে আদর্শত্ব শিক্ষা দিবেন এটা যেন কেমন কেমন বোধ হয়।

তৎপর লোকাচার মত যথারীতি বিবাহ হইয়া গেল। আশীর্ব্বাদের সময় ব্রহ্মা পার্ব্বতীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন কিন্তু তিনি বাচস্পতি হইয়াও শিবকে কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না। তৎপর লক্ষ্মী তাঁহাকে পদ্মছত্র ধারণ করিলেন, সরস্বতী স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। তৎপর

দেবগণ মদনের সেবার জন্য করজোড়ে প্রার্থনা করিলেন, মহাদেবও তখন অনুমতি করিলেন। কারণ তাহা না হইলে দেবকার্য্য হয় না।

প্রবন্ধ ক্রমেই দীর্ঘ হইয়া পড়িল। অতএব আর অধিক দূর অগ্রসর হইব না। যে পর্য্যন্ত দেখান গেল তাহাতে শিবের ঈশ্বরত্ব কালিদাসের হস্তে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। ভারতচন্দ্র ও কালিদাসের শিবের প্রভেদ কতদূর তাহা বেশ বুঝা যায়। চরিত্রচিত্রণে কালিদাসের ক্ষমতা অসীম। স্বীয় উপাস্য দেবতার চিত্রঅঙ্কণে সে প্রতিভা আরও উজ্জ্বল আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহা বোধ হয় পাঠকগণ বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন।

এস্থলে একটী কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কালিদাস এ সময়ের লোক নহেন। সুতরাং আজকালকার সংস্কারক মতে পরমেশ্বরের মূর্ত্তি ধরা অসম্ভব মনে করিতেন না। সুতরাং তিনি নিজ বিশ্বাস মতই তাঁহাকে চিত্র করিয়াছেন, তাঁহাকে বিবাহ দিয়াছেন, স্ত্রীর সহিত গৃহস্থালী করাইয়াছেন, সন্তান সন্ততির কথাও বলিয়াছেন। এবিষয় আলোচনা করিতে আমরাও সেই ভাব অবলম্বন করিয়াই তাহার সমালোচনা করিব। নতুবা আজকাল-কার কষ্টি পাথরে ফেলিয়া তাহার উজ্জ্বলতা পরীক্ষা করা কোন মতেই যুক্তি যুক্ত নহে। তবে দেখা কর্ত্তব্য যে তৎকালীন বিশ্বাসের প্রতিকূলে কোন ভাব চিত্রে আরোপিত হইয়াছে কি না। যদি তাহা না হয় তাহা হইলেই হইল। আমরা যাহা দেখিলাম তাহাতে কালিদাসের শিবের পরমেশ্বরত্ব অক্ষুণ্ণই আছে।

তিনি জগৎপূজ্য, জিতেন্দ্রিয়, ন্যায়পর, সেবকবৎসল, ভগবান্, বিভু, ইচ্ছাময়, দেবপূজ্য, তিনি ভারতের বা রামেশ্বরের বা মুকুন্দরামের শিবের ন্যায় কোঁচনীপাড়াবিলাসী লম্পট কোন্দলকারী, সিদ্ধিধুস্তুরপায়ী পরমেশ্বর নহেন। যাহা দ্বারা জাতীয় জীবন উচ্চ আদর্শে গঠিত হইতে পারে সেই চিত্রই প্রশং-সনীয় স্থায়ী সাহিত্যে তাহারই স্থান, কুৎসিত চিত্রে জীবন কলুষিত হয়—জাতীয় সাহিত্যে তাহা স্থান পাওয়ার উপযুক্তও নহে।

বাস্তবিক পরমেশ্বরের সমস্ত গুণ কালিদাসের শিবে বর্ত্তমান। ইহাই যথেষ্ট। আমরাও তাহাই দেখাইতে চাহিয়াছিলাম। নতুবা ভারতচন্দ্রের সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, ভাষানৈপুণ্য ও চিত্রণকুশলতার মর্য্যাদা হানি করা প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

# যামিনী।

## পঞ্চম অধ্যায়।

---

পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য পুত্রকে সঙ্গে করিয়া যামিনীর শ্বশুর পলাশপুর গিয়াছিলেন, শীঘ্র শীঘ্র যামিনীর অবাধ্যতার প্রতিফল দিবার জন্য সংকল্প করিয়াছিলেন—যত শীঘ্র হয় পুত্রের বিবাহ দিয়া গৃহে ফিরিবেন। কিন্তু একটী গুরুতর বিষয়ের জন্য তাঁহাকে বিবাহের পূর্ব্বেই আবার বাটী ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। সংজ্ঞালাভ করিয়া যামিনী যখন দেখিয়াছে বাটীতে আনন্দকলরব নাই, হুলুধ্বনি নাই, লোকজনের গতিবিধি নাই, গৃহ প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় যেমন নীরব নিস্পন্দ থাকে আজিও তেমনি রহিয়াছে, তখন তাহার হতাশ প্রাণে আবার কথঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইয়াছে। ভগ্ন হৃদয়ে আবার যেন একটু বল পাইয়াছে। কিন্তু তাহার সংশয় অপনীত হয় নাই।

শ্বশুর বাটী আসিয়া অবধি বিবাহসম্বন্ধীয় কোন কথা বলেন নাই, শাশুড়ীও কোন কথা তুলেন নাই, শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিতেও তাহার সাহস হয় নাই। কি জানি পাছে তিনি বলিয়া ফেলেন 'বিবাহ হইয়া গিয়াছে।' তাহা হইলে যামিনী কি করিবে? তাহার ধারণা—বিবাহ হয়'ত হইয়া গিয়াছে, আমি কাঁদিব বলিয়া শ্বশুর শাশুড়ী আমার কাছে গোপন করিয়াছেন। আ'জ গভীর রজনীতে যামিনী লুকাইয়া লুকাইয়া তাহার শ্বশুর বিবাহের কথা কিছু বলেন কি না তাহা শুনিবে। সেই জন্য সে আ'জ নিজ শয্যাগৃহে শয়ন করিয়া রজনীর গভীরতার অপেক্ষা করিতেছে, পাছে শাশুড়ীর কোন কষ্ট হয় বলিয়া দিবারাত্রির যাহা কিছু গৃহকার্য্য যামিনীই তাহার অধিকাংশ সম্পন্ন করে। আ'জ মূর্চ্ছা হওয়ায় তাহার শাশুড়ী উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে নিষেধ করিয়াছেন; ইহার পূর্ব্বে কয়দিন শাশুড়ীর কাছেই শয়ন করিয়াছিল, আ'জ ইচ্ছা করিয়া যামিনী নিজ শয়নকক্ষে আসিয়া শয়ন করিয়াছে। জ্ঞানেন্দ্রের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বিরামদায়িনী নিদ্রাও যামিনীর নিকট হইতে বিদায় হইয়াছে, শত চেষ্টাতেও রাত্রিতে তাহার নিদ্রাগম হয় না, আ'জ তথাপি জাগিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছে।

বাটীর ভিতর দক্ষিণদ্বারী যে ঘরখানি, সেই ঘরটী জ্ঞানেন্দ্রের পিতার শয়নাগার; যামিনীর শয্যাগৃহ হইতে তাহা অধিক দূরে নয়, মুখোপাধ্যায় মহাশয় নৈশ আহারাদি সম্পন্ন করিয়া স্বীয় শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে-ছেন রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর হইয়াছে, জ্ঞানেন্দ্রের জননী গৃহকার্য্য সমস্ত শেষ করিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং মৃদুস্বরে স্বামীকে বলিলেন "এতক্ষণ বৌমা'র সাক্ষাতে তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পারি নাই, সত্য সত্যই কি বিয়ে দিয়ে এলে ? তুমি এলে, জ্ঞানেন্দ্র কোথায় ?"

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন, "সে অনেক কথার কথা, সেই কথা ব'ল্‌বার জন্যই আমি এসেছি, এখন তোমার বৌমা ঘুমালেন না জেগে আছেন ?"

"কি জানি, দেখে আসি, বাছার ঘুম কি আছে; সেই মূর্চ্ছার পর শুইয়ে রেখে এসেছি আর তো দেখি নাই !" এই বলিয়া একটী প্রদীপ হস্তে লইয়া গৃহিণী যামিনীর শয্যা গৃহাভিমুখী হইলেন। নিদ্রাবিহীনা যামিনী কি কথা-বার্ত্তা হয় শুনিবার জন্য আপনার নিশ্বাস পর্য্যন্ত রুদ্ধ করিয়া কাণ পাতিয়াছিল; শ্বশুর শাশুড়ীতে যে কথাবার্ত্তা হইল তাহা সে শুনিতে পাইল; তাহাকে জাগরিত দেখিলে পাছে সংশয়চ্ছেদে ব্যাঘাত ঘটে এই ভয়ে সে নিদ্রার ভানে নয়নযুগল মুদ্রিত করিল। গৃহিণী গৃহপ্রবেশ করিয়া ডাকিলেন "বৌমা !" যামিনী উত্তর দিল না। আবার ডাকিলেন সে বারও উত্তর নাই। তখন তিনি নিকটে আসিয়া যামিনীর গায়ে হাত দিলেন ; দেখিলেন—সর্ব্বাঙ্গ স্বেদ-জলে পরিপ্লুত ! "আহা ! বাছা আমার এক গা ঘেমেছে, জান্‌লাটীও খুলে দেয় নাই" এই বলিয়া তিনি যামিনীর মাথার কাছের জান্‌লাটী খুলিয়া দিয়া, পুনঃ-রায় স্বামীর নিকট গমন করিলেন। বলিলেন "কয়দিনের পর বাছা আ'জ একটু ঘুমাইয়াছে।"

কর্ত্তা। উত্তম, এখন আমি কয়টী কথা বলি, স্থির হ'য়ে শোন।

গৃহি। শুন্‌বো, আগে বল বিয়ে হ'য়ে গিয়েছে কিনা ?

কর্ত্তা। না বিবাহ এখনও হয় নাই, সমস্ত আয়োজন ঠিক্ হয়েছে, এখন কেবল সাতপাকটা ঘুর্‌লেই হয়।

গৃহি। তবে তুমি এর মধ্যে চলে এলে কেন ?

কৰ্ত্তা। তাই তো বল্‌ছি, শোন, প্রথম কথা হ'চ্ছে তুমি আগে বল আমার একটী কথা তুমি রাখ্‌বে ?

গৃহি। তুমি আগে বল, আমার একটী কথা তুমি রাখ্‌বে ?

কৰ্ত্তা। কোন কথাটা তোমার না রাখি ? বল কি কথা।

গৃহি। রাখ্‌বো—বল—

কৰ্ত্তা। আচ্ছা, রাখ্‌বো, বল ;

গৃহি। রাখ্‌বে ? তবে শোন, জ্ঞানের বিয়ে তুমি দিও না, সম্বন্ধ ভেঙ্গে দাও, এর মধ্যে কি বৌমার ছেলে হবার বয়স গিয়েছে।

কৰ্ত্তা। হা হা, এ অনুরোধ কি তোমার করা উচিত ; তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি বড় কম, একটী মাত্র পুত্র তার সন্তান সন্ততি না হ'লে বংশরক্ষা কেমন ক'রে হবে। পিতৃপুরুষেরা কি এক গণ্ডূষ জল অভাবে হা হা ক'রে ম'র্‌বে ?

গৃহি। বালাই, ও কথা মুখে এন না, আমি নিশ্চয় বল্‌ছি বৌমার আমার ছেলে হবে, সবারই কি এক বয়সে ছেলে হয় ? নাপিতদের মানদার যে ত্রিশ বছরে ছেলে হ'ল, ফকিরের বৌয়ের যে আটা'শ বছরে হ'ল, বৌ'মার তো যেটের এই চব্বিশ বছর।

কৰ্ত্তা। তুমি তো মস্ত একটা গণৎকার ! ছেলে হবার যদি আশা থা'ক্‌তো, তাহ'লে কি আমি বিয়ের জন্য জেদ ক'র্ত্তাম, না জ্ঞানেন্দ্রই স্বীকার ক'র্ত্তো ; এখন ওসব কথা ছেড়ে দাও, কাজের কথা বলি, শুন।

গৃহি। আমার আর কাজের কথায় কাজ নাই ; তোমার যে এমন পাষাণের শরীর তা আমি জা'ন্‌তাম না, এমন সতী লক্ষ্মী বৌটীকে তুমি একটী দিনের জন্য সুনজরে দে'খ্‌লে না, সে ছেলে মানুষ, সে তোমার কি দোষ ক'রেছে, তার উপর তোমার এত দ্বেষ কেন ?

কৰ্ত্তা। আমার দ্বেষটা তুমি দে'খ্‌লে কিসে ? বৌমা'র মুখপানে চেয়ে তো পিণ্ডিলোপ ক'র্‌তে পারিনে ?

গৃহি। তা পার আর না পার, আমার একটা অনুরোধ তুমি রাখ ; এখন বিয়ে দিও না, আরও দুই এক বছর দেখ, ছেলে না হয় তখন যা ভাল হয় তাই করা যাবে।

কর্ত্তা। বেশ্ তোমার বুদ্ধি বটে, সেখানে জ্ঞানেন্দ্র থা'ক্‌লো হাতে সুতা বেঁধে, আর আমি বলি কিনা 'এখন বিয়ে হবে না', তা'হলে তারাই বা মনে ক'র্‌বে কি আর জ্ঞানেন্দ্রই বা মনে ক'র্‌বে কি ?

গৃহি। জ্ঞানেন্দ্র আর কি মনে ক'র্‌বে; তার কি ইচ্ছে যে সে বিয়ে করে, তোমারই উপরোধে না রাজী হ'য়েছে; সে যদি কিছু মনে করে, সে ভার আমার থা'ক্‌লো—সে তো আমার পেটের ছেলে, আমি তাকে ব'লে ক'য়ে বুঝাবো।

কর্ত্তা। সে সব হবে না, ওসব পাগলামি ছেড়ে দাও, এখন আমার কথাটা শুন।

গৃহি। তোমার কথা আমি কবে না শুনেছি, কিন্তু বাছার সেই কাঁদ কাঁদ মুখখানি মনে ক'রে তোমার কোন কথা শুন্‌তে ইচ্ছা ক'র্‌ছে না, আমার মাথা খাও, তুমি অমন সোণার প্রতিমার গলায় সতীনকাঁটা বিঁধে দিও না, অমন রাজলক্ষ্মীকে তুমি আর কাঁদাও না।

কর্ত্তা। আঃ তুমি যে জ্বালাতন ক'র্‌লে, আর কি আমার হাত আছে ? যে অনুরোধ থাক্‌বে না, সে অনুরোধ তোমার মিছে করা; সেখানে বিবাহের সমস্ত আয়োজন ঠিক হ'য়েছে, লগ্ন পর্য্যন্ত স্থির হ'য়ে গিয়েছে, এখন কেবল মাত্র আমার যাওয়ার অপেক্ষা। কাল অধিবাস, পরশু বিবাহ।

গৃহি। পরশু যদি বিবাহ, তবে এর মধ্যে আবার ধেয়ে এলে কেন ? বুঝি সুসংবাদ শুনাতে এসেছ ?

কর্ত্তা। বড় বিপদে পড়ে এসেছি, সেখানে গ্রামশুদ্ধ লোকে ধ'রেছে, কিছু অলঙ্কার চাই, আমিও বিবেচনা ক'রে দে'খলাম কিছুখানা অলঙ্কার না দেওয়া-টাও ভাল দেখায় না। তবে কি না এ অল্প সময়ের মধ্যে অলঙ্কার হ'য়ে উঠাই কঠিন। বিশেষঃ জান্‌ছোই তো ট'কা কড়ির টান !

গৃহি। টান্ তো বটে, এত কিছু কন্যাদায় নয়, ছেলের বিয়েও কিছু গলায় লাগে নাই, তুমিই তো সাধ ক'রে হুজুক তুলেছ এখন তার কি কর্ত্তে হবে ?

কর্ত্তা। ক'র্ত্তে হবে এই—বৌমার যে অলঙ্কার গুলি আছে—সব গুলি নয়, তার মধ্যে বেছে বেছে খান কতক আমাকে দাও, বিবাহের পর আবার ফিরে দিলেই হবে।

গৃহি। ছি, ছি, তোমার কি কোন আকেল নাই, একথা তুমি মুখ দিয়ে বা'র ক'র্‌লে কেমন কবে ?

কর্ত্তা। কেন ? তা দোষ কি ? গহনা তো সময় অসময়ের উপকারের জন্যই।

গৃহি। এই বুঝি তোমার অসময়ের উপকার ? গায়ের গয়না সতীনকে দেবে ? দায় পড়েছে তার, বেটার বিয়ে দেবে যেখানে খুসী সেইখান হ'তে এনে দাও গে।

কর্ত্তা। আঃ—শুন শুন, অত উতলা হও কেন ? তোমার বৌমাকে বল, আপনিই দেবে, দিবে কেন—দিতেই হবে, যার খাবে পর্‌বে বিপদের সময় তার মুখপানে চেয়ে দে'খ্‌বে না ?

গৃহি। কি তোমার বিপদ তাই সে গয়না বা'র ক'রে দিবে, আর সে গয়না কি তুমি দিয়েছ ? তার বাপ মা তাকে দিয়েছে, তা তুমি চাবে কোন মুখে ?

কর্ত্তা! যেই দি'ক মূল কথা গয়না আমার চাই, নইলে সেখানে আমার মুখ দেখান ভার হবে, তুমি আমার নাম ক'রে তাকে বল—সব না দেয় বালা, চিক আর অনন্ত এই তিন খানা দি'ক, আমি কাল ভোরেই যেন নিয়ে রওনা হ'তে পারি।

গৃহি। তোমার নাম ক'রে বল্লে যে সে দেবে তা আমি জানি, সেকি ভাল মন্দ ছল চাতুরী কিছু জানে ? সে গয়না দেবে বটে কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার বুক যে ফেটে যাবে তাকি তুমি বুঝতে পার্‌ছো না ?

কর্ত্তা। এতে আর বুক ফাটা ফাটি কি আছে ?

গৃহি। হা-নিষ্ঠুর ! তুমি তা বুঝবে কোথা হ'তে ?

গৃহের অন্ধকারময় ছায়ায় লুকাইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া অশ্রুপ্লাবিতা যামিনী এই কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল, তাহার মনে যে কি ভাব হইতেছিল তাহা যিনি যামিনীর অদৃষ্টলিপির নিয়ন্তা তিনিই বলিতে পারেন। সে উদ্বেলিত হৃদয়োচ্ছ্বাস অতি কষ্টে সংযত করিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতেছিল, অন্তরের রোদনধ্বনি অতি কষ্টে চাপিয়া রাখিতেছিল; আর বুঝি পারিল না ছুটিয়া আপন শয়নকক্ষের ভিতর প্রবেশ করিল, উপাধানের উপর মুখ লুকাইয়া

ফুকরিয়া ফুকরিয়া ডাকিল 'মাগো! তুমি কোথায়? মা, তুমি যেখানে আছ আমাকে সেইখানে তুলিয়া লও, আমি আর সহিতে পারিতেছি না।' অগাধ দুঃখরাশির মধ্যে পড়িয়া অনেক দিনের পর যামিনীর মা'কে মনে পড়িল।

জানি না আকাশের জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের হৃদয় আছে কিনা? যামিনীর নিদারুণ দুঃখে তাহারাও বুঝি কাঁদিল, তাহারাও বুঝি শিশির ছলে নয়নজল বর্ষণ করিল; যামিনী উদ্দেশ্যে স্বামীকে ডাকিয়া বলিল "স্বামিন্! তুমিই আমার কণ্ঠহার, তুমিই আমার সর্ব্বাঙ্গের অলঙ্কার! আমার রূপ তুমি, যৌবন তুমি, লাবণ্য তুমি, কান্তি তুমি; তোমার স্নেহই এ হতভাগিনীর জীবনের সর্ব্বস্ব! আমি অলঙ্কার লইয়া কি করিব, তোমার পরিতৃপ্তির জন্যই এ ঘৃণিত দেহ অলঙ্কার দিয়া সাজাইতাম। আমি তোমার, আমার সর্ব্বস্ব তোমার; তোমার সামগ্রী তুমি লইবে তাহাতে আমার দুঃখ কি? তোমার স্নেহ ভালবাসা পাইলে আমি স্বর্গের অধিশ্বরী, আর যদি চরণে ঠেল নাথ! তাহা হইলে এ দুঃখিনীর এ জগতে আর দাঁড়াইবার স্থান নাই।"

প্রাতঃসূর্য্যকরে জগৎ যখন আলোকিত হইয়াছে, যামিনী তখন আপনার সমস্ত অলঙ্কার গুলি আনিয়াই শ্বশুরের চরণ সমীপে রাখিয়া প্রণাম করিল, ঐ যে শিশিরবিন্দুর ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তাফল গুলি যাহা যামিনীর নয়ন হইতে ঝরিয়া সুবর্ণ অলঙ্কার গুলির সৌন্দর্য্য বাড়াইয়াছে, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লোলদৃষ্টি সে দিকে আর নিক্ষিপ্ত হইল না, ব্যস্তভাবে অলঙ্কার গুলি তুলিয়া লইয়া বস্ত্রান্তরালে বাঁধিলেন, যামিনীর প্রণাম জন্য আশীর্ব্বাদ করিলেন "সুখে থাক

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

---

# বাঙ্গালা ভাষার লেখক।

বাঙ্গালা ভাষার লেখক-সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে; কিন্তু পাঠক-সংখ্যা বোধ হয় এখনও আশানুরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই। বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের দুর্গতি দেখিয়া মনে হয়,—পাঠকের অভাবেই এতগুলি ভাল ভাল মাসিক পত্রিকা অকালে লীলা সংবরণ করিয়াছে! বঙ্গদর্শন, জ্ঞানাঙ্কুর, আর্য্যদর্শন,

বান্ধব, প্রচার, নবজীবন, সাধনা এবং এইরূপ আরও কত উচ্চশ্রেণীর সাময়িক সাহিত্য প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু এমন উপাদেয় পত্রিকাগুলিও অকালে বিসর্জ্জন দিতে হইল! যে দেশের পাঠকসমাজের হতাদরে এরূপ পত্রিকাগুলিও লয়প্রাপ্ত হইল, সে দেশে মাতৃভাষার ক্রমোন্নতির আশা কি এখনও বহুদূরবর্ত্তী নহে?

আমরা যতই বিলাপ করি, সংবাদপত্রে মাসিক পত্রিকায়, সভামণ্ডপে দশ-জনের মুখের কাছে হাত নাড়িয়া যতই হায়! হায়! করি, কিছুতেই কিছু হয় না,—বাঙ্গালা ভাষার লেখকের অভাব নাই, কিন্তু পাঠক কোথায়? লেখকের দল সমস্বরে পাঠকের অত্যাচারকেই বঙ্গসাহিত্যের ক্রমোন্নতির অন্তরায় বলিয়া প্রচার করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাহাই কি যথার্থ সিদ্ধান্ত? আমি একজন বঙ্গভাষার পাঠক;—আমি পাঠকের হইয়া দুই চারি কথা বলিতে চাহি।

তৈলাধার পাত্র কি পাত্রাধার তৈল তাহার এখনও মীমাংসা হয় নাই; কিন্তু তজ্জন্য কাহারও কিছু আসে যায় না। লেখকের অত্যাচারে পাঠক পলায়ন করেন, কি পাঠকের অত্যাচারে লেখক পলায়ন করেন,—এ তর্কের একটা নিরপেক্ষ মীমাংসা হওয়া আবশ্যক; কেন না, তাহার সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি অবনতির ঘনিষ্ঠ সংস্রব।

সুন্দর দ্রব্যের জন্য মানবমনে এক স্বাভাবিক অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়; যাহা সুন্দর—সে চিত্র হউক, শিল্পকৌশল হউক, সঙ্গীত হউক, সাহিত্য হউক—মানুষ তাহাকে পাইবার জন্য, সম্ভোগ করিবার জন্য, আত্মীয় অন্তর-ঙ্গের কাছে প্রদর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকে। এই স্বাভাবিক অনু-রাগ যে এদেশ হইতে একেবারে পলায়ন করে নাই, বাঙ্গালীর দৈনিক জীবনে তাহার শত শত প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

অন্যান্য সুন্দর বস্তুর ন্যায় সুন্দর সাহিত্যকেও বাঙ্গালী হতাদর করে না,—ইহার প্রমাণ চাহ ত একবার শিক্ষিত বাঙ্গালীর গৃহসজ্জার মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখ,—গৃহস্বামীর যেরূপ রুচি তদনুরূপ দুই চারি খানি ইংরাজী সাহিত্য দেখিতে পাইবে। তাঁহার বিশ্বাস, বাঙ্গালা সাহিত্যে কিছু নাই; কেবল সেই জন্যই বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার রুচি হয় না!

এজন্য গৃহস্থকে নিন্দা করিয়া ফল নাই। কেন এরূপ ধারণা হইয়াছে,

তাহারই অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। জ্ঞানার্জ্জনের জন্য যাঁহারা বিদ্যার্জ্জন করেন, তাঁহাদের জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা ও পাঠানুরাগ জীবনে কখনও পরিত্যক্ত হয় না। অন্নপানের ন্যায় অধ্যয়ন চিরজীবনের সঙ্গী হইয়া থাকে। তাই তাঁহাদিগকে চিরজীবন নূতন নূতন মানসিক খাদ্যের সন্ধান লইতে হয়; স্বদেশে দুর্ভিক্ষ হইলে বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। বাঙ্গালী এখনও জ্ঞানার্জ্জনের জন্য বিদ্যাশিক্ষা করে না;—বিদ্যা এখনও কেবল অর্থকরী, সুতরাং সংসারে প্রবেশ করিবার পর অর্থোপার্জ্জনই বাঙ্গালী জীবনের লক্ষ্য হইয়া পড়ে। সেই অর্থোপার্জ্জনের জন্য যদি পুস্তক, পত্রিকা বা সংবাদপত্র পাঠ করা আবশ্যক হয়, বাঙ্গালী তাহাতে পশ্চাদ্‌পদ হয় না; কিন্তু কেবল ঐ পর্য্যন্ত। বঙ্গসাহিত্যে এমন কোন্ গ্রন্থ লিখিত ও প্রকাশিত হইতেছে যে তাহা অধ্যয়ন করিলে উকিলের ওকালতি-পসার ফলাও হইয়া পড়িবে, ডাক্তারের ডাক্তারী বিদ্যা উন্নত হইয়া উঠিবে, গুরুশ্রমক্লিষ্ট কেরাণীর চাউলের দর কিছু সস্তা হইয়া দাঁড়াইবে? ইংরাজি না পড়িলে—সর্ব্বদা চর্চ্চা না রাখিলে—পড়া বিদ্যাও ভুলিয়া যাইতে হয়, তাই ইংরাজিভাষাজ্ঞানটা দোরস্ত রাখিবার জন্য সকলেই দু চারি খানি ইংরাজী কেতাব, ইংরাজী সংবাদপত্র কাড়াকাড়ি করিয়া পড়িয়া লই। যে সকল গ্রন্থের বিবরণ অজ্ঞাত থাকিলে অর্থোপার্জ্জনে বিশেষ অসুবিধা তেমন শ্রেণীর আইন নজীর বা ডাক্তারী কেতাব—নীরস হউক, শুষ্ক কঠোর হউক, মনে রাখা নিতান্ত দুরূহ হউক—তথাপি আমরা তাহার একখানিও ছাড়ি না। ইহার বাহিরে যদি কিছু থাকে তাহা আমাদের অপাঠ্য—কে তাহা ক্রয় করিয়া অর্থ নষ্ট করিবে, কেই বা তাহা পাঠ করিয়া সময়ের অপব্যয় করিতে সম্মত হইবে? ইহা যে কেবল মানসিক ধারণা তাহাই নহে;—প্রতিদিনের কার্য্যেও ইহা সবিশেষ পরিস্ফুট!

বাঙ্গালীর এইরূপ মতি গতিও অকারণজাত নহে, কিন্তু এখানে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এইরূপ মতি গতি আছে বলিয়া গৃহস্থের নিকট হইতে বঙ্গসাহিত্য সমাদর লাভ করিতেছে না। বঙ্গসাহিত্যের কি তবে কিছুমাত্র সমাদর নাই? তাহা ঠিক নহে। সম্প্রদায় বিশেষের নিকট তাহার বিলক্ষণ সমাদর আছে,—সে সম্প্রদায় অবরোধকারানিবাসিনী বঙ্গকুলরমণী, এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থভারগ্রস্থ দুর্ব্বল বালক। ইহারা নানা কারণে বঙ্গ-

সাহিত্যের জন্য লালায়িত। বঙ্গসাহিত্য ভিন্ন অন্য সাহিত্যে ইঁহাদের অধিকার অল্প, তাই ইঁহারা প্রাণপণে বঙ্গসাহিত্য পাঠ করে, কিন্তু ইঁহাদের পাঠের এত প্রবৃত্তি কেন তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, সময়ক্ষেপণ ও চিত্তবিনোদন ভিন্ন জ্ঞানার্জ্জন ইঁহাদিগেরও লক্ষ্য নহে। কুলরমণীগণ যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া অবসর সময়ে দুই চারি খানি পুস্তক পাঠ করিয়া সময়-ক্ষেপণ ও চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করিয়া থাকেন; বিদ্যালয়ের যুবকগণ বহু-সংখ্যক অপাঠ্য বা অশান্তিজনক পাঠ্যপুস্তকের অধ্যয়নে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া সাময়িক চিত্তবিনোদনের জন্য বঙ্গসাহিত্যের রসাস্বাদন করিতে ধাবিত হন। ইঁহারা সকলেই অল্পাধিক মাত্রায় পরমুখাপেক্ষী,—বঙ্গসাহিত্য পাঠ করিবার আগ্রহ থাকিলেও অর্থদানে বঙ্গসাহিত্যকে উপকৃত করিতে অক্ষম। যাঁহারা অর্থদানে সক্ষম, তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন; যাঁহারা বঙ্গ-সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান ভক্ত তাঁহারা পরমুখাপেক্ষী সুতরাং বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে দরিদ্র—অধিক ব্যয় বহন করিতে পারেন না।

এই সকল কারণে বঙ্গ-সাহিত্যে কেবল একশ্রেণীর সাহিত্যেরই ক্রমোন্নতি হইতেছে,—ইহা সুলভ, সাময়িক চিত্তবিনোদন মাত্রই ইহার প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং যে সকল গ্রন্থে গভীর গবেষণা, বহুতত্ত্বানুসন্ধানের প্রাণপণ চেষ্টা, এবং প্রাচীন বা আধুনিক জ্ঞানসংকলনের প্রয়াস, সে সকল গ্রন্থ যে হতাদৃত হইবে, তাহা স্বাভাবিক। বাঙ্গলা মাসিক পত্রিকায় বা সচরাচর প্রচলিত সাহিত্য ইতিহাসে যাহা বাহির হয় তাহার জন্য আর বাঙ্গালা নিকৃষ্ট অনুকরণ পড়িয়া কি হইবে—মূল গ্রন্থই ত আমাদের অনায়াস লভ্য! এই জন্য বঙ্গসাহিত্যের এত হতাদর। আবার এই জন্যই বঙ্গসাহিত্যে কেবল কাব্য উপন্যাসের এত সমাদর!

সস্তা করিতে গিয়া, মনোরঞ্জন করিতে গিয়া, গ্রাহক সংগ্রহ করিতে গিয়া, বঙ্গসাহিত্যসংসারে যে সকল কবিতা, উপন্যাস ও রঙ্গরস স্থানলাভ করিতেছে, তাহাতেই বেশ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে বাঙ্গালীর সাহিত্যানুরাগের প্রবৃত্তি ও মূল্য কত যৎসামান্য। যাঁহারা এই যৎসামান্য সাময়িক সাহিত্য প্রচার করিতেছেন তাঁহাদের অত্যাচারেই বাঙ্গালা সাহিত্য শিক্ষিত সমাজে এত হতা-দর প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু সুলভ সাহিত্যে অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা থাকায়,

তদ্দ্বারা পাঠক অপেক্ষা অসংখ্য সুন্দরী পাঠিকার চিত্তবিনোদনের প্রলোভন থাকায়, এই শ্রেণীর জঘন্য সাহিত্যের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

---

# আকাশ।

১

অসীম দিগন্তব্যাপী অনন্ত বিকাশ,
সমভাবে সর্ব্বকাল সর্ব্বত্র প্রকাশ।
আকাশ তোমার নাম, শাস্ত্রের আভাষ
তোমাতে স্থাপিত বিশ্বস্রষ্টার নিবাস।

২

সত্য সত্য আছে কি হে হেন কোন স্থান
নিয়ত করেন বাস যথা ভগবান?
শুনি ত তাঁহার কাছে সকল(ই) সমান,
স্থিতি সর্ব্বঘটে, তবে কিসে তব মান?

৩

করেছি সিদ্ধান্ত আমি ভাবিয়া বিস্তর,
তোমাতেই সর্ব্বব্যাপী আছেন ঈশ্বর।
মোক্ষধাম পরলোক পরীক্ষার স্থল,
মৃত্যুশেষে মানবের তুমি সে সকল।

৪

সর্ব্বোচ্চ বলিয়া কেহ তোমাকে আদরে,
স্বর্গনামে শতবার প্রণিপাত করে।
কেহ পুনঃ শূন্য বলি উড়ায় হাসিয়া,
ঠিক যথা করে লোকে ঈশ্বর লইয়া।

৫

কি তব প্রকৃতি তাহা না জানে মানব,
ইন্দ্রিয়ে না করিবারে পারে অনুভব।
অশব্দ অস্পর্শ তুমি অরূপ অব্যয়,
স্পৃষ্ট, দৃষ্ট, শ্রুত যত সর্ব্বের আলয়।

৬

অনাদি, অনন্ত তব বিরাট আকার।
কল্পনার বহির্ভূত, দৃষ্টি কোন ছার।
অনাদি অনন্ত তুমি ব্যাপিয়া সময়ে।
আছিলে সৃষ্টির পূর্ব্বে, রহিবে প্রলয়ে।

৭

উচ্চাদপি উচ্চ তুমি অন্তরীক্ষপরে।
নিম্নাদপি নিম্ন পুনঃ ভূগর্ভবিবরে।
জীবদেহঘটে কিংবা নিভৃত কন্দরে,
ব্যাপ্তি তব ব্যোমসিন্ধো, সর্ব্ব চরাচরে।

৮

গ্রহ উপগ্রহ যত আর তারাগণ
ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া নরে করে যে কীর্ত্তন,
সকল(ই) তোমাতে স্থিত, কে বলিবে আর
এ হেন ব্রহ্মাণ্ড কত উদরে তোমার।

৯

"ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম" পদ যে সাধিল
মূঢ় সে, প্রকৃত জ্ঞান তার নাহি ছিল।
স্থাপি শেষে তোমাবে সে ভূতে মিশাইল।
সর্ব্বভূতাধার তুমি মনে না ভাবিল।

১০

পারে কি মৃত্তিকা, জল, অনিল, অনল,
তিষ্ঠিবারে ক্ষণমাত্র বিনা তব বল?
তুমি পাত্র, সব বিনা, ওহে সর্ব্বাধার
ক্ষিত্যপ্তেজোমরুত্তব রূপের বিকার।

১১

স্থাবর জঙ্গম যত স্থাপিত তোমায়,
ঘুরিতেছে অবিরত চক্রনেমি প্রায়।
মিশিয়া তোমাতে লয় না পাবে যাবৎ,
ঘুরিবে, ঘুরাবে তুমি সকলে তাবৎ।

১২

সমভাবে দশদিকে বিস্তৃতি তোমার।
জাগ কিন্তু সদা শিরোপরি সবাকার।
নরলোক চন্দ্রলোক সূর্য্যালোক কিবা
সকল(ই) তোমারে উচ্চে হেরে রাত্রিদিবা।

১৩

তাই বলি সর্ব্বদৃষ্ট সর্ব্বসাক্ষী তুমি,
নিশ্চয় সে নিয়ন্তার নিত্যবাসভূমি।
নতুবা এ ঐশ্বরিক গুণসমাচার
কেন রহে একাধারে? অন্যে নাহি আর।

১৪

পাইয়াছি আর(ও) এক অকাট্য প্রমাণ,
বুঝিয়াছি যাহে, ব্যোম, তুমি নিত্যস্থান।
বিপদের কালে কিংবা হলে মৃত্যুভয়,
তোমা ভিন্ন অন্যপানে দৃষ্টি নাহি বয়।

১৫

পড়িয়াছি অর্ণবের ভীষণ তরঙ্গে,
যুঝে যবে ক্ষুদ্রপোত ঝটিকার সঙ্গে,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভাবি প্রাণ বুঝি যায়,
ঊর্দ্ধ বিনা অন্যদিকে নেত্র নাহি ধায়।

১৬

ঘেরে যবে চারিদিকে শত্রু অগণন,
মৃত্যু ভিন্ন অন্য পথ নাহি দেখে মন।
পার্থিব যতেক চিন্তা যায় পলাইয়া।
রহে প্রাণ সে সময়ে তোমারে হেরিয়া।

১৭

সহিয়া বিপদ বিঘ্ন দুঃখ অনুক্ষণ
সংসারে বিতৃষ্ণা ঘোর জনমে যখন
ভূতলের যাহা কিছু হয় বিষময়,
একমাত্র তুমি ব্যোম প্রিয় সে সময়।

১৮

রাখে নর কত চিন্তা লুকায়ে অন্তরে,
কেহ কিন্তু তোমারে না অবিশ্বাস করে।
পাপী যবে অনুতাপে শান্তিহারা হয়।
আত্মগ্লানি মনোদুঃখ তোমারে সে কয়।

১৯

সবল দুর্ব্বলে যবে করে অত্যাচার,
তোমা পানে চেয়ে আর্ত্ত করে হাহাকার
প্রতিকার-প্রার্থনা সে করে মনে মনে,
চাহিয়া তোমার(ই) দিকে কাতর নয়নে।

২০

না থাকিলে হৃদিসখা তোমাতে সতত
ধায় কি মানবমন শূন্যপানে স্বতঃ?
ভাবী পরীক্ষার স্থল হও তুমি বলে
পড়ে দৃষ্টি তোমা প্রতি মৃত্যুভয় হলে।

২১

ভাবুক' তোমারে তুচ্ছ নীরস বিজ্ঞান,
শূন্য বলি কত মতে করুক প্রমাণ।
আমি বুঝিয়াছি ধ্রুব তুমি স্বর্গধাম।
নতচিত্তে শতবার করিহে প্রণাম।

শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

# উকিল-নীতি।

সুহৃদ্বরেষু—

সাহিত্য-ক্ষেত্রে মহারথীর অভাব নাই, কবি, ঐতিহাসিক, উপন্যাস-লেখক, ভ্রমণকারী, বৈজ্ঞানিক,—বাঙ্গলা ভাষার লেখক যথেষ্ট। রাজনৈতিক সংগ্রামেও বক্তা ও লেখকের অভাব নাই, তবে এই 'বিলটা' পাশ হইলে কতদূর কি হয় বলিতে পারিতেছি না: কারণ বাঙ্গালী রাজনৈতিকের জীবন ক্ষণভঙ্গুর, একটু আরক্ত লোচনেই তাহার মৃত্তিকাভাণ্ড শতধা বিভক্ত হইয়া যায়, তাহা ছাড়া অন্য মোলায়েম ব্যবস্থাও আছে, একটু দাম্ দিতে, একখানি সোণার গিল্‌ট-করা ভোঁতা তলওয়ার দিলেই সব চুপ।

আমি কোন দলাদলির মধ্যেই নাই, ঘরের কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকি। যখন নিতান্তই আপনাদের তাড়নায় গৃহে তিষ্ঠান ভার হয়, তখন যাহা হয় দুই কলম লিখিয়া দিয়া দীর্ঘ নিদ্রার আয়োজন করি। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই দীর্ঘ নিদ্রার অনেক ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে। এই একটু লেখাপড়া শিক্ষাই সব গোল করিয়া দিয়াছে, এই সামান্য লেখাপড়া না শিখিলে চাষবাস করিতাম, কি মুদিখানার দোকান করিতাম, আপনার দেশের কোন ধারই ধারিতাম না, আপনিও ডাকিয়া একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেন না; বেশ নির্ব্বিবাদে দিন কাটিয়া যাইত।

ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের পড়াশুনা শেষ করিয়া যখন কলিকাতায় আসি, তখন কলিকাতার শোভা সৌন্দর্য্য দেখিয়া যত মুগ্ধ না হইয়াছিলাম, সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতায় তাহা অপেক্ষা অনেক গুণে অধিক উন্মত্ত হইয়াছিলাম; তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য পদব্রজে বাগবাজার হইতে ভবানীপুর পর্য্যন্ত যাইতাম এবং ঘন করতালি আমরাই দিতাম। ইহার জন্য কলিকাতা অঞ্চলের ছেলেদের কাছে আমরা ভাল Compliments পাইতাম; তাহারা বলিত "এই বাঙ্গাল গুলো না থাকলে কলিকাতার অর্দ্ধেক সভাই মাটী হইত।" সে যাই হো'ক সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা শুনিয়া যে স্বদেশপ্রেম আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ

করিয়াছিল, তাহার কিছুও যদি এখন না থাকে, তবুও সে জ্বলন্ত উৎসাহের স্মৃতিটুকু আছে। এই স্মৃতিটুকুই মহাশয়। মধ্যে মধ্যে নিদ্রার ব্যাঘাত করে। এই স্মৃতির তাড়নায় 'উৎসাহে' রাজনীতি লিখিয়াছিলাম। আপনি এখন অন্য একটা 'নীতি'র ফরমাইস করিয়াছেন। তথাস্তু।

ঐ যে গৌরবর্ণ দাড়িচসমাধারী যুবকটি ফরাসের উপর বসিয়া রাইটিং ডেস্ক-সম্মুখে বসিয়া আছেন, আর চারিদিকে ফরাসের উপর, ভূমিতলে, বারান্দায় পিপাসিত সহস্র চক্ষু তাঁহারই বাক্যামৃত পান করিবার আশায় বসিয়া আছে, উনি কে যদি জানিতে চাও, তাহা হইলে ঐ যে ছিন্ন মলিন বস্ত্রপরিহিত রুক্ষকেশ রামমোহন পরামাণিক একরাশি কাগজ বগলে দাঁড়াইয়া আছে উহাকে জিজ্ঞাসা কর। রামমোহন কাতর স্বরে বলিয়া দিবে "উনি উকিল বাবু, যথাসর্ব্বস্ব দিয়া ঐ বাবুটীর নিকট হইতে এই কয়খানি রায় ফয়সালা পাইয়াছি, এই কাগজ কয়খানি আর ঐ উকিল বাবুর পদধূলি সম্বল করিয়া এখন একবার হাইকোর্টে আপিল করিবার আয়োজন করিতে হইবে।" রামমোহনের অন্দর বাড়ীর পাশে একটা বাঁশের ঝাড় ছিল, রামমোহন বলেন ওটী তাঁর সীমানায়, রামমোহনের জেঠতুতো ভাই হরেকৃষ্ণ বলেন ওটী তাঁর। এমন একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার কি সহজে নিষ্পত্তি হয়, আর গ্রামে কি তেমন নিরপেক্ষ লোক আছে? কাজেই জেলায় যাইতে হইল। রামমোহনের যে গ্রামে বাড়ী, সে গ্রাম সদর মুনসেফীর অধীন। রামমোহন জেলায় যাইয়া আর ছোট উকিলের কাছে কেন যাইবে, একেবারে একটা প্রকাণ্ড পাশ করা জয়পতাকাধারী উকিল বাবুর নিকট উপস্থিত।

জানুয়ারী মাস, উকিল বাবু আজ তিন চারি দিন হইল সবে কন্‌গ্রেস হইতে দেশে ফিরিয়াছেন, এখনও সুরেন্দ্র বাবু, ব্যানার্জ্জি সাহেব, মদনমোহনের কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, এখনও তাঁহারই কন্‌গ্রেসবক্তৃতা সহরে সহরে স্কুল কলেজের ছাত্রেরা পড়িতেছে "Litigation is the curse of the country" অথবা এমনি একটা কিছু। রামমোহন পরামাণিক উকিল বাবুর নিকটে মোকদ্দমার বিবরণ বলিল, উকিল বাবু কিছুক্ষণ গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর সম্মুখের একখানি আইনের দুই চারি পৃষ্ঠা উল্টাইলেন, (N. B সেই সময়ে আমাদের সতীশ সেখানে বসিয়াছিল, সে আমাকে

গোপনে বলিয়াছে আইন খানি Mahomedan Law of Inheritance.) তাহার পর রামমোহনের মুখের দিকে চাহিয়া একটা নাতিদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন 'তাই ত হে! এ ভারি কঠিন মোকদ্দমা, অনেক আইন নজীর ঘাঁটিতে হইবে। তা হো'ক, মোকদ্দমা তোমাকে জিতাইয়া দিব; তা জান কি, আমি মুনসেফ বাবুদের কোর্টে বড় একটা যাই না, তার কি বল?" রামমোহন অবিলম্বেই সে অসুবিধা দূর করিয়া দিল। তাহার পর আদালতের কৃপায়, মুনসেফ বাবুর অনুগ্রহে ৮ বার মোকদ্দমার দিন পরিবর্ত্তন হইল, শেষে যদি বা মোকদ্দমা আরম্ভ হইল তখন আজ একটা সাক্ষীর জবানবন্দী, আগামী কল্য আধখানা, এমনি করিয়া তের দিন ধরিয়া মোকদ্দমা হইল। তাহার পরে রায় প্রকাশ হইল, রামমোহন মোকদ্দমা হারিয়াছে। ক্ষেতে যে ধান হইয়াছিল, যাহা রামমোহনের সারা বৎসরের সম্বল, সে সব বিক্রয় করিয়া উকিল বাবু, মোহরের বাবু, আদালতের টিক্‌টিকিটাকে পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট করিতে হইয়াছে। ছোট আদালত হইল, সেখানেও রামমোহনের পরাজয়। রামমোহনের ঘটিবাটী যতই বাঁধা পড়িতেছে, উকিল বাবুর জেদ ততই বাড়িতেছে, রামমোহন ততই মরণের পথে অগ্রসর হইতেছে।

আজ রামমোহন উকিল বাবুর নিকট হইতে সোপারেস চিঠি লইয়া হাইকোর্টে যাইতেছে। সম্পত্তি যাহা ছিল সব গিয়াছে, এবারে ভদ্রাসন বন্ধক দিয়া রামমোহন প্রধান বিচারালয়ে যাইতেছে।

সুহৃদ্বরেষু! আমি যে দৃশ্য সামান্য একটু বর্ণনা করিলাম, প্রতিদিন প্রতি উকিলের বাড়ীতে এই দৃশ্যের অভিনয় হইতেছে। মোকদ্দমার দায়ে আমাদের দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, আর সেই ভগ্ন স্তূপের উপর স্বদেশহিতৈষী উকিল বাবুদের সৌধধবলিত উন্নত প্রাসাদরাজি সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া অধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতেছে! বড় দুঃখেই স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবু বলিয়াছিলেন "পূর্ব্বে যাহা ডাকাইতে লইত, এখন তাহা উকিলে আর পুলিসে ভাগ করিয়া লয়।"

এই মোকদ্দমাপ্রবৃত্তি দমন করিবার কি কোন উপায় নাই? মধ্যে 'জমিদারী পঞ্চায়েৎ' বসিয়াছিল এখনও তাহার নাম আছে, কিন্তু কাজ আর হয় না। যাঁহারা প্রকৃত দেশহিতৈষী তাঁহারা যদি চেষ্টা করিয়া এই পঞ্চায়েৎ-

প্রথা গ্রামে গ্রামে প্রচলন করিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের অশেষ কল্যাণ হয়। উকিল বাবুদের ভয় নাই, যতদিন মানুষ আছে ততদিন তাহাদের মধ্যে শয়তানের রাজত্বও আছে, ততদিন উকিল মোক্তার না হইলে তাঁহার সৃষ্টিরক্ষা হইবে না? তবে আমি যে প্রস্তাব করিতেছি তাহাতে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ ক্ষতি হইতে পারে। স্বদেশের উন্নতির জন্য এই উকিলশ্রেণী কত ত্যাগস্বীকার করিতেছেন, এই সামান্য একটু কি তাঁহারা পারিবেন না? আর তাঁহারাই যে এখনকার সমস্ত আন্দোলনের নেতা। সম্মুখে 'প্রাদেশিক সমিতি' আসিতেছে, যাঁহারা এই সমিতির অগ্রণী তাঁহারা সকলেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল. তাঁহারা এবারকার 'কন্‌ফারেন্সে' একটা প্রস্তাব উপস্থিত করুন, শুধু প্রস্তাব নহে, শুধু বক্তৃতা নহে, যথারীতি একটা প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করুন্ যে তাঁহারা কায়-মনোবাক্যে মোকদ্দমাপ্রিয়তা নিবারণের চেষ্টা করিবেন। নতুবা শুধু রেজলিউসন পাস, কন্‌ফারেন্স বা রাজনৈতিক চড়ুইভাতি করিতে আর কি লাগে? কিঞ্চিৎ অর্থ আর কিঞ্চিৎ হৈ, চৈ, (তাও বুঝি Sedition Act. পাশ হইলে বন্ধ হয়)। আজ এই খানেই ইতি। "হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ।"

শ্রীজলধর সেন।

---

## গোজাতির উন্নতি। *

---

গত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মন্ত্রণাসভায় তাহেরপুরের রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর গোজাতির উন্নতিকল্পে একটী সুন্দর প্রস্তাব করিয়াছিলেন। প্রস্তাবটি এই যে, বাঙ্গলার প্রত্যেক গ্রামে ২ গোচারণজন্য যথোপযুক্ত ভূমি পৃথক্ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য, এবং এই কর্ত্তব্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য জেলা-বোর্ডের প্রতি আবশ্যকীয় ভার প্রদত্ত হইবে। যে সকল হিন্দু জমিদারগণ স্বেচ্ছায় ঐরূপ জমি জেলা-বোর্ডের হস্তে অর্পণ না করিবেন, তাঁহাদের নিকট হইতে তাহার মূল্য গৃহীত হইবে। প্রথমতঃ রাজা বাহাদুরের এই প্রস্তাব ও কৃষিকার্য্যের উন্নতিসম্বন্ধীয় অপর প্রস্তাব সভা হইতে অন্যায় পূর্ব্বক অপসৃত হয়। তাহার

---

* এই প্রবন্ধ বিগত আষাঢ় মাসে বিরচিত, এতদিন স্থানাভাবে অপ্রকাশিত।

কারণ এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ঐ দুই প্রস্তাব উপযুক্ত স্থলে প্রস্তাবিত হয় নাই। যাহাহউক পরদিন প্রস্তাবদ্বয়ের উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া মাননীয় ব্যারিষ্টার মিঃ W. C. Banerjee মহাশয় Subjects Committeeতে তাহার আলোচনা ও পক্ষসমর্থন করেন। প্রস্তাব দুইটী গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও গোচারণসম্বন্ধীয় প্রস্তাবটি উত্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বেই ভয়ানক ভূমিকম্প সভাগৃহ আলোড়িত হওয়ায় তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কৃষীদিগকে ঋণদান জন্য ব্যাঙ্কস্থাপন ও বিজ্ঞানসম্মত উপায় দ্বারা বঙ্গীয় কৃষির উন্নতিসম্বন্ধে যে প্রস্তাব ছিল, রাজা বাহাদুর গোচারণভূমিসংক্রান্ত প্রস্তাব তদন্তর্গত করিয়াছিলেন ইহা অসঙ্গত হয় নাই। পরে শিল্পকার্য্যাদি-সম্বন্ধীয় যে প্রস্তাবের অঙ্গীকার করা হইয়াছিল ববং তাহাই অসঙ্গত।

ভারতবর্ষে গোজাতিই কৃষির প্রধান সহায়। গোজাতির উন্নতি ব্যতীত কৃষির উন্নতি অসম্ভব। ভূমি উত্তমরূপে কর্ষিত না হইলে উপযুক্ত শস্য উৎপন্ন হয় না। গোজাতির শরীরে বল না থাকিলে তাহাদিগের দ্বারা কর্ষণকার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় না, উপযুক্ত আহারাভাবে ও সর্ব্বদা আবৃত স্থানে আজকাল গোজাতির বলের হানি হইয়া থাকে, দুর্মূল্য খইল ও আউড় খরিদ করিয়া দরিদ্র কৃষকগণ তাহাদের গোবৎসাদিকে খাওয়াইতে পারে না, বিশেষতঃ পরের জমিতে গোচারণ করিলে যে শাস্তি হয়, তাহা সর্ব্বজনবিদিত।

এখন দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যেক কৃষকের নিজের একখণ্ড গোচারণ-ভূমি থাকা আবশ্যক। তাহাও বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভব নহে ও নিতান্ত অসুবিধাজনক। আজকাল আবাদি জমি ও গোচারণজমির সাধারণতঃ কোন পৃথক্ দর নাই, বিশেষতঃ আবাদপূর্ণ মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে যদি প্রত্যেক কৃষকের জন্য পৃথক্ গোচারণভূমি থাকে, তাহা হইলে কোন কৃষকেরই ফসল গোগ্রাস হইতে নিস্তার পায় না। গোচারণ জন্য উচ্চ ভূমির আবশ্যক। বর্ষাকালে গোজাতির বিশেষ কষ্টের সময়। হয়ত কোন প্রজার উচ্চ ভূমি নাই, হয়ত কোন নূতন প্রজা বসত করিতে আসিয়া এক কাঠাও উচ্চ ভূমি পাইল না ইত্যাদি নানা অসুখ ও অসুবিধা উপস্থিত হইতে পারে। সুতরাং গোচারণের একটী পৃথক্ স্থান হওয়া আবশ্যক ও তাহা সামান্য দরে পাইলে কৃষকগণ আপন আপন গোবৎসাদি বাঁচাইতে পারে।

ভূমিষ্ঠ হইতে আশৈশব আমাদের প্রত্যেকর যে গাভীর দুগ্ধে জীবন-ধারণ, যৌবনে যে গোজাতিকর্ষিত ভূমির শস্যে আমাদের বলবীর্য্য, যাহার গোময় আমাদের গৃহসংস্কারের একমাত্র সুলভ দ্রব্য, সেই গোজাতিতে কি হিন্দু কি মুসলমান কি ইংরাজ কাহারও অনাস্থা থাকা নিতান্ত নিন্দনীয়।

গোজাতির অবনতি বঙ্গীয় কৃষির অবনতির এক প্রধান কারণ। বাঙ্গলা কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের অবনতি হইতেছে। কৃষকের ছেলে লাঙ্গল ছাড়িয়া কলম ধরিয়াছে। কৃষকেরা ভূমিকর্ষণ ছাড়িয়া কেবল শকটবহন সার করিয়াছে। কালের পরিবর্ত্তনে, অনিয়মিত রৌদ্র বৃষ্টির ফলে, কৃষকের দরিদ্রতায়, জমিদার ও গবর্ণমেণ্টের শাসনে এবং ধনী-দিগের ঔদাস্যে কৃষিকার্য্য দেশ হইতে একরূপ উঠিয়া গেল। বাঙ্গলা স্বর্ণ-প্রসূ, তথাপি বাঙ্গলায় ভাত নাই। বঙ্গীয় দারিদ্র্যের অন্য কারণ যাহাই থাকুক কৃষি যে অন্যতম প্রধান কারণ, সন্দেহ নাই। শিল্পের বিনিময়ে ভিন্ন দেশ হইতে শস্য আনিয়া জীবন ধারণের দুরাশা কেহ করেন কিনা জানি না। স্থানে স্থানে শিল্পাদির উন্নতিকল্পে বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে, কিন্তু বঙ্গীয় কৃষির উন্নতির জন্য এপর্য্যন্ত কোন উদ্যম হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ভারত-ময় সহস্র সহস্র শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলেও কেবল শিল্পে কাহারও উদর-পূরণ হইবে না।

কৃষকের সন্তান বিদেশীয় শিল্পের লোভে লাঙ্গল পরিত্যাগ করিলে দেশের সমস্ত জমি পতিত ও অনুর্ব্বরা হইবে। জমিদারের আয় ও তৎসঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের কর সংক্ষেপ হইবে। আর যদি সব দেশেই সেই বিনিময়ের আশায় কৃষির অবহেলা হয়, তবেই প্রতুল।

বর্ত্তমান অবস্থায় দেশে সুন্দর রূপ শস্য জন্মিতেছে না। কেহ কি তাহার কারণ নিরাকরণ ও নিবারণের উপায়োদ্ভাবনের জন্য মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া থাকেন? দরিদ্রের বিপদ হইলে ধনীরও যে বিপদ তাহা কি ধনীদিগের জ্ঞান আছে? দেশের যত ধন তাহা কি কৃষকদিগের গৃহ হইতে গৃহীত নয়? তবে সেই মৃত্তিকার ও তাহার শস্যের উন্নতিকল্পে এত ঔদাস্য কেন? বিগত ভীষণ ভারতদুর্ভিক্ষেও যদি দেশীয় কৃষির প্রতি দৃষ্টি না পড়ে তবে যে কখন পড়িবে তাহার সম্ভাবনা নাই, যদি সখের দ্রব্য, বিলাসের সহায় শিল্পজাত পণ্য ভারতে

না জন্মিত বা অন্যত্র হইতে না আসিত তাহা হইলে একটী প্রাণীও দুর্ভিক্ষে মরিত না। ধনীর প্রাসাদে, বণিকের দোকানে শিল্পবিদ্যালয়ের এসকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও না খাইয়া মানুষ মরে কেন ?

শিল্পবিদ্যালয় যে অনাবশ্যক তাহা বলি না। তাহার সঙ্গে সঙ্গে কৃষির উন্নতির জন্য চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। নচেৎ সম্পূর্ণরূপে মঙ্গলের আশা নাই। তাঁতির ছেলে তাঁত ছাড়িল বলিয়া ঘোর আর্ত্তনাদ শুনা যায়, কিন্তু কৃষকের সন্তান লাঙ্গল ছাড়িল বলিয়া কোন অনুযোগ এখনও শুনা যায় নাই।

শ্রীসারদাচরণ মজুমদার।

---

# কবিতাকুঞ্জ।

## বসন্ত-প্রভাত।

(বাগেশ্রী—আড়াঠেক)।

কি আনন্দ কোলাহল
উঠিছে আকাশ মাঝে।
প্রভাতে প্রকৃতি সতী
কি মধু শোভায় সাজে।

করি সুধা-বিকীরণ
বহে শান্তি-সমীরণ,
বিহঙ্গ প্রেম-কূজনে
পূজিছে জগত রাজে।

উথলি উঠিছে গান,
জাগিয়া উঠিছে প্রাণ,
বিষাদের নিশীথিনী
হের ম্রিয়মাণ লাজে।

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

## নবালোক।

(“সিরাজদ্দৌলা” পাঠে লিখিত)।

হেরিয়াছি কত শত কাব্য পারিজাত—
বাণীর বীণায় যাহে মধুর ঝঙ্কার,
কল্পনার শূন্যপথে অমৃত-প্রপাত।
কত দিন শুনিয়াছি গীত অপ্সরার।
“নবীন” মেঘের গুরু গভীর গর্জ্জনে
হেরেছি নাচিতে মরি! কলঙ্ক-শিখিনী
সরসী-পুলিন-পাশে অলস নয়নে
“বঙ্কিম” মৃণালে কত নভেল-নলিনী।
কিন্তু একি নব রবি দীপ্ত জ্যোতিঃ ধরি'
চুম্বিতেছে শত করে শিশির-হিল্লোল,
একাধারে একি গঙ্গাযমুনা-কল্লোল,
“অন্ধকূপ” ভোগবতী বিদারণ করি।।
আলোকিত বাঙ্গালীর কলঙ্ক-আঁধার।
“অক্ষয়”, অক্ষয় হোক লেখনী তোমার!

## প্রকৃতির শাসন।

(শেলীর অনুকরণে)

অনন্ত প্রণয় ভরা হৃদয় লইয়ে,
নির্ঝরিণী ছুটে আসে দূর নদীপানে,
মিশাইয়া অন্য স্রোতে স্বজীবন-ধার
ছুটে যায় সাগরেতে উল্লসিত মনে;—
প্রেমিকের প্রাণ লয়ে ধীরে সমীরণ,
উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের গাঢ় আলিঙ্গনে,
অসীম উন্মত্ত সেই ক্ষিপ্র জলধীরে
কেমনে বাঁধিয়া ফেলে প্রেমের বন্ধনে।—
বিশ্বের নিয়ম এ যে থাকে না নীরবে
একাকী একটি প্রাণী ফেলি দোসরেরে,
অনন্ত প্রেমের সেই মধুর শাসনে
কেন না বাঁধিবে বল তোমারে আমারে

শ্রীমন্মথলাল রায় সরকার।

# মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

---

**সাহিত্য।** কার্ত্তিক। সাহিত্যের লেখকগণ যেরূপ ভাবে বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছেন তাহাতে বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকার মুখ ক্রমেই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এমন সুন্দর পত্রিকাও যথাসময়ে প্রকাশিত হইতে পারে না। অক্ষয় বাবুর 'রাণী ভবানীর' ঐতিহাসিক চিত্র ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে, বর্ত্তমান সংখ্যায় একখানি চিত্রপট প্রদত্ত হইয়াছে। বটব্যাল মহাশয়ের 'দীর্ঘতমা ঋষি' বোধ হয় এইবার শেষ হইল। জলধর বাবুর 'শিকার কাহিনী' তাঁহার বহুদর্শনের ও বর্ণনালালিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছে। 'কাজির বিচার' নামক প্রবন্ধে লেখকের নাম নাই, কিন্তু তাহাতে সেকালের অদ্ভুত বিচারপ্রণালীর অনেক তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে।

**ভারতী।** কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ। এই সংখ্যায় দ্বাদশটি বিবিধ প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; সকল গুলি সমান সুখপাঠ্য হইলে সমধিক আহ্লাদের কারণ হইত। শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর 'ভাইফোঁটা' কবিতায় বাঙ্গালীর হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিবার কথা, কিন্তু ইহাতে ভাবের প্রাচুর্য্য থাকিলেও ভাষার মাধুর্য্যের অভাব রহিয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'শ্যাম বাউলের' খোল কিছু অসংযত ভাবে বাজিয়া উঠিয়াছে। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'বর্ণ রহস্য' বেশ সুখপাঠ্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। অক্ষয় বাবুর 'মীর কাসিম' বহুবিধ রণকোলাহলকাহিনী লইয়া অবিরাম গতিতে ভাসিয়া চলিয়াছে। একে ইতিহাস, তাহাতে বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত—বঙ্গীয় পাঠকসমাজ এত অত্যাচার সহ্য করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। এবারকার ভারতীতে ও সাহিত্যে 'কাজির বিচার' নামক দুইটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। সাহিত্যে লেখকের নাম নাই, ভারতীর লেখকের নাম শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। দুইখানি পত্রিকায় দুইজন লেখক একই সময়ে একই বিষয়ের কিরূপ বিভিন্ন চিত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহা তুলনায় সমালোচনা করিলে অনেকেই আমোদ প্রাপ্ত হইবেন।

**পূর্ণিমা।** পৌষ। পূর্ণিমায় সমালোচনা সমেত পাঁচটি প্রবন্ধ পত্রস্থ হইয়াছে। সমালোচনাগুলি সাহিত্যরথী বহুমানাস্পদ অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের নামে প্রকাশিত হওয়ায় তাহার মূল্য অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উহাতে আমাদের ক্ষুদ্র পত্রিকারও উল্লেখ রহিয়াছে দেখিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম। অস্মৎ প্রসঙ্গে সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন "মূল কথা উৎসাহের বাদিস্বর জান্-সুর যে কি তাহা ধরিতে পারিলাম না। কি সুরে যন্ত্র বাঁধিয়াছেন তাহা ধরিতে না পারিলে প্রকৃত সমালোচনা চলে না।" ইহার পর সরকার মহাশয় আমাদের সমালোচনা করিতে বসিয়া নিজেই নিজের উক্তির খণ্ডন করেন নাই কি? যেখানে সমালোচনা চলে না সেখানে শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেই ভাল হয়। সুবিজ্ঞ সরকার মহাশয় বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন যে আজকাল এদেশ হইতে ওস্তাদি খেয়ালাদি উঠিয়া গিয়া জঙ্গলা রাগ রাগিণীরই প্রাধান্য হইয়াছে। মাসিক পত্রিকাগুলি সমস্তই জঙ্গলা রাগিণীতে বাঁধা, সাধা সুর তাহাতে প্রায়ই বাজিবার অবসর পায় না। দৃষ্টান্তের জন্য অন্যত্র যাইবার আবশ্যক নাই, বর্ত্তমান সংখ্যার পূর্ণিমায় 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' প্রবন্ধ কোন্ সুরে বাঁধা, কেহ ধরিতে পারিয়াছেন কি?

---

# অজ্ঞেয়-বাদ

(সমালোচনা)

## চতুর্থ অধ্যায়—আদি-কারণ কিং স্বরূপ?

(৪)

——00——

এই জড় জগতের বস্তুনিচয়কে কঠিন, তরল ও বাষ্পীয় এই তিন শ্রেণীতে সাধারণতঃ বিভাগ করা যাইতে পারে। লৌহ কঠিন, জল তরল, মেঘ বায়বীয় পদার্থ। এই ত্রিবিধ পদার্থের উপর উত্তাপের কার্য্য সর্ব্বদাই জগতে চলিতেছে ও চলিবে—সূর্য্যরশ্মি কখন প্রখর কখন মৃদু হইয়া ইহাদের মধ্যে কখন অধিক কখন অল্প তাপ সঞ্চারিত করিয়া দিবে এবং শীতগ্রীষ্মাদি ঋতুপরিবর্ত্তনে ও দিন রাত্রির অনন্ত পরিবর্ত্তনে এই সকল জড় বস্তু কখন অল্পাধিক তাপ পাইবে কখন তাহা হারাইয়া শীতল হইবে. এই প্রাকৃতিক নিয়ম সকলেরই সুজ্ঞেয় ও সুপরিচিত। সকলেই জানেন যে উত্তাপে আয়তন বৃদ্ধি হয়, শীতলতায় বস্তুর আয়তন সংকুচিত হইয়া থাকে। গাড়ির কাষ্ঠময় চাকার চারিদিকে লৌহবেড় পরাইতে হইলে উত্তাপে তাহার আয়তন বাড়াইয়া চাকার উপর বসাইয়া শীতল করিয়া চাকার সহিত সংলগ্ন করিয়া দিতে হয়। এই আয়তনের হ্রাসবৃদ্ধির একটি বিশেষ নিয়ম জগতে বর্ত্তমান আছে এবং সাধারণতঃ কঠিন তরল ও বায়বীয় পদার্থ মাত্রেই এই নিয়মের অধীন। সুতরাং এই নিয়মাধীন জল যত শীতল হইবে ততই সংকুচিত হইয়া ক্রমেই ঘন তুষারে পরিণত হওয়া উচিত। কিন্তু যদি তাহা হইতে পারিত তাহা হইলে শীতের হিমানীতে নদ নদী, সাগর তড়াগ্ একেবারে জমাটবদ্ধ বরফের স্তূপ হইয়া সমুদায় জলচর বিনাশ করিয়া ফেলিত এবং গ্রীষ্মের প্রখর কিরণেও সেই স্তূপ বিগলিত হইতে না পারায় জলের অভাবে নরনারী হাহাকার করিত। এই বিপদ হইতে জীবজগৎকে রক্ষা করিবার জন্য জলের আয়তনের হ্রাসবৃদ্ধির নিয়ম অন্যান্য বস্তুর ন্যায় সর্ব্বত্রই অধীন হইয়া কেবল জমাট হইবার বিষয়ে সর্ব্ব হইতে ভিন্ন নিয়মাধীন হইয়াছে। সেই ভিন্ন নিয়মের বলে বরফ আয়তনে সঙ্কুচিত না হইয়া প্রসারিত হইয়া উপরিভাগে ভাসিতে থাকে, নিম্নে জলচর

জীবিত রহে, এবং গ্রীষ্মোত্তাপে উপবিষ্ট এক স্তর মাত্র বরফ সহজেই গলিত হইয়া যায়। যে বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত পরীক্ষা দ্বারা এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহার জ্ঞানপ্রভাব প্রশংসা সভ্যজগতে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে,—আর যে শক্তি হইতে এই বিচিত্র নিয়মের উৎপত্তি হইয়াছে কেবল তাহাকেই বলিব "অজ্ঞেয় অন্ধ শক্তিমাত্র"? ইহা যদি আদি-কারণের অনন্ত জ্ঞানের পরিচায়ক না হয়, তবে আর তোমাকে অন্ধ ভিন্ন কি বলিব?

জগৎকারণ যে অনন্ত জ্ঞানময় তাহা কেমন করিয়া বুঝিব? ইহাই অজ্ঞেয়-বাদিগণের সর্ব্বশেষ আপত্তি। ইহার অতি সহজ ও সরল উত্তর এই যে, মানুষের ক্ষুদ্র জ্ঞানের অস্তিত্ব যেমন করিয়া বুঝিয়া থাক, ইহাও সেইরূপ করিয়া কার্য্যতত্ত্ব সমালোচনা করিয়া বুঝিতে হয়। জগতের সমুদায় পরমাণু এক নিয়মাধীন হইয়া এক ধর্ম্মাক্রান্ত প্রকাণ্ড একটি জড়পিণ্ড সৃষ্টি না করিয়া এই যে অনন্ত বিচিত্রতাময় আশ্চর্য্য জগৎ প্রকাশ করিতেছে, ইহাই জ্ঞানের প্রধানতম চিহ্ন; কেন না বিচারণা ভিন্ন, ইচ্ছাশক্তির পরিচালনা ভিন্ন, ইহা হইতে পারে না; এবং ইচ্ছা বলিতেই জ্ঞানকেও সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়া লইতে হয়। আদিকারণের অনন্ত জ্ঞানের কত অনন্ত চিহ্ন জগতে বর্ত্তমান, তাহা বিস্তার করিয়া দেখাইতে হইলে, স্বতন্ত্র আয়োজন করা আবশ্যক। সাধারণতঃ দুই চারিটি দৃষ্টান্ত দেখিয়াই যেমন মানবজ্ঞানের অস্তিত্ব অনুভব করি, সেইরূপ দুই চারিটি পরিচয় মাত্রই এখানে প্রদত্ত হইল। তাহার মধ্যে একটি পরিচয় এই যে, সকল কার্য্যের মূলেই যদি ভবিষ্যদ্দৃষ্টি দেখিতে পাই, তাহা যে জ্ঞানেরই উজ্জ্বল চিহ্ন তাহা বুঝিতে ইতস্ততঃ থাকে না। এখন এই জগতের সমুদায় তত্ত্বের মধ্যে দেখ, সর্ব্বত্র ভবিষ্যদ্দৃষ্টি বিরাজমান। কবে শিশু জন্মগ্রহণ করিয়া দুগ্ধ পান করিবে, তাই তাহার সঞ্চারের বহু পূর্ব্বে বালিকাবক্ষঃ ভেদ করিয়া প্রথমে স্তনোদ্ভব, তাহার পর দুগ্ধসঞ্চারের নিয়ম; কবে শিশু দুগ্ধপান ত্যাগ করিয়া কঠিনতর পদার্থ আহার করিয়া জীবনধারণ করিবে, তাহার জন্য প্রথম দন্তমূল পরে দন্তোদ্গমের ব্যবস্থা, কবে পক্ষী বিচিত্র পক্ষে ভর করিয়া অনন্ত গগনে বিচরণ করিবে, তাহার জন্য ডিম্বকোষের মধ্যে পক্ষবিস্তারের আয়োজন —কত উদাহরণ দেখিবে? যে দিকে চাও, ভবিষ্যদ্দৃষ্টিতে জগতের ক্ষুদ্র বৃহৎ সমুদায় পদার্থই পরিপূর্ণ! ইহা কি অজ্ঞান হইতে উদ্ভূত হইয়াছে?

জ্ঞান ও অজ্ঞান দুইটি বিপরীত ভাবাত্মক বিষয় হইলেও, পরস্পর এমনি সংযুক্ত যে, কাহাকে অজ্ঞান বলে তাহার কিছু না জানা থাকিলে 'জ্ঞান' কাহাকে বলে তাহা বুঝা যায় না। জ্ঞান ও অজ্ঞানকে এইরূপে বিভিন্ন করিয়া বুঝিবার জন্য অল্পাধিক পরিমাণে এই উভয়ের স্বরূপ বা লক্ষণা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। এই সকল লক্ষণার মধ্যে যাহা মীমাংসক লক্ষণা তাহার একটি মাত্র অবলম্বন করিয়াও জ্ঞান হইতে অজ্ঞানকে পৃথক করিয়া বুঝা যায়। 'কৌশল' এই মীমাংসক লক্ষণা, অর্থাৎ যেখানেই কৌশল সেখানেই জ্ঞান, অজ্ঞানের সহিত কৌশলের সংস্রব নাই। কেহ কেহ বলিতে পারেন আকস্মিক ঘটনাক্রমে কৌশলের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নয়, তুমি কার্য্য করিতেছ একরূপ তাহা হইতে অন্যরূপ কৌশল লোকে বুঝিতেছে। ইহা কিয়ৎ পরিমাণে সত্য বটে। কিন্তু যদি দেখিতে পাও যে, সর্ব্বত্র সকল কার্য্যের মধ্যেই ধারাবাহিক প্রণালী অনুসারে কৌশল বর্ত্তমান, তখন আর এই আপত্তি খাটে না। তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, তাহার মূলে জ্ঞান আছে। সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে এই কৌশল ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল বস্তুর মধ্যে এত পর্য্যাপ্তরূপে বর্ত্তমান যে, দর্শন বিজ্ঞান তাহার আলোচনা করিতে গিয়া পরাস্ত হইতেছেন। বিবর্ত্তনবাদী মহাত্মা ডারবিন্ এই কৌশলতত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, জগতের কৌশলজাল যে আকস্মিক হইতে পারে তাহা তিনি বিশ্বাস করিতে অক্ষম।

এখন বিচার করিয়া দেখ, জগতে যে বহুরূপত্ব বর্ত্তমান তাহা দেখিয়া আদিকারণকে অনন্ত শক্তিশালী বলিয়া তোমার ক্ষুদ্র মস্তক সেই অনন্ত শক্তির নিকট অবনত করিতে কোন আপত্তি আছে কিনা? জগতে যে মহা নিয়ম বর্ত্তমান তাহা হইতে সেই নিয়ামককে প্রভু মহান্ ও ন্যায়বান্ বলিয়া স্বীকার করিতে কোন আপত্তি হইতে পারে কি না? জগতে যে অনন্ত কৌশল ও জ্ঞানের পরিচয় পাইতেছ তাহা হইতে আদিকারণকে মঙ্গলময় বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি হইতে পারে কি না? ইহা হইতেই জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা ও অনন্ত দয়া প্রকাশিত হইতেছে না কি?

এ সম্বন্ধে সচরাচর একটি আপত্তি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা এই যে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিয়া পরিমিত জ্ঞানাদির চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা বরং

আদিকারণের সাস্ত স্বরূপই প্রকাশ করে। ইহা যে সামান্য আপত্তি মাত্র তাহাও কি বুঝাইতে হইবে? বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ণপরিচয় লিখিয়াছেন বলিয়া, যে সেই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি মাত্রই দেখিয়াছে, সে কি মনে করিবে যে উক্ত পুস্তকে যাহা আছে তাহাই গ্রন্থকর্ত্তার সমুদয় জ্ঞান? জগৎরহস্য হইতে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় কিনা তাহাই দেখ, সেই জ্ঞান যে অনন্ত জ্ঞান তাহা বুঝিবার জন্য অনন্ত সৃষ্টির দিকে চাও, সেই জ্ঞানও যে অনন্ত তাহা বুঝিতে অধিক বিলম্ব হইবে না। কিন্তু সকলই যেন বুঝিলাম তথাপি ইহার উপর ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে কি? তাহাই যথার্থ আলোচনার বিষয়।

## পঞ্চম অধ্যায়—ধর্ম্ম কি?

ধর্ম্ম কি? এই কথা প্রাণের উৎকণ্ঠার সঙ্গে সকল লোকেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি বিশেষ বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ের নিকট হইতে ইহার উত্তর গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে যে কত অসঙ্গতি, কত বিভিন্ন মতকেই ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। আবার কেবল তাহাই নহে, একযুগের লোক তাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া অবনত মস্তকে পূজা করিয়াছে, আর এক যুগের লোক তাহাকেই অধর্ম্ম বলিয়া মানবসমাজ হইতে বিদূরিত করিবার জন্য দেহপাত করিতেছে, আমি যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করি, তুমি তাহাকে অধর্ম্ম বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া থাক। ইহার সকল গুলিই কি ধর্ম্ম? না, ধর্ম্ম ইহার সকলের অতীত কোন স্বতন্ত্র বস্তু?

সমুদায় সভ্যজগতে "ধর্ম্ম" নামে যে কয়েকটি প্রধান প্রধান মত প্রচলিত আছে, ধর্ম্ম বলিতে সভ্যসমাজ যে কয়েকটি সুবৃহৎ সম্প্রদায়ের নাম করিয়া থাকে, তাহারা পরস্পর বিভিন্ন। যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রকারান্তরে পৃথিবীর অধিকাংশ নরনারীর জীবন ও মৃত্যুর সহায় তাহার সহিত হিন্দুধর্ম্মের, যে মুসলমানধর্ম্ম আজিও মধ্যে মধ্যে আপন বীরদর্পে পৃথিবী রুধিরপঙ্কে পরিপূরিত করিতে চায় তাহার সহিত খ্রীষ্টধর্ম্মের, মৌলিক বিষয়েই কত না ভিন্ন ভাব! কাহারও মতে মধ্যবর্ত্তিবাদ অলঙ্ঘনীয়, কাহারও মতে তাহা ঘোরতর মূর্খতা।

সভ্যজগতের প্রধানতম কয়েকটি ধর্ম্মের মধ্যেই যে কেবল এইরূপ ভিন্ন ভাব তাহা নহে। এক একটি বিশেষ ধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা কর দেখিবে,

যদিও রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট উভয়েই খ্রীষ্টান নামে জগতে পরিচিত হইবার জন্য ব্যাকুল, তথাপি উভয় মতের মধ্যে কত আকাশ পাতাল প্রভেদ। যে হিন্দুধর্ম্মের সুবিশাল চন্দ্রাতপতলে ভারতবর্ষের বিংশতি কোটী নরনারী দাঁড়াইবার জন্য ব্যাকুল, তাহার মধ্যে কত অগণ্য সম্প্রদায়, কত অগণ্য মতভেদ, কত অসংখ্য শ্রেণীর উপাসনা প্রচলিত। কেবল যে মতবিষয়েই পার্থক্য তাহা নয়, আচার ব্যবহার, উপাসনাপ্রণালী, উপাস্য দেবতা প্রভৃতি আবশ্যকীয় অঙ্গেই আবার পার্থক্য! এই সকল দেখিয়া শুনিয়া একজন হৃদয়বান্ সুলেখক প্রাণের নিদারুণ আক্ষেপপূর্ণ করুণ ভাষায় এই ধর্ম্মবিরোধিতার কাহিনী এমন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিয়া চিন্তাশীল পণ্ডিতমণ্ডলী সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মমত হইতেই দূরে থাকিতে ইচ্ছা করেন। বহিরাচরণ দেখিয়া মুগ্ধ হইলে ধর্ম্মের নামে পৃথিবীতে যত পাপ, যত কুসংস্কার, যত অত্যাচার, যত অবিচার, যত নরহত্যা, যত ভ্রূণনাশ, যত নির্যাতন চলিয়া আসিয়াছে তাহার আলোচনা করিবামাত্র ‘ধর্ম্ম’ নামের উপর হইতেও প্রাণের শ্রদ্ধা দূরীভূত হইয়া যায়। কিন্তু কোন অতুল বিভবশালী গৃহস্থের পুত্র কন্যারা তাঁহার ত্যক্ত বিপুল বৈভব লইয়া যদি সংসারে কলহ বিবাদ অত্যাচার অবিচার পাপতাপ আনয়ন করে, আমরা কি সেই বিবাদমান্ পুত্র কন্যাদিগকেই অভিসম্পাত করিব, না তাহাদের আচরণ মন্দ হইল বলিয়া তাহা ধনরত্নে আরোপ করিব? সেই ধন সেই রত্ন সাধুসন্তানদিগের হাতে পড়িলে কি অনাথরোদননিবারণ করিয়া বিধবার অশ্রুধারা মুছাইয়া দিয়া পৃথিবীতে স্বর্গের ছবি সংস্থাপিত করিতে পারিত না?

জগতের শত বিসংবাদপূর্ণ এই সকল বিভিন্ন ধর্ম্মমত সমালোচনা করিতে গিয়া আমেরিকার বিখ্যাত ধর্ম্মসংস্কারক মহাত্মা থিওডোর পার্কার যে সুন্দর বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল, চিন্তাশীল পাঠক দেখিবেন খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে মহাত্মা পার্কার যে কথা বলিয়াছেন, সমুদায় ধর্ম্ম সম্বন্ধেও সেই কথাই বলা যাইতে পারে কি না? জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মমত সমালোচনা করিতে গিয়া পার্কার একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে,—“তুমি যদি একজন প্রধান ঔষধবিক্রেতার দোকানের মধ্যে প্রবেশ কর, দেখিবে সেখানে ছোট বড় নানাবিধ কাচপাত্রে নানা বর্ণের ঔষধ “এক এক ভিন্ন ভিন্ন

নামের নিদর্শন পত্রসহ সুন্দর করিয়া স্থানে স্থানে সাজান রহিয়াছে, ঘরের মধ্যে কেমন একটা অপ্রীতিকর গন্ধ বাতাসের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে, এবং এক পার্শ্বে কাচাবরণের অভ্যন্তরে ছোট বড় নানা আকৃতির বিবিধ প্রকার শাণিত লৌহাস্ত্র সকল ঝকমক করিতেছে—দেখিলেই প্রাণ মন কেমন করিয়া উঠে। অন্য পার্শ্বে একজন উন্নতললাট চিন্তাশীল চসমাধারী ক্ষীণকায় যুবা পুরুষ দণ্ডায়মান, তুমি সাহসে নির্ভর করিয়া যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর যে এ সকল দ্রব্যজাত কি? তিনি বলিবেন ইহার সকল গুলিই ঔষধ, রুগ্ন মানুষকে সুস্থ করিবার জন্য, সবল সুস্থকায় নীরোগীকে রোগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই সকল ঔষধ বিক্রীত হইয়া থাকে। শুনিবা মাত্র এমন মহদুপকারী দ্রব্যজাত ক্রয় করিবার ইচ্ছা করিয়া তুমি যেন বলিলে যে, মহাশয় ঔষধের যখন এমন গুণ তখন আপনি ইচ্ছামত ইহার কতকগুলি আমার নিকট বিক্রয় করুন। ইহাতে ঔষধবিক্রেতা কি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তোমাকে বলিবেন না যে, যদিও ইহার সমুদয় গুলির নামই ঔষধ বটে, কিন্তু কেহ সদ্য প্রাণনাশক, কাহারও একবিন্দু পান করিলে আজীবন উন্মাদ হইয়া থাকিবার সম্ভাবনা; আবশ্যক রোগীর অবস্থা বুঝিয়া যেখানে যেটি প্রয়োজন সেইটি ব্যবহার করিতে হয়, যদিচ সকল গুলিরই উদ্দেশ্য এক তথাপি এক অবস্থায় এক উদ্দেশ্যে সর্ব্ব প্রকার লোকের জন্য সকল গুলিই প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। ঔষধালয় সম্বন্ধে ও ধর্ম্মালয় সম্বন্ধে এই এক কথা। ধর্ম্মালয়ে যাও নানা ধর্ম্মের নানা মত বর্ত্তমান প্রচারকগণ নিজ নিজ মতের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া ক্রেতাগণকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছেন এবং বলিতেছেন ইহাতে বিপদগামী আত্মা সুপথে আইসে, সুপথপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিপদগামী হয় না, ইহা জীর্ণ আত্মার মহৌষধ, ইহার সকল গুলিই ধর্ম্ম। তুমি যদি স্থান কাল অবস্থা বিবেচনা না করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে কতকগুলি ধর্ম্মমতকে আত্মার মহৌষধ বলিয়া গ্রহণ করিতে চাও তাহাতে বিড়ম্বনা হইবে না কেন? স্থান কাল অবস্থা বিবেচনা না করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে কতকগুলি ঔষধ গ্রহণ ও প্রয়োগ করিয়া তাহার সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল লাভ করতঃ ঔষধ মাত্রকেই অনিষ্টকারী মনে করা যেমন ভুল, স্থান কাল ও অবস্থা বিবেচনা না করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে যাহা তাহা ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহার অনিষ্টময় ফল দর্শন করতঃ একেবারে ধর্ম্মের নামের উপর বিরক্ত হইয়া

ধর্ম্ম মাত্রকেই বর্জ্জন করাও কি তুল্য রূপ ভ্রমের কথা নহে? যাহা যাহা এই পৃথিবীতে বহুকাল হইতে ধর্ম্ম নামে পরিচিত হইয়া আসিয়াছে তাহা তৎকালোপযোগী ঔষধ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু এখন যে তাহা বিষময় তাহা একটু আলোচনা করিলেই দেখিতে পাইবে।

খৃষ্টীয় ধর্ম্ম জগতে 'ধর্ম্ম' নামে কত অদ্ভুত লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে একবার মানসচক্ষে তাহার কঠোর চিত্র দর্শন কর। ন্যূনাধিক তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দেখিতে পাই যে, একজন অশীতিপর বৃদ্ধ একটি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে একহস্তে নিজের শিশুসন্তান ও অপর হস্তে শাণিত অস্ত্র ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান—বদনমণ্ডল যেন পৈশাচিক গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ। জিজ্ঞাসা করিলাম বৃদ্ধ! তুমি কি করিবার জন্য এখানে এমন ভাবে দণ্ডায়মান? আমার এবম্বিধ অশ্রদ্ধাপূর্ণ প্রশ্ন শুনিয়া বৃদ্ধ বলিলেন কেন? আমি ঈশ্বরোদ্দেশে স্বহস্তে আপনার সন্তানকে বলিদান করিয়া এই জলন্ত অগ্নিতে আহুতি দিতে আসিয়াছি। তুমি কি শুন নাই যে গত রজনীতে স্বয়ং পরমেশ্বর এই আদেশ দিয়াছেন—ইহা যে ধর্ম্ম!!

এই অমানুষিক চিত্র পরিত্যাগ করিবা মাত্র দ্বিতীয় আর একটি চিত্র নয়নপথে পতিত হইল। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার প্রায় দুই শত বৎসর পরে একটি কুটির বাহিরে এক কদর্য্য কাষ্ঠাসনে একজন বৃদ্ধ উপবিষ্ট, চারিদিকে উন্মত্তপ্রায় নরনারী দণ্ডায়মান, অদূরে একটি হতভাগার মৃতদেহ ধূলি বিলুণ্ঠিত। জিজ্ঞাসা করিলাম ঐ মৃতদেহ কাহার এবং কেন ঐরূপ নৃশংস অবস্থায় পতিত? সেই সম্মিলিত নরনারী এক বাক্যে বলিয়া উঠিল ঐ হতভাগা এমন বর্ব্বর যে সে শনিবারের সায়ংকালে কাষ্ঠ সঞ্চয় করিয়াছিল। স্বয়ং পরমেশ্বর ছয় দিবস সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া শনিবার সায়ংকালে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, আর এই হতভাগা তখনও কাষ্ঠ সঞ্চয় করিয়াছিল! এমন নরাধমের পৃথিবীতে স্থান নাই, তাই আমরা সকলে মিলিয়া ইহাকে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপে নিহত করিলাম—ইহা ধর্ম্ম!!

তার পর অন্য চিত্রে দেখিলাম যে, একজন য়িহুদীয় সেনানায়ক একত্রিশ জন মুকুটিত রাজার মুণ্ডপাত করিয়া তাহাদের প্রজাবৃন্দকে বলিদান দিয়া—রুধিরসাগরের তরঙ্গ মধ্যে অসি হস্তে দণ্ডায়মান। জিজ্ঞাসা করিলাম এ সব

কি? সেনাপতি জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন, ভগবানের আদেশে এই সকল অবিশ্বাসীদিগের সমূলোৎপাটন করিলাম—ইহা যে পরম ধর্ম্ম!!

ভ্রমণ করিতে করিতে সার্দ্ধ অষ্টাদশ শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী এক কোলাহলময় নগর প্রান্তে আসিয়া উপনীত—পৃথিবীর মুখ মলিন হইয়া আসিয়াছে, লজ্জায় সূর্য্যদেব আপন উজ্জ্বল মুখ মেঘাবরণে ঢাকিয়া ফেলিয়াছেন, ঈষদালোক-রেখায় বিভৎস অন্ধকারের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্পষ্টতর নয়নপথে পতিত হইতেছে, সেই অন্ধকারবেষ্টিত প্রান্তর মধ্যে নরনারী মিলিয়া জয়োল্লাসে আকাশ প্রতি-ধ্বনিত করিতেছে আর মৃত্যুযন্ত্রণাপীড়িত এক সুগঠিতদেহ উজ্জ্বলকান্তি যুবা-পুরুষ কুশকাষ্ঠে বিদ্ধ লইয়া কাতর বচনে বলিতেছেন "ভগবন ক্ষমা কর, এই সকল অজ্ঞানান্ধ নরনারী কি করিতেছে তাহা জানে না।" একজন দর্শককে জিজ্ঞাসা করিলাম একি ব্যাপার? তিনি সাহ্লাদ ব্যঙ্গের স্বরে উত্তর করিলেন "ঐ যে কুশকাষ্ঠে দোদুল্যমান সুন্দর যুবার মৃত্যুযন্ত্রণাগ্রস্ত শরীর দেখিতেছ, ঐ ব্যক্তি পরম নাস্তিক। যুবা বলিত যে বাহ্য ক্রিয়াকাণ্ড কিছুই নহে, ঈশ্বর মানুষের পিতা, তাঁহাকে প্রীত করা ও সমুদয় নরনারীকে ভ্রাতা ভগিনীর ন্যায় ভালবাসাই ধর্ম্ম। আমরা তর্ক করিয়া পরাস্ত করিতে পারিলাম না, শত শত নরনারী ইহার দৃষ্টান্ত অনুসারে কুপথগামী হইতে লাগিল তাই ইহাকে চোরের ন্যায় প্রাণদণ্ড করিলাম—ঐ দেখ ঈশ্বরের পুত্রের তেজস্বী ভাষা চির দিনের জন্য নীরব হইল—জয় ধর্ম্মের জয়।"

অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে অন্য চিত্রের নিকট গমন করিয়া দেখিলাম—সসাগরাধরাবিজেতা রোমনগরীর একজন পরাক্রান্ত বিচারপতি কতকগুলি পদাতিক লইয়া একটি গৃহ প্রাঙ্গন হইতে রাশীকৃত বালক বালিকা যুবা বৃদ্ধের রুধিরপ্লাবিত মৃতদেহ স্থানান্তরিত করাইয়া প্রাঙ্গন হইতে রুধিরচিহ্ন বিলুপ্ত করিবার আদেশ দিতেছেন। জিজ্ঞাসায় জানিলাম যে, সেই গৃহ একটি খৃষ্টান পরিবারের, তাহারা দেবদেবীর পূজা করিত না, এক মহান্ ঈশ্বরকে ডাকিত বিশ্বাসে অর্চ্চনা করিত ও নরনারীর সেবায় নিয়ত নিযুক্ত থাকিয়া সকলকে ভালবাসিত। এই গুরুতর অপরাধে রাজাদেশে প্রাণদণ্ডের আদেশ হওয়ায় বীরের ন্যায় বালকবালিকা পিতামাতা ধীরে ধীরে গৃহপ্রাঙ্গনে আসিয়া প্রাণদণ্ড গ্রহণ করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম এ নৃশংস অত্যাচার কেন? বিচারপতি বলিলেন ইহার নাম ধর্ম্ম।

অপেক্ষাকৃত সভ্যতর যুগে ফরাশী দেশের লিওঁনগরে আসিয়া দেখি কতকগুলি রোমান ক্যাথলিক পুরোহিত ও রাজকর্ম্মচারী মিলিয়া একটি যুবতীকে কাষ্ঠমঞ্চে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া তাহার শিশুসন্তান দেখাইয়া বলিতেছে—'তুই যদি এখনও বলিস্ যে রোমের পোপ যাহা বলেন তাহাই সার ধর্ম্ম, প্রাণ যাহা বলিতে চায় তাহা কিছুই নহে, তবে তোর এই শিশু এখনই তোর কোলে দিব।' যুবতী উৰ্দ্ধনেত্রে স্থির গম্ভীর ভাবে বলিতেছে—না, তাহা বলিব না। অমনি জননীর সাক্ষাতে শিলাখণ্ডে আঘাত করিয়া সেই শিশু হত্যা করতঃ সকলে মিলিয়া কাষ্ঠমঞ্চে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিল। জিজ্ঞাসায় জানিলাম ইহার নাম ধর্ম্ম।

তারপর সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা নগরের তোরণ সম্মুখে দেখিলাম কতকগুলি ধর্ম্মযাজক ও বিচারপতি মিলিয়া একজন চিকিৎসককে জীয়ন্তে অগ্নি সংকার করিতেছে, শত জিহ্বা বিস্তার করিয়া অগ্নিশিখা গগনমার্গে ধাবিত হইতেছে, ধর্ম্মপ্রচারকগণ সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বনি করিতেছেন। জিজ্ঞাসায় জানিলাম যে, এই হতভাগা চিকিৎসক সাধুস্বভাব, জিতেন্দ্রিয় ও পরোপকারী ছিল, কিন্তু সে যীশুখ্রীষ্টকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করিত না, মানবের অনন্ত নরকে বিশ্বাস করিত না, সেই গুরুতর অপরাধে প্রোটেষ্টাণ্ট বিচারপতি ও প্রচারকগণ তাঁহাকে জীয়ন্তে অগ্নি সংকার করিতেছেন। আকুল প্রাণে কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিলাম এ নৃশংসতা কেন? সকলেই বলিল ইহার নাম ধর্ম্ম।

বাস্তবিক জগতে ধর্ম্মের নামে যত অধর্ম্ম, সত্যের নামে যত অসত্য, ন্যায়ের নামে যত অন্যায় প্রচারিত ও অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সমুদায় চিত্র গুলি মানসনেত্রে দর্শন করিলে প্রাণ মন অবসন্ন হইয়া পড়ে, কেবল অতীত ইতিহাসের কথাই কেন আলোচনা কর, একবার চাহিয়া দেখ বর্ত্তমান সময়েও ধর্ম্মপ্রচারকনামধারী মনুষ্যগণ ধর্ম্মের নামে কত বিসংবাদপূর্ণ হলাহলবটিকা গলাধঃকরণ করাইবার চেষ্টায় পৃথিবীর কেন্দ্রে কেন্দ্রে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন। অন্য দেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া আপন দেশের মধ্যেই দেখ, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কত পাপ কত নির্য্যাতন আজিও ভারতভূমিকে কলুষিত করিতেছে! কেহ ধর্ম্মের নামে নবমবর্ষীয়া বালিকা-বিধবাকে দারুণ চৈত্রের সুদীর্ঘ একাদশী

দিনে গৃহের মধ্যে অর্গল বদ্ধ করিয়া রাখিতেছে, হতভাগিনী ক্ষুধাতৃষ্ণায় মৃতবৎ হইয়া ক্ষীণকণ্ঠে হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ করিতেছে; কেহ ধর্ম্মের নামে নবজাত শিশু সন্তানকে স্বহস্তে কূপে গর্ত্তে জীয়ন্তে সমাধি দিয়া বিধবার ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতেছে, কেহবা আত্মকল্যাণোদ্দেশে ধর্ম্মের নামে শত শত প্রাণিহিংসায় গৃহপ্রাঙ্গন রুধিরধারায় প্লাবিত করিয়া উন্মত্ত চীৎকারে ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতেছে। ইহার সকলই কি ধর্ম্ম! অনেক সময়ে এই সকল চিত্র দর্শন করিতে করিতে প্রাণ মন এমনি বিকল হইয়া যায় যে, চিন্তাশীল হৃদয়বান্ সরল প্রকৃতির মানবসন্তান ঊর্দ্ধ দিকে চাহিয়া প্রাণের আবেগে বলিয়া উঠেন, ইহাই যদি ধর্ম্ম হয়, ইহাকে লইয়া স্বর্গের নন্দনকাননেও যাইতে চাহি না! সেই জন্য ধর্ম্ম কি তাহার আলোচনা না করিয়া কেবল মাত্র অজ্ঞেয়বাদের সমালোচনা করিয়া কোন ফল নাই। বুঝিলাম ঈশ্বর আছেন, বুঝিলাম আমরা কিয়ৎপরিমাণে তাঁহাকে জানিতে পারি, কিন্তু যে সকল কার্য্য করিতে আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান নিষেধ করে, ক্ষুদ্র প্রাণ শিহরিয়া উঠে, মহান্ অনন্ত ঈশ্বরের নাম লইয়া কি সেই সকল কার্য্য সাধন করিবার জন্যই প্রস্তুত হইতে বলেন? যদি তাহাই ধর্ম্ম হয়, ধর্ম্ম চাহি না—অজ্ঞেয়বাদ লইয়া জীবন যাপন করিয়া যদি অনন্ত নরক হয় তাহাও শ্রেয়ঃ। (সম্পূর্ণ)

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

———oo———

# কৃষ্ণলীলামৃত।

( সমালোচনা )

বলরামদাস কৃষ্ণলীলামৃত গ্রন্থ রচনা করেন। বলরামদাস এই গ্রন্থে লিখিয়াছেন, মগধ দেশের এক শূদ্র রাজা বৈরাগ্যধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। রাজা বৃন্দাবনে গমন পূর্ব্বক দশ বৎসর বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া গুরুর অনুমত্যনুসারে দেশ ভ্রমণে নির্গত হন। যমুনাকূলবর্ত্তী পাঞ্চাল নগরে এক দিন সন্ধ্যার সময়ে তারা নাম্নী গোয়ালিনীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তারা যত্ন করিয়া বিবেকী বৈষ্ণবকে নিজ গৃহে লইয়া যায়। বিবেকী তারাকে যে কৃষ্ণলীলা বলিয়াছিলেন, বলরামদাস নিজ গ্রন্থে তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন।

গল্পটি বোধ হয় বলরামের মনঃকল্পিত। বলরাম নিজে সেই বিবেকী রাজা। বিবেকী তারাকে প্রাণপ্রিয়া এবং তারা বিবেকীকে প্রাণনাথ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে। টীকা অনাবশ্যক। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় কৃষ্ণের সে লীলা নয়, যে লীলা পাঠ করিলে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। কবি ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তের দোহাই দিয়াছেন। ভাগবতের সঙ্গে ব্রহ্মবৈবর্ত্তের নাম করিলে ভাগবতের অপমান হয়। জগতের মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মত খেউড়ের পাঁচালী কোন জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হয় কিনা জানি না। কবি ভাগবতের অপেক্ষা ব্রহ্মবৈবর্ত্তেরই মতানুসরণ করিয়াছেন। শাক্তমত বাঙ্গালীকে মাতাল ও বৈষ্ণবমত বাঙ্গালীকে লম্পট করিয়াছে, একথা স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ হওয়া উচিত নহে।

কবি বেশ বিনয়ের সহিত গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। যথা,—

বন্দে বৃন্দাবনাসীনমিন্দিরানন্দ মন্দিরং।
তমালশ্যামলং দেবং রাধাস্যেন্দু চকোরকং॥
জয় জয় কৃষ্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন।
অনাদির আদি সর্ব্বকারণের কারণ॥
জয় জয় কৃষ্ণ বৃন্দা বিপিনবিহারী।
জয় জয় কৃষ্ণ গিরিগোবর্দ্ধনধারী॥
জয় জয় কৃষ্ণ গোপীগণ-চিত্তচোর।
রাধার বদন বিধু সুধা চকোর॥
জয় জয় কৃষ্ণ নন্দনন্দন সুন্দর।
গোপিকার বস্ত্রহারী জয় দামোদর॥
জয় জয় কৃষ্ণ কালী মর্দ্দন কংসারি।
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ মোহন বংশীধারী॥
ত্রিগুণাত্মক যারে ধায়ে অবিরত।
হেন কৃষ্ণ-পাদপদ্মে নতি কোটি শত॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন ভকতের নব নিধি।
সে কৃষ্ণ শ্রবণে আরম্ভের হৌক সিদ্ধি॥
মিনতি করিয়া বলি শুন সভাসদ্।
মূর্খমতি হঞা মুই আরম্ভিনু পদ॥
অযোগ্য হইঞা কৈনু যোগ্যের আরম্ভ।
এমত জানিঞা না করিব উপালম্ভ॥
চাণ্ডালে করয়ে যদি কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
তাহা সাধুলোকে কিনা করে আস্বাদন॥

যদি গঙ্গাজল থাকে কর্দ্দমে মিশ্রিত।
তাহা পরশিয়া হয় পাতকী পবিত্রে॥
তেমতি আমার কথা কর্দ্দম সমান।
কৃষ্ণকথা অমৃত করহ কর্ণে পান॥
অতএব সাধু সব মোর পরিহার।
দোষ দিহ পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার॥
যদি মূর্খ দোষে এহি পদে থাকে দোষ।
কৃষ্ণ কথা শুনি কর ভুবন সন্তোষ॥
স্ববর্ণের পাত্রে থাকে মদিরা পূরণ।
তাহা পরশিয়া স্নান করে সাধু জন॥
মৃত্তিকার পাত্র গঙ্গা জলেতে পূর্ণিত।
তাহা ত্যাগ করা সাধুজনে অনুচিত॥
ভাণ্ড দোষ গুণ বুদ্ধি কিছু বস্তু নয়।
দ্রব্য বিচারিঞা লয় সাধু যেহি হয়॥
বিশেষ বৈষ্ণবজন দয়াল স্বভাব।
পরপক্ষ নিন্দাবাদে নাহি তার লাভ॥
যদি অনুচিত হয় মোর এহি কর্ম্ম।
তথাপিও মহান্ত জনের ক্ষমাধর্ম্ম॥
পুনরপি বৈষ্ণবচরণে পরিহার।
আপনারা গুণ দোষ ক্ষেমিয় আমার॥
কনিষ্ঠ জনেক আমি বলি প্রিয়বাণী।
নিন্দা না করিবা মোক অতি অল্প জানি॥
পুটাঞ্জলি করি শিরে হঞা ভূমিগত।
শ্রীগুরু বৈষ্ণবপদে কোটি দণ্ডবত॥

গ্রন্থকার কোন্ সময়ের লোক তাহা এই গ্রন্থের একটী শ্লোক পাঠে অবগত হওয়া যায়।

শ্লোকটী এই,— অজমুখ ভুজ অঙ্গ অশ্বিনীশ কায।
এই পরিমাণে শকাদিত্য শক যায়॥

শ্লোকটীর অর্থ পরিস্ফুট রূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হইল না। অজমুখ=৪, ভুজ=২, অঙ্গ=৬, অশ্বিনীশকায=১ ধরিলে ১৬২৪ শক হয়। যদি আমাদের কৃত অর্থে ভ্রম না হইয়া থাকে তবে কৃষ্ণলীলামৃতকার বলরামদাস প্রায় দুই শত বৎসরের পুরাতন লোক। বলরাম একটি কবিতায় বলিয়াছেন—

শ্রীযুত গদাধরচরণ ভরসে।
কৃষ্ণলীলামৃত কহে বলরাম দাসে॥

বলরাম স্বকৃত গ্রন্থে নরোত্তম দাস ও লোচন দাসের এক একটী পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

নরোত্তম দাসের পদ—

পীরিতি বলিয়া কোন সিরজিলে বিধি।
জাতি কুল গেল পরাণ অবধি॥
হাম যদি জানব হেন রীত হব।
দারুণ পীরিতি পাশ হাম কেন যাব॥
একেত অবলা আমি পরের অধীন।
ভাবিতে শ্যামের গুণ তনু ভেল খিন॥
বিধাতা করিলে মোক পীরিতির মরা।
পীরিতি বিহনে প্রাণ হারাইলাঙ পরা॥
কি করিব কোথা যাব দেহ না আরতি।
পরাণে মারিলে শ্যাম করিঞা পীরিতি।
কান্দিতে কান্দিতে কয় নরোত্তম দাসে।
অগাধ জলের মীন মরয়ে পিয়াসে॥

লোচন দাসের পদ—

প্রাণের বলরাম হে— কেমনে বাচিব মোর যশোমতী মা।
গোকুল নগরে আমি পাসরিব কাহা॥
তিলেক না দেখি আমা যেইজন মরে।
কেমনে ছাড়িব তাহা জ্বলন্ত অন্তরে॥
নিরবধি অন্তর পোড়য়ে আমার।
কেমনে না জীব বড় মা রোহিণী আমার॥
শ্রীদাম সুদাম দাম সংহতি ছাওয়াল।
শ্যামলী ধবলী বলি না ডাকিব আর॥
কালিন্দী কদম্ব আর বৃন্দাবনবনে।
গোপগোপীগণ আমি পাসরিব কেমনে॥
কহএ লোচন দাস ইহা কহিলে কি হয়।
হৃদয়ে রহিল শেল পাসরিল নয়॥

গ্রন্থের অধিকাংশ সরল পয়ারে রচিত। অল্প সংখ্যক ত্রিপদী আছে। গ্রন্থকার পণ্ডিত লোক ছিলেন। রচনা সুমিষ্ট। সভাস্থলে গ্রন্থের পদগুলি গীত হইত। কবিসভাসদগণকে বারংবার উদ্দেশ করিয়া পদ বলিয়াছেন।

অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের ভাষার সহ বলরামের ভাষার অনেক সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ভবননির্ম্মাণে অদ্ভুতাচার্য্য এই কবিতাটী বারংবার বলিয়াছেন—

হিঙ্গুলে নির্ম্মিত তার ভবন বিশাল।
পথ ঘাট নির্ম্মাইল দিঞা কাচ ঢাল॥

বলরামের গ্রন্থেও অবিকল ঐ কবিতাটী পাওয়া যায়। কবি, কোন্ স্থানের লোক তাহা জানা যায় না। গ্রন্থ পাঠ করিয়া সাময়িক আচার ব্যবহারও কিছু জানা যায় না। একটী ব্যবহারের উল্লেখ আছে, ভাগবতে কি ব্রহ্ম বৈবর্ত্তে উহার উল্লেখ আছে কি না স্মরণ হইতেছে না। ব্যবহারটী এই—বৃন্দাকে দৌত্যে বরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজের তৃণকেশ (?) রাধার নিকট প্রেরণ করেন। বৃন্দা উহা রাধাকে অর্পণ করিলে রাধা পদ দ্বারা ঠেলিয়া ফেলিয়াছেন। তৃণকেশ প্রেরণ করা নায়ক নায়িকাদের কোন সঙ্কেত কি না জানি না।

বারমাস্যা প্রাচীন কবিগণের একটী বিশেষ বর্ণনার বিষয়। মুকুন্দরামের বারমাস্যা পাঠ করিলে মোহিত হইতে হয়। বলরাম, গোপীগণের যে বারমাস্যা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল।

এহি মতে গোপীগণ বিরহব্যাধিনী।
বারমাস্যা দুঃখ কহে আপনা আপুনি॥
মাঘে মুগুধ মতি আইল অক্রূর।
প্রাণকৃষ্ণ নাথ লঞা গেল মধুপুর॥
হিমহিমালয় বায়ু সহনে না যায়।
দ্বিগুণ মদনতাপে প্রাণ দহে তায়॥
শুন শুন আরে সখি কি হবে উপায়।
নন্দের নন্দন বিনা প্রাণ মোর যায়॥
ফাল্গুনে দ্বিগুণ পাপ বসন্তের বাও।
সহিতে না পারি তাহে কোকিলার রাও॥
প্রাণ যায় রসালমুকুল দেখি জলে।
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ পাব কত কালে॥
চৈত্রে চাতক পাখী ডাকে পিয়া পিয়া।
বিধাতা বঞ্চিলে হামা হাতে নিধি দিঞা॥
পলাশ কাঞ্চন বিকসিত নানা ফুলে।
আর নাকি প্রাণকৃষ্ণ আসিবে গোকুলে॥
বৈশাখে বিশেষ দিন প্রচণ্ড তপন।

ট হেন সময়ে সখি শূন্য বৃন্দাবন ॥
ভ্রমর পড়িয়া ফুলে করে মধু পান।
প্রাণকৃষ্ণ বিনে সখি দগধে পরাণ ॥
জ্যৈষ্ঠে নিষ্ঠুর ভানু আনন পোড়ায়।
নিদাঘে বিদরে বুক না দেখি উপায় ॥
তাহাতে দ্বিগুণ সখি মদন প্রবল।
প্রাণকৃষ্ণ বিনে আমা কে করে শীতল
দারুণ আষাঢ় মাসে মেঘের গর্জ্জন।
শুনিঞা বিদরে বুক স্থির নহে মন ॥
তাহাতে বিষম হৈল দাদুরীর বোল।
প্রাণপ্রিয় বলিয়া বালিশে দিনু কোল ॥
শ্রাবণে সঘনে ঘন বরিষয়ে বারি।
শয়নে স্বপনে মনে পড়য়ে মুরারি ॥
তাহাতে দারুণ পাপ ময়ূরের রাও।
অনল সমান বহে মলয়ের বাও ॥
ভাদরে বাদর ঘন তিমির রজনী।
কৃষ্ণ শুক্ল দুই পক্ষ একই না জানি ॥
ডাহুকীর কলরবে প্রাণ জর জর।
শ্রীনন্দনন্দন বিনে বিষ হৈল ঘর ॥
আশ্বিন মাসেতে হৈল শরত সময়।
নির্ম্মল গগনে পাপ চান্দের উদয় ॥
তাহার কিরণে প্রাণ ছটপটি করে।
নিষ্ফল জীবন নন্দসুত নাহি ঘরে ॥
এহিত কার্ত্তিক মাসে নির্ম্মল তামসী।
সহিতে তারকাগণ প্রকাশিত শশী ॥
রাসরস বিহার করিল বৃন্দাবনে।
এখনে সে সব তাপ সহিব কেমনে ॥
বিধাতা থাইলে চক্ষু হরিলে লোচনা
মরিল যমুনাভ্রাতা না রহে জীবন ॥
অগ্রাহণ মাসেতে হৈল নবীন সকল।
কৃষ্ণের বিরহে প্রাণ সদাই চঞ্চল ॥
দারুণ শীতের তাহে হইল প্রকাশ।
দৈব দোষে প্রাণপ্রিয় গেল দূর বাস ॥
পৌষে প্রবল শীত প্রিয় নাঞি ঘরে।
কে হেন আছয়ে দুঃখ নিবেদি এ কারে ॥

দাস বলরাম কহে শুন ঠাকুরাণী।
অনুরাগে থাকিলে সে পাইবে আপুনি ॥

যে গ্রন্থ খানি দেখিয়া আমরা সমালোচনা করিলাম উহা ১১৬৭ সালের হস্তলিখিত।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

---

# যামিনী।

## ষষ্ঠ অধ্যায়।

---

মন দিয়া মন পাইবার আশার নাম অনুরাগ, মন পাইলে তাহার নাম হয় ভালবাসা, অনুরাগ বল, প্রেম বল আর ভালবাসাই বল আপনার টুকু দিয়া পরের টুকু পাওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেখানে প্রতিদান নাই সেখানে ভালবাসা নাই। ভৈরবনিনাদী বজ্রাগ্নিপ্রসবকারী, নীলিমালঙ্কৃত নবীন নীরদ স্নিগ্ধ ধারা বর্ষণ করে বলিয়া, তৃষিত চাতক সতৃষ্ণ নয়নে সেই বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরিত মেঘমালার পানে চাহিয়া থাকে, কুমুদহৃদপ্রফুল্লকারী, কৌমুদী-অনুলিপ্ত মৃগাঙ্কলাঞ্ছিত পূর্ণিমা প্রফুল্ল চন্দ্রমামণ্ডল অমরকাঙ্খিত সুধাবিন্দু বর্ষে বলিয়াই উদ্ভ্রান্তা চকোরী, অগণিত জ্যোতিষ্মান্ হীরকখণ্ডখচিত চন্দ্রমা-কিরণপরিপ্লাবিত গগনমণ্ডলের সীমাশূন্য পথে গগনান্তবিলম্বী ধরাতলপ্রান্ত-সংস্পর্শী ছায়াপথের পার্শ্ব দিয়া অশ্রান্ত পক্ষসঞ্চালনে উড়িয়া বেড়ায়, দশ দিগ্দাহী মিহিরমণ্ডলের তীব্র ময়ূখমালা,—সুস্নিগ্ধ সলিলাসনারূঢ়া, সৌরকর-প্রয়াসিনী, অর্দ্ধোন্মেষিতনয়না পঙ্কজকলিকার কোমল কান্তি উৎফুল্ল করে বলিয়াই মুকুলিতযৌবনা নলিনী বালা, বারিরাশির সস্নেহ শীতল স্পর্শকেও তুচ্ছ করিয়া ধ্বান্তাপহারী ভাস্কর দেবের নীলাশ্ববাহিত অগ্নিময় রথের কিরণ-মণ্ডিত রক্ত পতাকার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকে। যদি জলধর বারিশূন্য, শশাঙ্ক সুধাশূন্য, সূর্য্যকর স্নেহশূন্য হইত তাহা হইলে কি চাতক মেঘ পানে, চকোরী চাঁদের পানে, নলিনী সূর্য্য পানে চাহিয়া থাকিত? ভালবাসার বিধান এই তোমার যা কিছু আমাকে দাও আমার যা কিছু তুমি লও, এই দান প্রতিদান লইয়াই ভালবাসার অস্থিপঞ্জর!

নিঃস্বার্থ প্রেম এ জগতে আছে কি না জানি না, শুনিতে পাই ব্রজ-গোপীর প্রেম নিঃস্বার্থ ছিল, কিন্তু মোহনবংশীধারী একটী বারের জন্য চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জে আসিতে মানাও হইয়াছিল, তবেই দেখা গেল যতক্ষণ তোমার হৃদয়ের সমস্ত স্থান টুকু আমি অধিকার করিয়াছি বলিয়া মনে মনে অহঙ্কার থাকে ততক্ষণ ভালবাসার গ্রন্থিও দৃঢ় থাকে, যেমন তাহাতে বিপর্য্যয় লক্ষিত হয় অমনি যে গ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়ে। যেখানে সম্পূর্ণ আমিত্বের বিকাশ সেইখানে ভালবাসার পূর্ণ অভিব্যক্তি যেখানে আমিত্ব নাই সেখানে ভালবাসা নাই।

এক শ্রেণীর ভালবাসা আছে যাহা প্রতিদানবিহীন কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ স্বার্থবিজড়িত, সেখানে 'আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি আমাকে ভালবাসিও' ইহা জানাজানির আকাঙ্ক্ষা নাই। চন্দ্রকর, কুসুমের হাসি, শিশিরের হার ভাল-বাসি কিসের জন্য ? দেখিতে ভাল লাগে বলিয়া, মলয় স্পর্শে শরীর শীতল হয়, মধুপগুঞ্জনে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হয়, মুকুলভারাবনত সহকারশাখাটী নয়নানন্দ দান করে তাই তাহাদিগকে ভালবাসি, ভালবাসি বলিয়াই কি তাহাদিগকে আমার হৃদয় টুকু লইতে বলি ? এই সকল ভালবাসার মূলে এক এক ইন্দ্রিয়বৃত্তির পরিতৃপ্তি নিহিত আছে, যেখানে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন সর্ব্বেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সেই খানেই প্রকৃত ভালবাসা, সেই খানেই আত্মদান, সেই খানেই আত্মোৎসর্গ।

আমি যাহাকে ভাল বাসিলাম সে আমাকে ভাল বাসিল না, এই খানেই স্রোতের মুখে বাঁধ পড়িল, স্রোত অন্য দিকে ছুটিল। আমি ভাল বাসিলাম সেও ভাল বাসিল, দুকুলপ্লাবী প্রবাহ দুইটী মিলিয়া শান্ত ভাব ধারণ করিল, দুজনে দুজনকে ভাল বাসিতে বাসিতে মাঝ পথে আসিয়া বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল, অমনি অন্তঃসলিলা তরঙ্গচাঞ্চল্যবিহীনা প্রবাহিনীর উপর তরঙ্গ উঠিল। প্রথম প্রথম অভিমান, তাহার পর বিরহ, তাহার পর আপনার প্রতি ক্ষুদ্রতা অনুভব, তাহার পর আত্মহননেচ্ছা।। সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, সে আমাকে পর ভাবিল তখন মনে হয় এ জীবন রাখিয়া লাভ কি ? তবে যামিনী মরিল না কেন ? যামিনী এখনও বুঝিতে পারে নাই কি সে কি হইল।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গহনা লইয়া বিদায় হওয়ার পর ছয় দিন অতীত

হইয়াছে, জ্ঞানেন্দ্র বিবাহ করিয়া পারুলের মুখছবি বুঝি যামিনীকে দেখাইবার জন্য পারুলকে সঙ্গে করিয়া গৃহে ফিরিয়াছেন। যামিনীর সুখ দুঃখের সহিত অপর দশজনের কি সম্বন্ধ আছে, তাহারা সকলের বিবাহে যেরূপ উৎসব [আনন্দপ্রকাশ করে এ বিবাহে ও তাহারা সেই রূপই আনন্দোৎসব করিতেছে; যামিনীও সহাস্য বদনে সে উৎসবে যোগদান করিয়াছে, তাহার প্রাণের ভিতর যাহা হইতেছে তাহা বাহিরের কাহাকেও দেখিতে দিতেছে না। কেহই যামিনীর সেই পরিম্লান মুখমণ্ডলের নৈরাশ্যপরিপূর্ণ হাস্যের অর্থ বুঝিতেছে না। আ'জ ফুল শয্যার দিন; যামিনী যত্ন করিয়া প্রাঙ্গনের পার্শ্বে পার্শ্বে যে ছোট ছোট পুষ্পবৃক্ষগুলি রোপণ করিয়াছিল, বসন্তসমাগমে সে গুলি এখন কুসুমিত হইয়াছে; সে আ'জ আপন হাতে ফুলশয্যা রচনা করিবে, সেই পুষ্প-বৃক্ষ গুলিতে যত ফুল ফুটিয়াছিল সব গুলি তুলিল, পাড়ার ছোট ছোট মেয়েরা যামিনীর আদেশমত আঁচল ভরিয়া বকুলের ফুল কুড়াইয়া আনিয়া তাহার কাছে দিতে লাগিল; সে কতকগুলি ফুলে মালা গাথিল, কতকগুলি ফুল আঁচলে করিয়া শয্যাগৃহে প্রবেশ করিল।

সেই শয্যাগৃহে—যে শয্যাগৃহের সুখশয্যাপার্শ্বে বসিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া যামিনী জীবনের সমস্ত সুখস্বপ্নগুলি দেখিয়াছিল, যে শয্যা-গৃহে প্রবেশ মাত্র তাহার নয়নে স্বর্গের আনন্দরশ্মি ফুটিয়া উঠিত, যে শয্যাগৃহে থাকিলে তাহার হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অপার্থিব অনুভূতি ভিন্ন আর কিছুই স্থান পাইত না, যামিনী সেই শয্যাগৃহে স্বামীর ফুলশয্যা রচনা করিতে প্রবেশ করিল! সে ফুলশয্যায় যামিনীর অংশ নাই, সে ফুলশয্যায় যামিনীর অধিকার নাই, সে শয়নমন্দিরে যামিনীর আর স্থান নাই!! যামিনী মরিয়া পুষ্প হইয়া জন্মিল না কেন? বকুলের শাখায় থাকিত, অন্যান্য ফুলের সহিত সে'ও ঝরিয়া পড়িত, বালিকারা কুড়াইয়া আনিয়া যামিনীর পুষ্পকান্তি দিয়া জ্ঞানেন্দ্রের ফুলশয্যা রচনা করিত! সে সুখ কি যামিনীর ভাগ্যে ঘটিবে? যামিনি! সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা তুমি সে সাধ করিও না। প্রভাতে চাহিয়া দেখিও কত ফুল পারুলের অলক্তরঞ্জিত চরণঘর্ষণে দলিত হইয়াছে।

যামিনী শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল তাহার প্রণয়ের পূর্ব্ব স্মৃতি গুলি তেমনি ভাবে সজ্জিত রহিয়াছে, সেই প্রথম সমাগমের দিন—যে দিন এই

শয়নমন্দিরে যামিনীর প্রথম ফুলশয্যা হইয়াছিল, সে দিন জ্ঞানেন্দ্র নিজ হস্তে যামিনীকে আপন নাম লিখিতে বলিয়াছিলেন, যামিনী লজ্জায় তাহা পারে নাই, তারপর জ্ঞানেন্দ্র নিজহস্তে যামিনীর হস্ত ধরিয়া যামিনীকে দিয়া যামিনীর নাম লিখাইয়াছিলেন; সে নামটি এখনও সেই ভিত্তিতে লেখা রহিয়াছে। প্রথম মিলনকালে যামিনী একদিন কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া কাঁদিয়াছিল, জ্ঞানেন্দ্র নিজহস্তে সে নয়নজল মুছাইতে মুছাইতে যামিনীর ললাটের সিন্দূর-বিন্দু মুছাইয়া দিয়াছিলেন, নয়নজল সিন্দূরবিন্দুর সহিত মিলিত হইয়া জ্ঞানেন্দ্রের হস্ত রঞ্জিত করিয়াছিল, জ্ঞানেন্দ্র পর্য্যঙ্কপার্শ্বে সে হস্ত মুছিয়াছিলেন। সে আজ অনেক দিনের কথা, কিন্তু সিন্দূরচিহ্ন গুলি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। কত দিন দুইজনে কথা কহিতে কহিতে গৃহের আলোক নিবিয়া যাইত, জ্ঞানেন্দ্র গবাক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দিতেন, হাস্যময় চন্দ্রকর হাসিতে হাসিতে সে সুখময় শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিত, জ্ঞানেন্দ্র সেই জ্যোৎস্নার উপর স্বীয় বাহু-উপাধানে যামিনীর মুখ খানি রাখিয়া সপ্রেম দৃষ্টিতে দেখিতেন, আজিও সে গবাক্ষ তেমনি ভাবে উন্মুক্ত রহিয়াছে, তেমনি ভাবে শশিকর সেই গবাক্ষ দিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সে চিরপরিচিত চন্দ্রকরে, সে বাহু-উপাধানে আর আর কি যামিনী স্থান পাইবে না ?

ইহার পূর্ব্বে কয়দিন যামিনী কেবল কাঁদিয়াছে, মনকে বুঝাইয়াছে, আপনাকে আপনি কত প্রবোধ দিয়াছে, একবারে হতাশ হয় নাই, কিন্তু বিবাহ আসিবার পর হইতে যামিনী আর আশা করিতে সাহস করিতে পারিতেছে না। বিবাহ আসিবা মাত্র যামিনী গিয়া পারুলকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিল, তখন পারুল কোলে আসিয়াছিল, কিন্তু যখন হইতে যামিনীর পরিচয় পাইয়াছে তখন হইতে আর যামিনীর সহিত কথা কহে না, যামিনী স্নেহ করিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে গেলে সে মুখ ফিরাইয়া বসে। সে না হয় সতীন, সে তেমন করিতে পারে, কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রের কাছে হতভাগিনী কি অপরাধ করিয়াছে তাই জ্ঞানেন্দ্র বাটী আসিয়া অবধি একটী বারের জন্য তাহার সহিত দেখা করিলেন না, একটী বারের জন্য কেন একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। যামিনী একবার ভাবে বুঝি ঘৃণা করিয়াছেন, এ জীবনের মত হয়ত কথাবার্ত্তা শেষ হইয়াছে; আবার ভাবে হয়ত না ভুলিয়া বিবাহ করিয়াছে-

তাই লজ্জায় সম্মুখে আসিতে পারিতেছে না। জ্ঞানেন্দ্রনাথ! দাসীর দাসীর কাছে তোমার আবার কিসের লজ্জা? তুমি একবার আসিয়া তেমনি সহাস্যমুখে যামিনীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তেমনি করিয়া বল "যামিনি, আমি না বলিয়া বিবাহ করিয়াছি, আমায় ক্ষমা কর,' যামিনীর আহ্লাদ রাখিবার স্থান হইবে না। নবদম্পতি তোমরা কুসুমশয্যায় শয়ন করিয়া হাস্যমুখে যামিনীকে বল "যামিনি, তুমি ঐ পদপ্রান্তে বসিয়া পদসেবা কর," যামিনী আপনাকে স্বর্গের রাণী মনে করিয়া হাসিতে হাসিতে পদসেবা করিবে, হাসিতে হাসিতে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তোমাদিগকে চামর ব্যজন করিবে। কিন্তু নিরপরাধা বলিয়া তাহার প্রতি ঘৃণার দৃষ্টিতে চাহিও না, তাহার হৃদয়খানি কুসুম অপেক্ষাও কোমল, মোহে অন্ধ হইয়া সে হৃদয়খানি পদদলিত করিও না।

যামিনী মালা গাঁথিয়া আচল ভরা ফুল লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল, সে ভাবিয়াছিল—কুসুমশয্যা পাতিয়া দিবে, কিন্তু স্মৃতির বৃশ্চিক দংশন তাহাকে বিবশা করিয়া তুলিল। শুষ্ক নয়নের জল আর সে চাপিয়া রাখিতে পারিল না, কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাড়াইয়া সজলনয়নে চাহিয়া চাহিয়া অতীত সুখ স্মৃতি-চিহ্ণ গুলি দেখিল, কিছুক্ষণ পর্য্যঙ্কপার্শ্বে মাথাট ন্যস্ত করিয়া নিঃশব্দে রোদন করিল। একবার মনে মনে অভিমান করিল, একবার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিল, আবার ভাবিল—আমি কি কেবল সপত্নীর ফুলশয্যা পাতিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি? এ ঘৃণিত জীবন রাখিয়া লাভ কি? আমি মরি না কেন, মরিলে আর দুঃখ কি? সকলেই তো বলে মরণের পর আবার সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, মরিলেই তো মায়ের সঙ্গে দেখা হইবে, এখানে আশা মিটাইয়া কাঁদিতে পাই না, সেখানে গিয়া মায়ের কোলে বসিয়া, প্রাণ ভরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিব।

উদ্বেলিত হৃদয়বৃত্তি মানুষকে কখন কোন পথে চালিত করে তাহাকে বলিতে পারে? যামিনী সে যত্ন-গ্রথিত পুষ্পহার ছিঁড়িয়া ফেলিল, অঞ্চলের ফুলরাশি ছড়াইয়া দিল, গৃহের আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া শয্যার যে পার্শ্বে জ্ঞানেন্দ্র শয়ন করিতেন যেখানে তাঁহার পদযুগল স্থাপিত থাকিত সেইখানে গিয়া একবার লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে কাদিতে মনে মনে ডাকিল "হে নাথ! হে দুঃখিনীর হৃদয় সর্ব্বস্বধন, হে অন্তর্যামিন্! তুমি তো যামিনীর অন্তর জান,

তবে কেন চরণে ঠেলিলে প্রভো! তুমি তীক্ষ্ণধার তরবারি আনিয়া যামিনীর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া দিলে না কেন? আমি হাসিতে হাসিতে মরিতাম, তুমিও চক্ষুঃশূল ঘুচাইয়া প্রাণে শান্তি পাইতে, অভাগীকে এমন করিয়া তুষের আগুনে পোড়াইয়া বধ করিলে কেন?"

উদ্ভ্রান্তা হইয়া ন্যায় যামিনী উঠিয়া দাঁড়াইল। গৃহের আলোকটী আবার জ্বালিয়া দিল, শরীরে যে দুই একখানা অলঙ্কার পরিহিত ছিল সে গুলি খুলিয়া সাজির উপর রাখিয়া দিল, সিন্দূরের কৌটা খুলিয়া সিন্দূর লইয়া সীমন্তে পরিল, তারপর নয়ন দুটী মুছিয়া তেমনি শুষ্ক হাসি হাসিয়া ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বহির্গতা হইল। যামিনী দেখিল তাহার পরলোকগতা জননী যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া আকাশের উপর দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাহাকে আহ্বান করিতেছেন। সে ছুটিয়া বাটীর ভিতর হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিল।

এমন সময় যে রমণীর স্নেহপূর্ণ সতর্কদৃষ্টি প্রতি মুহূর্ত্তে যামিনীর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছিল সেই স্নেহশালিনী রমণী আসিয়া যামিনীর অঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করিলেন, কাতরস্বরে বলিলেন 'বৌমা! এ বেশে কোথায় যাও মা!' যামিনী চমকিতা হইয়া স্পন্দহীনা পাষাণ প্রতিমার ন্যায় দাঁড়াইল, ঊর্দ্ধদিকে অঙ্গুলি তুলিয়া কি বলিতে গেল বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, হৃদয়ের নিভৃত নিকেতনের প্রতিবিম্ব যে নয়ন দুটীর উপর প্রতিভাত হইতেছিল, সে নয়ন দুটী লক্ষ্যহীন দৃষ্টি পরিপূর্ণ হইল, যে অব্যক্ত অসহনীয় যন্ত্রণা তাহার হৃদয়পঞ্জর বিধ্বস্ত করিতেছিল, উদাস মুখচ্ছবিতে তাহা প্রতীয়মান হইতে লাগিল, জ্ঞানেন্দ্রের জননী যামিনীকে বুকের মাঝে ধরিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

## সপ্তম অধ্যায়।

আমরা প্রসঙ্গ ক্রমে প্রকৃতির রম্য নিকেতন, কৃষকপল্লী সেই তারাপুর গ্রাম খানিকে অনেক দূরে ফেলিয়া আসিয়াছি, চলুন পাঠক! আজ একবার সেই তারাপুর গ্রামের ভিতর প্রবেশ করি, সেই নীল প্রান্তরে, সেই মালিনীতীরে, সেই নব নব কুসুমালঙ্কৃত বনতরুতলে দুঃখিনী যামিনীর শৈশবের সেই লীলা-কুঞ্জ দেখিয়া আসি; এ সভ্যতার রাজ্য ছাড়িয়া সেখানে প্রবেশ করিতে পারিলে

তবু মনে অনেক শান্তিলাভ করিতে পারিব। কৃষকগণের অকপট ব্যবহার, কৃষকবালিকাগণের উদার হাস্য, রবিকরশ্রান্ত কাননচারী রাখালবালকগণের সুমধুর বংশীধ্বনি এ সভ্যজগতের কাপট্য স্বার্থপরতা অনেক পরিমাণে বিস্মৃত করিয়া দিবে।

কিন্তু তারাপুরের সে শস্যশ্যামলাকান্তি, সে অশ্রান্ত আনন্দকোলাহল, এখন কোথায়? যে তারাপুর হইতে কৃষিবলগণ দলে দলে হলস্কন্ধে বাহির হইত, দলে দলে কৃষকরমণীগণ মালিনীতীর কোলাহলময় করিত, সেই তারাপুরে এখন দুই দশ জন দরিদ্র কৃষকের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর, দুই একটি দারিদ্র্যনিপীড়িতা কৃষকপত্নীর দারিদ্র্যসুলভ কাতর ধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না কেন? যামিনী যখন এই তারাপুরের পথে পথে সঙ্গিনীগণ সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া খেলা করিয়া বেড়াইত, তখন তারাপুর ধনধান্যে পূর্ণ ছিল, এখন মূর্ত্তিমতী দরিদ্রতা বিরাজ করিতেছে কেন? যামিনী রায় মহাশয়ের গৃহের, তারাপুরের কৃষকপল্লীর আনন্দরূপিনী—যামিনী তারাপুর হইতে গিয়াছে তাহাতেই কি তারাপুর দিনে দিনে শ্মশানদৃশ্য বক্ষে ধারণ করিতেছে? তারাপুরে আর সে ঘনসন্নিবিষ্ট মৃণ্ময় গৃহশ্রেণী নাই—গৃহ সকল ভগ্ন—স্থানে স্থানে মৃত্তিকাস্তূপ—মধ্যে মধ্যে দুই একটি ক্ষুদ্র কুটির। গ্রামে প্রবেশ করিলে দুই একটি দরিদ্র কৃষকের সহিত সাক্ষাৎ হয়, পথপার্শ্বে দুই একটি অতি দুর্ব্বল বলীবর্দ্দ আহার অন্বেষণে নিযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, আর সেই গ্রামের মধ্যস্থলে রায় মহাশয়ের যে বাটী কমলার অধিষ্ঠানভূমি ছিল সেই বাটীর অট্টালিকার কোটরশ্রেণী হইতে পেচককুলের কর্কশ স্বর বহির্গত হইতেছে শুনিতে পাওয়া যায়, কে বলিবে কোন দেবতার অভিশাপে তারাপুরের এই দুর্দ্দশা হইয়াছে?

পিতৃ-বিয়োগের পর যামিনী যেদিন তারাপুর ছাড়িয়া যান, সেদিন তারাপুরবাসিগণ কাঁদিতে কাঁদিতে যামিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া যামিনীকে বিদায় দিয়া আসিয়াছিল, যামিনীর শ্বশুর রায় মহাশয়ের ভিটা বিক্রয় করিয়া ভিটায় প্রদীপ দেওয়া টুকুও বন্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, কৃষকগণ দলবদ্ধ হইয়া তাহাতে বাধা দিয়াছিল. যামিনীর পক্ষ হইতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভ্যজগতের সুনীতি অবলম্বন করিয়া কৃষকগণের উপর মোকদ্দমা-রূপ মহাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন,

যামিনী শ্বশুরকে অনুরোধ করিয়া তাহাদিগকে প্রথম প্রথম সে বিপদ হইতে মুক্ত করিয়াছিল, সেই সময় হইতেই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ক্রোধাগ্নি প্রধূমিত হয়, তাহার পর তাঁহার সুকৌশলে তারাপুরে যামিনীর নাম লুপ্ত হইল, স্বয়ং তারাপুরের হর্ত্তা কর্ত্তা হইলেন, তাঁহার প্রধূমিত ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, কৃষকগণের সর্ব্বনাশ সাধন করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। রায় মহাশয়ের সেই প্রাচীন কর্ম্মচারী যিনি প্রজাগণকে রায় মহাশয়ের ন্যায় পুত্রস্নেহে পালন করিতেছিলেন—তিনি কর্ম্মচ্যুত হইলেন, শান্তিসুখভোগী প্রজাগণের উপর সত্য মিথ্যা রাশি রাশি মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইল, কৃষকগণ একত্র হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল—আর এ তারাপুরে থাকিব না, আবার যদি কখন এই তারাপুর দিদিঠাকুরাণীর হয় তবেই আসিব! দলে দলে কৃষকশ্রেণী তারাপুর ত্যাগ করিতে লাগিল, নিতান্ত দারিদ্র্য বশতঃ যাহারা স্থান পরিবর্ত্তন করিতে অক্ষম হইল তাহারাই দুই দশ জন কেবল তারাপুরে থাকিয়া গেল, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুকৌশলে দুই তিন বৎসরের মধ্যেই তারাপুর প্রায় জনশূন্য হইল। তাঁহার ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে কিনা জানি না তবে তারাপুরের জন্য সরকারী রাজস্ব যাহা দিতে হয় তাহার জন্য মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এক্ষণে প্রত্যেক কিস্তিতেই ঋণ গ্রহণ করিতে হইতেছে ইহা অবগত হইয়াছি।

যামিনীর পিসি ঠাকুরাণী—অন্নপূর্ণা দেবী এখনও তারাপুরের মমতা ছাড়িতে পারেন নাই। এখানে তাঁহার জীবিকার উপায় কিছু মাত্র নাই—তারাপুর যখন যামিনীর ছিল তখন তাঁহার কিছুরই অভাব ছিল না; তাঁহার ইচ্ছামত ব্যয়—যামিনীর অনুরোধে জমিদারীর আয় হইতেই নির্ব্বাহিত হইত। মহাল হইতে এখন আর কপর্দ্দকের আশা নাই, রায় মহাশয় কয়েকটী জোত তাঁহার নামে করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, মুখোপাধ্যায় মহাশয় নানা কৌশলে প্রায় সেগুলি কাড়িয়া লইয়াছেন, দুই দশ বিঘা যে জমি আছে গ্রামে কৃষক না থাকাতে তাহা আর আবাদ হয় না, কাজেই তিনি এখন বড় ক্লেশে পড়িয়াছেন। নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাঁহার ক্লেশ এই যে——তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া গুলি আর নিয়মিত হয় না, তাঁহার দ্বারে অতিথি আসিয়া এখন ফিরিয়া যাইতেছে, প্রতিবেশী দরিদ্র কৃষকগণকে পূর্ব্বের ন্যায় অন্নবস্ত্র দিয়া আর সাহায্য করিতে পারিতেছেন না, প্রতি মাসের ব্রত নিয়ম গুলি আর

সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে না। শ্বশুরগৃহে তাঁহার স্থান আছে, তথাপি স্বর্গীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরের স্নেহ স্মরণ করিয়া তারাপুর ত্যাগ করিতে পারেন নাই, অসহায়া বিধবা সেই ভগ্ন অট্টালিকার ভিতর একাকিনী বাস করিয়া নীরবে অশ্রুজল মোচন করিতেছেন।

আর মমতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই সেই বৃদ্ধ কর্ম্মচারী ভৈরব ভট্টাচার্য্য মহাশয়! যামিনীর জমিদারী গিয়াছে তাঁহার চাকুরী গিয়াছে, প্রজাগণ একে একে প্রায় সকলেই তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তিনি পাছে সেই পুণ্যশীলা অসহায়া বিধবার কোন কষ্ট হয় ভাবিয়া তারাপুর ত্যাগ করিতে পারেন নাই। অন্নপূর্ণা দেবী তাঁহাকে দাদা বলিয়া ডাকেন, তিনিও তাঁহাকে কনিষ্ঠা সহোদরার ন্যায় স্নেহ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন। অথচ পূর্ব্বে প্রভুর ভগিনী বলিয়া যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করিতেন এখনও সেইরূপ সম্মান করেন। তাঁহার অন্য কোন সংসারগ্রন্থি নাই, চিরকাল যেমন রায় মহাশয়ের পরিবারভুক্ত ছিলেন এখনও তেমনি আছেন, লোকে বলে তাঁহার বহু অর্থ সঞ্চিত আছে কিন্তু বাহিরে তাহার কিছু প্রকাশ নাই। তিনি কর্ম্মচ্যুত হওয়ার পর যামিনীর পিসীর মহাল হইতে সাহায্য পাওয়া বন্ধ হইল, ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রায় দুই বৎসর কাল একথা তাঁহাকে জানিতে দিলেন না, যখন যাহা আবশ্যক ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজ অর্থে তখনই তাহা যোগাইতে লাগিলেন। তাহার পর অন্নপূর্ণা দেবী যে দিন শুনিতে পাইলেন যামিনীর জমিদারী বিক্রয় হওয়ায় তাঁহার সাহায্য বন্ধ হইয়াছে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বয়ংই এ সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেছেন সেই দিনই তিনি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন 'দাদা! এত যে খরচ এ টাকা কে দেয়?' বৃদ্ধ বলিলেন 'ভক্তি করিয়া প্রজারাই দিতেছে,' তিনি বলিলেন 'দাদা! আমি শুনিয়াছি জমিদারী আর যামিনীর নাই, প্রজাদিগকে বল আমি আর তাহাদের সাহায্য লইব না,' বৃদ্ধ বলিলেন "আর যদি আমি দেই দিদি?' অন্নপূর্ণা বলিলেন 'না দাদা, তোমার বহু কষ্টের অর্থ, অসময়ের সম্বল, আমি আর এমন করিয়া খরচ করিব না, আমার এক মুঠা আতপ চাউল হইলেই যথেষ্ট, যদি কিছু দিতে সাধ হয় যামিনীকে দিও।' সেই দিন হইতে অন্নপূর্ণা দেবীর অতিথি ফিরিতে লাগিল, ব্রত নিয়ম বন্ধ হইল, দীন দুঃখীর কষ্ট বাড়িল, বৃদ্ধ বহু চেষ্টা করিয়াও আর তাঁহার মত ফিরাইতে পারিলেন না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, তারাপুরে জনকোলাহল আর বড় শুনা যাইতেছে না, অন্নপূর্ণা দেবী অন্তঃপুরের একটি গৃহ মধ্যে ক্ষুদ্র একটি প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া মালা জপিতেছে, এমন সময় ভৈরব ভট্টাচার্য্য সেইখানে দেখা দিলেন এবং অন্নপূর্ণা দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'দিদি! সংবাদ মিথ্যা নয়, শুনলাম জ্ঞানেন্দ্র বাবুর বিবাহ হ'য়ে গিয়েছে।'

অন্নপূর্ণা যেন চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন 'হ'য়ে গিয়েছে? আমরা কিছুই জান্‌তে পা'লাম না?'

ভট্টাচার্য্য। যে সুসংবাদ, এ আর জেনে কি হবে?

অন্নপূর্ণা। সুসংবাদ নয় বটে দাদা, তবু জা'ন্‌তে পা'রলে কেঁদে কেটে জামাইয়ের হাত ধরে ব'ল্‌তাম, আর দুই এক বছর কি আমাদের কথা রা'খতেন না।

ভট্টাচার্য্য। এখন আমাদের পক্ষে সবাই সমান, শুন্‌লাম এ বিবাহে জামাই বাবুর তত মত ছিল না, বেহাই মহাশয়ের চক্রান্তেই এ কাণ্ড হ'য়েছে।

অন্নপূর্ণা। দাদা! আমরা বেহাইয়ের কি দোষ ক'রেছি, তাই পদে পদে আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রছেন? দাদা কি এই জন্যই ঘরজামাই রাখবো বলে যামিনীর বিয়ে দিয়েছিলেন? তিনি বেঁচে থা'ক্‌লে আ'জ কি জ্ঞানেন্দ্র এমনি ক'রে আবার বিয়ে ক'রতে পা'রতেন?

অন্নপূর্ণার নয়নজল উছলিয়া পড়িল, স্বীয় শুভ্র বসনাঞ্চলে সে অশ্রুবিন্দু মুছিয়া ফেলিলেন।

বিবাহের সংবাদ শুনিয়া অবধি রোষে ক্ষোভে বৃদ্ধের হৃদয় জর্জ্জরিত হইতেছিল, অন্নপূর্ণা দেবীর নিকট কষ্টে আপনার হৃদয়ভাব সংযত রাখিয়া কথা-বার্ত্তা কহিতেছিলেন, অন্নপূর্ণার অশ্রুবিন্দু নিরীক্ষণ করিয়া তিনি ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিলেন, অত্যন্ত ক্রোধের সময় প্রতিহিংসা লইতে না পারিলে বালক যেমন রোদন করে, তিনিও তেমনি ভাবে কাঁদিয়া উঠিলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন 'দিদি, তিনি যে এমন অসময়ে ম'রবেন তা কি তিনি জা'ন্‌তেন, আর এমন হবে তাই বা কেমন ক'রে জা'ন্‌বেন, তা জা'ন্‌লে এর বিলি ব্যবস্থা একটা কিছু ক'রে যেতেন; তিনি স্বর্গে গিয়েছেন, সকল যন্ত্রণার হাত হ'তে মুক্ত হ'য়েছেন, আমিও যদি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যেতে পা'রতাম, তাহ'লে এমন ক'রে আর যন্ত্রণা ভোগ ক'রতে হ'ত না।' বৃদ্ধের রোদন দেখিয়া অন্নপূর্ণা দেবীও

শোকসিন্ধু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, কিছুক্ষণ রোদনের পর বলিলেন 'দাদা ! যা হবার তা হ'য়ে গিয়েছে, এখন যামিনীর অদৃষ্টে কি হবে তাই ভাব্‌ছি, আমার কত সোহাগের যামিনী সে এখন কার কাছে দাঁড়াবে ?'

বৃদ্ধ নয়ন মার্জ্জনা করিয়া গদগদ স্বরে বলিলেন 'দিদি ! যামিনীর জন্য কিসের ভাবনা ? যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি ততক্ষণ যামিনীর কোন কষ্ট হ'তে দিব না; কা'লই এখান হ'তে পাল্কী বেহারা যা'ক, সেখান হ'তে যামিনীকে নিয়ে আসুক।

অন্নপূর্ণা। এখন কেমন ক'রে নিয়ে আ'সবো, খরচ পত্রের টানাটানি—

ভট্টাচার্য্য। সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হ'বে না, যামিনী আমার মা, বৃদ্ধ সন্তান আমি, ভিক্ষা ক'রে এনে মা'য়ের সেবা ক'রবো।

অন্নপূর্ণা। দাদা ! তোমার ধার শোধ দিবার নয়, দাদা ম'রে গিয়েছেন, আমাদের জন্য কেবল তোমাকে রেখে গিয়েছেন, তুমি আমার জন্য কত না কষ্টই ক'রছো। আচ্ছা দাদা ! বেহাই যখন এখান হতে সব নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন তখন যদি আমরা মানা না ক'রতাম তাহ'লে হয় তো তিনি জামাইয়ের এ বিয়ে দিতেন না, তবে কি আমার দোষেই এমন হ'ল ?

ভট্টাচার্য্য। তোমার দোষ কি ? সে ব্রাহ্মণের মতন দুষ্ট লোক আর কি কেউ আছে, জামাই বাবুর এখানে বাস ক'রবার কথা, তা ক'রতে দিলে না, বিষয়টাকে ফাকি দিয়ে নিজ নামে ক'রলে, তারাপুরটাকে জঙ্গল ক'রলে, তোমার জোতকটা কেড়ে নিলে, শেষে যামিনীরও সর্ব্বনাশ ক'রলে—

কথা বলিতে বলিতে সহসা বৃদ্ধের শরীরে ক্রোধ-লক্ষণ আবির্ভূত হইল, নয়নদ্বয় যেন জ্বলিয়া উঠিল, শরীর থর থর কাঁপিয়া উঠিল, স্ফুরিতাধরে বলিলেন 'দিদি ! এইবার তোমাদিগকে আমাকে ক্ষমা ক'রতে হবে, আমি অনেক সহ্য করেছি আর সহ্য ক'রতে পার্‌ছি না। পাছে যামিনী আমার মনোকষ্ট পাবে বলে আমি এতদিন ক্ষমা ক'রে আস্‌ছি কিন্তু আর ক্ষমা কর্‌ছিনে আমিও পাটওয়ারী, আমারও পেটে অনেক বুদ্ধি আছে, দে'খবো সেই বিট্‌লে বামণের কত বুদ্ধির দৌড় ! যদি আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান হই তাহ'লে এই সকল মনোকষ্টের প্রতিফল সম্বৎসরের মধ্যে দিবই দিব।'

এই বলিয়া বৃদ্ধ স্খলিতপদে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, অন্নপূর্ণা ডাকিয়া বলিলেন 'দাদা! যে'ও না, শুন, আ'জ রাত্রিতে কি খাবে?'

বৃদ্ধ উত্তর দিলেন "কিছুই না, যতক্ষণ যামিনী না আস্‌ছে ততক্ষণ আর জলস্পর্শ ক'র্‌বো না।"

বৃদ্ধের স্নেহ কৃতজ্ঞতা স্মরণ করিয়া অন্নপূর্ণার নয়নদ্বয় আবার জলপূর্ণ হইল, তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য তিনিও গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

---

# বর্ণ।

প্রায় প্রত্যেক দেশস্থ মনুষ্যগণেরই এক একটি স্বতন্ত্র বর্ণ দেখা যায়। ইউরোপীয়গণ শ্বেত, চীনদেশীয়গণ তাম্রবর্ণ, আফরিকার কাফরী প্রভৃতি জাতি কৃষ্ণবর্ণ, আমেরিকাস্থ আদিম নিবাসিগণ রক্তাভ, এইরূপ নানা জাতীয়গণ নানা বর্ণ। সাধারণতঃ এক একটি নির্দ্দিষ্ট জাতি এক এক নির্দ্দিষ্ট বর্ণের হইয়া থাকে। তবে এতদ্দেশীয় জাতির ন্যায় কোন কোন জাতি বিবিধ বর্ণেরও দেখা যায়; সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু বিভিন্ন জাতীয় জনগণের এক একটি নির্দ্দিষ্ট বর্ণ হওয়ার কারণ কি? তাহা অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। প্রাণিতত্ত্ব ও শরীর-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ ইহার তথ্যানুসন্ধানে অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কিন্তু মূলকারণ যতদূর বুঝা যায় তাহাই এস্থলে বিবৃত করিব।

এই বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে সর্ব্ব প্রথমে বর্ণোৎপত্তির কারণ কি; ইহাই দেখিতে হয়। পদার্থ সকলের নির্দ্দিষ্ট কোন বর্ণ নাই। যে পদার্থ শুভ্র সূর্য্যালোকে শ্বেতবর্ণ, তাহাই আবার নীলালোকে নীলবর্ণ, রক্তবর্ণ আলোকপাতে রক্তবর্ণ দেখা যায়। সুতরাং ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে যে, যেরূপ আলোক কোন নির্দ্দিষ্ট পদার্থে পতিত হয়, সেইরূপ আলোকের বর্ণানুসারে ঐ পদার্থের বর্ণ প্রতিভাত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে আলোকের কোন বর্ণ নাই, কিন্তু বোধসৌকর্য্যার্থে এস্থলে "আলোকের বর্ণ" উল্লেখ করা গেল।

আলোকবিশিষ্ট পদার্থ আকাশমণ্ডলে ইতস্ততঃ বিবিধ তরঙ্গরাশি পরি-

চালিত করে। লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে যেরূপ সরোবরজলে ক্রমশঃ তরঙ্গমালা উৎপন্ন হইয়া নিক্ষেপস্থানকে কেন্দ্র করতঃ চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয়, তদ্রূপ আলোকযুক্ত বস্তুকে কেন্দ্র করতঃ বিভিন্ন প্রকারের তরঙ্গমালা আকাশপথে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। ঐ তরঙ্গরাশির কম্পনাঘাত প্রাপ্ত হইয়া সকল পদার্থের মধ্যগত সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম আকাশভাগ কম্পিত হইয়া থাকে, এবং উপযুক্ত কম্পন প্রাপ্ত হইলেই উহা হইতে জীবচক্ষুতেও ঐ তরঙ্গ সঞ্চারিত হয়, তখনই আলোকের জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং আলোকপ্রাপ্ত পদার্থ যে পরিমাণে স্বীয় কম্পনজাত তরঙ্গমালা জীবচক্ষুতে সংক্রামিত করিতে পারে, সেই পরিমাণে উহার বর্ণবিষয়ে জীবের জ্ঞানোদয় হয়। প্রত্যেক পদার্থই প্রাপ্ত রশ্মি ন্যূনাধিক পরিমাণে নিজ দেহ মধ্যে নষ্ট করে, অবশিষ্ট অংশ মাত্রই উহা হইতে প্রত্যাগত হইয়া দর্শকের চক্ষুসংযুক্ত হয়। তাহাতেই বর্ণজ্ঞান হইয়া থাকে।

এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে যে বিভিন্ন জাতীয় জনগণ বিভিন্নবর্ণ হইবার কারণ কি? তাম্রবর্ণ চীনদেশীয় ব্যক্তির শরীরে সূর্য্যালোক পতিত হইলে তাহার যে অংশ শরীর মধ্যে নষ্ট হয় হয়, তদ্ভিন্ন অবশিষ্টাংশ যাহা দেহ হইতে প্রতিফলিত হইল, তাহাই দর্শকের নেত্রে বর্ণজ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। সুতরাং ঐ সূর্য্যালোকের ঐ প্রতিফলিত অংশ চীনীয় ব্যক্তির তাম্রবর্ণের উৎপাদক, সন্দেহ নাই। এইরূপে কাফরিগণের শরীর হইতে প্রায় কোন আলোকই প্রতিফলিত না হওয়ায়, উহা কৃষ্ণবর্ণ প্রতিভাত হয়। কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ প্রাপ্ত রশ্মি সমস্তই শোষণ ও নষ্ট করে।

ইহা হইতে উপলব্ধি হইবে যে ভিন্ন ভিন্ন দেশে মনুষ্যদেহ বিভিন্ন রূপ আলোক প্রতিফলিত করে, এবং বিভিন্নরূপে আলোক শোষণ করে। এই শোষণ ও প্রতিফলন কিরূপে হয়? তাহাই এক্ষণে বিবেচনা করা আবশ্যক। দেশভেদে এইরূপ ক্রিয়ার বিভিন্নতা হওয়া সম্ভব কি না? অনেকের বিশ্বাস এই যে শীতপ্রধান দেশের লোক শ্বেত বর্ণের আলোক প্রতিফলিত করে। সুতরাং শ্বেতকায়, ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক উহার বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত হওয়ায় কৃষ্ণবর্ণ প্রতিভাত হয়। কিন্তু ইহা কিছু অনুধাবন করিলেই অনুমিত হইবে যে তাপভেদ বর্ণভেদের নিকটবর্ত্তী কারণ হইতে পারে না। কারণ

শীতপ্রধান দেশে মনুষ্য যদিও শ্বেতবর্ণ হয়, কিন্তু মনুষ্যের সমধর্ম্মপ্রাপ্ত অন্যান্য জীবগণ শ্বেততর হইতে দেখা যায় না কেন? অথবা উষ্ণপ্রধান দেশে নরগণ কৃষ্ণবর্ণ হইলেও অন্যান্য জীবগণ অন্য বর্ণ হয় কেন? আফ্রিকা দেশে কাফিরী প্রভৃতি নরগণ কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু যাহারা অন্যান্য সর্ব্ববিষয়ে নরধর্ম্মাক্রান্ত (অর্থাৎ গরিলা, বনমানুষ ও বানর প্রভৃতি প্রাণিগণ) তাহারা সকলে কৃষ্ণবর্ণ হয় না কেন? ঐ দেশের উষ্ণতা কি কেবল মনুষ্যের উপরই ক্রিয়া করে, অন্য জীবের উপর কোন ক্রিয়া করে না? এরূপ কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। সুতরাং ইহার অন্যবিধ কারণ অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন হয়। তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে উদ্ভিজ্জগণের বর্ণানুসন্ধান করা প্রয়োজন। কারণ জীবশ্রেণীর নিম্ন-স্তরে উহারাই বিরাজ করিতেছে। উহাদিগের পত্র পল্লবাদির সবুজ বর্ণের কারণ অনুসন্ধান করতঃ পণ্ডিতগণ নিঃসন্দেহে অবধারণ করিয়াছেন যে Chlorophile (ক্লোরোফাইল) নামক পদার্থ ঐ সবুজ বর্ণের মূলীভূত কারণ। প্রত্যেক পত্র পল্লবের প্রথম স্তরে ঐ ক্লোরোফাইল পদার্থ বিদ্যমান থাকায় উহা সবুজবর্ণ দেখা যায়। ঐ কারণেই উদ্ভিজ্জগণের সাধারণ বর্ণ সবুজ। কিন্তু অবস্থাভেদে উহাদিগের বর্ণ মলিন হইয়া পীত অথবা অন্যবিধও হইয়া থাকে। সে স্বতন্ত্র কথা, তাহা পশ্চাৎ আলোচিত হইবে। সাধারণতঃ সবুজ বর্ণের একমাত্র কারণ উল্লিখিত ক্লোরোফাইল। যদি এই নিয়ম জীবশ্রেণীর নিম্নতর স্তরে প্রযোজ্য হয়, তবে উচ্চস্তরে ইহার ব্যতিক্রম হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। মনুষ্যগণেরও চর্ম্ম অথবা চর্ম্মের নিম্ন স্তরে এরূপ কোন পদার্থ বিশেষ থাকা অত্যন্ত সম্ভব, যদ্দ্বারা তাহাদিগের বর্ণ নির্ম্মিত হয়। মনুষ্যত্বকের সমপরিমাণ স্থান অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় বিভিন্ন সংখ্যক লোমকূপ দৃষ্টি-গোচর হইবে। আমি ইংরাজ, বাঙ্গালী ও নেয়ারজাতীর সম্বন্ধে ঐরূপ পরীক্ষা করিয়া লোমকূপসংখ্যার পার্থক্য পাইয়াছি। সুতরাং সূর্য্যালোক বিভিন্ন রূপে তাহাদিগের শরীর হইতে প্রতিফলিত হইবার কারণ প্রাপ্ত হইয়াছি, এরূপ বলিলে অসঙ্গত হইবে না। কিন্তু ত্বকের মধ্যে অথবা নিম্ন ভাগে উদ্ভিদের ক্লোরোফাইলের ন্যায় কোন পদার্থ আছে কি না, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইলে ত্বকবিশ্লেষণ ও তাহার স্থূলতা ও ঘনতা ইত্যাদি পরিমাণ করিতে হয়। সে অবকাশ আমার হইয়া উঠে নাই। যদি কোন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি তাহা

করতঃ অনুসন্ধানের ফল প্রকাশ করেন, তবে ইহা স্থিরীকৃত হইতে পারে। বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পরীক্ষা ভিন্ন কিছুই স্থিরীকৃত হইতে পারে না।

কিন্তু যদি ক্লোরোফাইলের ন্যায় বস্তু বিশেষের অস্তিত্ব হেতুই বর্ণভেদ উৎপন্ন হয়, তবে তাহা কি উষ্ণতাভেদে বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত হইতে পারে না? যে ক্লোরোফাইল গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কোন বর্ণ প্রতিফলিত না করায় কৃষ্ণবর্ণ উৎপাদন করে তাহা কি শীতপ্রধান দেশে ঘনীভূত হওয়ায় শ্বেত বর্ণ উৎপন্ন করিতে পারে না? এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে পদার্থগণের বর্ণ-প্রতিফলনশক্তি উহাদিগের ঘনতা, উহাদিগের আনবিক সংযোজন এবং উহাদিগের গভীরতা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। সুতরাং গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে ঐ সকল গুণ যদি শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা বিভিন্ন হয়, তবে ঐ রূপ ফল সংঘটন হওয়া অতীত সম্ভবপর। গ্রীষ্মপ্রধান দেশীয়গণ, শীত জলে অধিকক্ষণ শরীর অথবা শারীরিক অঙ্গনিচয় নিমজ্জিত রাখিলে তাহার শ্বেতত্বপ্রাপ্তি প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। ইহার কারণ ঐ শরীরত্বকের সংকীর্ণতা। সুতরাং ঐ ত্বকসন্নিবিষ্ট অথবা ত্বকাভ্যন্তরস্থ বর্ণপ্রসূ পদার্থের ঘনতা ও গভীরতা উহার বর্ণোৎপাদনের নিকট কারণ সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাই একমাত্র কারণ নহে। কারণ, কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রিজাতি শীতপ্রধান দেশে সন্তান সন্ততি উৎপাদন করিলেও তাহারা গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও অনেক বংশ পর্য্যন্ত কৃষ্ণবর্ণই থাকে। সুতরাং বংশানুক্রমিক ধর্ম্ম অবশ্যই বর্ণনির্দ্ধারণে ক্রিয়াবান হয়, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব, ইহা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অনুমদিত হইবে যে বিভিন্ন দেশের নরগণের বর্ণভেদের কারণ——

(১) প্রথমতঃ ঐ নরগণের ত্বকসংশ্লিষ্ট পদার্থ বিশেষ যাহা উদ্ভিজ্জগতের ক্লোরোফাইল পদার্থের ন্যায় ক্রিয়াসম্পন্ন হইয়া থাকে,

(২) দ্বিতীয়তঃ দেশভেদে উষ্ণতা ও শৈত্য অনুসারে, ঐ পদার্থের বিকৃতি,

(৩) তৃতীয়তঃ পুরুষানুক্রমিক সংক্রামিত ধর্ম্মানুসারে উহার স্থিরতা ও বিভিন্নতা।

"স্থিরতা ও বিভিন্নতা" কথার অনেক অসদর্থ হইতে পারে। এই জন্য ইহার পরিষ্কৃতি অত্যাবশ্যক। বংশানুক্রমে বর্ণ-স্থিরতাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু যে স্থলে বর্ণসঙ্কর দৃষ্টি গোচর হয়, তথায় বংশসঙ্করতাও অনুমান

করিতে হইবে। এতদ্দেশীয়গণের ন্যায় যে সকল জাতি নানাবর্ণের দেখা যাইতেছে, তাহারা নিঃসন্দেহ বর্ণশঙ্করতা অর্থাৎ জাতিশঙ্করতা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা যুক্তিসিদ্ধ। প্রকৃত প্রস্তাবে এতদ্দেশীয়গণ, আর্য্য, মঙ্গোলীয় দ্রাবিদিগ এবং অনার্য্য জাতি সংমিশ্রণে সঞ্জাত হইবার অন্যবিধ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, বিভিন্ন জাতিষগণের বিভিন্ন বর্ণ, কেবল বহিস্থ কারণ সম্ভূত নহে, আভ্যন্তরিক শারীরিক কারণ সঞ্জাতও বটে, তাহাতে সন্দেহ করিবার হেতু নাই।

শ্রীশশধর রায়।

---

# ভৌতিক নোট।

আমি সে দিন বৈকালে নরেন্দ্র বাবুর বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিলাম। নরেন্দ্র বাবু আমার অনেক কালের বন্ধু এবং তাঁহার পত্নী আমার সম্পর্কে ভগিনী। আমি যখন তাঁহাদের বাড়ী পৌঁছিলাম তখন তাঁহারা একটা ঘরে বসিয়া ছিলেন। আমাকেও ভিতরে আসিতে বলিলেন। আমি যাইয়া দেখি নরেন্দ্র বাবু একটা ভগ্ন বাক্স হইতে কতকগুলি পুরাতন কাগজ পত্র বাহির করিয়া অকর্ম্মণ্যগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিতে ছিলেন, তাঁহারপত্নী নিকটে বসিয়া আবশ্যকীয় কাগজ গুছাইতে ছিলেন এবং ছেঁড়া টুকরা সমস্ত ফেলিয়া দিবার জন্য একটা টুকরিতে তুলিতে ছিলেন। অনতিদূরে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও তাঁহার অষ্টম-বর্ষীয় পুত্র প্রবোধ ছিল। নরেন্দ্র বাবু আমাকে বসিতে দিয়া বলিলেন, "কি হে, প্রসন্ন, অনেক দিন পরে যে।" যথোচিত উত্তর দিয়া আমি প্রবোধের নিকট উপবেশন করিলাম। নরেন্দ্র বাবুর খুড়তুতো ভাই ধীরেন্দ্র বাবু পার্শ্বের বাড়ীতে বাস করেন, আমাকে আসিতে দেখিয়া তিনিও আসিয়া জুটিলেন। এমত সময় নরেন্দ্র বাবু কাগজ দেখিতে দেখিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"এ কি, এখানে কি করিয়া আসিল।" তাঁহার ব্যস্ততা দেখিয়া আমরা সকলে কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি এক খানা কাগজ দেখাইয়া বলিলেন— "ভাল জিনিস, এক খানা দশ টাকার নোট।' পুরাতন কাগজের স্তূপের মধ্যে কি করিয়া আসিল ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি।"

নোটের কথা শুনিয়া আমরা সকলে দেখিবার জন্য তাঁহার নিকটে যাইয়া বসিলাম। নরেন্দ্র বাবু আমাদের দেখাইলেন যে প্রকৃতই এক খানি দশ টাকার নোট। তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, "টাকার আবশ্যক আছে কি? এই নোট খানি আমি তোমাকে দান করিলাম।" বলিয়া নোট খানা তাঁহার নিকট ফেলিয়া দিলেন। তিনি নোট খানি তুলিয়া লইলেন, "টাকার আবশ্যক সকল সময়েই আছে।" বলিয়া আঁচলে বাঁধিলেন। অল্পক্ষণ পরে কি ভাবিয়া খুলিলেন, একবার দেখিয়া নরেন্দ্র বাবুর জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে বলিলেন "ঠাকুর ঝি, আমি সে দিন তোমার কয়েক টাকা লইয়াছিলাম, আজ তাহার কিছু পরিশোধ করি।"

নরেন্দ্র বাবুর ভগিনী নোট লইলেন ও হাসিয়া বলিলেন "বেশ, আমি কিন্তু ধীরেণের নিকট হইতে টাকা লইয়াছিলাম, ধীরেণ, তুমি আমায় ৩০৲ টাকা দিয়াছিলে না, এই দশ টাকা আজ লও, বাকী হাতে হইলে দিব।"

ধীরেণ বাবু লইলেন, বলিলেন "আজ দেখিতেছি ঋণ পরিশোধের পালা পড়িয়া গিয়াছে, আমি ও ঐ পথ অনুসরণ করি না কেন।" আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"প্রসন্ন বাবু, তুমি আমার জন্য যে পুস্তক পাঠাইয়াছিলেন সে সময় দিতে পারি নাই, এখন কিছু গ্রহণ কর।" আমি উত্তর করিলাম। "আমি ত আর টাকা আদায় করিতে আসি নাই, তবে তুমি যখন দিতেছ, তখন ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত নহে।"

এইরূপে নোট খানি এহাত ওহাত ঘুরিতেছে দেখিয়া আমরা সকলে হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না। নরেন্দ্র বাবু কাগজ বাছা রাখিয়া বলিলেন, "এত বড় আশ্চর্য্য নোট দেখিতেছি। কেহ কি আমার কিছু ধারে না, যে আমিও তোমাদের দলভুক্ত হইতে পারি।"

আমি উত্তর দিলাম, "নরেন্দ্র বাবু তোমার কি স্মরণ নাই যে দিদি আমার খুকিকে বালা গড়াইয়া দিবার সময় ২০৲ টাকা নিজে দিয়াছিলেন, উঁহার প্রাপ্য ও তোমার প্রাপ্য একই কথা। আপাততঃ এই দশ টাকা গ্রহণ করিয়া আমাদের দলভুক্ত হও।"

নরেন্দ্র বাবু সহাস্যবদনে নোট খানি আমার হাত হইতে লইয়া তাঁহার পত্নীর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "পুনর্ব্বার তোমাকেই দিলাম, যাহা ইচ্ছা হয় কর।"

তিনি নরেন্দ্র বাবুর ভগিনীর দিকে চাহিয়া কহিলেন 'ঠাকুর ঝি, এইবার দশ টাকা জমা কর, সুদটুদ্ দিতে পারিব না, দিদি।'

নরেন্দ্র বাবুর ভগিনী হাসিয়া উত্তর করিলেন 'তাও কি হয় বোন, মহাজন কি সমস্ত সুদ ছাড়ে।' বলিয়া নোট তৎক্ষণাৎ ধীরেন বাবুর হাতে দিলেন।

ধীরেন বাবু বলিলেন, "প্রসন্ন বাবু তোমারও এই কুড়ি টাকা শোধ হইল।" এবং নোটখানি আমায় দিলেন।

আমিও সে সময়ের প্রথামত নরেন্দ্র বাবুকে দিলাম, বলিলাম, "নরেন বাবু, হিসাব রাখিও, ভুলিলে আর পাইবে না।"

এই সমস্ত বিনিময় নিমেষ মধ্যে হইয়া যাইতেছিল দেখিয়া সকলে হাসিয়া আকুল।

নরেন্দ্র বাবু নোট খানি হাতে করিয়া একবার সকলের মুখ পানে চাহিয়া দেখিলেন, পরে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ইহাতে ঋণ পরিশোধ না হইয়া আমি ত দেখিতেছি কেবল ছেলেখেলা হইতেছে।"

প্রবোধ এতক্ষণ হাঁ করিয়া দেখিতেছিল, পিতার নিকটে আসিয়া বলিল "বাবা, ছেলেখেলা যদি ত নোট খানি আমায় দেও না, আমি খেলা করি।"

কাণ্ডটা কি নরেন্দ্র বাবু সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। প্রবোধকে কাছে সরাইয়া বলিলেন "চুপ্ ক'রে বোস্, দেখ্ কে পায়।" তাঁহার ভগিনী বলিলেন "ছেলেখেলা কেন হইবে? নোট খানা যাহার হাতে আসিয়াছে, তখন তাহারই হইয়াছে, এবং সে ইচ্ছা মত হস্তান্তর করিয়াছে। এরূপ হস্তান্তর বড় দেখা না গেলেও ন্যায়সঙ্গত তা নিশ্চয়ই।"

ধীরেন্দ্র বাবু বলিলেন "দিদির কথাই ঠিক। ইহাতে অর্থের উপকারিতা সুন্দর বুঝিতে পারা যাইতেছে। টাকা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়ায়, আর যে কেহ একবার মাত্র স্পর্শ করিতে পায়, তাহারই উপকার করিয়া আসে।"

নরেন্দ্র বাবু বলিলেন সে সমস্তই ত বুঝিলাম, কিন্তু এই নোট খানা কাহার কি কাজে লাগিবে।" তাঁহার পত্নী তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, এ নোটের কাজ এখনও শেষ হয় নাই, আপনি যদি পুনঃরায় ও খানি আমায় দান করেন ত দেখাইতে পারি।"

নরেন্দ্র বাবু তাহাই করিলেন। তাঁহার পত্নী তাঁহার ঠাকুরঝির হাতে

দিলা বলিলেন "দিদি, বোকশোধ।"

নবেন্দ্র বাবুর ভগিনী কহিলেন, "ঠিক। ধীরেন, এই লও। তোমাব ত্রিশ টাকা তুমি পাইলে।" ধীবেন্দ্র বাবু লইলেন, আমাকে বলিলেন "প্রসন্ন বাবু, তুমি ত আব দশ টাকা পুরা পাইবে না ভাই, পাঁচ টাকা মাত্র পাইবে। যদি বাকী দিতে পাব, তাহা হইলে নোট তুমি পাও।"

আমি পকেট খুজিযা টাকা বেজকি ও পয়সাতে পাঁচ টাকা করিয়া ধীবেন্দ্র বাবুকে দিলাম।

ধীবেন্দ্র বাবু টাকা লইয়া হাসিয়া বলিলেন, 'এইবাব নোটের ভেল্কি ভাঙ্গিল, দেখ দেখি ভাই, কত টাকাব কাজ হইল।'

আমবা হিসাব কবিযা দেখি ১৩৫৲ টাকাব।

নরেন্দ্র বাবু বলিলেন "কত, ১৩৫৲ টাকা! মিথ্যা কথা। টাকা দিতে দিতে বাড়ে না কমে? এ ছেলেখেলা, পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি। তোমাদেব পবস্পাবেব যে দেনা পাওনা ছিল এখনও তাহাই বহিল।

আমি উত্তব কবিলাম নবেন্দ্র বাবু, তুমি ভুল বুঝিতেছ, চক্ষেব সম্মুখে অবিচ্ছিন্ন ভাবে এই হস্তান্তব গুলি হইযাছে বলিযা তুমি উহাব গতি অনুসবণ করিতে পার নাই। যদি ছেলেখেলা হইত ত নোট খানি তোমারই থাকিত, আমবা দুজনে ভাগ কবিয়া লইতে পাবিতাম না।"

নবেন্দ্র বাবু বলিলেন "হইতে পাবে, আমি কিন্তু এমন ভৌতিক নোট কখনও দেখি নাই।"

এই সময় নরেন্দ্র বাবুর পত্নী আমাদিগকে কিছু জলযোগ করিতে অনুরোধ করায় সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

# ছোট কথা।

আমবা আত্মচরিত্রই ভাল কবিয়া বুঝি না,—পবচবিত্র বুঝিব কেমন করিয়া? না বুঝিযা সমালোচনা করিতে বসিয়াই ত সংসারে এত পবনিন্দাব প্রশ্রয় দিতেছি!

পবনিন্দা জিনিষটা একটু—একটু কেন—প্রচুব পরিমাণে বসাল। তাই বোধ হয পরনিন্দাব প্রলোভন পরিত্যাগ করা ঘটিয়া উঠে না। তুমি আমার

নিন্দা কর, আমি তোমার নিন্দা করি,—ইহাতে তোমারও সুখ আমারও সুখ! কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখ, তুমি আমাকে নিন্দা করিতেছ, আমি তোমাকে নিন্দা করিতেছি, ইহাতে কাহার ক্ষতি অধিক? বুদ্ধিমান লোকে দূরে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে, সহৃদয় লোকে আমাদের দুর্ম্মতি দেখিয়া দুঃখ করিতেছে, সম্ভ্রান্ত লোকে আমাদের পরিচয় পাইয়া শিহরিয়া উঠিতেছে!

লোকসমাজে এত দলাদলি কেন? গালাগালি তাহার মূল প্রস্রবণ না হউক, দলাদলির সঙ্গে গালাগালির সংশ্রব খুব ঘনিষ্ঠ বলিয়াই বোধ হয়। দেশে গালাগালি না থাকিলে দলাদলি কত দিন প্রশ্রয় লাভ করিত?

তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কত নিকট তাহা কি কখন ভাবিয়া দেখিয়াছ? মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ এত নিকট যে তাহা ভাবিতে গেলে অবাক হইতে হয়। এক দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন এ উহার উপর নির্ভর করিয়া জীবিত রহিয়াছে, এক সমাজের জনসঙ্ঘও তেমনি এ উহার উপর নির্ভর করিয়া বিরাজ করিতেছে। হাতের সঙ্গে মুখের বিবাদের মত, আমার সঙ্গে তোমার বিবাদও কি নিতান্তই হাস্যাস্পদ নহে? তবু কেমন স্বভাব—বুঝিয়াও অবুঝের মত ব্যবহার করা ঘুচিতেছে না!

তুমি প্রগাঢ় পণ্ডিত, সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া প্রতিষ্ঠার উচ্চ চূড়ায় কীর্ত্তিধ্বজা উড়াইয়া দিয়াছ—তথাপি তুমি পরনিন্দা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছ না!

আমি অতুল অধ্যবসায়ে সংসারের অনেক অভাব দূর করিয়া দুর্দ্দমনীয় রিপুগণকে বশীভূত করিয়াছি,—বিপদে ধৈর্য্য, অভ্যুদয়ে ক্ষমা, প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত শম দম তিতিক্ষার পরিচয় প্রদান করিতেছি। কিন্তু হায়! আমিও পরনিন্দা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না!

তোমাকে আমাকে লইয়াই ত সমাজ—তোমাকে আমাকে লইয়াই ত সংসার। আমরা যদি পরনিন্দা ত্যাগ করিতে না শিখিলাম, তবে সংসারে আর শিখিবে কে? আমরাই না অধঃপতিত বাঙ্গালী জাতির শিক্ষক? ইংরাজেরা বলেন Physician heal thyself—আমরা বলি পরচরিত্র সংশোধনের পূর্ব্বে আত্মচরিত্র সংশোধন করা আবশ্যক।

"আত্ম", "পর"—দুইটি পৃথক বাক্য। কিন্তু ব্যাপার খুব বেশী পৃথক নহে।

আত্মশিক্ষাই পরশিক্ষার নিদান। যদি প্রত্যেকে আত্মশিক্ষার জন্য ব্যাকুল হই, তবে আর পরশিক্ষার অভাব থাকে না।

উপাধি লাভ করিলেই যে শিক্ষা লাভ করা হইল না, ইহার দৃষ্টান্তস্থল অনুসন্ধান করিতে ছুটিয়াছ কেন? তুমি আমিই ত তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

শিক্ষা এখনও শেষ হয় নাই,—এই কথা শিখাইবার জন্যই মানবজীবন গঠিত হইয়াছে। মানুষ দেখিয়া শিখে, ঠেকিয়া শিখে, এবং লোককে শিখাইতে গিয়াও শিখে। এই ত্রিবিধ উপায়ে মানুষ শিশু থাকিতে থাকিতে প্রবীণ হইয়া উঠে। যতদিন তাহা না হয় ততদিন মানুষ শৈশবদশা অতিক্রম করিতে পারে না। এই কথা বুঝাইবার জন্যই আমাদের শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন—

"ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।"

# উকিল-কলঙ্ক।

(উপক্রমণিকা)

পুরাণে ইন্দ্র চন্দ্রের কলঙ্কের কথা অপিচ শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্কের কথা শুনিয়াছি। বহু দিন পরে এবার উকিল-কলঙ্ক-কথা গাহিব। যথা, প্রশ্নোত্তরমালা,—দেশে মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা বাড়িয়াছে না কমিয়াছে? ধরা যাউক বাড়িয়াছে। এ কালের মামলা মোকদ্দমায় সে কালের চেয়ে বেশী পয়সার আবশ্যক কি না? ধরা যাউক আবশ্যক। বাদী ও প্রতিবাদীর ঘরের সব টাকা এই মোকদ্দমা বলে উকীল বাড়ী যাইতেছে কিনা? নিশ্চয়ই যাইতেছে। এই যে টাকাগুলা অবিশ্রান্ত রূপে অধর্ম্মের পথে উকীল বাড়ী যাইতেছে তাহার দায়ী কে? উকীল, গবর্ণমেণ্ট, বাদী, প্রতিবাদী, সাক্ষিগণ, আদালতের আমলাগণ, না দেশের আইন? দায়ী একাই উকীল। আর কে? তিনিই আদি, তিনিই মধ্য, তিনিই শেষ। এই অর্থ ধর্ম্মের না অধর্ম্মের? অবশ্য অধর্ম্মের।

১। ভাল, মোকর্দ্দমা করিতে আসিয়া বাদীর যে খরচ হইল তাহার একটা তালিকা করা যাউক। প্রথম একটা ছোট খাট মামলা ধরি। ছোট আদালত।

| | |
|---|---|
| ১০৲ দাবির আরজী ষ্ট্যাম্প | ৸৹ |
| ওকালত নামা | ॥৹ |
| তলবানা | ॥৹ |
| দরখাস্তাদি | ।৹ |
| সাক্ষির সমনাদি, | ১৲ |
| উকীল | ২৫৲ |
| | ২৮৲ |

বাঁশের ঝাড় লইয়া স্বত্ব সাব্যস্থ, দাবী ৬০৲ টাকা।

| | |
|---|---|
| আরজি ষ্ট্যাম্প | ৪॥০ |
| ওকালত নামা | ॥০ |
| তলবানা | ১৲ |
| ৪ জন সাক্ষীর তদ্বির মায তলবানা ৮বার দিন পরিবর্ত্তন ছানি সমন ওয়ারেণ্ট আদি খোরাকী বাবরবদাবী | ১০৲ |
| আদালতে দরখাস্ত | ৫৲ |
| | ২১৲ |

উকীল বাবু ১০০৲ টাকা।

ইতি উকীল কলঙ্ক কাব্যে শোসণ নাম প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত।

২। তারপর দ্বিতীয় কথা যে টাকাটা উকীলবাড়ী যায় সেটা ধর্ম্মের না অধর্ম্মের। অধর্ম্মের যে, তার আর কথা নাই। তুমি চিকিৎসক ঔষধাদি দ্বারা রোগ আরাম করিয়া ভিজিটের টাকা চাহ কেন বাপু? ইহা ত মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের কর্ত্তব্য, ইহার আবার দর্শনী কি? তুমি বাপু শাস্ত্রব্যবসায়ী বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছ—বিতরণ কর। দানই মোক্ষ। তবে আবার বেতন কেন? ইহা ত তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তুমি বাপু টোল খুলিয়াছ কেন? ছাত্র তোমার নিকট উপস্থিত হইবা মাত্র কেন বাপু তাহার বিদ্যা উপার্জ্জন হইবে কি হইবে না একদম বলিয়া দেও না? অনর্থক হয়রাম পেরেসান হও কেন, আর করই বা কেন? একদম বলিয়া দিলেই ত অন্য চেষ্টা করিতে পারে; নিরর্থক অর্থ ও সময় ব্যয় করিতে হয় না। তাহা না করিয়া নিয়তই তোমার গাধা পিটিয়া ঘোড়া করিবার ইচ্ছা এত বলবতী কেন? উকীলের টাকাটা কেবল অধর্ম্মের !! তুমি খুন করিয়া ফাঁসে যাইতেছ উকীল রাশীকৃত টাকা লইয়া তোমাকে খালাস করিল। উকীল তোমার খুনের ভাগী হইল নাকি? তুমি বাপু খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া আইনের কুট অর্থে defamation এর দায়ে পড়িলে যে উকীল তোমায় বাঁচাইল সে অধার্ম্মিক নয় ত কি? ইতি উকীল কলঙ্ক কাব্যে অধর্ম্মাচার নামক দ্বিতীয়াঙ্ক সমাপ্ত।

৩। পরে দেখা যাউক উকিল যদি বিনা পয়সায় মামলা করিয়া দেন তাহা হইলেও তাঁহার কোন স্বার্থ আছে কিনা? আছে বৈকি হাত পাকান। তাহা হইলেই বা তাহার নিস্তার কোথায়? তিনি যে প্রয়োচক; তিনি যে প্রশ্রয়দাতা, তিনি যে সহায়তাকারী (abetter if the term is applicable) বটে কিনা! উকীল ত আর তাহাকে বলে নাই "বাপুরে ঘরে বা /১ কাঠা জমির জন্য কেন সর্ব্বস্বান্ত হবি" বরং বলিয়াছে "প্রতিবাদীর বড় অন্যায় তাহাকে যে কোন প্রকার হউক সমুচিত দণ্ড দেওয়া উচিত। তুমি কখনও তাহাকে ক্ষমা করিও না। যদ্যপি খরচ যোগাইতে না পার, খরচ আমি যোগাইব, দেখির এ সংসারে ন্যায় আছে কিনা, নচেৎ মোকদ্দমা করিবার পর দিনই ডিপ্লোমা ছিঁড়িয়া দেশান্তরী হইব।" (তা ক্ষতি নাই অনেকের জয় জয়) নেহাৎ যদি কিছু না বলিয়াই মামলা লওয়া হয় তাহাও পাপ, তাহাতেও গোপন জন্য পাপী হইতে হইবে।

তা হইলেই বস্। উকীল গেল, হাকিম গেল, আদালত গেল, গবর্ণমেণ্টের রেবিনিউ কমিল, বাদী প্রতিবাদীর হাত ছাড়াইল। এবং যে কোন ব্যক্তি ঐ প্রকার রেবিনিউ কমের সহায়তা করিবে তাহাকে দণ্ডনীয় করিবার জন্য আইন করিবার কারণ হইবে। ইতি উকীল সংহার নামক তৃতীয়াঙ্ক সমাপ্ত।

৪। যখন উকীলগণ রসাতলগত, তখন ধর্ম্মবীরগণ সম্মুখাগত হইলেন। তখন সেই 'বিনাশায়চ দুস্কৃতাং' বাক্যের স্বার্থকতা হইল; অধর্ম্ম স্তূপোপরি ধর্ম্ম-পতাকা উড়িল। ক্রমে সমাজের ঘোরতর উন্নতি আরম্ভ হইল। সত্য যুগের আবির্ভাব হইল। মেষে শার্দ্দূলে ক্রীড়া হইতে লাগিল। দেশ হিংসাদ্বেষ-বিবর্জ্জিত হইল। আহা! নয়ন যে ধাঁধিয়া গেল! নব অভ্যুদয়, দেশের কালরাত্রি প্রভাত, কেউ কেউ শব্দে জাতীয় নবজীবন-প্রভাত ঘোষিত হইতে লাগিল। ইতি উকীল কলঙ্ক কাব্যে নব অভ্যুদয় নামক চতুর্থাঙ্ক সমাপ্ত।

৫। একদা রাজমোহন প্রামাণিক উর্দ্ধশ্বাসে উকীল বাবুর নিকট আসিয়া উপস্থিত, রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "মহাশয়, আমার সীমানায় একটা শিমুলগাছ ছিল তাহা আমার খুড়তুতো ভ্রাতা রাসমোহন জোর করিয়া কাটিতেছে। ইহার উপায় কি?" উকীল বাবু—"উপায়! উপায় ত বড় কঠিন। বিস্তর টাকার দরকার, যে টাকা মোকদ্দমায় খরচ করিবে তাহা লইয়া ৫০টা শিমুলগাছ

কেনা হইবে। 'চেপে যাও বাপু, জোর যার মুল্লুক তার।" রাজমোহন তাহাই করিলেন। বৎসরের পর ঐ স্থানে উভয় ভ্রাতারই একখানি ঘর উঠান আবশ্যক হইল। রামমোহন জোর করিয়া ঘর উঠায়। তখন রাজমোহন উকীলালয়ে চলিল। উকীল বলিল "এবার ত আরও বেশী টাকার আবশ্যক। কি কাজ, চেপে যাও।" তথাস্তু বলিয়া রাজমোহন ঘরে ফিরিলেন। কিন্তু এবার রামমোহনও যো পাইল। ঘর তুলিয়া রাজমোহনের পথবন্ধ করিয়া এক বেড়া দিল। তখন রাজমোহন "আসি পুনঃ দেখা দিল উকীল আলয়ে।" উকীল বাবু বলিল, "ঝকমারি, যে টাকা খরচ করিয়া মামলা করিবে তাহা খরচ করিয়া অন্যত্র ঘর কর।" রাজমোহন কাতর স্বরে বলিল—"পৈতৃক ভিঁটে যে যায়!" উকীল রুক্ষস্বরে বলিলেন "টাকা হইলে ফের পৈতৃক ভিঁটে মিলিবে।" রাজমোহন কাঁদিতে কাঁদিতে বাটী গেল। কিন্তু এবার এক ঘটনা ঘটিল। তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, ভাইয়ের সহিত বিবাদ করিয়া মারামারি হইল ও রাজমোহন কর্ত্তৃক রামমোহন গুরুতর রূপে আহত হইল। তখন বিপদে পড়িয়া রাজমোহন পুনঃ উকীলের বাড়ী গেল। পরামর্শ প্রার্থনায় উকীল বাবু হুঙ্কারিয়া বলিলেন, "মারিয়াছ মরিবে, তোমাকে ছাড়াইতে যাইয়া আমি পাপী নাম কিনিব না। তাহা হইলে যে আমার ঐ সৌধধবলিত শুভ্র প্রাসাদরাজির ন্যায় আমার যশোরাশি যে অধর্ম্ম কালিমায় কলঙ্কিত হইবে।" বলিয়া ক্রোধভরে রাজমোহনের প্রতি অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইলে রাজমোহন উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। ইতি উকীল কলঙ্ক কাব্যে আদর্শ উকীল নামক পঞ্চমাঙ্ক সমাপ্ত।

শ্রীসারদাচরণ মজুমদার।

# জাতীয় মহাসমিতি।

( অমরাবতীকংগ্রেশের একটি ক্ষুদ্র চিত্র

জাতীয় মহাসমিতির ত্রয়োদশ অধিবেশন শেষ হইয়া গিয়াছে। অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া এবার অমরাবতী-কংগ্রেশ সম্পন্ন হইয়াছে, আজকাল তৎসম্বন্ধে বড় একটা উচ্চবাচ্য শুনা যাইতেছে না। স্বপক্ষ, বিপক্ষ ও নিরপেক্ষ প্রত্যেক শ্রেণীর লোকই আপনাদের বক্তব্য শেষ করিয়াছেন। গত কংগ্রেশের

অধিবেশন এক্ষণে অতীতের গর্ভে বিলুপ্ত হইযাছে। সুরেন্দ্রনাথপ্রমুখ বাগ্মি-গণের বক্তৃতাস্রোত সমাগত প্রতিনিধিবর্গের ও অপরাপর দর্শকবৃন্দের কর্ণে যে তান তুলিয়াছিল, তাহার স্মৃতিটুকু এখনও সংসারের কলরবের মধ্য হইতে দূরাগত বীণাঝঙ্কারের ন্যায় সময়ে সময়ে প্রতীয়মান হইলে হইতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ বলিতে গেলে অমরাবতীকংগ্রেশ এক্ষণে লোকহৃদয় হইতে অপসৃত হইয়াছে এবং সাময়িক বিষয়ান্তর তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রশংসা, কুৎসা ও ব্যঙ্গোক্তি ইত্যাদি কংগ্রেশের প্রতি প্রচুর পরিমাণে বর্ষিত হইয়া এক্ষণে এক প্রকার নিস্তব্ধ হইয়াছে, নিরপেক্ষ ভাবে গত অধিবেশনের সমালোচনার এই প্রকৃত সময়। যে আবেগস্রোতে হৃদয় তখন পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এক্ষণে তাহা শান্ত হইয়াছে; যে মানসিক বৃত্তি তখন উত্তেজিত হইয়া সকলকে পরিচালিত করিয়াছিল, আজকাল তাহা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। গুণাগুণ বিচার করার উপযুক্ত সময় এই বটে, কিন্তু তাদৃশ ক্ষমতা আমার নাই, কেবলমাত্র কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে অমরাবতী-কংগ্রেশের এই ক্ষুদ্র চিত্রটি সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে বাধ্য হইলাম।

রাজসাহী সভা কর্তৃক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইযা আমি ও আমার একটি বন্ধু অমরাবতীকংগ্রেশমণ্ডপ অলঙ্কৃত করিব স্থির ছিল, সংসারের কুটিল আবর্তে আমাদের সে আশা নিমজ্জিত হইল। কংগ্রেশযাত্রী আমিই একাকী অমরীর উদ্দেশে সজ্জিত হইলাম।

আমাদের স্থানীয় কংগ্রেশ-কমিটি হইতে সংবাদ পাইলাম অমরাবতীর ট্রে ৯॥টার সময় হাবড়া-ষ্টেসন ছাড়িয়া পরদিন অপরাহ্ণ ৬ টার সময় কংগ্রে প্লাটফরমে পহুছিবে। ২৭ শে ডিসেম্বর সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হই জানিতাম, ২৪ শে তারিখে বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে কলিকাতাযাত্রী কয়েক ন্ধুর সহিত নৌকাযোগে রামপুর হইতে কলিকাতা রওনা হইলাম। ২৫ে কলিকাতা পহুছিয়া ঐ দিনের রাত্রির গাড়ীতে রওনা হইয়া ২৬শে তারিখে অমরাবতী পহুছিব এইরূপ স্থির করিয়াছিলাম, কার্য্যেও তাহাই ঘটিল। ২৫শে প্রাতে কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম। বেলা ১০ টা পর্য্যন্ত কার্য্যোপলক্ষে স্থানে স্থানে ঘুরিয়া বাসায় ফিরিলাম। বাসায় আসিয়া শুনিলাম কলিকাতার প্রতিনিধিগ বেলা ৯॥টার ট্রেনে এক ঘণ্টা পূর্ব্বে রওনা হইয়া গিয়াছেন, নিজের ভ্রম বুঝিলাম,

অভীষ্ট সময়ে অমরাবতী প্রাপ্ত হইবার শেষ সুযোগ গত হইয়াছে। যাহাহউক সেদিন সন্ধ্যা ৭ টার গাড়ীতে উঠিয়া রাত্রি দুই প্রহরের প্রাক্কালে আসান্‌সোল্ পঁহুছিয়া ষ্টেসনের বিশ্রামগৃহে আশ্রয় লইলাম।

বিশ্রামগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ৪ জন যাত্রী কামরা অধিকার করিয়া আছেন। একখানা বেঞ্চের উপর অর্দ্ধশায়িতা দুইটি ইংরাজবালিকা; নিকটেই কম্বলাসনে ব্রাহ্মণপণ্ডিতবেশধারী একটি স্থূলকায় বাবু বসিয়া আছেন; পার্শ্বে অপর একখান বেঞ্চে ঘনকৃষ্ণবর্ণ একজন সাহেব বাবুটির সহিত ইংরাজীতে আলাপ করিতেছেন। বাবুটিকে দেখিয়া প্রথমতঃ বাঙ্গালী বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল, পরিচয়ে জানিলাম তিনি পুনানিবাসী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ; পরদিন ডাকগাড়ীতে বালিকা দুইটির সহিত স্বদেশ যাত্রা করিবেন। এই আশাতীত সঙ্গিলাভে বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আমার নূতন সঙ্গীটি কংগ্রেশের একজন প্রধান উৎসাহী; অবসর না থাকায় এবার কংগ্রেশে যোগদান করিতে পারেন নাই। সুরেন্দ্রবাবুর নামোল্লেখে তিনি একেবারে অধীর, তাঁহার মতে "Mr. Banerji is the greatest man in India' এবং " He is the greatest of all our Presidents." বন্ধু সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, " Ah! he can have no rival in the field. He is the best orator. At Poona, you see, he could make every word heard from the most distant corner of the Pandal." সুরেন্দ্র বাবু ভারতের ভিন্ন প্রদেশের লোকের হৃদয়ে যে অধিকার স্থাপন করিয়াছেন তাহার আভাস এই স্থানেই প্রাপ্ত হইলাম।

২৬ শে বেলা ২ টার সময় কলিকাতা হইতে ডাকগাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ীতে উঠিয়া এক কংগ্রেশযাত্রী সঙ্গী পাইলাম। আমি যে কামরায় উঠিলাম ঐ কামরায় বরিশালের প্রতিনিধি মিঃ এন্ গুপ্ত ছিলেন। তিনিও আমার অবস্থাপন্ন। গাড়ী ছাড়িল। ক্রমে আমরা সুবিস্তৃত প্রান্তর, নিবিড় শালবন, বিচিত্র পর্ব্বতউপত্যকা, সুশীতল নদীতীর অতিক্রম করিয়া লোকালয় প্রাপ্ত হইলাম। এইরূপে ষ্টেসনের পর ষ্টেসন, দেশের পর দেশ অতিক্রম করিয়া নিসর্গের অপরূপ রূপবৈচিত্র্য সন্দর্শন করিতে করিতে ২৭ শে অপরাহ্ণ ৫ টার সময় আমরা বাদ্‌নেরা জংসনে আসিয়া পহুঁছিলাম। এখানে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হয়। আমরা অপর গাড়ীতে উঠিতেছি এমন সময় একজন ভদ্রলোক আমাদের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন; পুলিশের গুপ্তচর ভাবিয়া তাঁহার উপর আমার কিঞ্চিৎ

সন্দেহ হইয়াছিল ; কিন্তু শুনিলাম তাহা নহে, তিনি একজন সরকারী ডাক্তার, প্লেগব্যাপারে তথায় উপস্থিত আছেন। গাড়ীতে উঠিয়া অনেক নূতন প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইঁহারা এই দেশীয়, এবং হিসাবে আমারই মত ভুল করিয়াছিলেন। কয়েক জনের সহিত আমার পরিচয় হইল; তাঁহারা শিক্ষা উপলক্ষে কলিকাতায় ছিলেন। আমরা এই ষ্টেসনেই অভ্যর্থনাকমিটির একজন সভ্যের নিকট সংবাদ পাইলাম প্রথম দিনের অধিবেশন শেষ হইয়াছে। সুরেন্দ্র বাবু সভাপতি মহাশয়কে সমিতির সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলেন তাঁহার নিকট অবগত হইলাম। " Mr Banerji introduced the President in a *very nice speech*" এইটি তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতেছিলেন। বাদ্‌নেরা হইতে গাড়ী ছাড়িয়া সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে অমরাবতী পহুঁছিল। ষ্টেসনে কয়েক জন সভ্য ও ভলাণ্টিয়ার উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সাহায্যে কংগ্রেশক্যাম্পে উপস্থিত হইলাম। এখানে ভলাণ্টিয়ারদল আমাদিগকে সংবাদ-আফিসে লইয়া গেলেন; আফিসে নাম লেখান হইলে গৃহ হইতে গৃহান্তরে ঘুরিয়া "বি" ব্যারাকের একটি কামরাতে আমি আশ্রয় প্রাপ্ত হইলাম। এই কামরাতে দুইজন প্রতিনিধি ও একজন রিপোর্টার ছিলেন, সকলেই বাঙ্গালী। মনোমত স্থানলাভে পরিতুষ্ট হইয়া কংগ্রেশক্যাম্প দেখিবার অবসর পাইলাম। দেখিলাম সারি সারি অসংখ্য ব্যারাক, মধ্যে মধ্যে প্রশস্ত রাস্তা,— দীপালোকে আলোকিত। রাত্রিতে আর অধিক কিছু দেখিতে পাইলাম না।

পরদিন প্রাতে কংগ্রেশক্যাম্প দেখাই প্রথম কর্ত্তব্য হইল। কি মনোহর দৃশ্য! দক্ষিণে পূর্ব্বপশ্চিমবিস্তৃত প্রশস্ত রাজপথ। তাহার উত্তরে ময়দানে কংগ্রেশ ক্যাম্প অবস্থিত, ক্যাম্পের দক্ষিণভাগে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সুন্দর মণ্ডপ। মণ্ডপের মঞ্চের উপরিভাগে মহাসমিতির তিনটি চিত্র দৃষ্টিগোচর হইল। তাহাতে সমিতির বিগত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা চিত্রিত হইয়াছে। এই তিন অবস্থা সমিতির শৈশব, বাল্য ও যৌবনাবস্থার পরিচয় দিতেছে। মণ্ডপের পশ্চিমপার্শ্বে কয়েক খান দোকান, ডাকঘর, তার-অফিস এবং সমিতির অপরাপর আফিসসমূহ। সকল গুলিই সভা উপলক্ষে অস্থায়ী ভাবে স্থাপিত। মণ্ডপের পূর্ব্বপার্শ্বে মহারাষ্ট্র-রমণীদিগের শিল্পপ্রদর্শনী গৃহ; তাহাতে নানা প্রকারের সুন্দর সুন্দর দ্রব্যসমূহ দেশীয় কুলবালাগণের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয়প্রদান করিতেছে। ইংরাজী

শিক্ষিতা কয়েকটি যুবতী এই প্রদর্শনীর তত্ত্বাবধানে নিযুক্তা ছিলেন। গৃহের নিকটেই মহিলাগণের বিশ্রামগৃহ। মণ্ডপের উত্তর পার্শ্বে বিশ্রামগৃহ পাঠগৃহ এবং সমাজসভার মণ্ডপ; তাহার উত্তরে শ্রেণীবদ্ধ ব্যারাক। সেগুলি প্রতিনিধিগণের অবস্থানের জন্য স্থাপিত। ব্যারাকশ্রেণীর পশ্চিমপার্শ্বে পাকশালা ভোজনগৃহ, নাট্যগৃহ, স্নানগৃহ এবং জলের কল,—এখানে পাইপের সাহায্যে ঈষদুষ্ণ জল বিতরিত হইতেছে। কংগ্রেশক্যাম্পের উত্তরে বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্র, পূর্ব্বে নাতিদূরে নগরের বসতিভাগ, পশ্চিমে দূরে স্বল্পোচ্চ পাহাড়, তদুপরি ধনীর প্রাসাদ সকল অবস্থিত।

ক্যাম্পপরিদর্শনের পর প্রথম দিনের অধিবেশনের বিষয় বিস্তারিত অবগত হইলাম। বেলা দুই প্রহর গত হইলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়; সপ্তশত প্রতিনিধি এবং সহস্রাধিক দর্শক উপস্থিত ছিলেন। অভ্যর্থনাকমিটির সভাপতি মিঃ কপর্দ্দী প্রতিনিধিগণকে সমাদরে আহ্বান করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করিতে বলেন। সুরেন্দ্র বাবু তৎপরে মিঃ শঙ্কর নায়ারকে সভাপতিরূপে বরণ করেন। মিঃ নায়ার সভাপতির আসনগ্রহণ করিয়া এক তেজস্বিনী বক্তৃতা পাঠ করেন। ভাষা ও ভাব উভয় সম্বন্ধেই সভাপতির ভাষা অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত। তাহা একদিকে যেমন ধীর, নিরপেক্ষ ভাবে রাজনীতির আলোচনা করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিল, অপর দিকে তেমনই স্বাধীন চিত্তের নির্ভীকতা দেখাইয়া সকলকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল। বক্তৃতাপাঠের পর বিষয়-নির্ব্বাচন-কমিটি গঠিত হইয়া তাহার কার্য্য আরম্ভ হয়। এই স্থানেই প্রথম দিনের অধিবেশন শেষ হয়।

২৮ শে বেলা ১ টার পর সমিতির দ্বিতীয় দিনের কার্য্য আরম্ভ হয়। আমরা তৎপূর্ব্বেই মণ্ডপগৃহে উপস্থিত হইলাম, এদিন দরবারের পোষাকেই সজ্জিত ছিলাম। মঞ্চের বামপার্শ্বে সর্ব্ব প্রথমেই বাঙ্গলা দেশের প্রতিনিধিগণের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। নিকটে পশ্চিমপার্শ্বে মাদ্রাজ ও বোম্বায়ের প্রতিনিধিগণের স্থান। আমাদের পশ্চাতে কিছু দূরে একটি "গ্যালারি", তাহাতে দুই শতাধিক ভদ্রমহিলা দৃষ্টিগোচর হইল। দেখিলাম ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই মহারাষ্ট্র-রমণী কেবল কয়েক জন পার্শিযুবতী ১ম লাইনের শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন। বলা বাহুল্য মহারাষ্ট্রপ্রদেশে অবরোধপ্রথা আজও অজ্ঞাত আছে,

এই উপস্থিত সুন্দরীদের মধ্যে অধিকাংশ হিন্দুপরিবারের গৃহলক্ষ্মী, তাহাতে সন্দেহ ছিল না। সীমান্ত সংগ্রামের অনাবশ্যকতা এবং অপকারিতা ও তৎসংক্রান্ত ব্যয়ভার-বহন, 'বয়েল কমিশনের' কার্য্যপ্রণালী এবং ভারতের সর্ব্ব প্রদেশেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপযোগিতা এই কয়েকটি নূতন বিষয়ের আলোচনা করিয়া অদ্য ৮ টি প্রস্তাব উপস্থিত ও অনুমোদিত হয়। বক্তাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই যুক্তিপূর্ণ তর্কের ও তাহার পক্ষে অকাট্য প্রমাণের অবতারণা করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য আপনার মনোহর বক্তৃতাদ্বারা সভাগৃহে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বহুক্ষণ স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছিলেন! বেলা ৫ টার অব্যবহিত পূর্ব্বে সভা ভঙ্গ হয়।

সভাভঙ্গের কিয়ৎকাল পরে আমরা কয়েকজন নগরপরিদর্শনে বাহির হইলাম; দেখিলাম অমরাবতী খুব পুরাতন সহর, ইহার বসতিভাগ উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। নগর-প্রবেশের কয়েকটি 'গেট' আছে, তন্মধ্যে অম্বা গেট প্রধান। বাজার বেশ বড়। সহরের আয়তন পক্ষে লোকসংখ্যা অতিরিক্ত। নগরের দক্ষিণপশ্চিম ভাগে অম্বাদেবীর মন্দির। প্রতিদিন তথায় বহুলোকসমাগম হয়। আমরা মন্দির পরিদর্শন করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। সেখানে কয়েকটি সরকারী কর্ম্মচারীর সহিত আমাদের আলাপ হইল। শুনিলাম রাজপুরুষগণ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আপিসের কাজ করেন। ইঁহারা সকলেই সুরেন্দ্রনাথকে দেখিবার আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিলেন। বলা বাহুল্য পরদিন প্রাতে কংগ্রেসক্যাম্পে আসিয়া নয়নাভিলাষ পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। প্রাচীরের বাহিরে গবর্ণমেণ্টের আপিস ও স্থানীয় উকিল ব্যারিষ্টারগণের শ্রেণীবদ্ধ প্রাসাদ দেখিলাম। বাসায় ফিরিতে ফিরিতে রাত্রি ৮ টা বাজিয়া গেল।

পরদিন সম্মিতির শেষ অধিবেশন। বেলা ১১ টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। আজ আমাদের কিছু বিলম্ব হয়। যখন সভামণ্ডপে প্রবেশ করিতে যাই তখন ঘন ঘন উচ্চ করতালি শুনিতে পাইলাম। প্রবেশমাত্র দেখিলাম প্রতিনিধি ও দর্শকগণের মধ্যে অনেকেই আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া সোৎসাহে করতালি দিতেছেন এবং দূরে মঞ্চের উপর সুরেন্দ্রনাথ সতেজে আবেগপূর্ণ বক্তৃতা করিতেছেন। এতাধিক উৎসাহ প্রদর্শনের কারণ তখন বুঝিতে পারিলাম না। পরক্ষণেই বুঝিলাম তিলকের নামোল্লেখে এই ব্যাপার!

আজ অনেকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়। স্থানাভাবে তাহাদের আলোচনা পারিলাম না। সুরেন্দ্রনাথ, অম্বিকাচরণ, উমেশচন্দ্র প্রভৃতি মহারথিগণ কার প্রধান বক্তা। এতদ্ভিন্ন স্থানীয় বক্তাগণ মহারাষ্ট্র—ভাষায় জলন্ত করিয়া সভাগৃহ কম্পিত করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য আমরা তাহার বিন্দু বুঝিতে পারি নাই। প্রস্তাব গ্রহণের পর ভূপেন্দ্র বাবু অভ্যর্থনাসমিতিকে বাবু বিপিনচন্দ্র পাল সভাপতিমহাশয়কে উপযুক্ত ভাষায় ধন্যবাদ প্রদান ক... পরে মিঃ নায়ার মহাসমিতির এই ত্রয়োদশ অধিবেশনের উপসংহার করিলেন

সভাভঙ্গের পরই স্বদেশে ফিরিবার উদ্যোগ। মিঃ ঘোষাল প্রভৃতি কে কেহ কিছু দিনের জন্য থাকিয়া গেলেন। তদ্ভিন্ন বাঙ্গলার সকলেই সেই রাত্রেই রওনা হইয়াছিলেন। সেই দিন প্রাতে স্থানীয় সিভিল সার্জ্জন আমাদিগকে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত নিয়মানুসারে স্বাস্থ্যসম্বন্ধে এক এক খণ্ড সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন। এই সার্টিফিকেট গ্রহণোপলক্ষে মিঃ বোনার্জ্জি, মিঃ চালু প্রভৃতিকেও সনাক্ত করিতে হয়। যাহাহউক 'প্লেগ-অনুশাসন' হইতে মুক্তি পাওয়ার এই প্রবল অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া রাত্রি ১০ টার সময় আমরা স্পেশাল ট্রেণে রওনা হইলাম। আমাদের সাথে জি আই, পি, রেলওয়ের ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ওয়েবেষ্টার নাগপুর পর্য্যন্ত আসিলেন। তিনি সুরেন্দ্র বাবু প্রভৃতির বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইয়া কংগ্রেশব্রতে প্রধান সহায় হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন ও নিজের অমায়িক ব্যবহারে প্রায় সকলকেই বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়া ছিলেন। অভ্যর্থনা—সমিতির সভাপতি মিঃ কপর্দ্দী, অন্যান্য সভ্য ও ভলেণ্টিয়ার দল আমাদের গাড়ীতে বাদ্নেরা জংসন পর্য্যন্ত আসিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিলেন। মিঃ কপর্দ্দীর সৌজন্যের সীমা ছিল না। তিনি প্রত্যেকের সহিত একাধিক বার করমর্দ্দন করিয়াও সন্তুষ্ট হন নাই। বাদ্নেরা হইতে গাড়ী ছাড়িল, আর সেই ষ্টেসনে সমবেত অসংখ্য জনমণ্ডলীর 'হিপ্‌, হিপ্‌, হুর্‌রে' ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগছী।

## মাসিক সাহিত্য সমালোচনা

প্রদীপ। মাঘ ও ফাল্গুন। বঙ্গসাহিত্যসংসারে সুপরিচিত লেখকগণের মধ্যে অনেকেই ইহাতে লেখনী ধারণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের কবিতা,

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'মামা বাবুর গল্প', শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের ও সংগ্রাম', শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'আসুর বিবাহ', আমাদের বাবুর 'লাল পল্টন', শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'নসীরাম পালের বক্তৃতা ক স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ক রঙ্গরস—একাধারে এতগুলি মিলিত া প্রদীপকে ক্রমশঃই উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছে।

মালা। প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যা। মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। বঙ্গ-সাহিত্যোদ্যানের 'সর্দ্দার মালী মারা গিয়াছেন" বলিয়া সাহিত্যকল্পদ্রুমের 'এক জন শিক্ষানবীশ মালী' আপন পরিচয় লুকাইয়া রাখিয়া, বঙ্গসাহিত্যের 'ঝরা ফুলের মালা' গাঁথিয়া গত 'মাকরী সংক্রান্তির দিন' পাঠকের করে অর্পণ করিয়াছেন। আমরা এই মাল্যোপহার সাদরে মস্তকে ধারণ করিলাম; কারণ মালা-কর মহাশয় ইহাকে ভগবচ্চরণে 'নিবেদিত নির্ম্মাল্য' বলিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন।

ভারতী। ফাল্গুন। প্রথম প্রবন্ধে 'বসন্ত বন্দনা' নামক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সরস কবিতা; ইহাতে কোকিলকূজন, ভ্রমরগুঞ্জন এবং চূতমুকুলের কিছু মাত্র সংস্রব না দেখিয়া কেহ কেহ হতাশ হইয়া আমাদিগের নিকট হৃদয়বেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। আমরা কিন্তু ব্যথা পাইবার মত কিছু দেখিলাম না। যখন পড়িলাম 'শুষ্ক শীর্ণ সরিত ভরিত নব যৌবন হরষে' তখন সংস্কার বশতঃ ভরা ভাদরের কথাই মনে পড়িয়া গেল, ভাবিলাম ইহার পরই শুনিব "মত্ত দাদুরী বোল"। কোকিলকূজন ভ্রমরগুঞ্জন বা চূতমুকুলের সংস্রব না থাকায় কোন অসঙ্গতির কথা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। এখন ভাবিতেছি,—কবিতাটি কি "বসন্তে বরষা"? কথার কুহকে পড়িয়া ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলামনা, ইহাই না কি আধুনিক কবিতার উৎকর্ষজ্ঞাপক সাধারণ লক্ষণ! শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বঙ্কিমচন্দ্রের "দেবী চৌধুরাণী" পাঠ করিয়া খট্‌কায় পড়িয়া সাহিত্যসুহৃদ্‌গণের কাছে তাহার বিশদ ব্যাখ্যা শুনিবার আশায় 'প্রফুল্লমুখী' নামে একটী সমালোচনাত্মক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র লাল রায় মহাশয়ের 'বসন্তবন্দনায়' যাহা বাদ পড়িয়া গিয়াছিল, তিনি 'কোকিল ও বিরহিনী' শীর্ষক হাসির গানে তাহা শুদ সমেত উপহার দিয়াছেন। 'মীর কাসিমের' ঐতিহাসিক চিত্রে 'কাটোয়ার যুদ্ধ' পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। অক্ষয় বাবু লিখিয়াছেন—"এরূপ বীরচরিত্রে কলঙ্কের কালিমা আরোপ করিলেও

## মাসিক সাহিত্য।

যাঁহাদের হৃদয় ব্যথিত হয় না, তাঁহারা অবশ্যই রঙ্গমঞ্চে মহম্মদ তকি খাঁর
অভিনয় দেখিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিবেন। কিন্তু ইতিহাসের এরূপ প্রকাশ্য
অবমাননায় রঙ্গভূমি ও বা
সমাদর প্রদর্শন করা হয়। "আলিচরিত্র কলুষিত না করিলেই বোধহয় সমুচিত
বনিতার পদাঘাত—নব্যবঙ্গের ইংরেজি খাঁর প্রতিমূর্ত্তির প্রতি বহু জনসমক্ষে বার
বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থিছাত্রগণ কলিকাতাবাসীর কলঙ্ক !!!" সংবাদপত্রে দেখিলাম বিশ্ব-
আগ্রহে ষ্টার থিয়েটারে সে দিনও "চন্দ্রকান্তায় সমবেত হইলে তাঁহাদের বিশেষ
এবারকার এল,এ,পরীক্ষায় বাঙ্গলা সাহিত্যে শেখরের" অভিনয় হইয়া গিয়াছে !!
চরিত্রের কিরূপ পরিচয় পাওয়া যায়" তদ্বিষয়ের প্রশ্নপত্রে "জাতীয় সাহিত্যে জাতীয়
লিখিত ছিল। অভিনয় দর্শনেচ্ছু পরীক্ষার্থিগণ ও প্রবন্ধ লিখিবার জন্য একটি প্রশ্ন
সাহিত্য। অগ্রহায়ণ। এতদিনে সহযোগীর দর্শন ইহাকে কিরূপ উত্তর দিয়াছেন ?
জন সদাশয় সাহিত্যলেখকের নিকট চাহিয়া লইয়া ! লাভ করিলাম, তাহাও এক
শয় বোধ হয় আমাদের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক শ্রীযুক্ত কার্য্যাধ্যক্ষ মহা-
হইলেও অগ্রহায়ণের 'সাহিত্য' বেশ সুখপাঠ্য হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র, বিলম্বে বাহির
প্রবন্ধ—"পরাধীনতা"। লেখক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সংখ্যার প্রধান
হস্তের লেখনী চালনায় ভারতবর্ষের পরাধীনতার মূলানুসন্ধানের তাঁহার সিদ্ধ
ঐতিহাসিক প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন। ইহা চিন্তাপূর্ণ—বহুবিধ জন্য এই
হাসিক তত্ত্বে মনোজ্ঞ, এবং মনঃসংযোগে পাঠ করিবার উপযুক্ত। ত্রিবেদী ঐতি-
মহাশয় বলেন, "আবার সময়ে সময়ে মনে হয়, এই প্রশ্নের কতকটা এইরূপ
উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। ইউরোপে ও ভারতবর্ষে এই পার্থক্যের প্রধান
কারণ, ইউরোপে প্রজা চির কাল ধরিয়া পরাধীন ও ভারতবর্ষে প্রজা চিরকাল
ধরিয়া স্বাধীন !" কথাটা শুনিতে কেমন বোধ হয় না ? কিন্তু ত্রিবেদী মহাশ
ঐতিহাসিকের ন্যায় তত্ত্বালোচনা করিয়া ইহা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন
সকলই, হইয়াছে, তথাপি "দুষ্ট ব্রাহ্মণের" উপর ইতিহাস চাপাইয়া দিয়া
তাহা সর্ব্বথা অপসারিত হইয়াছে কি ? ভারতবর্ষ পরাধীন হইল কেন ? পরা
হইবার কারণ উপস্থিত হইয়াছিল কেন ? তাহার সহিত কি ব্রাহ্মণপ্রমুখ
হিন্দুসমাজের রীতিনীতি বিচারব্যবস্থার কিছুমাত্র সংস্রব নাই ? যদি
তাহার সহিত ব্রাহ্মণের কি কিছুই সম্বন্ধ ছিল না ? ব্রাহ্মণ শিক্ষক যেমন
ইয়াছিলেন, হিন্দু ভারতবর্ষ তেমনই শিখিয়াছিল। বহু কারণে ভারতবর্ষ
হইয়াছিল, কিন্তু তাহার মূলেও ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা ! তজ্জন্য বহু কোটি
মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতেও বিশেষ ইতস্ততঃ করিয়াছিল বোধ হয় না।
ভরা পূর্ণ না হইলে স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয় না; পুণ্যের চাবিকাটি যাঁহারা
হাতে আটকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন হাত ধুইয়া সরিয়া
চলিবে কেন ? ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহাদিকে বাঁচাইতে গিয়া বাঁচাইতে
নাই। না পারুন,—তথাপি ব্রাহ্মণের হইয়া তিনি যে দুটা কথা কহি
করিয়াছেন, ইহাতেই তিনি অনেকের আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন।

উৎসাহ। ফাল্গুন ৬

এক সঙ্গেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।

ভারতী। পৌষ ও মাঘের ভারতী এবার যমজ সন্তানের ন্যায় প্রায় মধ্যে দীনেন্দ্রবাবুর দুখানি পল্লী-
পৌষের ভারতীতে 'পোষলা' এবং মাঘের ভারতীতে 'শ্রীপঞ্চমী' নর্মা সাহিত্য গত অগ্রহায়ণে লিখিয়াছেন
চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল পল্লীচিত্র সম্বন্ধে সহযোগী পুনরাবৃত্তিমাত্রে পরিণত হইয়াছে। হিন্দু
'ক্রমে ক্রমে পল্লীচিত্রগুলি নিতান্ত 'একঘেয়ে ও কষ্টকল্পিত প্রভৃতি, তিথির পালন ও একাদশীর উপবাস
বিধবা যেমন পঞ্জিকার আদেশ অনুসারে অমাবস্যা প্র বসিয়া আছেন;—পর্ব্ব দেখিলেই হিন্দুবিধবার মত
করেন, দীনেন্দ্র বাবুও যেন তেমনই পাঁজী খুলিয়া বসিতেছেন। ইত্যাদি।" গত বর্ষে দীনেন্দ্র বাবু 'পোষলা'
অবশ্য কর্ত্তব্যজ্ঞানে তাহার চিত্র অঙ্কিত করিয়াও তাহাই—ইহার সঙ্গে সহযোগী সাহিত্যের সমালোচনা
এবং 'শ্রীপঞ্চমী' লিখিয়াছিলেন, এবার লেখকের উদ্দেশে প্রচুর তিরস্কার বর্ষণ করিবেন।" আমাদের বোধ
একত্র করিয়া কেহ কেহ হয়ত "দেখিবার আছে। মাসিক পত্রের পরিচালকগণ যেরূপ পাঁজী হাতে
হয় ইহার আর একটা দিক তাহাতে তাঁহারা দীনেন্দ্র বাবুর মত পাকা চিত্রকর হাতে পাইয়া পাল
করিয়া বসিয়া থাকেন, সেজন্য উৎপীড়ন করিয়াই যে তাঁহাকে বিপদাপন্ন করেন না তাহার প্রমাণ কি?
পার্ব্বণে চিত্রাঙ্কণের সার্থকতা আছে, উহা নগরবাসীর নিকট তেমন মিষ্ট বোধ না হইলেও পল্লীবাসীদের
পল্লীচিত্রগুলি সমস্ত। কলিকাতার রঙ্গমহাল হইতে কালীঘাটের পট উঠিয়া গিয়া বিলাতী উলঙ্গ রমণীর
আদরের সৌন্দর্য্যের চিত্রপট আদর প্রাপ্ত হইয়াছে, আমরা কিন্তু এখনও পাড়াগেঁয়ে পটুয়াদের সেকেলে
নগ্ন পট একবারে বিসর্জ্জন দিতে পারি নাই; ভাল লাগে বলিয়াই রাখিয়াছি। আর কিছু না হউক
সেগুলি ত আমাদেরই শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক, তাহাকে হতাদর করিব কেন? এই দুই সংখ্যায়
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গান আবার ভারতীর পাঠকবর্গের নিকট উপনীত হইয়াছে।
পরিহাসরসিক দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং 'বিলেত ফের্ত্তা' ভুক্তভোগী হইয়া পৌষের ভারতীতে 'বিলেত
ফেওার' যে গান গাহিয়াছেন, 'বঙ্গবাসী' তাহা আহ্লাদে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। ভারতীর উভয়
সংখ্যাতে যে হাসির গানগুলি বাহির হইয়াছে, সকল গুলিই সুন্দর, কিন্তু তথাপি সকল গুলিই
রুচিসঙ্গত নহে। ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বা জাতি বিশেষের অসঙ্গত ব্যবহার পরিহাসরসিকের হাস্যো-
দ্দীপক কবিতায় সন্নিবিষ্ট হইয়া অধিকতর হাস্যোদ্দীপক হউক, ক্ষতি নাই, কিন্তু পরিহাস করি-
বার জন্য গায়ে পড়িয়া ঠাট্টা তামাসাটা সকল সময়ে সুরুচিসঙ্গত হয় না। 'স্ত্রীর উমেদার' নামক
গানে ইহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। মাঘের ভারতীতে শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র
রায়ের জ্যোতিষবিষয়ক প্রবন্ধ-চন্দ্র-সুন্দর হইয়াছে। সহযোগী সাহিত্য অগ্রহায়ণে আক্ষেপ
লিখিয়াছিলেন' কবে মাধব বাবু সর্ব্বসাধারণের জন্য লিখিতে আরম্ভ করিবেন?" চট্টোপা-
মহাশয় এবার তাহার উত্তর দিয়াছেন—"মাপ জোক না বুঝিলে জ্যোতিষিক প্রবন্ধ বুঝা যায়
মাপ জোক বুঝাও কিছু শক্ত ব্যাপার নহে, তবে কি না উপন্যাসাদি পড়িতে যেমন ভাবিতে
হয় না, জ্যোতিষীর কথা বুঝিতে গেলে তেমন হয়না, একটু মনঃসংযোগ দরকার করে।"
মনঃসংযোগ করিয়া, মাপজোক বুঝিয়া চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধপাঠ করিবেন, তাঁহাদিগকে মুক্ত
প্রশংসা করিতে হইবে।